প্যারাসাইট

আদিত্য সেন

প্রথম প্রকাশ

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৪

মুদ্রক

নয়া মুদ্রণ
১৬/৩সি, ডিক্সন লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১৪

আমার বাঙালী ভাই-বোনদের হাতে

মুখবন্ধ

দু'টি রেখায় প্যারাসাইট উপন্যাসের বক্তব্য। প্রথম রেখায় প্রেস ও মিডিয়ার কথা ও তার নানা সমস্যার মোকাবিলা। গণতন্ত্রের এই স্তম্ভের মধ্যে অনেক রকম জটিলতা ও চক্রান্তের পাক ধরেছে। দ্বিতীয় রেখাটি ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক-করা ব্রিটিশ রেভিনিউ পলিসি। ব্রিটিশদের অমোঘ পারস্পেকটিভ প্ল্যান আর আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যোগের অভাব ও ঐতিহাসিক নানা সুযোগের অপব্যবহার। ফলাফল যা তা আমাদের স্বভাবের অঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের মধ্যে সব সময় এই রেখাগুলো চোখে পড়ে না, এমন কি পণ্ডিত ও পড়ুয়াদেরও নয়। এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। সহৃদয় পাঠকরা অবশ্যই বুঝবেন যে বাঙালী জাতকে প্যারাসাইট বলা যায় না। তার বর্তমান অবক্ষয়ের কিছু ঐতিহাসিক কারণ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আত্মসমালোচনা পরজীবীদের ধর্ম নয়; ওটা আসে নির্ভীক ও উদাত্ত মন থেকে।

সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় একটি জাত সম্পর্কে যা প্রযোজ্য তা থেকে অন্য রাজ্যের অন্য মানুষ বা জাতও মুক্ত নয়। তবে স্বাধীনতার পর এগিয়ে যেতে গিয়ে বাঙালীরা সবার থেকে পিছিয়ে পড়েছে আর কেনই-বা পিছিয়ে পড়ছে—এই জিজ্ঞাসারই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

বলা বাহুল্য, যে সব চরিত্র প্যারাসাইট উপন্যাসে এসেছে তা সবই কাল্পনিক। কেউ যদি নিজের সঙ্গে এই সব চরিত্রের মিল খুঁজে পান সেটা নেহাতই কাকতালীয়। মানুষ বা চরিত্র তো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; অবস্থা ও পরিবেশ তার পারম্পর্য রেখে চলে। একজনকে ধরে টান দিলে অন্য জন তার সম-পর্যায়ের পরিবেশ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলমি-দলের মত উঠে আসে। সময়টাকে ধরতে গিয়ে তাই আমাকে অনেক ফাঁদ পাততে হয়েছে। কল্পনার মুখে সত্যের মুখোশ পরিয়েছি। তাই যদি কেউ নিজের বোধ, অবস্থা বা ছায়া দেখে আঁতকে উঠে অজান্তে এই আত্মসমালোচনার ফাঁদে পা দেন—তাহলেই আমার উদ্দেশ্য ম্যাজিক দেখাবার মতই সিদ্ধ হয়েছে বলে ভাবতে বাধ্য হব।

এই উপন্যাস লিখতে যাঁরা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নামের তালিকা বিস্তৃত। যখন একেবারে মুষড়ে পড়েছি, ভেবেছি পরিশ্রমটা বুঝি-বা বৃথাই গেল, কবি শঙ্খ ঘোষ তখন তাঁর বিদগ্ধ মন ও সুতীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে প্যারাসাইটের সমালোচনা ক'রে আমার আত্মবল জুগিয়েছিলেন। তাঁর এই ঋণ পরিশোধ করার নয়। এই উপন্যাস ছাপাবার জটিল কর্মকাণ্ডের ভার মাথায় নিয়ে বন্ধুবর নিতাই চট্টোপাধ্যায় আমাকে প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। নয়া প্রকাশের বারীণ মিত্র তাঁর উদার মন নিয়ে এগিয়ে না এলে এ উপন্যাস কোনদিনই আলোর মুখ দেখত না। শিল্পী দিলীপ ভট্টাচার্য লেখার সময় গোটা উপন্যাসটা শুনে আমাকে উৎসাহিত করেছেন; বই-এর হাফ-টাইটেলের রেখাঙ্কনটি তাঁরই। প্রচ্ছদপট অঙ্কনে শিল্পী সুশান্ত কর্মকার ও বন্ধুপ্রতীম শান্ত দত্ত আমাকে তাঁদের পরিকল্পনা ও পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। অন্যান্য আরও অনেক বিষয়ে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম ছেপে ধন্যবাদ জানালে হয়ত তাঁদের ছোট ক'রে ফেলব। তাই এঁরা সকলে পর্দার আড়ালেই রয়ে গেলেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না বলে আমার মনে একটা ফাঁক রয়ে গেল—তবু তাঁদের ইচ্ছাকেই আমি বেশী মূল্য দিলাম।

আদিত্য সেন

॥ এক ॥

শহর কলকাতাকে চিনি না। ড্রইংরুমে কোন অচেনার সঙ্গে পরিচিত হবার মতই অনেকটা।

কলকাতা বলতে কতগুলো চিত্র আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। যেমন হাওড়া স্টেশন। ভারতের পুরণো-হাবড়া সব ক'টা পার্টির যেন প্রকাশ্য লড়াই ; হাতাহাতি, হানাহানি। এ বলে আমার পথ ঠিক, ও বলে আমার ; কে কাকে টেক্কা দেবে তার জন্য হুল্লোড়বাজি, যেন রীতিমত একটা নাটক।

সেই নাটক দেখছিলাম। অসংখ্য লোক নানা ভঙ্গী ক'রে জনসমুদ্রের মত নির্গমনের পথে ধেয়ে চলেছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, কুলির ছুটোছুটি, হানাহানি। মালপত্র নিয়ে কুলি এমন একটা ছুট দিয়েছে, মালপত্র বা কুলি—কারুর মুখই দেখছি না। এক মুহূর্তের জন্য আমি কিরকম যেন নার্ভাস্ হয়ে গেলাম। স্বাতী বিশ্বাস, কলকাতার মেয়ে, সে ধীরে ধীরে নামল, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, মুখে হাসি, যেন কাউকে শক্ দিয়ে ওর ভারি মজা, যেন একটা বোমা ফাটিয়ে একটু সরে গেলেই বিস্ফোরণের বিপদ কাটে। স্বাতীকে আমি কি একটা গোঙানির মত কয়েকটা কথা বললাম, তা ওর মনে ধরল কিনা জানি না, মধ্য বয়সে আমার যৌবন কতটা অবশিষ্ট তার পরীক্ষা দিতে আমি তখন জোর কদমে হাঁটছি, দেখছি কাতারে কাতারে লোক বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কুলি নামক মহামান্য দেবতা কোথাও নেই। আমি এবার ছুটছি, ছুটছি। বুঝতে পারছি খুব অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, স্বাতীর কাছে অমরেশ রায়ের কি ইমেজ্ দাঁড়াল, সেটা ভাববার সময় তখন আমার ছিল না।

আমি দ্রুত স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। স্বাতী বিশ্বাস ততক্ষণে হারিয়ে গেছে। মালপত্র-কুলির টিকি দেখা যাচ্ছে না। ডিসেম্বর মাস। দিল্লীতে থাকতে অভ্যস্ত বলে আমি মোটামুটি সুটেড্-বুটেড্ ছিলাম, কিন্তু আমি বেশ ঘামছি, পকেট থেকে রুমাল বার করে আমি আমার অসহায়তা ঢাকবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম, তার জন্যই বলছি কলকাতাকে চিনি না।

দেখলাম স্বাতী কুলিটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখন স্বাতী এল, কখন-বা কিভাবে কুলিটাকে ধরল আমি কিছুই জানি না। শুধু দেখলাম সকালবেলার সূর্যের একটা মায়াবী আলো আলোকিত করেছে স্বাতীর মুখ। আলোর তীর্যক রেখাঙ্কন দেখছি, অসংখ্য গাড়ি আর ভয়ানক একটা উর্ধশ্বাস মুহূর্তের ওপর। দোতলা বাস, একতলা বাস, ট্রাম, প্রাইভেট্ বাস, ট্যাক্সি, লোকজন, মালপত্র কতগুলো চাকাকে মাথায় ক'রে কলকাতা যেন উর্ধশ্বাসে ছুটছে। আমরা তখন ট্যাক্সিতে বসে আছি। স্বাতী আমার পাশে বসে হাসছে, বলছে—খুব ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন, না?

স্বাতীর কাছে আমার লজ্জার সীমা রইল না। আলো-অন্ধকারের শহর রুদ্ধশ্বাসকে এক মুহূর্তে মুক্ত-নিশ্বাসে পরিণত করতে পারে, আমি তা কী ক'রে বুঝব? তাই আর বেশী কথা না বাড়িয়ে বললাম—সব কিছু হারিয়ে গেলে ভয় পাবারই কথা। মধ্যবয়সে হারাবার ভয়টা একটু যেন বেশী পেয়ে বসে স্বাতী, তুমি ঠিক বুঝবে না।

—আপনার খুব যে একটা বয়স হয়েছে, আমার মনে হয় না।

—যাক্, শুনে আশ্বস্ত হলাম। আমার এখনও চান্স্ আছে বল—। স্বাতী শব্দ ক'রে হাসল। অনেক সময় উত্তর দেয় না, হাসে। আমি বুঝি কি বলতে চায়। তবু আমার ইঙ্গিত স্বাতী বুঝল কিনা ঠিক জানি না। বয়সের কথা উঠলেই স্বাতী কথাটা যেন না শোনার ভান করে। হয়ত ও আমার মধ্যে ভয়ানক একটা বিপ্লবী মানুষ খুঁজে পেয়েছে কিংবা মানুষের যেরকম আজকাল অভাব বা সঙ্কট, তাতে আমার মধ্যে একটা কমিট্‌মেন্ট্ দেখে হয়ত মুগ্ধ হয়েছে স্বাতী। আমি ঠিক জানি না। স্বাতীর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে আমি অনেকবার ভেবেছি, কলেজ জীবনটা যদি কলকাতায় কাটাতাম, স্বাতীর মত একটা জলজ্যান্ত মেয়ে হয়ত আমার বান্ধবী হত। আজকাল যেমন দেখি রেস্তোরাঁয়, কফি-হাউসে সিনেমায় বা থিয়েটারে, ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে তুই-তোকারি করে, তবে একজন আরেক জনকে ঠিক ভালবাসে কিনা বুঝে উঠতে পারি না।

স্বাতীর সঙ্গে কিভাবে আমার আলাপ হয়েছিল মনে পড়ে গেল। একটা সেমিনারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী প্রফেসর সুনীল দাসকে ডেকেছিলাম, স্বাতী এসেছিল তাঁরই সঙ্গে। স্বাতী ওঁর খুব প্রিয়, বাংলার রণতরীর ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করছে। অসাধারণ কাজ করছে বলে ও এখন

প্রফেসর সুনীল দাসের ডান হাত। মাঝে মাঝে তাই সেমিনারে স্বাতী বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি ঘটে। প্রফেসর ওর মধ্যে আগামী দিনের ভবিষ্যত খুঁজে পেয়েছেন।

আমি সেবার রেডিও থেকে একটা সেমিনার কন্‌ডাক্ট্ করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। লেখকদের কমিট্‌মেন্ট্ নিয়ে সরকার তখন খুব ভাবছেন। ডি, জি, অর্থাৎ দিল্লীর খোদ্ বড়কর্তা, নিজে হিন্দী সাহিত্যিক, এটা তাঁরই আইডিয়া। কাগজে, ম্যাগাজিনে, সিনেমায়, রেডিওতে বা টেলিভিশনে যাঁরা বক্তৃতা দেন, দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবেন—তাঁদের ব্যক্তিগত কমিট্‌-মেন্ট্‌টা কোথায়, জানলে ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের বোঝার নাকি সুবিধে হবে সরকারের! ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালদের সরকার কতটা বুঝেছেন সেমিনারের পরেও তা ঠিক ঠাহর করতে পারি নি। তবে যেসব মূল্যবান 'পেপার' পড়া হয়েছিল, সেগুলি বই আকারে বার করার জন্য আমি মিডিয়া ইউনিট্‌দের কাছে সাজেস্ট্ ক'রে লিখেছি। ওটুকুই হয়; এর বেশী নয়। আলাপ-পরিচয় করতে অবশ্য সেমিনারই প্রশস্ত পথ। সরকারের পলিসি নিয়ে গালাগালি দিতে পারা মস্ত বড় ডেমোক্র্যাসি, যদিও সরকারের আয়োজিত সেমিনারে যোগ দিতে রাজী না হবার কোন অর্থ নেই। ওটাও কম প্রেস্‌টিজ্ নয়।

আমার অবশ্য ওতে ঠিক বিশ্বাস নেই। আগে এরকম বেশ কয়েকবার মিটিং হয়ে গেছে মিনিস্টারের সঙ্গে। যদিও জানি নতুন রাজা এলেই রাজত্বের একটু পরিবর্তন ঘটে। যাঁরা রাজত্ব চালান, তাঁরা অবশ্য এটা স্বীকার করেন না। সরকারের কাজে-কর্মে আমাদের মত সরকারী কর্মচারীদের কতটা বিশ্বাস, বা আমাদের কাজের সম্পর্কে সরকারের কতটা আশা-আকাঙ্খা—সেটা যাচাই করার জন্যই এই সব মিটিং—সেটা আমরা বুঝি। ওরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ মিনিস্টার বলেছিলেন, আমরা নাকি ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করি, নিউজ দি। যেহেতু দেশের দূর দূর সীমান্তে রেডিও শোনে, তাই নিউজ বাছার ব্যাপারে আমাদের প্রফেশনাল্ ব্যুৎপত্তি কতটা সেটা জানা দরকার। ওভাবে কী কমিট্‌মেন্ট্ বোঝা যায়? মন্ত্রীমহোদয়কে সে কথা কে বোঝাবে? আমরা অবশ্য এটুকুই বুঝলাম, মিটিং করার পেছনে উদ্দেশ্য যা, তা কোনদিন আমরা জানতে পারব না। তবে সরকার আমাদের দেখতে চান এবং সরকারের কাজকর্মের প্রতি আমাদের কতটা বিশ্বাস আছে,

তা কথাবার্তায় যতটুকু বোঝা যায়, সেটা নাকি সরকারের ভবিষ্যৎ-নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে দরকার। আসলে সরকারের যা আশা বা সরকার যা চান আমরা জানি। তার জন্য আনুষ্ঠানিক মিটিং করার দরকার নেই। কিরকম খবর দিলে সরকারের মনঃপূত হবে সেটাই মিনিস্টার বলতে চেয়েছিলেন। স্পষ্ট করে তিনি বলেন নি, কারণ তিনি শুনলাম, প্রকৃত ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাসী ; তবে তিনি এটা বলতে চেয়েছিলেন যে দেশের সর্বত্র যে বুরোক্র্যাটিক্ নাগপাশ, তা স্বাধীন চিন্তায় নাকি ভীষণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা যেকোনও সময়ে যেকোনও বিষয়ে ইচ্ছে করলে হাই-অ্যারকীর পরোয়া না করে মিনিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি। আমাদের মধ্যে ইনিশিয়েটিভ্ জাগাতে পারলে অনেক বেশী কাজ হবে ; হাইঅ্যারকী বা চিরকেলে বুরোক্র্যাটিক্ এটিচ্যুড্, মিডিয়া ইউনিট্‌গুলির যোগ্যতা বা কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে না, ইত্যাদি। আসল-কথা অন্যখানে। সেই মিটিং-এ এক জায়গায় এও বলা হয়েছিল যে আমাদের অভিযোগ বা বক্তব্য সব শোনা হবে এবং তা মেটাবার যথাসাধ্য চেষ্টাও করা হবে কিন্তু যে লয়াল্টি সরকার আমাদের কাছ থেকে আশা করেন, তার হেরফের হলে মন্ত্রীমহোদয় সব খবর পাবেন। স্বাধীনতা বা ডেমোক্র্যাসির অর্থে যেন আমরা স্বেচ্ছাচারিতা না বুঝি। এটা অনেকটা থ্রেটের মত শুনিয়েছিল। মিটিং-এর পরে ডি,জি,-কে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, এভাবে চাপা থ্রেট্ দিয়ে কিছু লাভ হয় না। বুরোক্র্যাসির জাল ওভাবে দূর করা সম্ভব নয়। প্রধান মন্ত্রী কিছু বললে ওটা আমাদের খবরের লিড্। সেটা না বলে দিলেও আমরা বুঝি। আমরা জানি, কতকগুলো অপরিজ্ঞাত নিয়মে সরকারী সংস্থা চলে এবং তার অদৃশ্য নিয়মে আমরা বাঁধা। ডি, জি, হেসে বলেছিলেন—মিনিস্টার সবার সঙ্গে মিট্ করছেন। এটাই তো একটা হ্যাপি ট্রেণ্ড। আপনার সেমিনার কতদূর এগোল ? বলেছিলাম—মাসখানেক সময় দেওয়া হয়েছে। কাগজের লোকের চেয়ে আমি সাহিত্যিক ও প্রফেসরদের বেশী ডাকতে চাই। এদেশের সাহিত্যিক বা চিন্তাশীল প্রফেসররা যদি ন্যাশন্যাল্ প্রবলেম নিয়ে বেশী মাথা ঘামান, তবে সরকারের হাত মজবুত হবে। ডি, জি, আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন —আপনি শুধু নিউজের লোক নন, সাহিত্যিকও। তাই মিনিস্ট্রিতে যখন এই বিশেষ মিডিয়া সেল্ খোলা হল, তখন আপনার নামটা আমিই সাজেস্ট

করেছিলাম। আমার হাসিটা নিশ্চয় দেখবার মত হয়েছিল, কারণ যাতে আমার আস্থা নেই তাতে আস্থা আছে এই ভাবটা আমাকে নাটক করেই ফুটিয়ে তুলতে হয়েছিল। সেমিনার করে বা মিটিং করে দেশের অনেক সমস্যা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি, সেটাই বোধ হয় সেমিনার করার সবচেয়ে বড় লাভ। সেমিনার করেই স্বাতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল—একেবারে লাভ হয় না, কে বলল ?

হাওড়া ব্রিজ পেরোবার সময় আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। যতবার কলকাতায় যাই আমি এভাবেই গঙ্গার উত্তর-দক্ষিণে নজর ছাড়ি। দূরে দূরে বজরা, আরও দূরে একটা জাহাজ। ওটা বোধহয় চাঁদপাল ঘাট। জেটি। গঙ্গার ঘাটে স্নান করার লোক কলিকালে কী বেড়ে গেল ? না কী আজ কোন স্নান করার বিশেষ পর্ব বা তিথি ? গঙ্গার ঘাট দিয়ে বহু লোক পাড়ে উঠে আসছে। স্বাতী ওদিকে তাকিয়ে ছিল। দূর থেকে মানুষের মুখগুলো ঠিক যেন ঠাহর করা যায় না, শুধু মাথাগুলো চোখে পড়ে।

স্বাতী বলল—এরা ফেরিঘাটের যাত্রী।

মুহূর্তের মধ্যে খুলনার ভৈরব-রূপসা নদীর কথা মনে পড়ে গেল। ফেরি-ঘাটে দাঁড়িয়ে থেকে আমি দূরের ষ্টীমারগুলি দেখতাম। অদ্ভুত একটা বোটকা গন্ধ। দূর পৃথিবীর ডাক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠত ষ্টীমারগুলি। রূপসা নদীর পাড় ছুঁয়ে গোয়ালন্দ হয়ে শুনেছিলাম ষ্টীমারগুলি ফরিদপুরের দিকে যায়। ঠিক যে কোন্ রুটে যায় জানি না। তবে এটুকু জানি বাবা খুলনা থেকে বছরে দু'বার দেশের বাড়ি ফরিদপুরে ষ্টীমারে ক'রে যেতেন।

কলকাতার মুখ দেখা মানে অসংখ্য অনাবিল লোকসমুদ্র দেখা। নিজের অস্তিত্ব যেন ভুল হয়ে যায়।

প্রফেসর দাসের কথায় আমি স্বাতীকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেব। সেখান থেকে আমার যাবার কথা রেডিওতে। কোথায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এখনও জানি না।

ট্যাক্সিটা শ্যামবাজারের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে মহা ভুল করেছি দেখছি, এগোতে পারছে না। সরু একটা পথ। ঠেলাগাড়ি, ট্রাম, বাস, রিক্সা, লোকজন—এরচেয়ে হেঁটে গেলে হয়ত আগে পৌঁছে যেতাম।

স্বাতী বলল—চুপচাপ বসে থাকুন—ছুটির দিনে সকালবেলা এত বেশী জ্যাম হবার কথা নয়। আজকে নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু আছে তাই লোকজন বেশী।

—বিশেষ কিছু থাকলে গোটা কলকাতা কী একটা গলিতে ঠেসে মরে ?

—হ্যাঁ, স্যার। আমরা ঠেলাঠেলি ক'রে চলতে ভালবাসি। ফুটপাত দোকান-পাটে ভরা। আমাদের চলার জায়গা নেই।

—তাহলে ট্যাক্সি করা কেন ? হেঁটে গেলেই হয়। বা একটা রিক্সা।

—তাই করুন। এখান থেকে কলেজ স্ট্রীট খুব দূর নয়—স্বাতী ঠাট্টার ছলে বলল।

সেটাই করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ট্যাক্সিটা সাঁ ক'রে ঘুরে কোনদিকে না তাকিয়ে শ্যামবাজার মুখো ছুটল।

স্বাতী হেসে উঠল, বলল—দেখলেন, অদ্ভুত একটা রোমান্স হত, তা আর হল না।

বললাম—কিরকম রোমান্স ?

—এই যে মধ্যবয়সী একজন মানুষের সঙ্গে কলকাতার এক টগ্‌বগে তরুণী রিক্সায় বসে ঠন্‌ঠন্‌ করতে করতে চলেছে—

—এরমধ্যে রোমান্স কোথায় ? মানুষের ঘাড়ে চেপে শক্ত-সমর্থ দু'টো লোক ছুটে যাবে—সেটা কী খুব শোভনীয় ব্যাপার ?

—শক্ত-সমর্থ লোকেই তো দুর্বলের ঘাড়ে চাপে।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

বললাম—তোমার রিসার্চ কত দূর এগোল ?

স্বাতী বলল—বাঙালী প্যারাসাইটিক্ জাত। এটাই প্রমাণ করবো তো, তাই একটু সময় লাগবে।

—বললেই তো আর বাঙালী জাত তোমাকে বাহবা দেবে না, প্রমাণ কী ?

বলল—যেমন আমি দেখাচ্ছি ভূমির থেকে বাঙালী চিরকাল সরে থেকেছে। যাঁরা জমিদার ছিলেন তাঁরা কুসীদবাণিজ্য ক'রে কিংবা সাহেবদের মোসায়েবী ক'রে প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন। এঁরাই পরবর্তী কালে জমির মালিক হয়ে বসেন। সুতরাং এঁদের থেকে কৃষকরা কী আশা করতে পারে, বলুন ?

—এর থেকে রণতরীর লিঙ্ক করবে কী ক'রে ?

স্বাতী বলল—সেটাই তো কথা। রণতরী বাংলার একদিন বড় শিল্প ছিল। এসব সমৃদ্ধ শিল্প হারিয়ে গেল কেন ? তার কারণ হিসেবে আমি দেখাতে চাই বাঙালী নন্-প্রডাকটিভ এফর্টে বেশী উৎসাহী। ত্রিশ জন

লোকের মধ্যে বারো-তেরোজন পরিবার তৎকালে প্রচুর টাকা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা মায়ের শ্রাদ্ধে বা উৎসবে-অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন, খিস্তি-খেউড়ী বা কবিদলের জন্য টাকা খরচ করেছেন, মন্দির করতে কম্‌পিটিশন্ ক'রে টাকা ঢেলেছেন, সাহেব-মেমকে খুশী রাখতে বাইজিদের নাচ-গানের ব্যবস্থা করেছেন, এক বাড়ির দুর্গা পূজো অন্য বাড়ির পূজোকে টেক্কা দিয়েছে, কিন্তু কি ক'রে একটা শিল্প গড়ে উঠবে, বা ক্যাপিট্যালকে কিভাবে খাটালে দশটা লোকের অন্ন সংস্থান হবে—সে দিকে কারুরই নজর ছিল না। অতএব বাঙালী আগেও যা ছিল, এখনও তাই। প্যারাসাইটিক।

আমি বাধা দিলাম। বললাম—তুমি বোধহয় একটু ভুল করছো স্বাতী। শিল্প তো শুধু ইনড্রাস্ট্রি নয়। কতরকমের শিল্প আছে, যেমন ধর কারুশিল্প, চারুশিল্প যা ফাইন আর্টস্। যে শিল্পের কথা তুমি বলছো ওটা চাইলেই গড়ে ওঠে না। ওর জন্য শুধু টাকা হলেই হয় না, মেহনত চাই, সরকারের উৎসাহ চাই আর লেগে থাকা চাই। শিল্প গড়ে ওঠে মাস্ বেস্-কে কেন্দ্র করে—তাই ওতে অনেকের সুবিধে হবার কথা—এটা ঠিক। কিন্তু বাঙালী তো অন্য দিকে তার মেধা বাড়িয়েছে—মানসিক স্ফুরণের জন্য সে বেছে নিয়েছে কারুশিল্প, চারুশিল্প, সাহিত্য বা গান। থিয়েটার আর সিনেমাতো আছেই। তাও তো কিছু কম নয়!

স্বাতী মানতে চাইল না। বলল—ওভাবে গোটা জাতটার কতটা মানসিক স্ফুরণ হয় জানি না, কিন্তু একটা শিল্প গড়ে উঠলে গোটা জাতটার জীবনধারণের পরিবর্তন আসে, দৃষ্টিভঙ্গী পালটায়। বৃহত্তর স্বার্থে তা অনেক বেশী কাম্য। প্যারাসাইটিক দৃষ্টি থেকেই ওদিকে অনীহার জন্ম।

—এসব আবলতাবল লিখলে পি, এইচ, ডি, আর পেতে হয় না।

—জানি।

—তবে?

—দেখি কতদূর হয়। আসলে, যা আমার রিসার্চ পেপার, কতদিন আগে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু পড়তে পড়তে এমন সব জায়গায় জড়িয়ে পড়ছি যে আমি আর লিখতে পারছি না, শুধু ভাবছি।

—হুম্-ম্, খুব মুশকিল। এ্যাকসেপ্‌টেড্ নর্মস বা ফর্মস্ থেকে একটু পা বাড়ালেই মুশকিল। প্রফেসর দাস কী বলেন?

—খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। তবে আমিই এগোতে পারছি না।

ট্যাক্সিটা শুভক্ষণে কেশব সেন স্ট্রীটে এসে গেছে।

স্বাতীদের বাড়ি বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে একটা গলির মধ্যে।

একটা পরিচিত রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে মালপত্র ট্যাক্সি থেকে নামাল। রাস্তায় তখন বিস্তর লোক। বহু লোক দোকানে দোকানে জটলা করছে। ব্যাঙ্গালোরের ক্রিকেট কমেন্ট্রি শুনছে ছুটির দিনে। লোকেদের একটু যেন বেশী উৎসাহ। কপিল দেব একটা ছক্কা মেরেছে আর হৈ-চৈ ক'রে লাফ দিয়ে উঠল ছেলেরা। একটা লোক স্নান করছিল, হাসি ছড়িয়ে সে আরও তিন ঘটি জল ঢালল।

ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। স্বাতীর বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল স্বাতী—রেডিওর একজন বড় আফিসর মিঃ অমরেশ রায়। প্রফেসর দাস এঁকে দেখতে পেয়ে কলকাতায় আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তবে দিল্লীর লোক তো, হাওড়া স্টেশনেই হারিয়ে যাচ্ছিলেন।

স্বাতীর বাবা ব্রজেশ বিশ্বাসকে একটু যেন কন্‌জারভেটিভ্ মনে হল। বললেন—বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তোমার কষ্ট হল তো!

—একদম না। দিল্লীর লোকের বোঝা বইবার ক্ষমতা থাকে।

স্বাতীর মা প্রভাবতী দেবী বেশ হাসিখুশী মানুষ। হেসে এসে দাঁড়ালেন। প্রণাম করলাম। বললেন—থাক্ বাবা, থাক্। সময় ক'রে এসো।

আমি উঠে পড়লাম। স্বাতী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কোথায় উঠবেন?

হেসে বললাম—এখনও জানি না। রেডিওতে গেলে বুঝতে পারবো। তোমাকে জানাবো।

দুই

আকাশবাণী আমার খুব আদরযত্ন করছে ; ডি,জি,-র লোক হলে এরকম নাকি খাতিরযত্ন পাওয়া যায়। পার্ক স্ট্রীটের এক হোস্টেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। মরশুমে কলকাতার সেরা পাটালি গুড় অথবা মধু ভেট পাঠাতে ভোলে না, এরকম একটি স্মার্ট তরুণ আমাকে হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে উঠিয়েছে এবং যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী আদরযত্ন করছে।

ঘরখানা বেশ বড়। একদিকে ডানলোপিলোর গদি, ততোধিক সুন্দর বেড কভার—বউ না থাকলেও শুতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এক রাতের সঙ্গীনী চাইলেও নিজের আইডেন্‌টিটি বজায় রাখতে পারা যায়—এতটা জায়গা। ঝক্‌ঝকে ফ্রেমে-আঁটা মশারী ; মশার হুল ফোটা থেকে বাঁচার জন্য যে প্রয়োজন তা নয়, অন্ধকারে যদেচ্ছাচারেরও একটু আড়াল। কোণের দিকে একটা লেখার টেবিল ; রাতে অফিসের দায়িত্ব সামলাতে বা মাঝে মাঝে প্রেম-পত্র লিখতে এটা আমার দরকার হয়। বইয়ের একটা র‍্যাক ; কিছু বই আমি সাজিয়ে রাখতে ভালবাসি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দু'এক খণ্ড ছাড়াও, জে, বি, প্রিস্টলের 'লিটারেচার এ্যাণ্ড ওয়েস্টার্ন ম্যান', বরিস্ প্যাস্‌টারন্যাকের 'ডক্টর জিভাগো', সাত্র্-এর 'দি এজ্ অব রিজন'—এগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়ি। কতকটা অন্যকে দেখাতে, আবার কখনও-বা নিজেকে দেখতে। দেয়াল আলমারী। আমার খুব সুবিধে হচ্ছে। কাপড়-চোপড় তো ঢুকিয়ে রাখিই—অনেক সময় নিজেকেও ঢুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। অ্যাটাচ্ বাথরুম এবং বড় আয়না ; রূপসী মেয়ের নগ্ন রূপ দেখার জন্য বোধ হয় আয়না ; পুরুষের নগ্নতা বড় কুৎসিত ; কারণ পুরুষ নানাভাবে নগ্ন হতে জানে। মাথার দিকে জানলা খুললে উঁচু উঁচু বাড়িঘেরা পার্ক স্ট্রীটে চোখ আটকে যায়। পুরণো কলকাতা বিস্মৃত সাহেব বা দেশী মেমসাহেবের মুখ নিয়ে ভেসে ওঠে। স্বপ্নেও মেমসাহেব বড় উপাদেয়—রাজার জাতের নগ্ন শরীর না জানি আরও কত সুন্দর। দূরের গলিতে নিম গাছের একটু সবুজ ছোঁয়া ; পড়ন্ত সূর্যের একটু রঙ ধরে। পার্ক স্ট্রীটের

মন্না ও ভরা যৌবনের মত। অন্য দিকের জানলা দিয়ে বড় রাস্তা দেখা যায়; আর কলকাতার একটু কৃপণ আকাশ। ভিডিও-তে যেন দেখি অসংখ্য মানুষ ছুটে চলেছে, অসংখ্য গাড়িঘোড়া আর অজস্র মুহূর্ত। ট্রাম-বাসের একটা বোবা শব্দ। যেন আধুনিক ঘুম-পাড়ানি গান। নয়েজ-এ খুব যে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তা ঠিক নয়—কিন্তু অনেকের মত, আমারও, শুতে যাবার আগে একটু পাশ্চাত্ত্য সিম্ফনী অথবা কোন রাগপ্রধান গান বা একটা বইয়ের মত কতগুলো দাসত্ব বা অভ্যাস রীতিমত বাঁচিয়ে রাখে। নির্জনতা আমাদের কাছে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা; অনেকটা আত্মঘাতের মত।

পাশাপাশি ঘর। করিডরের অন্য আর একদিকে মিঃ রবি চৌধুরী পরিবার নিয়ে থাকেন। গোলগাল ফর্সা মুখ। বিলাসী টানা চোখ। চওড়া কপাল, হালকা চুল। কান দু'টো সামনের দিকে একটু বাঁকান, মনে হয় খেপে গেলে জমিদারের প্রতিনিধির মতই নিষ্ঠুর। স্ত্রী রুবি, হোটেল রেনভোঁ-এর রিসেপ্‌শনিস্ট। হাসিটি মুখে লেগে আছে। ওটা বোধহয় হোটেলে চাকরী করার ডেজায়ার্ড্‌ কোয়ালিফিকেশন্‌। মানুষ সম্বন্ধে আশ্চর্য আগ্রহী, অল্পেতেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে।

এঁরা দু'জনেই আমার খুব খাতিরযত্ন করছেন। একটু কথাবার্তার পরেই বুঝলাম এঁরাই আমার এখানে থাকার স্পেশাল ব্যবস্থা করেছেন। সারা বাড়িটায় এঁদের খুব নাম-ডাক। কে যে কোথায় থাকে জানি না। আশেপাশে অনেক এরকম পোষ্যবর্গ, কে চাকর, কে খানসামা বা কার যে কী কাজ বোঝা মুশকিল। মিঃ চৌধুরী যখন আসেন, লিফট্‌ম্যান কি ক'রে যেন টের পায়। এসে স্যালুট্‌ ঠুকে দাঁড়ায়। ওঁর সঙ্গে এলে, ভদ্রলোক কখনও আমাকে আমার ঘরে সোজা ঢুকতে দেন না। টেনে নিয়ে যান নিজের ঘরে। কিংবা নিজেকে দেখাতে। রুবিকে অবশ্য হোটেল রিসেপ্‌শনিস্ট্‌ কেন, এ্যয়ার হোস্টেস্‌ হিসেবেও মানিয়ে যেত। সেবার ভাবটা ঠিক ওরকমই। চৌধুরী এলে গায়ের কোটটা খুলে নেয় রুবি। পা দু'টো তিনি বাড়িয়ে দেন চাকরের দিকে—হাত দিয়ে টেনে নেন টাইটা আর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করেন 'ই-য়্যফ'। তখন মনে হতে পারে মিঃ চৌধুরী ফ্যিউডাল্‌ লর্ড কিংবা সিনেমার হিরো। একবার দেখেছিলাম একটা নাটকের গ্রীণরুমে—সিনেমার হিরোকে কাপড় পর্যন্ত পরিয়ে দিচ্ছে চাকর, পাঞ্জাবী দিচ্ছে এগিয়ে। তিনি নাটকের অবসরে সর্বাঙ্গ এলিয়ে

দিয়েছেন। সামর্থ থাকলে সব কিছু নিজে ক'রে নেবার স্লেভারি প্রকৃত পুরুষের ঠিক মানায় না। ঠাঁটে থাকার এলেম চাই। ওটা জাতব্যবসা না হোক, কিছুটা নিশ্চয় ব্রিডিং-এর গুণ।

এ হোস্টেলের আশেপাশে নিশ্চয় আরও বেশ কয়েকটি পরিবার থাকেন। দু'টো ক'রে ঘর। বেশ ছিম্‌ছাম্‌। মিঃ চৌধুরীর তিনটে। ওটা বোধহয় নিজস্ব বিলাস-কক্ষ বা গেস্ট্‌ রুম। মিঃ চৌধুরী সব ব্যাপারেই ল্যাভিশ্‌; আলাপ-পরিচয় করাতেও। দিল্লী থেকে কেউ এলে সে যে রীতিমত দর্শণীয় বস্তু হয়ে যায়, আমার ধারণা ছিল না।

লোকজনের আসাযাওয়া, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাসিগল্প আলাপ-পরিচয় বড় তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে। ঘটাচ্ছেন মিঃ চৌধুরী। পাশেই থাকেন মিঃ মুখার্জী। তিনি কিংবা তাঁর বউ যে আর্টিস্ট, বোঝা যায়। ভদ্রলোকের কালো রঙ কিন্তু তীক্ষ্ণ চেহারা। বিশেষ ক'রে চোখের দৃষ্টিতে সব কিছু ধরে রাখার একটা তীক্ষ্ণ গতি। মিসেস মুখার্জীও বোধহয় শান্তিনিকেতনে পড়েছেন; বাটিকের কাজ করেন আর খুব আলাপী। ঘরে দেখলাম অবনঠাকুরের একটা ছবি আর শান্তিনিকেতন স্টাইলের ডেকরেটিভ্‌ পিস্‌। যাঁরা আসছেন, যাচ্ছেন—এঁরা কলকাতার সব প্রতিষ্ঠিত মানুষ; দিল্লীতেও এঁদের আমি চিনি। যাঁরা দিল্লীতে তাঁরাই আবার অন্য নামে কলকাতায়। এঁরা সবাই ভারতের প্রগতির কল্যাণে বেশ সুখে আছেন। যেখানেই থাকুন—ভাবধারা এঁদের এক ও অভিন্ন; একই ভাবে এবং একই সময়ে লিবারেল্‌, মিশুকে এবং মদের গ্লাসে ভয়ানক জেনারস্‌। সব রাজ্যের ফাইভ্‌ স্টার হোটেলের যেমন এক রূপ। অন্ধকারে বা একটু আলোতে উন্মত্ত নারী কণ্ঠের সাড়া-জাগান গান। মিঃ চৌধুরী আলাপ করাচ্ছেন এবং কে কোথায় কাজ করেন, আমাকে বলে যাচ্ছেন। সবটা মনে রাখতে পারছি না। পারছি না তার কারণ বোধহয় চাই না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি সবাই বড় বড় চাকুরে, ব্যবসাদার বা প্রাইভেট ও পাবলিক্‌ সেক্টরের চাঁই ব্যক্তি। কে কোথায় থাকেন আমি ঠিক জানি না। পার্ক সার্কাসে না থাকুন, এক অদৃশ্য আঁচলে সবাই সবার সঙ্গে জড়িত। অর্থ, নারী বা সুরার সব ইন্‌ভিসিব্‌ল্‌ ম্যান। যদিও আমি সবার সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না কিন্তু ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী-আগরওয়াল-ঢান্‌ঢারিয়া আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে খুব ব্যস্ত। অন্তত ইন্‌টারেস্ট্‌ দেখাচ্ছেন এবং আলাদা

ক'রে হোটেলে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কিন্তু মিঃ চৌধুরী যার খিদ্‌মদের দায়িত্ব নিয়েছেন, অন্য কারুর নাক গলাবার অধিকার নেই।

ঘরে হালকা সাদা নেটের পর্দা। সচরাচর যা দেখা যায় না। আলো এসে পড়লে আর পর্দা সরিয়ে ড্রইংরুমে কেউ ঢুকলে, হঠাৎ মনে হয়, নাটকের কোন চরিত্র দেখছি ; কোন একটা বিশেষ রোলে কেউ ঘরে এসে ঢুকল। কথা বললে মনে হয় পার্ট বলে যাচ্ছে এবং আমি সেখানে শুধু দর্শক। আর চোখের সামনে যা একটু টুকিটাকি আলাপ, একটু হাসি বা কথাবার্তা, সব জায়গায় সচরাচর ঠিক ঘটে না, তাই নিশ্চয় স্বপ্নে দেখা মানুষ বা ঘটনা— জেগে উঠে সব যে মনে থাকে তাও নয়, হঠাৎ কোন দৃশ্য মনে পড়ে যায়।

নিজের অফিসের কাজ ছাড়াও এক'দিনে কত কিছু দিগ্বিজয় ক'রে ফেললাম। বই পাড়ার পুরণো বইপত্রের মধ্যে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস'-টা চোখে পড়ল। নতুন দাম পঁয়ত্রিশ টাকা। অথচ পনের টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। স্বাতী ইকনমিক্সের ছাত্রী—এটা কী পড়েছে? একবার ভাবলাম কিনে নি, বড় সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, আবার ভাবলাম, এ বইটা পড়েনি হতেই পারে না। একটা মূল্যবান বই দেখলাম, ব্রিটিশ সরকারের 'ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড রেভিনিউ পলিসি'। এটা স্বাতীর নিশ্চয় দরকার। পড়ে থাকলেও ঘরে রাখার জিনিস। বিশেষ ক'রে ও যখন ওরকম একটা শক্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। বইটায় আই. সি, এস, রমেশ দত্তের যুক্তি ব্রিটিশ সরকার খণ্ডন করেছেন। দত্ত সাহেব বলতে চেয়েছিলেন, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আকবরের সময় নেওয়া হত বছরে ছ' কোটি টাকা কিন্তু সেটা ব্রিটিশ সরকার বাড়িয়ে চার কোটি টাকা করেছেন বলেই দেশে এত দুর্ভিক্ষ। স্বাতীকে বলতে হবে। আমার আগ্রহ দেখে কিংবা কলকাতার লোক নই হয়ত আন্দাজ ক'রেই লোকটা পঁচিশ টাকা হাঁকিয়েছে। দশ দিতে রাজী, তাও স্বাতীর জন্যে। দিল না। এরমধ্যে এক দিন বড়বাজারের দোকানপাট আর পাঁক দেখে এলাম। বড় বড় গাড়ি এক হাত পাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সারা রাজ্যের ইকনমিটা যাদের হাতে তারা কী সব পাঁকাল মাছের মত কলকাতায় থাকে? রামকৃষ্ণ সংসারে থাকতে বলেছেন পাঁকাল মাছের মত, তাহলে এই জীবনেই মুক্তি। এরা বড় তাড়াতাড়ি সেই মুক্তির পথ ধরে ফেলেছে।

রাস্তায় চলতে চলতেও ঘুরপাক খাচ্ছি। পথ দেখাতে কলকাতার মত কেউ পারবে না। অন্যকে পথ দেখাতে বাঙালীর মত এত বড় উদার জাত আর নেই। খুলনার মেলায় লোকজনের মধ্যে সুন্দর মনোহারী জিনিষপত্র দেখতে দেখতে আমি প্রতিবার হারিয়ে যেতাম আর বাবা ঠিক আমাকে খুঁজে বার করতেন। এখানেও কলকাতায় নানা স্থানে, নানা করিডরে, নানা অফিসে আমার হারিয়ে যাবার ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে এবং কি আশ্চর্য, কেউ-না-কেউ আমাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। পার্ক স্ট্রীটের এ বাড়ি-টাকেও সবসময় খুঁজে পাই না। ঘুরতে থাকি। অবশেষে হয় লিফট্‌ম্যান, না হয় ব্রিটিশ যুগের কোন বিশ্বস্ত খানসামা অথবা মিঃ রবি চৌধুরী নিজে আমাকে ঠিক খুঁজে বের করেন। অদ্ভুত এঁদের ক্ষমতা। লিফট্ ক'রে উপরে ঠিক তুলে আনেন।

একা একা যখন একটু মৌজ ক'রে থাকতে চাই, মিঃ চৌধুরী এসে বলেন—চলুন, আমার ঘরে চলুন। ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী যেদিন অনুপস্থিত সেদিনই বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর মনের ছট্‌ফট্‌নি লেগে যায়। রুবি অনেক রাতে ফেরে। আমি যাই। জিজ্ঞেস করেন—কি খাবেন? হুইস্কি না রাম? আমার আবার হুইস্কি পোষায় না। একটু রামনামই ভাল। পুণ্য হয় আবার অল্প একটু নেশাও।

দু'জনে খাই আর কলকাতার নানা গল্প হয়। কিছুক্ষণ পরেই দেখি কি কারণে যেন মিঃ চৌধুরী ছট্‌ফট্ করতে থাকেন। কথাও বলেন ছট্‌ফটিয়ে। সব মানুষেরই বোধহয় নানা দুঃখ থাকে কিন্তু মিঃ চৌধুরীর ঠিক যে কি দুঃখ বুঝতে পারি না। এই মুহূর্তে তাঁর একটি মাত্র দুঃখ—সরকার ওঁকে শুষে শেষ ক'রে দিল। এটা বোঝেন না, সব মানুষই শোষক এবং শোষিত।

তাই ভরসা দিয়ে বললাম—ছেড়ে দিন না। সরকারের মাইনে তো আপনার কাছে এক টিপ্ নস্যি।

—না কক্‌খনো নয়। কোন কিছুই ছাড়তে নেই। সাজানো বাগানের ফুলগুলো কী তুলতে আছে—কি, বলুন? এই বলছিলেন এক কথা, এই বলছেন অন্য। সত্যি, মানুষটাকে ঠিক সাইজ্-আপ্ করা মুশকিল—কি যেন এক ভয়ানক ঝড়, কিংবা বাতাস বা ছট্‌ফটানি।

আমিও কথার সুর ঘুরিয়ে বললাম—বেশ, তাহলে ছাড়বেন না।

কথাটা ওখানেই শেষ করলেন না, বুরোক্র্যাট্‌রা যেমন শেষ উক্তি করতে নারাজ, তেমনি সুতোটা আরও একটু ছেড়ে দিয়ে বললেন—আমি এবিষয়ে অবসর সময়ে আরও একটু আলোচনা করতে চাই।

চেপে ধরলাম—রোজই তো বলেন আলোচনা করবেন। অথচ করেন না। কি ব্যাপার?

—আচ্ছা ধরুন, যদি আমি দিল্লীতে ট্রানস্‌ফার নি—আপনি কী আমাকে হেলপ্‌ করতে পারেন?

—ও ভুলটি করবেন না। আমি যেন আঁৎকে উঠলাম। যেকোন কল্কের জোরেই চৌধুরী দেখছি একজন ফিউডাল্‌ লর্ড। এদিকে যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রীতিমত প্রগ্রেসিভ্‌। সে মানুষ কিনা দিল্লী যাবে? যেখানে মানুষের স্বাধীন সত্তার কোন মূল্য নেই? চৌধুরী জানেন না, দিল্লীর মাটির কোন রঙ নেই, অনেক তাক করলে বোঝা যায়, জং-ধরা রঙ। জীবনধারণ ও সামাজিক প্রতিপত্তির মাপকাঠি এখনও সেখানে ডেপুটি সেক্রেটারী। ভাবলাম, মানুষ কত স্বপ্নবিলাসী হয়। মিঃ চৌধুরীর মত মানুষ দিল্লীতে বড় জোর কন্‌ফারেন্সে যেতে পারেন অথবা সেমিনারে। এবং সরকারী খরচায়। যেকোন বিষয়ে এঁকে এক্স্‌পার্ট সাজান যায়। বড় জোর আমার মত কাউকে হয়ত স্পন্‌সর্‌ করতে হবে। এখানে তিনি আমার জন্যে করছেন, ওখানে না-হয় আমি এঁকেই স্পন্‌সর্‌ করলাম। আধুনিক যুগটা ত এই লেনদেনের ওপরেই ভরসা করে চলেছে। আজকাল এক্স্‌পার্ট্‌ জাতীয় ব্যাপারগুলো ওভাবেই হয়। একজন আর একজনকে ধরে টানে আর সেই টানে উপরে উঠে পড়লেই হল।

আসলে চৌধুরী আমাকে হয়ত বড় একজন অফিসর ঠাওরেছেন। ওঁর নিশ্চয় মনে হয়েছে মিনিস্টার আমাকে চেনেন, আমি ডি, জি,-র লোক অতএব আমি নিশ্চয় সাংঘাতিক একটা মানুষ (ওটা মনে হওয়া ভাল, তাই ত কলকাতায় আমার থাকা-খাওয়ার আর কোন ভাবনা নেই, চৌধুরী বেঁচে থাকুন)। আমি একথাগুলোই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সবাইকে সব কথা বলতে নেই, ক্ষতি হয়।

মদ খেয়ে হালকা চালে কথা বলার এই সুবিধে—আলোচনার লিঙ্ক থাকে না। চৌধুরী হয়ত আবার কথার পৃষ্ঠে কথা বলার ঠিক পক্ষপাতী নন। তাই হঠাৎ ক'রেই কথাটা বলে ফেললেন—শুনলাম, দিল্লীতে নাকি

অনেক কিছু হচ্ছে ? বলেই গ্লাসটায় একটু চুমুক দিলেন।

এক্ষুণি বলছিলেন দিল্লীতে ট্রান্স্‌ফারের কথা আবার এখন জিজ্ঞেস করছেন দিল্লীতে অনেক কিছু হচ্ছে কি না। তাই কথাটার অর্থ ধরতে না পেরে বললাম—ট্রান্স্‌ফারের অনেক কিছু হচ্ছে, না দিল্লীর অনেক কিছু বদলাচ্ছে—কোন্‌টা আপনি জানতে চান ?

—সবটাই। মানে দু'টোই।

ভেবে নিয়ে বললাম—দিল্লীতে সব সময়েই সব কিছু হয়। অর্থাৎ একই সময়ে অনেক কিছু হয়।

মিঃ চৌধুরী হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠলেন, বললেন—বড় ইন্‌টারেস্টিং তো, বলুন বলুন। আবার বলুনতো কথাটা, শুনি।

— কি বলবো ?

—এই যে অনেক কিছু হচ্ছে—চৌধুরী তখনও কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছেন। যেকোন কথার জন্য তিনি তৈরী। জানি যেকোন কথা বললেই তিনি লাফিয়ে উঠবেন।

—এশিয়াডের জন্য ১২শো কোটি টাকা খরচ হবে। সরকার অবশ্য বলছেন ৮শো কোটি টাকা। কিন্তু জিনিসপত্রের যা দাম বাড়ছে, ওরকমই গিয়ে দাঁড়াবে—

—সাংঘাতিক তো! দিল্লী কী সাংঘাতিক, ভাবুন। আর আমরা এখানে চারশো কোটি টাকা দিয়ে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট খুঁড়ে বসে আছি। কি কনট্রাস্ট! আমি একটু রহস্য ক'রে বললাম—রাজরাণী বলে কথা—একটু সাজবে না ?

—নিশ্চয়, হোক না। তবে যা হচ্ছে, মিসেস গান্ধীই করাচ্ছেন—না ? হয়ত বুঝলেন না আমি কি বলতে চাইছি। ধরুন, তিনি কি দেখেন বলেই হয় বা হচ্ছে—মানে তিনি না দেখলে কিছুই হয় না—এরকম কিছু ? যেমন ধরুন, আমার বাপ-ঠাকুরদাদের বলতে শুনতাম— আজকাল অবশ্য ওসব ভুয়ো কথায় আমার বিশ্বাস নেই—ও'রা বলতেন, কৃষকদের দুর্দশা কেন জানিসতো, কারণ ওদের কোনো ইনিশিয়েটিভ্‌ নেই। যা করেছে, সেই যুগেই ধরুন, স্কুলটুল, স্বদেশী আন্দোলন—সবই জমিদার। কিছু করছে না বা হচ্ছে না, তাও জমিদার। খুনখারাবি তাও জমিদার—বুঝলেন তো ব্যাপারটা।

আমি তখন ভাবছিলাম যোগ ক'রে দি—কংগ্রেসের যে টাকাটা আসত

তাও জমিদার। কিন্তু শুধু বললাম—হ্যাঁ, দিল্লীর হাওয়াও এই। তফাৎ শুধু এইটুকু এই পঁয়ত্রিশ বছরে বহু লোকের অর্থাগম হয়েছে এবং তাই ইচ্ছাটাও বহুমুখী হয়েছে। তবে দিল্লীর হাওয়াই এই—কর্তার ইচ্ছাতেই কর্ম। আবার কর্মতেই ইচ্ছার বীজ।

—কি সাংঘাতিক!

—মিসেস গান্ধীকে কী আপনি চেনেন?

—না।

চৌধুরী বোধহয় নিরাশ হলেন। বারবার রিপিট্ করতে থাকলেন—চেনেন না, সে—কি?

—চিনলে তো মশাই অনেক দূর উঠে যেতাম।

—যা বলেছেন—মহিলা হয়ে পুরুষগুলোকে কি রকম ধড়াধ্বড় ফেলেন বা তোলেন—কি সাংঘাতিক! ধরুন, আমি সি,পি,আই,-এম-এর, না, মানে লেফট্ ফোরসের হয়ে কলকাতায় একটু কাজকর্ম করি,—আমিও সবসময় মিসেস গান্ধীর চাল্‌চুলগুলো ঠিক যেন ধরতে পারি না। এরা বলে ডাইনেস্‌টিকাল্ রুল, বা অ্যাথরিটেরিয়ান্। শুনতে হয়, কিন্তু মিসেস গান্ধী হলেন আগের দিনের জমিদার—ওয়ার্লড্ লিডার।

—সি,পি,আই,-এম-এর হয়েও মিসেস গান্ধীকে শ্রদ্ধা করেন—এই তো!

—না, ঠিক শ্রদ্ধা বলবো না—এ্যাড্‌মিরেশন্‌ও নয়। আসলে সরকারী চাকরী ক'রে প্রকাশ্য দিবালোকে কী আর পার্টি করা যায়? তবুও আমি বলবো—আসলে মধ্যবিত্ত হলে যা হয়—কাজের প্রতি, সাহসের প্রতি একটা এড্‌মিরেশন্ থেকেই যায়। রুবি বলে আমি মিসেস গান্ধীর ভক্ত। তা মোটেই নয়। মেয়েদের ব্যাপারে আমি নাকি ভীষণ শিভাল্‌রাশ্। তা কেন হব না, বলুন? আর আছেটা কী? আমার আবার একটু গার্ল ফ্রেণ্ডের রোগ আছে, ওটা ইকনমির প্রশ্ন। ডিমাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই। পঞ্চাশ টাকায় আজকাল কলকাতায় খুব ভাল 'ভেনাস্' পাওয়া যায়—যাবেন? সব খরচা আমার। পরিষ্কার, নিটোল। হোটেলের ক্যাবারে ডান্‌সার বেশী হাঁকবে, কিন্তু গৃহস্থের সুখ, ওটা আলাদা জিনিস। তবে রুবি যেন না জানে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চৌধুরী বোধ হয় জানেন না, আমি বিবাহিত। কিংবা কে জানে বিবাহিত হলেই বোধ হয় আজকাল 'ভেনাস্' দরকার হয়

বেশী। পোড় খাওয়া জীবনের একটু বৈচিত্র্য আর কী।

আমি উঠে পড়লাম—বললাম, এই তো কলকাতায় এলাম। ওসব করার অনেক সময় পাব।

চৌধুরীর বোধহয় একটু নেশা হয়েছে। ভাঙ্গা রেকর্ডের মত শুধু একই কথা বলে যেতে থাকলেন—রুবি যেন কিছু জানতে না পারে।

হেসে বললাম—স্বামী নামক আধুনিক জীবগুলির পর্দা তোলে কার সাধ্যি ?

শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন চৌধুরী। বললেন—ঠিক বলেছেন, ওরাও আজকাল লুকোয় কিনা, তাই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে।

॥ তিন ॥

ঘরে এসে চৌধুরীর কথাটাই ভাবছিলাম। 'ওরাও আজকাল লুকোয় কিনা, তাই ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে।' কলিং বেল টিপে রাতের খানার অর্ডার দিয়েছি যদিও খেতে ইচ্ছা করছে না।

যুদ্ধের সময়ে আমি খুব ছোট। তখন আমরা কলেজ স্ট্রীটের পেছনের দিকে থাকি। দুটো ছবি আমার মনে রেখাপাত ক'রে আছে। আমরা উপরের তলায় থাকতাম। কোণের দিকে ছোট্ট ঘর থেকে জমিদার বাড়ির কিছু কিছু ছবি বা ছায়া দেখা যেত। সন্ধ্যেবেলা, কখনও-বা একটু রাতে, কে যেন গভীর সুরে বেহালা বাজাত! শুনতাম জমিদারের ছেলে, ওদের অনেক কিছু জমিজমা খোয়া গেছে। ছেলেরা এখন সবাই রেভলিউশনারী, একজন ছাড়া। যে বেহালা বাজায় সে শুধু হয়ত অতীতের কথা ভাবে। কখনও আবার এস্‌রাজ। তার মুখ কোনদিন দেখিনি। নীল হালকা একটা আলোকিত ঘর থেকে দুঃখের-বিষাদের সুর ভেসে আসত। আমি জানলায় দাঁড়িয়ে শুনতাম। মুখ ঢেকে মনের গভীরে কি সে একটা গোটা কালকে ধরে রাখতে চাইত? দেবুদা আসতেন দিদির কাছে, সায়েন্স নিয়ে পড়ছিলেন। ব্যাটারী তৈরী করার মসলা জানতেন দেবুদা। ব্যাটারী তৈরী ক'রে একটা ভাঙ্গাচোরা কাঠের ফ্রেমে ছোট্ট একটা আলো জ্বালিয়েছিলেন। ভাঙ্গা কাঠের পাঁজরে কখনও আলো জ্বলতে পারে—ছোটবেলায় আমি ভাবতে পারতাম না। ঘরে যখন সেই ভাঙ্গা হৃদয়ে আলোটা জ্বলে উঠত, দেবুদা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতেন, দিদিও বলত—অমু সারাদিন এই ভাঙ্গা লাইটা নিয়ে পড়ে থাকে, বারবার আলো জ্বালায় আর নেভায়। আমি দেবুদার দিকে বিজয়গর্বে তাকাতাম—আর ঠিক তখনই বেহালার সুর বেজে উঠত। মনে হত দেবুদার যেন প্রচণ্ড ক্ষমতা। এও মনে হত, ঐ যে মানুষটি গভীর মূর্ছনায় সুর বাজাচ্ছে, আগামী দিনের ভবিষ্যতের আলো দেখতে চায় না বা পায় না বলে সে কী শুধু অতীতের হারিয়ে ফেলা কোন মুহূর্তের শোকে অধীর? সুরের ঐ মূর্ছনায় দেবুদা-দিদির কথাবার্তাতেও একটু ছেদ্‌ পড়ত। ওরাও বোধহয় শুনত। সেই দেবুদা একদিন মারা গেলেন। আমার মনে হয়েছিল আমার ভাঙ্গা পাঁজরের আলোটা কেউ যেন জোর ক'রে কেড়ে

নিয়েছে। তার ঠিক পরেই দেখেছিলাম যুদ্ধের সেই বীভৎস দিনগুলো। একটা গোরা সৈন্য একদিন একটি সুন্দরী মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—সে চিৎকার করছে—'বাঁচাও, বাঁচাও'। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ছুটে গেলাম, আরও কয়েকজন ছুটল—কিন্তু মিলিটারী গাড়িটা গর্জন ক'রে ভিড়ের কলকাতায় উধাও হয়ে গেল। সেটাতো ১৯৪৪ সালের কথা। তার ঠিক এক বছর আগে ৩৫ লক্ষ লোক শুধু না খেতে পেয়ে তিলেতিলে মরেছিল। মৃত্যু কত সহজ হয়ে গেছে ততদিনে—কিন্তু সেই 'বাঁচাও, বাঁচাও' আর্তি আমার বুকে এখনও মোচড় দেয়। দেবুদার মৃত্যু ৩৫ লক্ষ মানুষের চেয়েও যেন আরও ভয়ঙ্কর ছিল। কারণ, দেবুদা আলো জ্বালাতে পারতেন। বেহালা কে বাজাত? এতদিন পরে তার মুখটা বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। ও হয়ত বাঁচতে চেয়েছিল—ভেঙ্গে যাওয়া—ভেসে যাওয়া সমাজের কোন অমোঘ নির্দেশ থেকে। তাই তার হাতে বেহালার সুরে আর্তনাদ করে উঠত দ্বিতীয় যুদ্ধের সেই করাল ছায়া। সেই মানুষটার আর্তনাদ কী গোটা একটা সময়ের আর্তনাদ? ...খেতে পারলাম না। ছোটবেলার সেই আর্ত চিৎকার কানে ভেসে উঠছিল 'একটু ফ্যান দাও মা, একটু ফ্যান।' লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মরেছিল, কারও খেয়াল হয় নি? কেউ তাদের বাঁচায় নি, বাঁচাতে আসে নি? বাঙালী তখন অত নির্বিকার হয়ে গিয়েছিল? ...ভাবতে পারি না...কত লোক মরেছিল, ৩৫ লক্ষ? নির্মম নিষ্ঠুর হিসাব...

কাজলকে এক'দিনে একটিমাত্র চিঠি লিখেছি। পৌঁছনর সংবাদ দিয়ে। অফিসে টেলিফোন করে জানিয়ে দিতে বলেছিলাম—আমি ভাল আছি। আজকে একটা চিঠি লিখতেই হবে। টেবিলে এসে বসলাম। কলম নিয়ে ভাবছি কোন্ কথাটা আগে লিখি। স্বাতী যে আমার সঙ্গে দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত এসেছে তা এখনও জানাই নি। নেহাৎ একটা যোগাযোগ। প্রফেসর দাসের সঙ্গে সেবারও দিল্লীতে গেছে সেমিনারে। প্রফেসর দাস নেহেরু ইউনিভারসিটির একজামিনার। কথা ছিল ওঁর যদি কাজ পড়ে যায় তবে স্বাতী একাই ফিরবে। ট্রেনে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা। —এইতো মিঃ রায় আপনিও যাচ্ছেন দেখছি, স্বাতী ফিরছে কলকাতায়, একটু দেখবেন। 'সম্ভব হলে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। ওর বাবাকে আমি কথা দিয়েছিলাম। স্বাতীকে ডেকে বলেছিলেন—সেমিনারে তোমার সঙ্গে তো মিঃ রায়ের আগেই আলাপ হয়েছে। রেডিওর লোক—তবে ওঁর অন্য একটা

পরিচয় তুমি জান না—ইনি লেখক। আমি অবশ্য ওঁর ব্রডকাস্ট শুনেছি, লেখা কোনদিন পড়ি নি। নিশ্চয় ভাল লেখেন। তোমার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম তো—এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম। স্বাতীকে যে কতটা স্নেহ করেন প্রফেসর, ওটুকু সময়ের মধ্যেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

কাজলকে লিখলাম—কলকাতা কেমন লাগছে নিশ্চয় জানতে চাও। অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা। চিঠিতে ঠিক লেখা যায় না। গিয়ে বলবো। অল্প অল্প করে কম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল না! সবাই যে মনে ছাপ রাখছে তা অবশ্য নয়। তবে কারুকে বাদ দিয়ে কারুর অভিজ্ঞতা বড় করে দেখছি না। স্বাতী বলে একটি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—ঐ ত, তোমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। এবার আসতে গিয়ে একই ট্রেনে দেখা। ভেবে বস না, স্বাতীকে নিয়ে আমি মধ্যবয়সে খুব ভাবনায় পড়েছি। তা কিন্তু নয়। তুমি তো জান, তুমি ছাড়া আমি জীবনে কাউকে ঠিক ভালবাসতে পারি নি। তুমি আমার অভ্যাস। জীবনের বড় প্রাপ্তি। বড় একা লাগছে। তোমার ঝর্ণায় বারবার স্নান করেই আমি মুক্ত হয়ে উঠি।

—না, ঠিক হচ্ছে না। গোটা পাতাটাই ছিঁড়ে ফেললাম। আবার লিখলাম—তোমাকে আরও ঘন ঘন চিঠি লেখা উচিত। স্বামীর ত্রুটি হলেই আজকালকার বউরা অনেক কিছু ভেবে নেয়। না গো, না। আমি খুব কন্‌জারভেটিভ, ওসব ব্যাপারে থাকি না। স্বাতীকে তো তুমি চেনো—ওর কথা আর কী বলবো। স্বাতী বলে—কলকাতাকে ভালবাসার মত কিছু আর নেই। আমার তা মনে হয় না। ভালবাসতে পারার একটা বয়েস আছে। তারুণ্য, সব কিছুকে গ্রহণ করতে জানে না। স্বাতীর কথা তোমাকে আগেও বলেছি। আজ আর একটু বলি—ইকনমিক্সের একটা জটিল বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছে। ভারতের সমৃদ্ধির প্রতীক রণতরী—সেটা কার অদৃশ্য হাতে একেবারে দেশ থেকে উবে গেল এবং কেন—এই তার পি, এইচ, ডি,-এর বিষয়। মনে হয় পড়তে পড়তে অনেক কিছু জানতে পারছে। সে সব নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করে। ব্রিটিশ জাত নাকি আমাদের লিবার‍্যালিজম্‌ মোটেই শেখায় নি। ওটা ভুয়ো কথা। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের অনেক কথাই আমরা পড়েছি। সেগুলি নাকি সত্য নয়। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ—কিছু ক্ষণজন্মা পুরুষ বা সাহিত্যে শিল্পে গানে গোটা কয়েক আদর্শবান পুরুষ জন্মালেই কী একটা জাতের মধ্যে রেনেসাঁস আসে? স্বাতী

বলে, সেটাই বড় প্রশ্ন। স্বাতী এও বলে, আমরা বাঙালীরা, চিরকাল জমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছি বলে একবারে প্যারাসাইট বা পরগাছা হয়ে গেছি। স্বাধীনতার আগেও যা, পরেও তাই। ডাঃ বিধান রায় পরবর্তী যুগে যেটুকু গড়লেন, ওটুকুই আমরা বাঁচিয়ে রাখতে হিমসিম্ খাচ্ছি। ৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫৩ হাজার শ্রমিক এই মুহূর্তে লক্ আউটের জন্য এবং ৯৮টি প্রতিষ্ঠানে ১ লক্ষ ১২ হাজার কর্মচারী ক্লোজারের জন্য কর্মহীন। শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে কোনও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী নন। ইন্ডাস্-ট্রিয়াল্ ক্রেডিট্ ইন্‌ভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া-এর কাছে বর্তমানে ৩০টি নতুন শিল্পের প্রস্তাব আছে, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার একটিও নেই। টাকাও এরা যা সাহায্য দেয় তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সব থেকে পেছনে পড়ে আছে। তাই আগেও যা, এখনও সেই একই অবস্থা—এরজন্য আমরা কতটা দায়ী—এরকম হয়ত কিছু প্রশ্ন স্বাতী তুলে ধরতে চায়। কথায় ও কাজে এই যে এত ফারাক—এও নাকি ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার কারণে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব আইডিয়া। আলোচনা করতে বেশ লাগছে। সব কথা আমি মেনে নিতে পারছি না, কারণ বাঙালী প্যারাসাইটিক জাত—এত সহজে এত বড় একটা কথা ঠিক প্রমাণ করা যায় কিনা জানি না। শুধু ডক্টরেট পেয়ে গেলে জীবন সার্থক হয়ে যাবে—ওটা বোধহয় স্বাতী ভাবে না। তাই নানা প্রশ্নের গোড়া ধরে টানাটানি করছে। তবে এর সবচেয়ে বড় রিস্ক—পুরণো বা বর্তমান ইতিহাসের কিছু সূত্র ধরে অত সহজে একটা জাতের কী বিচার বা বিশ্লেষণ হতে পারে? স্বাতীকে আমি পদে পদে বাধা দিচ্ছি, আমি যতটুকু জানি সেই বিচার-বুদ্ধি দিয়ে। যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তা দিয়ে।

এবারও চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম। শুধু লিখলাম—তোমাকে অনেক দিন চিঠি লেখা হয় নি। পৌঁছ-সংবাদ নিশ্চয় পেয়েছ। অফিসের চাটুয্যে নিশ্চয় আমার খবরাখবর দিয়েছে আর তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা জেনে এসেছে। কতদিন কলকাতায় থাকতে হবে এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। মাসটাতো শেষ হয়ে এল। আর কদিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজারখানিক টাকা তুলে এনো। এবার দীপা ও রঞ্জনের ফীস্ দিতে হবে। আমি এখান থেকে ফোনে চাটুজ্যেকে বলে দেব। তুমি ফর্মটর্ম ভরে রেখো, ও সময় মত গিয়ে স্কুলের ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে আসবে। তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না। আমাকে এখন আর টাকা পাঠাতে হবে না। যা

নিয়ে এসেছি দেড় মাস বা দু'মাস স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। প্রয়োজন হলে এখানেও টাকা ম্যানেজ করতে পারব। দেবার জন্য লোকেরা উঁচিয়ে আছে। পার্ক স্ট্রীটের যে বাড়িটায় আমি আছি—বেল টিপলেই হাতের কাছে সব এসে হাজির হয়। এরা সবাই মিলে একটা কমন্ কিচেন্ চালায়। অদ্ভুত সুন্দর ব্যবস্থা। একেবারে আলাদীনের প্রদীপের রাজ্যে যেন বাস করছি। অদ্ভুত যোগাযোগ; অফিসের লোকেরাই সব ব্যবস্থা করেছে। খাওয়াদাওয়া বা যত্ন কোনটারই অভাব হচ্ছে না। তবু রাতে বড় একা লাগে। তখন তোমার কথা মনে হয়। মধ্যবয়সের অভ্যাস তারুণ্যের চেয়ে কিছু কম নয়। কলকাতাকে ভালবাসতে পারি কিনা ভেবে দেখি নি। কোনদিনই বেশী দিন কলকাতাকে একটানা দেখি নি। আধা স্বপ্ন, আধা বাস্তব আমার কলকাতা। প্রচুর অভিজ্ঞতা হচ্ছে—মজা লাগছে। অফিসের লোক, কাজের লোক, গেঁতোমি, অকাজের লোক, মিটিং-তর্ক-ভালবাসা (শব্দটা লিখেই কেটে দিলাম) কলকাতায় থাকলে মানুষের বোধ হয় একটুও ভাববারই সময় থাকে না। গোটা দিনটা মনে হয় একটা মা-ভৈ শব্দে কেটে গেল। দিল্লীতে ভয়ানক একটা রাত আছে; ডিস্কো-নাচ আর আবছা অন্ধকারে শরীর নিয়ে ছিনিমিনি। কিন্তু সে জীবনে সবাই অভ্যস্ত নয়। এখানে সে জীবন যে নেই তা বলব না, বরং ইদানীং জনজাগরণে শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলার একটা তাগিদ দেখতে পাচ্ছি। ওটা ইকনমিক্সের প্রশ্ন। চাকরী নেই, খেতে পাচ্ছে না, অথচ বাঁচতে হবে। তাই মধ্যবিত্ত মেয়েরা আর কী করবে, বলো।

অনেক রাত হল। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ব। তুমি যখন দূরে থাক তোমাকে যেন আরও বেশী করে কাছে পাই। দীপা বড় হচ্ছে, আমাকে এখন বিচার করতে শিখেছে, ভয়ও পাই আবার মজাও লাগে। ওকে ছেড়ে থাকতে আজকাল বড় কষ্ট হয়। রঞ্জনের হাফ্-ইয়ার্লি রেজাল্ট কেমন হল জানিও। সারাদিন বই পড়ে ওটা ভাল, কিন্তু বিকেল হলেই জোর করে খেলতে পাঠাবে। ছোটবেলায় খুলনায় আমরা কখনও নদীর পাড়ে চলে যেতাম, কখনও সময় কাটত গাছে-গাছে, মাঠে-মাঠে আর পুকুরে সাঁতার কেটে। মনের সজীবতা রাখার জন্য ওটা দরকার। কলকাতার বিষয়ে অনেক কথা লেখার আছে। মিটিং করে আর বুরোক্র্যাসি সামলাতেই সময় চলে যায়—লিখব কী! ভাল থেকো।

—অমরেশ।

॥ চার ॥

কথা আছে আজ স্বাতীকে নিয়ে কলকাতায় ঘুরব। কলকাতাকে চেনাতে কোথায় কোথায় নিয়ে যাবে তা এখনও জানি না। ওর ডিপার্টমেন্টে একবার যাবে সেটা বুঝতে পারছি। ডঃ দাসের সঙ্গে একটু আলাপ হবে, স্বাতীর রিসার্চের বিষয় নিয়ে দু'চার কথা বলতে বলতে আবার জমেও যেতে পারি। ওরকম হলে কোথায় যাবার ছিল খেয়াল থাকে না। কফি হাউসে যাবার ইচ্ছে নেই, অবশ্য স্বাতী যদি চায়, বাধা দেব না। কফি হাউসে কার কার সঙ্গে দেখা হবে আগে থেকে বলা মুশকিল। একই সঙ্গে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এবং তখন, দিল্লীর গ্ল্যামারাস্ জীবনের কথাই হবে ; অর্থাৎ একই কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং যদি মুড্ থাকে আমি রসিয়ে দ্ব্যর্থবোধক জবাব দেব। দিল্লী যে ঠিক কি বস্তু, 'যাযাবর' একগাদা ভাল ভাল শব্দ বলতে চাইলেও ঠিকমত বলে উঠতে পারেন নি ; দিল্লীর কথা বলতে হলে এখন হয়ত অন্য কোন 'যাযাবর' চাই। তাই বলছিলাম কফি হাউসে যাব কিংবা অন্য কোথাও, নির্ভর করছে স্বাতীর মুডের ওপর ; আকাশের রঙটা কিরকম, লাল, মেঘলা বা হরিৎ, তার ওপর।

স্বাতী ঠিক সকাল নটায় এল। একটু অবাক হলাম। টাইম্ সেন্স্ আজকাল মিনিস্টারেরই নেই, একজন ছাত্রীর থাকবে ভাবা যায় না। আমি অবশ্য তৈরী হয়েছিলাম, কারণ ওটা একটা অভ্যাস, গোলামীর ইন্‌ডেকস্। আপার মহলের বুরোক্র্যাট্‌রা নিজেরা সময় মত কদাচ আসেন কিন্তু গোলামরা ঘড়ি ধরে আসে, আমি দেখেছি, এটাতে তাঁদের একটা ইগো স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শন্।

ঘরে এসে যাবতীয় জিনিস স্বাতী খুঁটিয়ে দেখছিল, আমি এক ফাঁকে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কী খাবে ? কফি, না চা ?

স্বাতী মুচকি হাসল—কফিটাই চলুক—কি বলুন ?

—চলুক। বুঝলাম স্বাতীর মুড মেঘলা নয়, হরিৎ-রঙা। ততক্ষণে ঘরটাকে ইনভেস্টিগেট্ করে নিয়েছে এবং অনুমান করলাম, আমার বইপত্র, আলমারী, আয়না—যাতে আমি আমার মুখ দেখে ঠিক ঠাহর করতে পারি না আমি সরল কিংবা গরল, তাই আয়না থেকে সরে যাই—আর অশারী—আর কী, আর কী খুঁটিয়ে দেখছিল স্বাতী ? ঠিক জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কফির সঙ্গে আর কিছু? ···স্বাতী মাথা নাড়ল। ঘরটা ঠিক সুসজ্জিত নেই বলে মাথা নাড়ছে বা খাবে না বলে মাথা নাড়ছে, ঠিক বুঝলাম না।

—আর কিছু খাবে না? এবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি। আমার দিকে পুরো প্রফাইলের নজর ছাড়ল। তাতেই বুঝে নিলাম, খেলে পরে খাবে, এখন নয়। হয়ত দেখছিল জিনিসপত্র বা এইসব ইন্‌অ্যানিমেট্ জিনিসের সঙ্গে মানুষটার মনের কতটা সংযোগ বা সাদৃশ্য আছে।

আমিও এক পলকে স্বাতীর চেহারাটা আর একবার দেখে নিলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। চোখেমুখে দীপ্তি। সমুন্নত গড়ন। হলদে রঙের শাড়ীটা দারুন মানিয়েছে। কথা বলার সময় হাসে। হেসে কথা বলতে বলতে গম্ভীর হয়, আমি কৌতুক ক'রে ভাবি আকাশের রঙ বুঝি পালটাল। মেয়েদের মধ্যে এমন কতগুলো সত্তা থাকে বা এমন কতগুলো রূপ—যা বোঝা বোধহয় ঈশ্বরেরও সাধ্যাতীত। নিজের সৃষ্টিকেই কী মানুষ বোঝে?

কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এসে হাজির। লোকটা যন্ত্রচালিতের মত এল, ভাবলেশহীন মুখ। বললাম—দুটো কফি।

এক মুহূর্তে অন্তর্ধান হল। এরা কী মানুষের অভিসন্ধি বোঝে? এবং বোঝে বলেই কী নীরব চোখে তাকায়? কিংবা কর্মবীর লোকের কাছেই কুমারী মেয়েরা আসে—আজকাল এটা দেখতে দেখতে এরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে বোধ হয় এটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার ভাবে। ভাবগতিক দেখলে বোঝার উপায় নেই, অতীতের মেমসাহেবকে যে খিদ্‌মদ্ করত, সেই টমাস, একালে নরহরি হয়ে এখন সমাজটার দিকে কি চোখে তাকায়? সমাজ কী খুব বদলাচ্ছে, নরহরি? ভাবলাম জিজ্ঞেস করি—কিন্তু ভাবতে না ভাবতে কফি এসে হাজির। লোকটাকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল, আমরা বাইরে লাঞ্চ করবো কথা আছে।

—এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? বলেই স্বাতী হাসি ছড়াল। দুটি মাত্র দাঁত তখন দেখা যাচ্ছিল, বেশ ঝক্‌ঝকে দাঁত, ঠোঁটে অদ্ভুত একটা কাঠিন্য, নাকের অগ্রভাগে একটা অনমনীয় জেদ। আমি এতগুলি কথা পলকে ভেবে নিলাম।

বললাম—দেখে কী মনে হচ্ছে?

—রাজধানীর লোককে খিদ্‌মদ্ করার ব্যাপারে কলকাতা চিরকালই

একটু জেনারাস্। বলেই গরম কফির পেয়ালাটা শেষ ক'রে ফেলল। বোধ হয় বেশ গরম কফি পছন্দ করে।

বললাম—ঠিক বলেছো। মিঃ চৌধুরীকে তুমি চেনো? উনিই সব ব্যবস্থা করেছেন।

—না।

—আলাপ করিয়ে দেবো। দারুণ ইন্‌টারেষ্টিং মানুষ। চৌধুরীকে দেখলেই বুঝবে, টাকাপয়সার সাচ্ছল্য থাকলে বাঙালী কেন একটু লর্ড স্টাইলে থাকতে ভালবাসে। আমার এক পরিচিত দিল্লীবাসী বিজনেসম্যান আছেন, তামিলনাড়ুর লোক, আয়েঙ্গার। কপালে তিলক্ কেটে রোজ ফ্যাক্টরীতে যান। ওঁর ফ্যাক্টরীর ভ্যালুয়েশন্‌ই হবে দশ লক্ষ টাকা। দেখে কে বলবে? বাঙালী অত টাকার মালিক হলে ঠিক বুঝিয়ে ছাড়ত।

স্বাতী বলল—সাহেব হবার একটা পুরণো ট্র্যাডিশন্ আমাদের রক্তে বাসা বেঁধেছে তো—তাই সিম্পল্ থাকা আমাদের পক্ষে একটু মুশকিল। আসলে টাকা কামাব আর ওড়াব না—এ কী হয়? টাকা হলে বাঙালী লোক দেখিয়ে ওড়ে বা অন্যকে ব্যতিব্যস্ত করতে ওড়ায়।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

কফিটা শেষ ক'রে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার রিসার্চ কিরকম এগোচ্ছে?

—কোনকালে লিখে উঠতে পারবো কিনা, জানি না। ডঃ দাস বলেন, যখন যেমন বই পড়বে, কার্ডে নোটস্ করবে আর মনে যা আসছে সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলবে। ওটা ডঃ দাসই পারেন। একটা বই পড়তে পড়তে আমি অন্য একটা বই ধরি, তারপরে দুটোই শেষ ক'রে দুটো আইডিয়া নিয়ে মহা বিপদে পড়ি।

আইডিয়া নিয়ে বিপদে পড়ার ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ। আমি ইন্ধন জোগালাম—ওরকমভাবে না পড়লে বই পড়ার মজা নেই, কি বল?

স্বাতী বলল—তা হয়ত ঠিক। কিন্তু থিসিসের ব্যাপারে ওটা মোটেই সহায়ক নয়।

ভরসা দিয়ে বললাম—আমি দিল্লীতে এক ভদ্রমহিলাকে জানি। সাত বছর ধরে পাকিস্থানের ওপরে রিসার্চ করেছেন। কিন্তু পাকিস্থানের ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কোন কথা বলেন না। কথায় বলে, বোবার শত্রু নেই।

আমার কথায় ব্যঙ্গের সুর ছিল কিনা জানিনা, স্বাতী হেসে উঠল। অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—সাত বছর?

বললাম—টাকাপয়সা থাকার সুবিধে কী জান, জীবনটাকে লালিপপের মত চোষা যায়। রিসার্চ করা আজকাল ওরকম একটা ফ্যাশন। ডিগ্রিটা জোটে বটে কিন্তু থিসিসগুলি হয়ত লাইব্রেরীর প্রাচীর পেরোয় না। অবশ্য যা আমি শুনি তাই বলছি। ঠিক জানি না, থিসিস যদি সেরকম না হয়, তবে কী কেউ শুধু 'পি; আর,' করে পি, এইচ, ডি, পায় ?

—কেন পাবে না ? আমি দেখেছি 'পি, আর,' কাকে বলে। আমার তো ঐখানে মুশকিল। সাত বছরেও আমার শেষ হবে কি না সন্দেহ। নিত্য নূতন শাখাপ্রশাখা বাড়িয়ে চলেছি।

—খুব ভাল, সেটাই হওয়া উচিত। আমি খুব উৎসাহ দিলাম। ভবিষ্যৎ হাতড়ে বললাম—এগিয়ে যাও, তুমি পারবে।

—আপনি যদি ইউনিভারসিটির লোক হতেন, তবে বলতেন—তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। ওখানে এখন অন্য হাওয়া। পশ্চিমে হাওয়ায় বিদেশে কোন স্কলারশীপ্ বাগিয়ে হয় উড়ে যাবেন, নয়ত পূবের হাওয়ায় ফ্রাস্ট্রেশনের অন্ধকারে খাবি খাবেন। আমারও খুব একটা সুনাম নেই। আমার বন্ধুদের ধারণা, আমি বড় বেশী লঙ্ রোপে খেলছি। ওরা বলে—খেলা শেষ করে দেখবি, নিজেকেই কশে বেঁধে ফেলেছিস, তোর নড়াচড়া করার আর শক্তি নেই।

—ওটা ডিগ্রি পাবার বুলি। 'কোয়েস্ট' অন্য জিনিস।

—ভয়ানক ফ্রাস্ট্রেটিং, জানেন। যাইহোক করে তাড়াতাড়ি শেষ করা—ওটা ঠিক মেনে নিতে পারি না। না হয় লেখাই হল না—তবে যদি লিখি শেকড় ধরে টানবো। নয়ত লিখবই না।

—আমিও সেকথা বলি। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, বিশেষ করে, তুমি যখন বাংলার ইকনমির মূল শেকড় ধরে টানতে চাইছ। আচ্ছা স্বাতী, তোমার কাছে কী ব্রিটিশ সরকারের 'ইণ্ডিয়ান্ ল্যাণ্ড রেভিনিউ পলিসি' বইটা আছে ?

—কেন বলুন তো ?

—না, ভাবছিলাম যদি বইটা না পড়ে থাক ?

—পড়েছি।

—ও, পড়ে নিয়েছো ?

—কেন ?

—বুঝতে পারছি বাংলার প্রশ্নটা তুমি ধরতে চাইছ—

প্রশংসার দিকে কানই দিল না স্বাতী, জানতে চাইল—বইটা আপনি কোথায় দেখলেন ?

—পুরণো বইয়ের দোকানে। কিনলাম না, ভাবলাম বইটা যদি তোমার কাছে থেকে থাকে।

—কিনে নিলেই পারতেন। এসব বই দেখলে কক্ষনো ছাড়বেন না, কিনে নেবেন। পরে না-হয় আমি টাকা দিয়ে দেব (কথাটা শুনতে আমার ভাল লাগলো না, যদিও বাধা দিলাম না। বেশী বই পড়া আবার ভাল নয় ; স্বাধীন সত্তার ক্ষতি হয়। কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল কিন্তু বললাম না।)।

—স্বাতী বলে চলল—ঐ এক রোগ আমার, বই পেলেই কিনে নি। তারপর যা থাকে বরাতে।

—বইটা পড়ে আমার কি মনে হয়েছিল জান ? মনে হয়েছিল ১৯০২ সালের মধ্যেই ব্রিটিশরা সারা দেশের রেভিনিউ পলিসিটা ঠিক করে ফেলেছে, তারা তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে কোন্ রাজ্যে কি ব্যবস্থা চালু করবে। কারণ সেটা দেশের স্বার্থে না হোক, ওদের স্বার্থেরই অনুকূল ছিল। এতদিন পরে বইটা পড়ার ঐখানেই মজা ঃ আমরা বুঝতে পারি যা ওরা একবার করবে বলে ঠিক করেছে, ওরা সেটা করবেই। আর, সি, দত্তের মত ওদের তখন অন্য কোন সাজেশনস্ দিয়ে লাভ নেই। এবং সেই করার স্বপক্ষে কি দারুণ আর্গুমেন্ট দেবে ওরা—মনে হবে ওদের কথাই ঠিক, আমরাই বরং গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এর কারণ কি জানতো, ওরা সব কিছু পাকাপাকি ভাবে জেনে তারপর কথা বলতো। আলতু ফালতু কথা, চার মুখে চার কথা বলতো না।

—আর আমরা ? স্বাতী ব্যঙ্গ ক'রে বলল। —বাঘা বাঘা আই, সি, এস, হই বা ইকনমিষ্ট বা রাজনীতিবিদ—সাহেবদের সামনে আমাদের সেদিন দৌড় ছিল লম্বা লম্বা পিটিশন ছাড়া। যাকে বলে বাঘের সামনে বেড়ালের মিউ মিউ ডাক। নয়ত দেখুন আই, সি, এস, দত্ত বলতে চেয়েছিলেন, আকবরের আমলে বাংলা থেকে বছরে দুই কোটি টাকা খাজনা নেওয়া হত—তাকে চার কোটি করাতেই বাংলার দুর্ভিক্ষ অত বেড়ে গেছে। এই যুক্তিটা, দেখেছেন ব্রিটিশরা কিভাবে খণ্ডন করেছে ? সেক্রেটারী টু দি গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া জে, বি, আর, ফুলার, রমেশ দত্তকে বুঝিয়ে ছাড়লেন যে কৃষকরা যদি

কষ্টে ভোগে, তার জন্য আর কেউ দায়ী নয়, দায়ী ওরা নিজেরা। দুর্যোগের সময় হা-হুতাশ করে অথচ যখন সুফলের সুদিন সব টাকাপয়সা উড়িয়ে দেয়। ফ্লার বলছেন, ওদের বলুন, একটু বাঁচাক। বাঁচাবে কী—জমিদাররা কী ওদের হাতে একটি পয়সা রাখে? অসুখ হলে ওষুধের পয়সাটাও জুটত না।

—ঠিক বলেছ। এদিকটা আমি অবশ্য ভেবে দেখি নি। তবে আর, সি, দত্ত বলতে চেয়েছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সারা ভারতে চালু হলে সরকারের খাজনারও একটা সুবন্দোবস্ত হবে আবার ওদিকে কৃষকরাও খেয়েপরে বাঁচবে। পরবর্তীকালে শুনেছি তাঁর মত পালটে ছিল। কিন্তু রমেশ দত্তের মত অত বড় ইকনমিষ্টও বুঝতে পারেন নি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে কী ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র ছিল। তাই আই, সি, এস, দত্তের সমসাময়িক কালের গভীরে যাবার ক্ষমতা ছিল, বা তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল, কী ক'রে বলি? ব্রিটিশরা অবশ্য দেখ, ওসব কিছুই মানতে চায় নি, কারণ বাংলায় যে ব্যবস্থা চালু করলে ওদের সুবিধে, পাঞ্জাবে তা নয়। সেখানে বা আরও অনেক জায়গায় তারা দশ শালা বা বিশ শালা ব্যবস্থা চালু করেছিল। এতদিন পরে মনে হয়, ওদের লাভটা কোথায় ওরা সে-ব্যাপারে কখনও, কোন অবস্থাতেই ভুল করে নি।

স্বাতী বেশ উৎসাহ পেয়ে বলল—মজার ব্যাপারটা একবার ভাবুন। কৃষকদের প্রতি পুরণো জমিদারদের যদি দরদটা বজায় থাকে, ওদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই মার খাবে। এটা ওরা বুঝেছিল বলেই ঝেটিয়ে পুরণো জমিদারদের সব সর্বস্বান্ত করেছিল। যে জমিদার নির্দিষ্ট দিনে বিপুল পরিমাণে খাজনা না দিতে পারবে, তার জমি গেল, সে পথের ভিখিরী হল। কোন অ্যাপীলই তখন তারা মেনে নেয় নি। আর ওদিকে নতুন যেসব জমিদার এল—তারা কারা? জমির সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, যারা বেশীর ভাগই শহরে থাকে অথচ যারা টাকাপয়সা করেছে তারাই সেই সব জমি কিনে কিনে এবার হল নতুন কলেবরে জমিদার। সেদিন যারা জমিদার হয়েছিল তারা সব কুসীদজীবী, প্লিডার, ট্রেডার, মারচেন্ট—কারণ ততদিনে জমিতে বিনিয়োগ করাটা হয়ে গেছে মস্ত বড় লাভদায়ক ব্যবসা। ব্রিটিশ এদেরই বরাবর প্রটেক্‌শন্ দিয়েছে। এমনও নিদর্শন আছে, খাজনার জন্য কৃষকদের ঘটি-বাটি-বিছানা পর্যন্ত জমিদারের পোঁ-ষ্য়া বিক্রি ক'রে দিয়েছিল। জমির থেকে পুরণো কৃষকদের উচ্ছেদ করতে না পারলে এই

জুলাদেরা বেশী খাজনায় অন্য কৃষকদের বসাবেন কী করে? ওদিকে ইম্‌প্লুটস্‌ বলতে যা আজকাল আমরা বুঝি—ওসবের বালাই নেই। কৃষির উন্নতি—সে আবার কী জিনিস? জমির জন্য কিছু করবো না অথচ ফসলটি দু'হাতে কুড়ব। এই দৃষ্টিকেই আমি বলি পরগাছা।

স্বাতী আস্তে আস্তে সিরিয়াস্‌ হয়ে উঠছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমাদের দু'জনের যে বেরুবার কথা ছিল, ওর বোধহয় আর খেয়াল নেই। ভাবলাম একবার বলি, এই তর্কে নামলে আজ আর বেরুন হবে না। কিন্তু বাধা দিতে খারাপ লাগল।

স্বাতী বলে চলল—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে যা অত্যাচার হয়েছে—পৃথিবীর ইতিহাসে তার নিদর্শন নেই। তার আগে তারা খুব সিস্‌টেমেটিক্যালি আমাদের সব শিল্প, কৃষি ব্যবস্থা, গ্রামের শান্তিময় ও সুখের জীবন—সব শেষ ক'রে দিয়েছে। শিল্প-টিল্প খুইয়ে আমরা তখন নুনটা পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানী করছি—ভাবা যায়? অথচ শহরে তখন শিক্ষিত লোকেদের কাছে সাহেব মানে কি বস্তু একবার ভাবুন—ওরা বসে বিচারকের আসনে—ওরা তখন জজ্‌-ম্যাজিস্‌ট্রেট্‌, ল্যাণ্ড্‌ সেটেলমেণ্ট্‌ অফিসার, ধর্মের ধ্বজাধারী বিশপ্‌ আর দেশের হর্তাকর্তা ভাইসরয়। এবং যেহেতু সতীদাহ ও ক্রীতদাস প্রথা ও আরও কিছু সমাজ ও ধর্মজীবনের কুসংস্কার দূর করতে আইন করা হল—তাই ব্রিটিশ জাতের মত এত বড় জাত নাকি পৃথিবীতে নেই। ব্রিটিশ আইন, ব্রিটিশ বিচারবুদ্ধি, ব্রিটিশ উদারতা—কোনটারই নাকি তুলনা হয় না। এই ফল্‌স্‌ ইমেজ্‌টাই তারা সব জায়গায় রেখেছে, কারণ অন্যায় করেছি আমরা,—'নেটিভরা', ওরা নয়—যা কিছু ভাল সেখানেই সাহেব—অন্যায়ের ধারেকাছে ওরা নেই। ওরা যে বিচারক, হর্তাকর্তা! আমরা মোসায়েবী ক'রে কুকুরের মত শুধু ল্যাজ নেড়েছি।

—আমি শুধু ভাবি, —আমি বললাম, —আমাদের দেশের কিছু মানুষ সেদিন প্রচুর টাকা কামিয়েছিল। আজ ভাবি যে দশ-বারোজন লোক, ধরো নবকৃষ্ণের মত লোক—এদের এত টাকা হয়েছিল কী করে? এদের টাকার সোর্স'টা কী ছিল?

স্বাতী হেসে উঠল—ভয় নেই। কষ্ট ক'রে বাঙালী কোনদিন টাকা করে নি। বাঙালী মস্ত বড় কুসীদজীবী,—যারা কাজ করে না কিন্তু মাঝখানে কমিশন বা দালালী হাতড়ায়, পুষ্ট হয় সুদে বা ঘুষে। বড় জাতের আর্ট অবশ্য মোসায়েবী। ওটা ছিল বাঙালীর জাত ব্যবসা।

বাঙালী জাতের ওপরে ব্যঙ্গ করতে পারলে স্বাতী ছাড়ে না। এটা ভয়ানক বাজে প্রেজুডিস্। যদি কাটিয়ে উঠতে পারে, তবেই হয়ত কিছু সত্য খুঁজে পাবে। অথচ প্রেজুডিস্ কাটিয়ে উঠতে বললেই কাটিয়ে ওঠা যায় না। ওঠা বড় শক্তের ঠাঁই। তাই আমি আলোচনাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলাম। বললাম—এখন দেখো লোকের কাজ নেই, চাকরী নেই—তরুণরা কী করবে? তাই লীডারশীপের নামে মস্তানগিরি। অথচ আমি অনেক সময় ভাবি যে রাজনীতি মানুষের ওপরে আমরা চাপিয়ে দিচ্ছি—ওটা আমাদের ইতিহাস ছুঁয়ে ইভ্যলভ্ করে নি, বাইরে থেকে শিখেছি এই সুবিধেবাদীর হিসেব বা রাজনীতি।

স্বাতী বলল—আজকের সুবিধেবাদীর এই যে রাজনীতি, এটার নিশ্চয় একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। তবে রাজনীতি সবটা দুরাচার নয়—রাজনীতি মানুষকে জাগায়, আবার চেতনাও দেয়। এখন দলের কোন্ নেতা কার কাছে যায়—কি করে বেড়ায়, পার্টির কমন্ ওয়ার্কাররাও পর্যন্ত জানে। আর তখন? সে যুগে ফুর্তি ছাড়া একটু দূরের দিকে তাকিয়ে দেখার কারুর সময়ই ছিল না।

আমি উশ্‌খুশ্ করছি। এখন বোধ হয় আমাদের ওঠা উচিত। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে স্বাতী উঠে দাঁড়াল। আলমারীতে সাজানো বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল।

আমি ওর পেছনে এসে দাঁড়ালাম—কোন্ বইটার দিকে ওর ইন্‌টারেষ্ট্ জানা দরকার। খুব যে প্রয়োজন আছে তা নয়, নেহাৎ কৌতূহল।

—এর মধ্যে এত বই যোগাড় করলেন কোথা থেকে? স্বাতী সাত্রে'র 'দি এজ অব্ রিজন' বইটা উল্টেপাল্টে দেখছিল। —পড়েছেন? পাতা ওলটাতে ওলটাতে জিজ্ঞেস করল।

—পড়েছি কিন্তু বুঝি নি। যুগপুরুষের যুগযন্ত্রণা। আমরা নিহিলিজমের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু নিহিলিজম্ প্লাস্ আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবাদ—বড় ভয়ঙ্কর মিশোল।

স্বাতী বেশ শব্দ ক'রে হেসে উঠল। আমিও সাথ দিলাম।

স্বাতী বলল—আগে জানেন, আমি গল্প-উপন্যাস খুব পড়তাম। এখন একেবারে সময় পাই না। শ্রেষ্ঠ লেখকরা কে কী ভেবেছেন বা ভাবছেন, জানতে খুব ভাল লাগে।

—কেন ?

—এই এমনি।

—সাহিত্যিকরা সব সময় কিন্তু রিসার্চার নন—

—নাই বা হল। দেশের মানুষ একটা যুগে কে কি ভাবছে, লোকজন, তাদের আশা-আকাঙ্খা, জীবন-যন্ত্রণা বা ফ্রাসস্ট্রেশন্—সবই তো ওতে থাকে—বরং বলবো রিসার্চারদের পক্ষে ওসব জানাও খুব দরকার।

আমি জানতে চাইলাম, (এও আমার নিতান্ত কৌতূহল। স্বাতীর সঙ্গে পরিচয়ের গভীরতা যে এভাবে বাড়াতে চাই, তাও নয়। আমি বিবাহিত। কতটা কার সঙ্গে মিশব আমার একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, ভাবনা আছে। নিজের কাছে কৈফিয়ৎ আছে।)—বাংলায় কার গল্প-উপন্যাস তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে ?

—আগে আমি সব লেখকের বই যেন গিলতাম—কিন্তু ইদানীং যা কাজকর্ম করছি কখনও যদি বোর্ ফিল্ করি মাণিক বাড়ুয্যে পড়ি। আমার মনে আছে এক্ষণ-এতে মাণিক বাড়ুয্যের ডায়েরী বেরিয়েছিল। এখন সেটা বই আকারে বেরিয়েছে। কলকাতায় তখন যদি দেখতেন! সারাক্ষণ,—কফি হাউসে, ইউনিভারসিটিতে, ক্যানটিনে, আলাপ-আলোচনায় শুধু সেই কথা। মা-কালীর নামে পান করাও কম্যুনিস্টদের পক্ষে খুব সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। খুব এমব্যারেসিং হয়েছিল ব্যাপারটা।

—কোন্টা ? ওতে তো উনি অনেক কথাই লিখেছিলেন—'মোষের' কাছ থেকে টাকা নিয়ে মায়ের নামে পান করা, —অভাব-অনটন, দারিদ্র আর অসহায়তা—যা সত্যিকারের কোন লেখক জীবনে হয় বা হওয়া উচিত, বা হয়ে থাকে—

—ওটা তো আলোচনার বিষয় ছিলই—আরও কিছু। এত পুয়োরলি পেইড্ হলে লেখকরা কী কমিট্মেন্ট রাখবেন, কী লিখবেন, কেমন ভাবে লিখবেন ? যদি লেখাটা প্রফেশন্ না হয়—তবে সত্যিকারের লেখা কী সম্ভব ? লেখা কী শুধু ফুল টাইম্ জব্, না, পার্ট টাইম্ হতে পারে ? পাব্লিশারস্দের ইতিহাস কী ? ওঁরা কী লেখাটাকে স্রেফ্ ব্যবসা হিসেবে ধরেছেন, না তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে একটু সচেতন হয়েছেন—ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন উঠেছিল সেদিন।

—মীমাংসা কী হয়েছিল ?

—প্রশ্নের কী কখনও মীমাংসা হয় ?

আমি আবার জানতে চাইলাম—মাণিক বাড়ুয্যেকে সবচেয়ে ভাল লেখক বল কেন ?

—কেন জানেন, ওঁর মধ্যে সত্যিকারের একটা অনুসন্ধান ছিল। শেষের দিকে পার্টি করাতে ওঁর কতটা ক্ষতি হয়েছিল বা হয় নি, কেন পার্টি ওঁর মত লেখককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু করে নি বা দু'একজনই কেন করেছেন, —সেও আবার পার্টি-লেবেলে নয়—এসব প্রশ্ন ওঠে বই কী ?

একটু থেমে স্বাতী আবার বলে চলল—যাঁরা বাঙালীর প্রতিনিধিস্থানীয় হতে পারেন তাঁদেরও আমরা ঠিক চিনি না, বড় দুঃখের। এখানেও সেই একই কথা—বেঁচে থাকতে বাঙালী কারুর জন্য কিছু করে না। এই সত্য কথাটারই আমরা ঘুরেফিরে বারবার প্রমাণ পাই।

আমি স্বাতীর এ ধারণার সংশোধন করার চেষ্টা করলাম—পৃথিবীর সব জায়গাতেই বোধ হয় তাই—বেঁচে থাকতে আদর নেই। পাছে বাঙালী জাতিকে আবার স্বাতী একটা সুইপিং রিমার্ক করে, তাই কথাটা আমি ঘোরাতে চাইলাম।

স্বাতী মেনে নিতে পারল না—কেন ? যতদূর জানি, ক্যামু বেঁচে থাকতেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। এরকম আরো অনেকে আছেন। নোবেল পুরস্কার নেবার সময় যে বক্তৃতাটা তিনি দিয়েছিলেন—তখন তো খুব পড়তাম, মনে আছে। ক্যামুর একটা কথা আমার এখনও মনে বাজে—দারুণ ভাল লেগেছিল। 'দুঃখকে রূপ দেওয়া যেমন কাজ, তেমনি বহু সংখ্যক মানুষকে জাগিয়ে তোলার মহতী কাজও আর্টের।' নোবেল প্রাইজ নিতে যাচ্ছেন অথচ দেখুন তিনি বলছেন—'প্রত্যেক মানুষই স্বীকৃতি চায়—আমিও চাই। আমার লেখক জীবন এখনও নানা সন্দেহের অন্ধকারে জড়িয়ে আছে; এখনও অনেক লেখা সম্পূর্ণ হয় নি···লেখার কাজে আমি এখনও নিঃসঙ্গ—।' তাই ভেবে পাচ্ছেন না কিভাবে এই পুরস্কার নেবেন। অন্য দিকে দেখুন, দেশের জন্য, গোটা ফ্রান্সের জন্য কি গভীর এক মমত্ববোধ। তাই বলছেন—'ফ্রান্স এখন গভীর এক সঙ্কটে বিমূঢ়'। আমাদের কোন্ লেখক গোটা দেশের কথা ভাবেন, বলুন ? এই দিক দিয়ে ভাবলে মাণিক বাড়ুয্যেকে খুব বড় লেখক মনে হয়।

আমি আর বেশী এগোতে চাইছি না, যদিও শুনতে আমারও খুব ভাল লাগছিল। বললাম—এখন কী আর বেরুন যাবে ?

স্বাতী আঁতকে উঠল—সে কী, কটা বাজে ?

—বারোটা। তবে একটা কাজ করা যাক্, আমরা বরং এখান থেকে লাঞ্চ ক'রে নি। কি, আপত্তি আছে ?

—আপত্তি নেই, তবে আমাকে একবার ডিপার্টমেন্টে যেতেই হবে। সেখান থেকে হয় কফি হাউস, না হয় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম্।

—না, প্ল্যানেটোরিয়াম্ অন্যদিন। আজ না হয় গড়ের মাঠে ঘুরবো, যদি সম্ভব হয় হাঁটতে হাঁটতে আউট্রাম ঘাট।

—বেশ, তবে যদি দেরী হয়, বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে কিন্তু। এখনও দেরী হলে বাবা ভেবে অস্থির হন—ভাবেন শহরের ভিড়ে আমি হারিয়ে যাব। বলে একচোট হাসল স্বাতী।

—শিক্ষক তো, তাই বোধ হয় আজকালকার ব্যাপার-স্যাপার ঠিক পছন্দসই নয়। আমি আন্দাজে ব্রজেশবাবুর চরিত্র বিশ্লেষণ করলাম।

—না, গুণ্ডার মুখে পড়বো বা কেউ আমার প্রেমে পড়বে—সেরকম কোন ধারণা ক'রে বাবা বোধ হয় ভয় পান না।

দু'জনেই আমরা শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম।

—আমার ঘরে তুমি এসেছ, তোমার মা শুনলে নিশ্চয় ভড়কে যাবেন ?

—তার কারণ আছে। এ শহরে আজকাল ঠিক সুস্থ লোকের অভাব, তাই আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তায় পড়েন।

কথাটা শুনে আমি যেন আঁতকে উঠলাম। আমার ঘরে স্বাতী একা এসেছে, তবে আমাকে নিশ্চয় ও সুস্থ মানুষ বলে মনে করে। ওকে বাধা দেব এত বড় সাহস আমার নেই। কে আর নিজের সম্পর্কে অন্যের মন বিষিয়ে দেয় ? কলকাতায় সুস্থ লোকের অভাব—এই কথাটার অর্থ কী ? এটুকু বুঝলাম স্বাতীর মা প্রভাবতী দেবী অত সহজে মানুষকে বিশ্বাস করতে নারাজ। এবং এ কথাটা তিনি সময় পেলেই মেয়েকে হয়ত বোঝান। কতটা সফল হয়েছেন স্বাতীই তার প্রমাণ। স্বাতীর মধ্যে অদ্ভুত একটা চাপা আগুন দেখেছি। হয়ত ওর মধ্যে ব্রজেশবাবুর সারা জীবনের সংগ্রাম অনেকটা প্রভাব ফেলেছে। ব্রজেশবাবুকে দেখেই মনে হয় তিনি আগের দিনের আইডিয়ালিস্ট শিক্ষক কিন্তু যেটুকু কম্প্রোমাইজ্ ক'রে নিয়েছেন, তার জন্য প্রচুর আফসোস আছে। সেটা কিছুটা হয়ত ওঁর স্ত্রীর চাপে কিংবা কম্প্রোমাইজ না করলে কারুর আজকাল আর বাঁচার উপায় নেই—তাই।

স্বাতী যে এত পড়াশুনা করছে বাপের প্রচ্ছন্ন হাত না থাকলে কী সম্ভব হত ?

ভাবতে ভাবতে আমি কলিং বেল টিপলাম। বেয়ারা এল। বললাম—দু'জায়গায় খানা লাগাও। লোকটা মাথা নাড়ল। জিজ্ঞেস করলাম—চৌধুরী সাহেব কী ঘরে লাঞ্চ করবেন, কিংবা বাইরে ?

—না, সাহেবের বাইরে একটা পার্টি।

তা আমি অনুমান করেছিলাম। এতক্ষণ ঘরে আছেন অথচ আমার খোঁজ করেন নি, এ আজকাল হয়ই না। তাই বাইরে খাবেন শুনে যেন বাঁচলাম। বেয়ারা চলে গেল।

স্বাতীর উক্তির রেশ টেনে বললাম—তুমি যে বললে এ শহরে সুস্থ লোকের বড় অভাব—তখন থেকে কথাটা ভাবছি—

—আমার জোরাল উক্তি শুনে আপনি নিশ্চয় খুব ঘাবড়ে যান—না ?

—না, ঠিক ঘাবড়াই না, তবে কতটা অভিজ্ঞতা থেকে বলো, কতটা আঘাত পেয়েছো বলে, ঠিক ধরতে পারি না।

—আসলে কলকাতায় থাকি বটে কিন্তু এ শহরকে আমি কোনকালে গ্রহণ করতে পারি নি—

—এখানে কারুর ভালবাসায় পড়ো না—এটা কী সেফ্‌লি অনুরোধ করা চলে ?

—ভালবাসা ? বলেই স্বাতী হাসল।

আমি একটু সাহস পেলাম—কেন ? ভালবাসা কী মস্ত বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ? জান স্বাতী, আমি অনেক সময় ভাবি, এ শহরে না থাকলে ভালবাসা কি জিনিস মানুষ হয়ত ঠিক বোঝে না। আমি কোন কালে কলকাতায় থাকি নি। তবে মনে হয় এখানে না থেকে আমার মধ্যে বিরাট একটা গ্যাপ্‌ রয়ে গেছে—

—কি সেই গ্যাপ্‌ ?

আমি বুঝলাম আমার কথা স্বাতী আরও বেশী জানতে চাইছে। কতটা বলব, কতটা কখনও বলা যাবে না ভেবে নিয়ে বললাম—এই যে অনেক কিছু কলকাতার জানি না।

—ওতে কোনো ক্ষতি হয় নি। মেইন স্ট্রীম্‌ থেকে দূরে থাকলে স্বাধীন চিন্তার ক্ষতি হয়—যারা বলে তারা বলে, আমি মানি না।

কথাটা আমার ভারী ভাল লাগল—বললাম, চলো, খানা হাজির।

স্বাতী হেসে বলল—হ্যাঁ চলুন। আমি হাতটা ধুয়ে আসি।

॥ পাঁচ ॥

আমার আসল কাজ কী তা বলা নিষেধ। যাকে বলে 'টপ সিক্রেট'। যেমন ধরুন, সেদিন দিল্লীতে যে ফাইলটা নিয়ে গিয়ে ডি, জি,-র সঙ্গে আলোচনা করতে হয়েছিল—ঠিক কলকাতা আসার আগে, তাতে লেখা আছে রেডিওর ওমুক এক বিরাট অফিসর ডিফেন্সের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিদেশে পাচার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং তাঁর ওপরে নানা-ভাবে এখন যেন ওয়াচ রাখা হয়। সেই ফাইলের ওপরে 'টপ সিক্রেট' লেখা। বর্তমানে তাঁকে রেডিও থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি বদলি হয়েছেন, সেখানেও তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ তাঁকে বেশী কাজ দেওয়া হচ্ছে না কেন, সেই কারণটা বলা নিষেধ এবং যেহেতু তিনি ভয়ানক কাজের লোক, সেহেতু প্রত্যেক ব্যাপারে মতান্তর ও নিষেধের জালে আটকা পড়ে তিনি ঘন ঘন বিরক্ত হয়ে উঠছেন এবং রেগেমেগে বুরোক্র্যাসির চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছেন। কখনও-বা তা চেপে রাখতে পারছেন না; তাঁর ইমিডিয়েট্ ওপরের অফিসারের সামনেই মুখ দিয়ে 'বাস্টার্ড' শব্দটা বেরিয়ে পড়ছে। এবং তাতে প্রকাশ পাচ্ছে সরকারের গোটা এই বুরোক্র্যাটিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা, রাগ। অফিসার শুনেও না শোনার ভান করেন। সেদিন একটু হেসে শুধু স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—'চো', এটা কিন্তু অফিস, এ্যণ্ড ইউ আর বাউণ্ড বাই সারটেন্ রুল অব কন্ডাকট্—। 'সরি' বলে 'চো' গম্ভীর হয়ে আবার ফাইলে মনোনিবেশ করেন।

কখনও মনোনিবেশ করতে পারেন না। সিট্ ছেড়ে এদিক ওদিক ঘোরেন। ফিরে এসে আবার বসেন আবার ছট্‌ফট্ ক'রে বাইরে যান, বা অকারণে বন্ধু ও বন্ধুনীদের কাছে অনবরত টেলিফোন ক'রে যান। এই একই ব্যাপার রোজই ঘটছে। এত কাজের লোক তিনি, অথচ কোন কাজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড্ হচ্ছে না বা করা হচ্ছে না—এটা বড় ফ্রাসট্রেটিং। 'চো'-র মনে কোন গিল্‌টি কন্‌শেন্‌স্ কাজ করছে কি না সেটা জানারও ব্যবস্থা

আছে, যদিও তার কতটা সাফারিং, দুঃখ বা আত্মচেতনা বা যাতনা, তার প্রতি সহানুভূতি জানান বারণ। 'চো'-র নিজস্ব বিচার এখন খুব স্পষ্ট রেখায় চলেছে। তিনি ভাবছেন, যেহেতু তেল মালিস ক'রে বহু অযোগ্য অফিসার বুরোক্র্যাসির সিঁড়ি বেয়ে চোখের সামনে উঠে যাচ্ছে এবং কাজে ও যোগ্যতায় তারা শ্রেফ লবডঙ্কা,—তাই এই অবস্থা বা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে লাভ নেই। মেনে নিতে গেলে যন্ত্রণা বাড়ে কিন্তু না মেনে নিলে বিদ্রোহ করতে হয়—তাতে আখেরে চাকরীটা খোয়াবার চান্স। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা গেল, 'চো'-র হাতে ইদানীং প্রচুর অবসর। তিনি সেই অবসরটা কাজে লাগাচ্ছেন নানা জাতের ও নানা ধরণের আর্টিকেল লিখে। আমরা আতঙ্কিত হয়ে দেখছি সেগুলি বড় বড় পত্রিকায় ছাপছে। নানা বিষয়ে, শুধু লেখার গুণে 'চো' কী রাতারাতি একস্‌পার্ট হয়ে গেলেন? বাইরের জগৎ তাঁকে জানছে 'চো' স্বাধীন ও ডেমোক্র্যাটিক চিন্তাধারার একজন বড় ক্রুসেডার—যেমন ভাবে সত্য গোপন ক'রে জার্নালিস্টদের অনেকে আজকাল স্বাধীন বক্তব্যের বা বিশ্বাসের ক্রুসেডার।

যে সুন্দরী স্টেনো 'চো'-কে দেওয়া হয়েছে—তার সঙ্গে অবসর সময়ের অনেকটাই তিনি এখন কাটাচ্ছেন। এবং খুব এগ্রেসিভ্‌ ভাবে। মেয়েটিও সেয়ানা, হেসে, খেলে এবং প্রতিবাদে ঝলসে উঠে 'চো'-র আবেদনে একটু-আধটু সাড়া দেয়। 'চো'-র বুঝবার সাধ্য নেই—এর পেছনে, এই সাজান ফাঁদের পেছনে আমাদের কতটা হাত।

সরকারের ধৈর্য অসীম, ঠিক যেন ঈশ্বরের মত। কিছু কিছু অ্যান্‌টি-সোসালের ওপর তার বিরাট বড় চোখ। এবং এসব ব্যাপারে সব সময় যা হয়—জলের গভীরে সবটুকু স্রোত—বাইরে থেকে তা বোঝার কোন উপায় নেই।

কলকাতায় সবাই জানে আমি 'টুরে' এসেছি, কতদিন থাকব কেউ জানে না—সেটা 'টপ সিক্রেট'। কী কারণে এসেছি, তা বোধহয় সব সময় আমিও জানি না কিন্তু আমিও তো গোলাম, চাকরী রাখতে গেলে আমারও কিছুটা জানতে হয়। তবে জানি না, ঠিক কতদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে। যেদিন দিল্লীর ডাক পড়বে চলে যাব। আপাতত ভেবে দেখেছি কলকাতায় আমার আসার সবচেয়ে বড় কারণ—দিল্লীর বড়কর্তাদের কথাবার্তা শুনে আমার যা মনে হয়েছে—কলকাতাকে একটু চিনবার চেষ্টা

করা। এবং কলকাতার জীবনে বা আকাঙ্ক্ষায় বা কর্মজীবনে বৈসাদৃশ্য যদি কখনও বা কোথাও চোখে পড়ে, তা জানান। জানান বলা ভুল—কারণ আমাকে এখানে রেখে নানা ব্যাপারে বা নানা অবস্থায় আমি কিভাবে রিঅ্যাকট্ করি, সেটাই বোধহয় এদের কাছে সবচেয়ে বড় 'জানা' হবে। এটার পেছনে যারই হাত থাক এবং কি কারণে এটা করা হচ্ছে আমি ঠিক জানি না, জানার কথাও নয়, কারণ এটা আরও অনেক বড় 'পলিসি'র ব্যাপার—যেখানে আমারও 'প্রবেশ নিষেধ'। তবু জানার সুযোগ মস্ত বড় একটা জিনিস বলেই আমার ধারণা। যেমন কিছু লিখতে হবে বলে কয়েকটা বই পড়তেই হবে এবং লিখতে হবে বলেই বইগুলি চটাপট্ পড়া হয়ে গেল—সেটা কম বড় লাভ নয়। অর্থাৎ যিনি লিখতে দিয়েছেন, তিনি আমার মস্ত বড় উপকার করলেন।

যেমন দেউলি এবং সাধুপুরে দশ জন হরিজন খুন হয়েছে, কেমন? একজন জার্নালিস্টকে পাঠান হল, সব ব্যাপারটা দেখে আসতে। আর্ত লোকেদের আত্মীয়স্বজনদের ইন্টারভিউ করে, মৃত্যুর পেছনে যে-যে ফোর্স কাজ করছে, জাতপাত বা সমাজ ব্যবস্থার যে ঔদ্ধত্যের ফলে কায়েমী স্বার্থ একজোট হয়েছে—তার বিরুদ্ধে কারা সংগ্রাম করতে গিয়েছিল এবং কাদের শেষ করে দেওয়া হল—এবং মৃত্যুর পেছনে ব্যক্তিগত শত্রুতাই বা কতটা বা ডাকাতদের বিরুদ্ধে পুলিশদের অত্যাচারই-বা কতটা দায়ী, পুলিশ কাদের চর বা কাদের চড় খেয়ে ইদানীং কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে—এইসব নানা জিনিস দেখেশুনে, নানা মসলাপাতি নিয়ে এসে, সরকার-বিরোধী ও সুস্বাদু কিছু রিপোর্ট কাগজে ছাপানর জন্যেই কাউকে পাঠাবার প্রয়োজন পড়ে। এবং এসব ব্যাপারে লেখার যাঁর হাত ভাল—তাঁকেই। অথচ ভাল যে লেখে সেও হয়ত জানে না কোথায় স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, সমাজ-ব্যবস্থার কত গভীরে তার কত বড় বিস্তার, বাসা বা যোগ—। এবং না বুঝেই দৃশ্যত বাইরের ব্যাপারগুলি নিয়েই তিনি হয়ত লিখতে শুরু করেন এবং তেড়ে লেখেন। সেখানে সরকার সব ব্যাপারেই দোষী—এরকমই একটা সিমপ্লি-ফিকেশন বা আন্তরিক রাগ লেখায় প্রকাশ পায়। সরকার চালাতে গেলেই কিছু কিছু ত্রুটি এসে যায় বা স্খলনের বীজ সূক্ষ্মাকারে চালকের হাতে বা মনে বাসা বাঁধে; তাই সরকারের পদস্খলন হলে কারা কোন্ পর্যায়ে সেই বিষাক্ত হাত মিলিয়েছে, তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে। অর্থাৎ গিট খুলতে গিয়ে

নির্দিষ্ট কোন অনুরুদ্ধ পথে চলতে গেলেই ভুল হবার সম্ভাবনা। তেমনি আবার অন্য দিকটাও নেহাৎ একপেশে যে এসব নৃশংস হত্যার খবর সরকার আগে থেকেই জানতেন, কিন্তু সরকারের করার কিছু ছিল না। এটুকু কথা বললেই গোটা ব্যাপারটা ধরা পড়ে না; সরকারের যদি করার কিছু না থাকে, কেন করার ছিল না, কে করতে দেয় নি, কেন করতে দেয় নি—বড় জটিল এসব ফাঁস। অর্থাৎ যাঁরা একটু গভীরে ভাবেন, যা-কিছু ঘটছে তার একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে চান—তাঁরা লেখার বাইরেকার চাকচিক্য বা ভাষার কারিকুরি দেখে খুব একটা ভুলে যান না। লেখার পেছনে লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী—নাম-যশ বা অর্থ বা বিদেশযাত্রা কিনা—সেই সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। যাঁরা জানেন সব কিছুর সঙ্গে সব কিছু জড়িয়ে আছে—তাঁরাই গভীরে ভাবতে পারেন বা ভাবার চেষ্টা করেন। আবার দৃষ্টিটাও তাঁদের সেদিকে ঘোরে। তা সরকারই হোক বা সাধারণ লোক। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরকম নানা প্রশ্ন জাগে বলেই তাকে তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় কোন্ পর্যায়ের লোক দেশটাকে কিভাবে চালাচ্ছেন, এবং কি তাঁদের মোটিভেশন্। ঠিক তখনই শুধু বোঝা যায় দেশটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কোন্ দিকে এগোচ্ছে—কাদের হাতে অর্থ, তাঁরা যদি বর্তমান সরকারের 'স্টেটাস্-কো' চান—তার পেছনে কতটা তাঁদের নিজেদের স্বার্থ জড়িয়ে। তাঁরা যদি কিছু লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে ফ্যাক্টরী বন্ধ রাখতে চান বা 'ভারতবন্ধে' উস্কানি দেন—তার পেছনে কার হাত এবং যাঁরা উস্কানি দিচ্ছেন এবং যাঁরা সেই উস্কানি দিতে দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা নিচ্ছেন—তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটা কী? উৎপাদন না বাড়লে, দেশটা ইন্‌ফ্লেশনের চক্করে পড়লে—তাঁরা আর কী-কী রুই-কাতলা তুলবেন বলে কে এবং কারা ওৎ পেতে বসে আছেন এবং সরকার সেখানে কি ভূমিকা নেবেন বা নিচ্ছেন—কাদের এবং কার স্বার্থ দেখছেন বা দেখতে পারেন এবং যদি এক ধরণের লোকের স্বার্থ দেখেন—তাহলে সরকারেরই-বা সেখানে ইন্টারেস্ট কোথায়—আগামী কোন ইলেক্‌শন্ লড়তে হবে কিনা, বা দেশে অন্য দল বা অন্য পার্টি বিদেশ থেকে কতটা টাকা হাতড়ে এখন প্রচণ্ড সবল হয়ে কি ধরণের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে—এবং তাদের মোকাবিলা করতে হলে এবং কিছু কিছু দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে হলে কী কী বা কোন্ কোন্ ষড়যন্ত্র করা দরকার, বা কিভাবে ছোট ছোট ইসুকে বড় আকার দিয়ে কোথা থেকে জাতপাত, সাম্প্রদায়িক

হাঙ্গামা বা তা থেকে অনৈক্যের বীজ বপন করতে হবে এবং খুব সূক্ষ্মাকারে, অনেকটা বোমা-বিস্ফোরক সন্তর্পণে যথাস্থানে রেখে আসার মত,—মানুষের বা কোন্ দলের বিরুদ্ধে কাদের অবিশ্বাস বা ষড়যন্ত্রের ফণা তুলে দিলে কাদের সুবিধে বা অসুবিধে হয়, বা কোন্ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা তখন সহজ হয়ে যায়—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন আগাছার মত মূল মহীরুহকে জড়িয়ে থাকে। যাঁরা ভাবেন বা তলে তলে ব্যাপারগুলো ওয়াচ করেন—বাইরে থেকে মনে হয়, দেশটা বেশ সুখে আছে, দেশের মানুষও সুখী এবং মনে হতে পারে ভেতর থেকে যারা কলকাঠি নাড়ে তাদের কোথাও কোন উদ্দেশ্য নেই—কিন্তু ভেতরের কথা সব সময়ে সব কালেই আলাদা। এবং সেটাই আমাদের টাইপের ডেমোক্র্যাসি বা পলিটিকস্ বা সমাজ-ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ভেতরের আগ্রহ, কর্মপ্রচেষ্টা বা ষড়যন্ত্র। যখন যেটা হয় বা চালান হয়—তার ফসল ফলে পরবর্তী দশকে বা তারও পরে ; আবার কিছু কিছু ফসল আছে যাকে বলে মরশুমী ফসল—অবিলম্বে চাই, নইলে দেশের লোক খেতে পারবে না, লোকেরা ক্ষেপে উঠবে কিংবা কিছু কিছু মারাত্মক স্থানে বিদ্রোহ দানা বাঁধবে।

যা বলতে চাইছি তা হল, আমার জীবনের যা টানাপোড়েন এবং যে অবস্থিতি ঘটেছে—কলকাতাকে চেনাজানা আমার কোনকালেই সম্ভব হয় নি এবং এরকম একটা সুযোগ না এলে কখনই হত না। তাই স্বল্পমেয়াদী প্রেমে পড়ার মত, সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে, কিছু কাজ দেখিয়ে বা গোলামী ক'রেও কলকাতাকে যদি কিছুটা চেনা হয়ে যায়—তাহলে জোর ক'রে কিছু বই পড়ার মতই, আমার উপকার হবে। অর্থাৎ আমার কাজ লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে নয়, যারা টাকার জোরে কালচারের ফর্মটাকেই চেঞ্জ ক'রে দিতে চায়—লোকেদের আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-অভিলাষ, সংগ্রাম ও চেতনার মূল ধরে টানে বা টানাটানি করতে চায়—এবং আস্তে আস্তে সাপের বিষ খাওয়াবার মত, গোটা একটা দেশের সংগ্রামী চেতনাকে শেষ ক'রে ফেলে। সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা অকাজ করার লোককে বা প্রতিষ্ঠানকে সরকার কতটা প্রশ্রয় দেন বা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন লোক বা প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগান কিনা বা ঐ 'ধর্মে-তে-বীর' লোকেদের ওপর সরকার নজর রাখেন কিনা, তাও জানি না। কিছু লোক কিছু কিছু স্বার্থের কথা ভেবে অনেক কিছু করতে দেয় না বা তাদের করতে

দেওয়া হয় না বা করতে দেয় না আরও কোন বৃহৎ শক্তি—সে সব কথা বা খবর সরকার নিশ্চয় রাখেন। অন্তত রাখা উচিত। আমার কাজ মিডিয়া নিয়ে। অত বড় বিরাট ব্যাপার-স্যাপারে আমি নেই। এঁদের কাছে আমি একজন চুনোপুঁটি।

অর্থাৎ আজ হয়ত আমি কলকাতার মেন বুলেটিন করব, যদিও আমার করার কথা না। অন্যরা, যাঁরা রোজ করছেন, বা ক'রে থাকেন, তাঁরা আমাকে সাহায্য করবেন। এরকম কথাই আছে। কিন্তু কথা থাকলেই যে সেটা করব তা নয়; বরং উল্টোটা করব। যেমন রেডিওর প্রোগ্রাম কি হচ্ছে না হচ্ছে—দেখতে গিয়ে আমি শুধু অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করি। আমি জানি একটা মানুষের এটিচ্যুডই অনুষ্ঠান পরিবেশনের মূলে কাজ করে। অর্থাৎ যা যা করার আমার কথা—তা যে আমি করছি কেউ টেরও পাচ্ছে না। এটা ভেবেও আমার শান্তি। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি কোন কোন চাঁই বা কিছু কিছু স্টাফ্ আমাকে সন্দেহ করছে—বেশী কথা বলছে যাতে আমি চাপে পড়ে বেশী কথা বলি এবং যেখানে আমার কাছ থেকে কিছুই আহরণ করতে পারছে না, নির্লজ্জের মত শত প্রশ্ন করছে। কেউ কেউ আবার আড়ালে কথা বলছে; কেউ আবার বেশী কিউরিসিটির গুণে আমার সম্বন্ধে বেশী ভেবে বসে আছে।

আসলে বুরোক্র্যাসির আজকাল সবচেয়ে যেটা ভয় বা মুশকিল—সবার উদ্দেশ্য সবাই জেনে যায়। অর্থাৎ ডিপ্লোম্যাসিটা আজকাল যেটুকু অবশিষ্ট আছে শুধু বোধ হয় পলিটিকাল্ লেবেলে বা পার্টি পর্যায়ে; সরকার চালাতেও যে ডিপ্লোম্যাসি লাগে, ব্রিটিশ সরকারের বড় বড় বুরোক্র্যাট্‌রা যা আমাদের শিখিয়ে গেছেন বা সেই ট্রাডিশন্ যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন—সেই 'মহৎ' ট্রাডিশনে লালিত হয়েও আমরা ঠিক বুরোক্র্যাসির যোগ্য সন্তান হতে পারি নি। বুরোক্র্যাট্‌দের সম্মানও তাই আজকাল আর রাখতে পারছি না।

তাছাড়া তখনকার দিনে ক্ষমতাসীন সরকারের স্বার্থ কোথায়, ব্রিটিশ বা দেশীয় বুরোক্র্যাট্‌দের তা বহু দিনের প্রয়াসে শেখান হত। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ ক'রে গেলে শেষ জীবনে তার যথাযথ পুরস্কার পাবারও সুযোগ ছিল। মতামত দেবার অধিকার দেওয়া হত বহু দিনের তপস্যায় মতামত দেবার অধিকার অর্জন করলে; তার মধ্যে,—সব কাজের মধ্যে টোটাল্

একটা পারসোনালিটি জড়িয়ে থাকত যাকে বলে 'বিয়িং' বা 'বিকামিং'। তাই এখনও বৃদ্ধ রিটায়ার্ড লোকেরা বলে থাকেন—কি ডিশিসনে, কি দক্ষতায়, কি বিচারে বা উন্নতিতে, কি সভয়ে বা নির্ভয়ে—ব্রিটিশ শাসনের তুলনা হয়? 'ওসব আপনারা দেখেন নি এবং আজকাল যা দেখছেন এ নিয়ে যদি সেদিনকার কথা বিচার করতে যান—ভুল হবে, বিস্তর ভুল হবে। রীতিমত ঠকবেন। আজকাল যা চলছে একে কী শাসন বলে?'

তা বটে। এখন যে সবাই নিজেরটা গোছাতেই ব্যস্ত; কে, কোথায় বা কারা কতদিন রাজত্বে আসীন—তা নিয়ে দেশে আজকাল ভয়ানক একটা অনিশ্চয়তা। কে রাজা আর কে প্রজা, বা কোন্ প্রজার কোন্ রাজার চেয়ে বেশী ক্ষমতা বা কী করে কোন্ 'বাবাজীর' বশীকরণ লাগিয়ে কোন্ রাজপুত্রের প্রাণটা কে-যে মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছে—এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা জটিল জট খোলা বুরোক্র্যাট্দের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। 'বিকামিং'-এর টোটাল্ স্পিরিট্ আর নেই বললেই চলে। যেটুকু অবশিষ্ট আছে, কাজ চালান, চাকরীটা নিরাপদ রাখা বা টু-পারসেন্ট (আজকাল নাকি টেন্-পারসেন্ট ছাড়া চাঁই সরকারী অফিসারও রা কাড়েন না) ম্যানেজ ক'রে কাজটা গোছান—ওটুকুই যথেষ্ট। বুরোক্র্যাট্দের শিরদাঁড়ায় আজকাল বড় ব্যথা; স্পন্ডিলাইটিস্ রোগের বড় প্রাদুর্ভাব। বিলেতের আশীর্বাদপুষ্ট বাঘা বাঘা আই, সি, এস,-দের মত, অত বোঝা আজকাল, এই ভেজালের দিনে, বইবার সাহস বা সাধ্য হাল-আমলের বুরোক্র্যাট্দের আর যেন নেই।

সুতরাং 'টপ সিক্রেট' হলেও বুরোক্র্যাট্রা কাজ গোছাবার জন্য যেভাবে প্রসিড্ করতে বলেন, গোলাম হলেও আমি আবার হুবহু সব কথা মানি না। জানি না কেন, হয়ত লেখক হিসাবে কিছুটা পরিচিতি আছে বলেই অনেক ব্যাপারে পার পেয়ে যাই; অর্থাৎ কোন ভাইটাল্ ইসুতে ডিফার করলেও আমার 'বস্রা' আমার উপরে অতটা চটে যান না, যতটা যাওয়া উচিত। হয়ত ভাবেন বুরোক্র্যাট্দের চেয়ে লেখকরা নিশ্চয় বেশী ইমাজিনেটিভ্, এবং অনেক বেশী তলিয়ে দেখতে জানে। তাই এই যে দেখার একটা নেশা বা তলিয়ে দেখার একটা আগ্রহ, ওটা আছে বলেই অনেক ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করা হয় বা বলা ভাল, ডিফার করলেও তাঁরা রাগ দেখান না বা রাগ দেখিয়ে লাভ নেই বলেই চুপ ক'রে থাকেন। হাজার মানুষের চিন্তাধারা বা

উদ্দেশ্য নিয়ে গোটা যে শক্তি দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যায় বা পিছিয়ে দেয়,—তার তাৎপর্য বিচারের সঙ্গে হাজারো প্রশ্ন সুতোর মত, তারের মত, হাজার সারকিট্ ঘুরে চলে—তার গভীরে অনেক সময় আমি যেতে চাই—এতে সমস্যা অনেক, কিন্তু মাঝে মাঝে লাভও হয়। লাভ এইটুকু যে সেই বোধটুকুর সামান্য একটু প্রসাদ ছড়িয়ে দিলেই বুরোক্র্যাট্‌রা রত্ন পেয়েছি মনে করেন এবং নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দে ফাইলগুলিকে একের পর এক তখন 'টপ সিক্রেট' মোড়ক লাগিয়ে তারই চারপাশে ঘন ঘন আবর্তিত হতে থাকেন এবং 'স্পিডিলি অ্যাক্ট', 'ইমীডিয়েট' বা 'ফার্ম অ্যাকশনের' হিড়িক পড়ে যায়। বুরোক্র্যাসির একটা তাৎক্ষণিক খিদে মেটানর ব্যাপার আছে ; এই ভূতের নাচন দেখা খুব মজার অভিজ্ঞতা।

সে যাক্, মেইন্ বুলেটিন্ করার কথা আমার, কিন্তু আমি তা করছি না। করার প্রয়োজনও দেখছি না। কি কারণে এবং কি অবস্থায় 'টপ সিক্রেট' ব্যাপারগুলো ঘটছে তার কার্যকারণ বোঝাই এখন বেশী দরকার। এটা শুনলে দিল্লীর বড়কর্তারা হয়ত ভড়কে যাবেন বা আঁৎকে উঠবেন। অথচ আঁৎকে ওঠার কিছু নেই কারণ আসাম আন্দোলনে রেডিওকে যদি আন্দোলনকারীরা কাজে লাগাতে পেরে থাকে—সে কি একদিনে সম্ভব? না, আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ঘটেছে এবং এর কার্যকারণ না জেনে হঠাৎ ওখানে গিয়ে ভিড় করলেই তা বন্ধ করা যাবে না। আমার ত অনেক সময় মনে হয় আমাকে আসামে পাঠাবার আগে আমাকে দিয়ে কলকাতার অবস্থাটা আগে হয়ত যাচাই ক'রে নেবে। সে যাক্।

খুঁটিয়ে কাগজটা পড়ছিলাম—এবার পশ্চিমবঙ্গে খরায় ৩৫ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত। সেটাই মাথায় ঘুরছিল। দিল্লী থেকে শুনলাম একজন নামী ও দামী জার্নালিস্ট পঞ্চায়েত মিনিস্ট্রীর গাড়ি চড়ে একদিনে গ্রাম-কে-গ্রাম দেখে এলেন, পঞ্চায়েত লিডারদের ইনটারভিউ করলেন এবং সি,পি,এম, সরকার রাজ্য চালাতে গিয়ে গ্রামের কতটা গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন তার একটা হিসাব নিয়ে এলেন। আমি অবশ্য ভাবছিলাম অত কম সময়ে নানা অদৃশ্য শক্তির হাতটা ঠিক কী বোঝা যায়? যেমন অন্য দল বা অন্য পরাজিত শক্তি, গ্রাম-পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করার জন্য কত রকম ভাবে চেষ্টা করছে এবং চেষ্টা ক'রে যদি সুবিধে করতে না পেরে থাকে, তবে কী এই কারণ যে সি,পি,এম, গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়াসে অনেকটা সফল? এত স্বল্প

সময়ে এসব কী ঠাওর করা যায় ? ভাবছি আর বুলেটিন যারা করে, তারাই নির্বিবাদে কাজ ক'রে যাচ্ছে। লক্ষ্য করলাম লিড স্টোরি যিনি করছেন, পরপর তিন-চারটে টেলিফোন পেয়ে এই মুহূর্তে তিনি ভয়ানক উত্তেজিত। টেলিফোন রেখে এত দিনের পুরণো সিরিয়াস্ মানুষটা বলে উঠলেন—দেখুন, এসব ইন্টারফেয়ারেন্সে কী কাজ করা যায় ?

কার ইন্টারফেয়ারেন্স ? কে ফোন করেছিল ? জিজ্ঞেস করতে পারতাম কিন্তু আমি ওদিক দিয়েই গেলাম না। শুধু ভাবলাম সাধারণতঃ শত টেন্শনেও আমাদের ভদ্রভাবে টেলিফোনে জবাব দেবার নিয়ম, কারণ ওতেই আমাদের গুডউইল, এবং ওটা আমরা অসুবিধা হলেও ক'রে থাকি। তা না ক'রে লোকনাথবাবু অত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন ? আমাদের রেডিওর কোন লোক ফোন ক'রে ওমুক খবরটা দিয়ে দেবেন, বলাতেই কী লোকনাথবাবু অত চটে উঠলেন ? কিংবা কোন সরকারী প্রতিনিধি বা পাড়ার কোন পিসতুতো ভাই—যিনি সরকারের লেজুর ধরে চলেন, তিনি লোকনাথবাবুর নিজস্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে খবরটা দিতে বলায় অতটা রিঅ্যাক্ট করলেন ? কিছুই ধরতে পারলাম না। এই যে সামান্য একটু রিঅ্যাক্শন্, এতে কত জটিল ব্যাপার জড়িয়ে থাকতে পারে ভাবছিলাম। কে এবং কারা এরকম ফোন করে ? মন্ত্রীদের পি,এ,-রা, না পার্টির চাঁইরা ? সেই ফোন কে এবং কারা ধরে এবং সেই ফোনে-দেওয়া খবর কতটুকু বুলেটিনে যায় ? যদি না যায়, তার পেছনে কী ব্যক্তিগত কোন রাগ বা প্রেজুডিস কাজ করে, না অন্য কোন জটিল পলিটিকাল্ বিশ্বাসে, খবরের নিরপেক্ষতাকে খর্ব করা হয় ? এসব নিয়েই ভাবছিলাম। কিন্তু আমি চুপ ক'রে কাগজ পড়ে যেতে থাকলাম। যারা এই ধরণের টেলিফোন এন্টার-টেইন্ করে তারা কিন্তু কেউ ডিউটি করছে না। লোকনাথবাবু ফোনই ধরতে চান না এবং আমি যতদূর জানি আজ তিনি কখনই ধরতে চান নি। অথচ কি অবস্থা হলে লোকনাথের মত ঠাণ্ডা মেজাজের লোকও রেগে উঠতে পারেন এবং রিঅ্যাক্ট করেন—সেটুকু জানাই আমার দরকার। কার ফোন পেয়ে এই রিঅ্যাক্শন্, সেটা বুলেটিন শেষ হবার পরে, এই ব্যস্ততা এবং সময়ের সঙ্গে যুঝবার টেন্শন্ কমে এলে, তিনি হয়ত নিজেই তা একসময়ে বলবেন। বা আমি কায়দা ক'রে জেনে নেব। আপাতত দেখা দরকার, খরায় কবলিত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য কি করা হচ্ছে—বোথ্ অ্যাট্ দি সেন্টার, অ্যাণ্ড

স্টেট লেবেল্। সেন্টার থেকে রিলিফ্ আসার ফলে রাজ্য সরকার কতটা ধাতস্থ হয়েছেন বা পেয়েও নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে বলছেন, 'পুরোটা পান নি'—এই দু'দিকের খবর যতটা সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বুলেটিনে যাওয়া উচিত। কাগজ পড়তে পড়তেই লক্ষ্য করলাম ইউ,এন,আই, পি,টি,আই, আমাদের সংবাদাতার খবর, আর কতগুলি সরকারী হ্যাণ্ড-আউট্ থেকে লোকনাথবাবু খরার যে খবরটা তৈরী করেছেন, তার মধ্যে শুধু যে নিরপেক্ষ খবর আছে তাই নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের এ ব্যাপারে অ্যাংজাইটিটাও বেশ সুন্দর ভাবে ফোটান হয়েছে। লোকনাথবাবুর কাছ থেকে নিয়ে পাতাগুলো আমি আলতোভাবে পড়ে নিলাম। বলতে গেলে তিনিই আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। পড়ে ভাবলাম, রীতিমত আমার প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু তা না ক'রে একটু সম্মতিসূচক হাসলাম।

লোকনাথবাবু তাতেই খুশী বা গদগদ হয়ে উঠলেন। বললেন—জানেন, দিনের পর দিন এরকম টেন্‌শনে আর লোকের লুচ্ছামি সহ্য ক'রে আমি নিরপেক্ষভাবে খবর পরিবেশন করে যাচ্ছি—অথচ তার কোন অ্যাপ্রিশিয়েশন্ আছে? নিজেই হতাশ নিশ্বাস ফেলে বললেন—নেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন, অ্যাপ্রিশিয়েশন্ নেই কেন?

কলমটা ও চশমাটা বুলেটিনের ওপর শুইয়ে রেখে আস্তে আস্তে বললেন—আর আমি দু'মাসের মধ্যে রিটায়ার্ড করব—এটাকে কী আপনি অ্যাপ্রিশিয়েশন্ বলেন? অথচ বলতে নেই, দিল্লীতে শুনেছি অনেক অযোগ্য লোক বছরের পর বছর এক্সটেন্‌শন্ পেয়ে যাচ্ছে—

বলতে পারতাম এবং বলার সে ক্ষমতা আমার আছে যে নির্ধারিত দিনে আপাতত আপনি রিটায়ার্ড করবেন না, আপনাকে এক্সটেন্‌শন্ দেওয়া হবে এবং সেটা মুখ ফুটে বললে তিনি আরও দ্বিগুণ উৎসাহে বুলেটিন করবেন, আমি জানি। হয়ত আমি পরে চুপিচুপি দিল্লীতে লিখব। কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমি ভেবে দেখলাম, মানুষকে ওয়াচ করতে হলে, মানুষের অভিযোগে বা দুঃখ-কষ্টে, উত্তেজনায় বা রিঅ্যাক্‌শনে অত তাড়াতাড়ি সাড়া দিতে নেই, 'হবে, সব হবে,'—এরকম একটা ভাব রাখলেই সুবিধে। বুরোক্র্যাসির এই রুগ্ন আশ্বাস মাঝে মাঝে সত্যিই বড় কাজে লাগে।

লোকনাথবাবু আমার মুখে কোন ভাবান্তর না দেখতে পেয়ে বললেন—কী, চুপ ক'রে গেলেন যে? আপনি দিল্লীর লোক, আপনি তো সবই

জানেন—কিছু বলুন।

এখন আমার আন্তরিকতা দেখান খুব দরকার—না হলে তার প্রভাব পড়বে বুলেটিনে। তাই আমিও খুব ধীরে ধীরে বললাম—অ্যাপ্রিশিয়েশন্ যে হচ্ছে না, তাই বা আপনি কী করে জানলেন?

আর ঐ শব্দটা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোক বা কর্মীর যেন কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেল। চারিদিকে দেখছি ভিড়। এত লোকের ত এখানে থাকার কথা নয়! এরা কেন কারণে-অকারণে এত জটলা করে—ওঠে, বসে, আবার ওঠে, লোকেরা আসে, লোকেরা ষ্টাফদের ডেকে নেয়, বাইরে যায়, আবার আসে—আবার যায়—এ কী? এত লোক রেডিওতে আসে কেন? কারা ঢুকতে দেয়? না কি এদের বারণ করে এমন হিম্মত বা আস্পর্ধা কারুর নেই?

হঠাৎ দেখি রুদ্ধ হালদার ঘরে এল। আমার প্রশংসা-বাক্য, অনুমান করলাম, তার পছন্দ হয় নি। কাজ করতে করতে কাজের অর্ধপথে একবার দেখলাম বাইরে গেল, কাকে কী বলে তাকে উত্তেজিত ক'রে আবার ফিরে এল। সব পুঞ্জিভূত রাগটা গিয়ে পড়ল পিয়নটার ওপর। প্রায় চিৎকার ক'রে উঠল—কী মণ্ডল, বুলেটিনের জন্য কাগজ সাপ্লাই করা—সেটাও কী আমার কাজ না কি? তোমরা কী কর বলত? কাগজ-ফাগজ রাখ না কেন—অ্যাঁ?

মণ্ডল এক গুচ্ছের কাগজ নিয়ে এসে বলল—আপনারই কাগজ কম পড়ে কেন, শুনি? আর কী এখানে কেউ কাজ করছে না? কই হালদারবাবুর তো কখনও কাগজ কম পড়ে না! আগে দেখেশুনে তারপরে তিনি কাজ করতে বসেন—

—তোমরা কী কর না কর—তা কী আমি জানি না—এই দিল্লীর লোক বসে আছে। সব আমি ফাঁস ক'রে দেব—দেখো।

—করবেন তো করুন না। আপনিও কী ক'রে বেড়ান—আমরাও তা ফাঁস করতে জানি। ভগবান আমাদেরও মুখ দিয়েছেন—বুঝলেন?

ওরে বাবাঃ, চারিদিকে দেখছি জাগ্রত জনতা। রুদ্ধদ্বার খুলে যায়। উত্তেজিত হয়ে উঠল রুদ্ধ হালদার—কি বলবে শুনি? বল এক্ষুণি বল। (নিজেকে দেখিয়ে এবং বুক চাপড়ে)—এ হল রুদ্ধ হালদার, বুঝলে? দিল্লীর বাপকেও ভয় পায় না।

স্বাগত জনা অফিসার মানুষ। কথাটা তার কানে হয়ত লেগেছিল। ধমক দিয়ে উঠল—রুদ্ধবাবু, আপনি একটু চুপ ক'রে কাজ করুন তো।

রুদ্ধ কাজে মন দিল—। একটু পরে আবার—চুপ করিয়েই তো আপনারা রেখেছেন। নয়ত পিয়নের এত বড় আস্পর্ধা হয়? বলে কি না আমার কথা ফাঁস ক'রে দেবে? ইউনিয়ন করি তো কী হয়েছে? একশো-বার করব—ওটা আমার ফান্‌ডামেন্‌টাল রাইট্‌। আর তারই জোরে আমি এই মণ্ডলকেই কতবার বাঁচিয়েছি, অস্বীকার করুক তো—।

স্বাগত জনা বলল—একটু চুপ করুন তো। কাজ করতে দিন।

তারপর দেখলাম সবাই চুপ। বুলেটিনের সময় যত এগিয়ে আসছে সমস্ত পরিবেশটাই যেন একেবারে পালটে গেল।

আমি আস্তে ক'রে উঠে পড়লাম। কখন, কোথায় এবং কতটুকু থাকা উচিত কষ্ট ক'রে আয়ত্ত করেছি। আমি বুঝি।

উঠে যাবার পরেই আবার ভয়ঙ্কর একটা কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। বুলেটিনের আর দশ মিনিট বাকি। এভাবে কী কাজ হয়? দিল্লীর লোকের সামনে আরও একটু বুঝেশুনে কথা বলা উচিত, এটাই বোধহয় বলতে গিয়ে স্বাগত জনা বিপদ বাধিয়েছে। কিন্তু জনা সময়মত সামলে নিল।

আমি আমার ঘরে বসে নিউজ বুলেটিন শুনলাম। নিউজ ডিভিশনে কত যে কাণ্ড হয়, বাইরে থেকে তা বোঝার কোন উপায় নেই। বাস্তবিক দিল্লীর কোন বাপকেই এরা তোয়াক্কা করে না।

॥ ছয় ॥

কলকাতায় স্বাতীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার এলিয়টের একটা কবিতার লাইন বারবার মনে পড়ছিল—'Ridiculous the waste sad time, stretching before and after'। গড়ের মাঠে হাঁটছি, মা বলতেন—'সমস্ত গা-হাত-পা জ্বলে যাচ্ছে রে—। দক্ষিণের জানলাটা খুলে দে।' অমনি দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিতাম। দেখতাম, সামনে অসংখ্য সুপুরি গাছের ঘন সবুজ পাতা কাঁপছে। তার ডালে হরিৎ রঙের আলো। দক্ষিণে হাওয়ায় নারকোল গাছের পাতা কাঁপছে, সুপুরি গাছ দুলছে। হাঁ-করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। গ্রীষ্ম পেরিয়ে শীত—দু-একটা খেজুর গাছ, নির্বিকার ধ্যানমগ্ন যেন। খেজুর গাছে দেখেছিলাম একটা হৃষ্টপুষ্ট লোক। হাঁটুর ওপরে কাপড়, গায়ে ময়লা গেঞ্জি। মোটাসোটা একটা দড়ি কোমরে বেঁধে তরতর করে খেজুর গাছে উঠে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে যেন আকাশে উঠছে। সেখানে লোকটা একটা হাঁড়ি ঝুলিয়ে রেখে এল আর এখন সেই শূন্যে টপাটপ্ পড়ছে খেজুরের রস। উত্তরে হাওয়া বইছে—দু-এক ফোঁটা খেজুরের রস কী আর মুখে এসে পড়বে না? ছোটবেলায় খুলনায় বড় লোভী ছিলাম আমি।

গড়ের মাঠ দিয়ে হাঁটছি। সঙ্গে স্বাতী। ও কখনও কথা বলছে, কখনও-বা আমি। দূরে দূরে লাইন বেঁধে গাড়ি ছুটছে—গাছের ফাঁকে, দম নিয়ে দম দিয়ে কে কার স্পিডোমিটার উপড়ে ফেলবে, তারই দুরন্ত ছোটার খেলা। দূরে—আরও দূরে, অসংখ্য মানুষ-সমুদ্রের ভিড়। তারা খেলা দেখছে উন্মত্ত জন্তুর মত। হাঃ-হাঃ—হিঃ-হিঃ-হিঃ। শিকার হাত ছাড়া হলে বাঘ যেমন আফসোস করে তেমনি দুরন্ত হা-হুতাশ বা উল্লাস। এখানে, এই মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের পাশ দিয়ে হাঁটছি; দু-একটা বিশাল গাছ, তাতে দুপুর-পেরন রোদ। স্বাতী বলে যাচ্ছে পুরণো কলকাতার কথা। শুনছি, আবার শুনছিও না।

—জানেন, তখন জাপানীদের বোমা পড়েছে। কলকাতা একেবারে

ফাঁকা। সব কথা আমি আবার বাবার মুখে শুনেছি। লোক তখনও ছুটছে। কিন্তু বাবা কলকাতার শীর্ণ বুক আঁকড়ে পড়ে রইলেন। বলজেন —বুঝলে আমাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই। এখানেই থাকবো। মরতে হয় এখানেই মরবো। মা রেগেমেগে মাসির বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। দু'দিন পরে আবার ফিরে এলেন। বাবা বলতেন—জানিস, কি ভীষণ অন্ধকার আর ঘন ঘন সে-কী ভয়ঙ্কর সাইরেণ। কলকাতা যেন আবার সেই পুরণো গ্রাম হয়ে গিয়েছিল আর লর্ড হেষ্টিংস্ মেঠো কলকাতার রাস্তায় যেন হেঁটে বেড়াচ্ছেন। বাবা কোন ভয় পেতেন না। আশ্চর্য মানুষটার মানসিক শক্তি। সেই অচঞ্চল মানুষটাকে দেখেই আমি এগিয়ে চলার সাহস পাই। একটু থেমে, স্বাতী বলল—আমার অনেক সময় মনে হয় বাবার মত কিছু লোকের সাহস দেখে জাপানীরা স্রেফ্ গিল্টি কন্শেন্সে একদিন পালিয়েছিল।

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম।

রেড রোড পেরিয়ে আমরা তখন ময়দানের দিকে হাঁটছি। স্বাতী বলল—তাড়াতাড়ি হাঁটুন। খেলা ভাঙ্গলে কলকাতাকে আর সামলানো যায় না আজকাল। যেন অন্য আর এক কলকাতা, উদ্ধত, অবুঝ। এত লোকের ঠাঁই কলকাতায়, আপনার অবাক লাগে না?

—লাগে, খুব অবাক লাগে। বলেই চুপ করে গেলাম। একটু পরে—প্রথম প্রথম থ্রিল্ড হতাম, তাকিয়ে থাকতাম শত শত মাথা দেখতে। লাইন বেঁধে গুঞ্জনধ্বনি তুলে চলে যাচ্ছে জনসমুদ্র। তাকিয়ে দেখতাম। কিংবা দেখতাম কেমন লাগে অসংখ্য মুখের উল্লাসধ্বনি। আবার চুপ। আজ ওসব ভাল লাগছে না। স্বাতীর কথায় তখন আমি তাড়াতাড়ি হাঁটছি। আমার মনে পড়ে গেল, আমি সেদিন ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে। ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলা ছিল। হঠাৎ দেখি উন্মত্ত এক জনতা ক্ষুর দিয়ে অসহায় মহিলা ও জনতার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চারিদিকে অসহায় চিৎকার, রক্তপাত। বড় বড় রক্তের দাগ। এরা কারা? এরা কী মানুষ? না, পশু? বাঘের একটা খাঁচায় এক এক করে ঢুকে পড়ুক না! তার কদিন আগে, কাগজে কাগজে দেখেছিলাম খেলোয়াড়দের কেনা-কাটির পালা। যাকে বলে অ্যক্‌শন্—ষাট, ষাট হাজার, সত্তর, এক, এক, এক লক্ষ। কে কত দামে কোন্ দলে বিকোচ্ছে তার ফটকা বাজার। ৩২৫জন

খেলোয়াড় এভাবে খেলতে খেলতে এক দল থেকে অন্য দলে চলে গেল। গা-টা ঘিনঘিন্ ক'রে উঠেছিল। অনেক দিন কেনা গোলামদের খেলা দেখতে যাই নি। মনে হয়েছিল, বাবুরা কার কত দাম দেয়, তা নিয়ে কলকাতার বেশ্যাপল্লীতে বচসা চলেছে।

মাঠ দিয়ে হাঁটছি। সবুজ ঘাস আমাকে বড় টানে, কোথাও বসতে পারলে হত। তখন আমার খুলনার সেই মাঠ-ঘাট-পথের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। গলি ধরে দশ মিনিট হাঁটলেই খুলনা মডেল হাই স্কুলের পাশাপাশি বিরাট বিরাট দু'টি মাঠ—ওগুলো ঠিক মাঠ নয়, প্রান্তর ; এ পাড়ে দাঁড়িয়ে ও পাড়ের মানুষগুলোকে ঠিক যেন দেখা যেত না। দেখা গেলেও মনে হত গাড়ি-ঘোড়া, মানুষ-জন দম দেওয়া কতগুলি খেলার পুতুল ও গাড়ি, একই বৃত্তে যেন ঘুরছে। দূরে, ঠিক দেখা যায় না, দেবদারু গাছের মাথায় সূর্যের আলো, তারও পরে লাল-রঙা একটা বাড়ি, আমরা জানতাম পোষ্ট অফিস। পাশ দিয়ে সরু রাস্তা, ওপাশ দিয়ে সোরাবর্দি গান্ধীপার্কে যান মিটিং করতে, তারও অনেক পরে, পাকিস্থানের দাবীতে এখানে মুসলমানরা অসংখ্য হাত তুলত। আর অন্য প্রান্তের অন্য প্রান্তরে আরও একটু হাঁটলে যেখানে রূপসা নদী—খেয়াঘাট, ফেরিঘাটে দু'পয়সা দিয়ে লোকেরা উঠছে আর নামছে। সেখানে অনেকগুলি বকুল গাছ, —অসংখ্য পাকা বকুল। আমরা স্কুলের হাফ্-টাইমে বকুল গাছে চড়ে পকেট ভরে পাকা বকুল নিয়ে আসতাম আর ক্লাসে বসে খেতাম। সেই খোলা প্রান্তর আর ভৈরব আর রূপসা নদীর কলোচ্ছাস আমি বুকে নিয়ে ফিরি। আমার অন্তরের সঙ্গে যেন মিশে আছে তাদের ছায়া বা রূপ।

স্বাতীকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মানুষ কী তবে ভবিষ্যতের দিকে এগোয় অতীতের ছায়া বুকে নিয়ে? Ridiculous the waste sad time, stretching before and after—

কোথাও বসবে? বললাম। ঘাস বড় টানছিল, আর ছায়া আর রদ্দুর।

—না, কখনো না। এখানে বসলে অন্যেরা ভাববে আপনি আমাকে পয়সা দিয়ে—স্বাতী কথাটা শেষ করল না। একটু পরে বলল—সিট্‌স্ আর স্ট্রীক্টলি রিজার্ভড। ইঙ্গিতটা বুঝে আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে হাঁটছি। আর ঠিক তখনই দেখলাম, এক দল কাল কাল মেয়ে, একই সঙ্গে হাঁটছে, চোখ নাচাচ্ছে এবং গায়ে ঢলে পড়ছে আর খরিদ্দার সামলাচ্ছে। একজন এক পুরুষ

শিকার নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। আর একজন পুরুষ ভাবল, যা দিনকাল পড়েছে দর না করলে হয়? তাই বলে বসল—পাঁচ টাকা দেব, যাবে? মিনসে বলে গাল পাড়ল মেয়েমানুষটা। পাঁচ টাকায় ঝি হয়, ভদ্র মেয়েমানুষ হয় না। পুরুষ ফোঁস ক'রে উঠল—তা ও ভদ্র মেয়েমানুষ, বলেই ফেল তোমার রেট্ কত? তখনও বেড়ালের মত ফুঁসছে মেয়েমানুষটা—তা টাকা না থাকে ঝি নিলেই পার, আমাকে চাও তো, পনেরো টাকা।

স্বাতীকে নিয়ে এদিকে আসা ঠিক হয়নি। বড় গিল্‌টি লাগছে। তাড়াতাড়ি স্বাতীকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে গেলাম, এদিকটা তবু ভাল। দর কশাকশি নেই।

—এদিকে কতদিন আসিনি। স্বাতী চারিদিকটা তাকিয়ে নিয়ে বলল—আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে। আজকাল শুধু ইউনিভারসিটি—না হয় লাইব্রেরী বা কফি হাউস। স্বাতী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমাকে নীরব দেখে চুপ ক'রে গেল।

—আমারও ভাল লাগছে। আমারও পুরণো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—খুলনায় জীবনের বেষ্ট পার্টটা কাটিয়েছি ত।

—বলুন, আমি শুনবো। চলুন কোথাও বসি। ভাগ্যিস, আজ কফি হাউসের দিকে যাই নি। বড় ভিড়। সব সময় ভাল লাগে না। আমাদের জানেন, অতীত বলে কিছু নেই। কলকাতার অতীত বড় বিভীষিকাময়—হয় যুদ্ধ, না হয় দাঙ্গা। বাবা কখনও কলকাতা ছেড়ে যান নি। এই যে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা, এটা বড় অদ্ভুত জিনিস, না?

আমি বললাম—আমরা কিন্তু খুলনাকে আঁকড়ে থাকতে পারি নি। নাগপুরে চলে গিয়েছিলাম পার্টিশনের পরে। বাবা অবশ্য খুলনা ছাড়তে চান নি। স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তো, তাই। বলেই ভাবলাম এ ব্যাপারে আশ্চর্য মিল আছে স্বাতীর বাবা ব্রজেশবাবুর সঙ্গে। বাবাকে আমরা জোর ক'রে উদ্বাস্তু করেছিলাম। নাগপুরে তাঁর বড় দুঃসহ সময় কেটেছে।

আমরা একটা বেঞ্চিতে এসে বসলাম। দূরে দূরে দু'একজন বৃদ্ধ বসে। দু'একজন নিঃসঙ্গ মহিলা। ছোটমত একটা পুকুর। টলটলে জল। এদিক-ওদিক গাছের তলায় বা ছায়ায় হাতটা টেনে সুখ নিচ্ছে তরুণ বা তরুণী।

স্বাতী বলল—চুপ ক'রে রইলেন যে—। কিছু বলুন।

—কি বলবো ? অনেক কথা যখন ভিড় ক'রে আসে, চুপ ক'রে থাকাই বেশী বলা—।

স্বাতী খুব একচোট হাসল। বলল—সাহিত্যিকদের নিয়ে এই এক মুশকিল, বড় রিফ্লেক্‌টিভ্‌ হয় তারা।

—আর আমি ?

—আপনি যেন কেমন।

—কেন বলছো ?

—এই যে, যা জানতে চাই, বলেন না।

আমি জানি একটা মানুষ যখন সময়ের টারময়েলে খাবি খায় তখন তার বলার কিছু থাকে না। সে শুধু দেখে—তাই কি বলব ভেবে না পেয়ে শুধু হাসলাম।

তখন স্বাতী আমাকে যেন ইনটারভিউ করতে শুরু করল—কতদিন খুলনায় ছিলেন ?

—ওরে বাবাঃ, আমাকে নিয়ে কোন রিসার্চ করতে চাও নাকি, যে সন-তারিখ পর্যন্ত বলে যেতে হবে ?

—না, তা না। তবে আপনার কতটা অভিজ্ঞতা বা গভীরতা জানলে আমার একটু উপকার হয়—আমি ঠিক প্লেস করতে পারি—

—তাই নাকি ? প্লেস করতে বড় অসুবিধা হচ্ছে, না ? অসুবিধা হবারই কথা, আমারও হয়। কী জান, বলার লোক পাই না। বলতে বললে কথার খই ফুটবে কিন্তু। তখন আবার সামলাতে পারবে না। বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে—খেয়াল আছে তো ?

—এখনও রোদ। সন্ধ্যা হতে অনেক বাকি।

—ব্রজেশবাবুকে কী বলবে—বলবে, আমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গিয়েছিলে ?

—কি বলবো না বলবো সে স্বাধীনতা আমার। আপনি সঙ্গে থাকলেই বাবা বুঝবেন আপনাকে নিয়ে আমি কোথায় কোথায় যেতে পারি—।

—ডঃ দাসের সঙ্গে আলাপ করা হল না। লাইব্রেরী থেকে দু'খানা বই নিলে, —তারপর কফি হাউসে যাবার কথা, তুমি গেলে না, বললে—অন্য দিন। এখন শুনতে চাইছ খুলনার কথা—তোমার তো বেশ সাহস বেড়ে গেছে, স্বাতী।

শিকার নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। আর একজন পুরুষ ভাবল, যা দিনকাল পড়েছে দর না করলে হয়? তাই বলে বসল—পাঁচ টাকা দেব, যাবে? মিনসে বলে গাল পাড়ল মেয়েমানুষটা। পাঁচ টাকায় ঝি হয়, ভদ্র মেয়েমানুষ হয় না। পুরুষ ফোঁস ক'রে উঠল—তা ও ভদ্র মেয়েমানুষ, বলেই ফেল তোমার রেট্ কত? তখনও বেড়ালের মত ফুঁসছে মেয়েমানুষটা—তো টাকা না থাকে ঝি নিলেই পার, আমাকে চাও তো, পনেরো টাকা।

স্বাতীকে নিয়ে এদিকে আসা ঠিক হয়নি। বড় গিল্‌টি লাগছে। তাড়াতাড়ি স্বাতীকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে গেলাম, এদিকটা তবু ভাল। দর কশাকশি নেই।

—এদিকে কতদিন আসিনি। স্বাতী চারিদিকটা তাকিয়ে নিয়ে বলল—আমার অদ্ভুত ভাল লাগছে। আজকাল শুধু ইউনিভারসিটি—না হয় লাইব্রেরী বা কফি হাউস। স্বাতী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমাকে নীরব দেখে চুপ ক'রে গেল।

—আমারও ভাল লাগছে। আমারও পুরণো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—খুলনায় জীবনের বেস্ট পার্টটা কাটিয়েছি ত।

—বলুন, আমি শুনবো। চলুন কোথাও বসি। ভাগ্যিস, আজ কফি হাউসের দিকে যাই নি। বড় ভিড়। সব সময় ভাল লাগে না। আমাদের জানেন, অতীত বলে কিছু নেই। কলকাতার অতীত বড় বিভীষিকাময়—হয় যুদ্ধ, না হয় দাঙ্গা। বাবা কখনও কলকাতা ছেড়ে যান নি। এই যে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা, এটা বড় অদ্ভুত জিনিস, না?

আমি বললাম—আমরা কিন্তু খুলনাকে আঁকড়ে থাকতে পারি নি। নাগপুরে চলে গিয়েছিলাম পার্টিশনের পরে। বাবা অবশ্য খুলনা ছাড়তে চান নি। স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তো, তাই। বলেই ভাবলাম এ ব্যাপারে আশ্চর্য মিল আছে স্বাতীর বাবা ব্রজেশবাবুর সঙ্গে। বাবাকে আমরা জোর ক'রে উদ্বাস্তু করেছিলাম। নাগপুরে তাঁর বড় দুঃসহ সময় কেটেছে।

আমরা একটা বেঞ্চিতে এসে বসলাম। দূরে দূরে দু'একজন বৃদ্ধ বসে। দু'একজন নিঃসঙ্গ মহিলা। ছোটমত একটা পুকুর। টলটলে জল। এদিক-ওদিক গাছের তলায় বা ছায়ায় হাতটা টেনে সুখ নিচ্ছে তরুণ বা তরুণী।

স্বাতী বলল—চুপ ক'রে রইলেন যে—। কিছু বলুন।

—কি বলবো ? অনেক কথা যখন ভিড় ক'রে আসে, চুপ ক'রে থাকাই বেশী বলা—।

স্বাতী খুব একচোট হাসল। বলল—সাহিত্যিকদের নিয়ে এই এক মুশকিল, বড় রিফ্লেক্‌টিভ্‌ হয় তারা।

—আর আমি ?

—আপনি যেন কেমন।

—কেন বলছো ?

—এই যে, যা জানতে চাই, বলেন না।

আমি জানি একটা মানুষ যখন সময়ের টারময়েলে খাবি খায় তখন তার বলার কিছু থাকে না। সে শুধু দেখে—তাই কি বলব ভেবে না পেয়ে শুধু হাসলাম।

তখন স্বাতী আমাকে যেন ইনটারভিউ করতে শুরু করল—কতদিন খুলনায় ছিলেন ?

—ওরে বাবাঃ, আমাকে নিয়ে কোন রিসার্চ করতে চাও নাকি, যে সন-তারিখ পর্যন্ত বলে যেতে হবে ?

—না, তা না। তবে আপনার কতটা অভিজ্ঞতা বা গভীরতা জানলে আমার একটু উপকার হয়—আমি ঠিক প্লেস করতে পারি—

—তাই নাকি ? প্লেস করতে বড় অসুবিধা হচ্ছে, না ? অসুবিধা হবারই কথা, আমারও হয়। কী জান, বলার লোক পাই না। বলতে বললে কথার খই ফুটবে কিন্তু। তখন আবার সামলাতে পারবে না। বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে—খেয়াল আছে তো ?

—এখনও রোদ। সন্ধ্যা হতে অনেক বাকি।

—ব্রজেশবাবুকে কী বলবে—বলবে, আমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গিয়েছিলে ?

—কি বলবো না বলবো সে স্বাধীনতা আমার। আপনি সঙ্গে থাকলেই বাবা বুঝবেন আপনাকে নিয়ে আমি কোথায় কোথায় যেতে পারি—।

—ডঃ দাসের সঙ্গে আলাপ করা হল না। লাইব্রেরী থেকে দু'খানা বই নিলে, —তারপর কফি হাউসে যাবার কথা, তুমি গেলে না, বললে—অন্য দিন। এখন শুনতে চাইছ খুলনার কথা—তোমার তো বেশ সাহস বেড়ে গেছে, স্বাতী।

—হ্যাঁ, স্বাতী আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সাহসী মেয়ে, না? আপনি বলে যান।

—কি বলবো? আচ্ছা ব্যাপার তো!

—কতদিন খুলনায় ছিলেন?

—পার্টিশনের পরে খুলনা ছাড়ি। খুলনার গান্ধী পার্কে তখন মুসলমানেরা খুব হাত তুলছে, পাকিস্থান তাদের চাই-ই। অথচ জান, মুসলমান কত বন্ধুর সঙ্গে আমরা কত খেলা করেছি, কোনদিন মনে হয় নি, ওদের আলাদা কোন দেশ দরকার, ওরা বিত্তহীন হিন্দু জমিদারদের হাতে নির্যাতিত। মনে হয় নি ওরা কখনও ভাবে হিন্দুর দাপটে ওরা আর টিঁকতে পারছে না। ধরো যে গোয়ালা আমাদের দুধ দিত, সে মুসলমান—নামটা যে কি, তা ঠিক মনে নেই তবে লোকেরা ডাকত রহিম মিয়াঁ। লম্বা মতন মুখে অল্পসল্প দাড়ি। হাসত। কলসি নিয়ে বাড়িতে আসত। কলসির মধ্যে একটা খেজুরের পাতা সুদ্ধ ডাল পুরে দিত কেন, তা অবশ্য জানি না। আমাকে খুব আদর করত। —কি বাবুমশায়, খেল্‌তি যাও নি? সারাদিনই খেলি কিনা, জানত। ডাংগুলি খেলতে যাই বাবা বাড়ি থেকে বেরুলেই; সকালেই বাজার করতে যেতেন গান্ধীপার্ক ছাড়িয়ে ছয়-সাত মাইল দূরের হাট-বাজারে; ফিরতে পাক্কা দু'ঘন্টা। ঐ সময়টা কখনও-বা গাছে গাছে বাঁদরের মত লাফঝাঁপ দিয়ে বেড়াই। কখনও খাই পাকা খেজুর, জামরুল বা কুল।

—দারুণ। তারপর? স্বাতী হেসে বলল—এগুলি লিখুন, লোকে নেবে।

—সেক্স বা নস্‌টাল্‌জিয়া। বাংলা সাহিত্যে ও-ছাড়া তো আর কিছু নেই। তাই সাহস হয় না।

স্বাতী কিছু বলল না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি তখন ওকে নিয়ে অন্য একটা যুগে, অন্য কোন বিস্মৃতির রাজ্যে ফিরে যাচ্ছি—হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি স্বাতীকে—বলছি, দেখবে এস, হারান স্মৃতি কি ভয়ঙ্কর, দেখবে এস।

আবার স্বাতী বলল—তারপর?

—তুমি কী স্বপ্ন দেখছো, স্বাতী?

—কেন বলুনতো?

—এই যে আমার স্বপ্নে তোমার এত লোভ—

—বাঃ একটা মানুষ বলার জন্য উদ্‌গ্রীব, আমি শুনবো না?

—মোটেই না, আমি বাধা দিলাম—আমি বলার জন্যে মোটেই উদ্‌গ্রীব নই, তুমি আমাকে জোর ক'রে বলাচ্ছ—

—মনের ভেতরে ভাবনাগুলো পুষে রাখলে নিজের ক্ষতি হয়। উগরে ফেলুন, দেখবেন ভাল লাগছে।

—বলে কী হবে? যা তোমার নিজস্ব—তা কী কখনও ঠিকমত বলা যায়? যেমন ধর, রূপসা নদীর পাড় দিয়ে তুমি যাচ্ছ—অসংখ্য নৌকো। দু'একটা স্টীমার ভোঁ-পা ছাড়ছে। বোটকা একটা গন্ধ। ইলিশমাছ-ভরা নৌকো এসে পাড়ে ভিড়ল। ভিড় জমে গেছে। লোকেরা দু'একটা ইলিশ মাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছে মহা আনন্দে—আমি দাঁড়িয়ে আছি শক্তিদার কাছে যাব বলে—

—শক্তিদা? সে আবার কে?

—সে গল্প আর একদিন করবো। আজ শোন যা মনে আসছে বলে যাচ্ছি।

—ধরো স্টীমারে তোমার যেতে ইচ্ছে করছে, কেমন? অথচ পকেটে মাত্র দু'পয়সা। একশোটা পাকা চুল আনলে বাবা দু'পয়সা দিতেন। তা দিয়ে তো আর স্টীমারে চড়া যায় না। পাটাতনে দাঁড়িয়ে স্টীমারের নিচেটা ঘুরে ঘুরে দেখতাম। একবার মাত্র একটি স্টীমারের উপরে উঠেছিলাম সাহস ক'রে। যাত্রী নেই, তবু উঠে এসেছি, মনে হল এক্ষুণি যদি স্টীমারটা ছেড়ে দেয়—তাহলে কী গোয়ালন্দে চলে যাবে? বাবা যেখান দিয়ে দেশে-গাঁয়ে যেতেন। নাকি আরও কোন দূর দেশে যাবে স্টীমারটা? মনে পড়ে আমার বয়স যখন চার-পাঁচ বছর, বাবা একবার দেশে গিয়ে আমাদের খুলনায় নিয়ে এসেছিলেন। খুলনায় বাবা একাই থাকতেন। পঁচিশ বছর বিবাহিত জীবন তাঁর একা কেটেছে। কখনও বছরে দু'বার বা পুজোর সময় একবার যেতেন।

—তাহলে দেশেই আপনার জন্ম, কোন দেশ?

—ফরিদপুর, কার্তিকপুর গ্রাম। গ্রামের কথা কিছুই মনে নেই। চৌধুরীবাড়ির উঠোনটা মনে আছে। বড় একটা তুলসিগাছ ছিল, চৌধুরীবাড়ির মা তাতে রোজ সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতেন। তাঁর একমাত্র ছেলে দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে গেছে মানে কলকাতায় গেছে—শুনেছিলাম ব্যবসা করে। সে নাকি দেশে আর কোনদিন ফিরবে না। মায়ের মন তো, তার

মঙ্গল কামনা করে রোজ তুলসি গাছে প্রদীপ জ্বালায় দুঃখী মা— ।

—অতীত বড় মধুর, না ?

—মধুর নয় স্বাতী, বড় জ্বালায়। অতীত বড় জ্বালায়—অনেক সময় ভূতের মত জাপটে ধরে আমাকে।

স্বাতী বাধা দিল। রিসার্চের মন তো, তাই সন-তারিখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করছে—কোন্ সালে আপনারা দেশ ছেড়েছিলেন ?

—ধরো ১৯৩৭ সাল, তখন আমার বয়স চার-পাঁচ বছর হবে। দেশে-গাঁয়ের সব কথা মনে নেই। দু'একটা টুকরো ছবি মনে ভেসে ওঠে—যেন সিনেমার কাট্। গ্রামের স্কুলের চালাটা মনে আছে। স্কুলের পাশে ঘন একটা বন ছিল—সেখানে প্রায়ই আমি চলে যেতাম—হাঁটতে হাঁটতে গভীর বনে। কিন্তু বেশী দূরে নয়। কি এক অদৃশ্য কারণে হয়ত ভয় পেয়ে আবার ফিরে আসতাম। খেলার ঝোঁক ছিল খুব বেশী—তাই বাড়ির সবচেয়ে নেগ্লেক্টেড জায়গা—যেখানে মানুষ পায়খানা করে—যাবার পথে একটা জলা জমিতে লম্বা লম্বা একরকমের ঝোপঝাড় ছিল। ও-জায়গায় আমি বাজি পোড়াতাম— ।

—সে কি ? অত ছোট বয়সে বাজি ? আপনি দেখি সাংঘাতিক মানুষ।

—নাগো, না। তোমাদের বোমা-পটকা বা পাইপগান নয়। একরকমের লতার মত গাছ, দুটো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে উপরের দিকে টানলে চড়-চড় আওয়াজ হত। আর সে কি আনন্দ! তাকে কি বলে জানি না। আনন্দটুকু মনে আছে।

—তাই নাকি ? তাহলে কলকাতার বোমা ফাটতে দেখলেও আপনার আনন্দ হবে। তখন নকসালবাড়ির সেই ভয়ঙ্কর সময়। জানেন, সরি, আপনার বলার মুডে বাধা দিচ্ছি। কিন্তু না বলে পারছি না। আমাদের বাড়ির সামনের গলিতে ব্যাপারটা ঘটেছিল। একদিন ভীষণ অন্ধকার রাত। বীভৎস সব আর্তনাদে কলকাতার তখন ঘুম ভাঙ্গে। আঃ—একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনে বাবা জেগে গেলেন। আমিও। —কে, কে রে, আমাদের গলি থেকেই গোঙানির আওয়াজটা আসছে না ? ধড়্ফড়্ করে বাবা উঠে বসলেন। মা বাধা দিলেন—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ? এত রাতে ওসব ছেলেদের মধ্যে যাচ্ছ ? দেখলাম বাবা উঠে পড়লেন। মাকে বললেন—না, যাচ্ছি না, তুমি কিছু ভেবো না। আমাকে

ওরা কিছু বলে না কিন্তু আমি যে শিক্ষক। এদেরই তো পড়িয়েছি—কেমন যেন লাগে। একজন আর একজনকে গলা টিপে ধরেছে—ছুরি মারছে, সইতে পারি না; জান? বাবা বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আমিও তখন বাবার পেছনে—মা বাবাকে ধরে আছেন। বলছেন—দাঁড়াও, যেও না। আমাকে একটা বকা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন মা—তাও আমি জানলা দিয়ে দেখছি ছয়টি ছায়ামূর্তি একজন ছেলেকে ঘিরে ধরেছে। ছেলেটি প্রাণপণে বলছে—আমার কোন দোষ নেই—না আমি করি নি। অন্যেরা চাপা গলায় ধমক দিচ্ছে। একজন তার মধ্যে এগিয়ে এসে পিঠে একটা ছোরা বসিয়ে দিল—আঃ করে পড়ে গেল ছেলেটা, আর ছয়মূর্তি ছুটতে ছুটতে আমাদের গলি পেরিয়ে ছুটে গেল। ছুটে পালাল রাতের আততায়ীরা। ওসব দিনের কথা ভাবলে কেমন যেন লাগে। বাবা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবতে পারেন—ছেলেটা এখনও বেঁচে আছে?

স্মৃতি-বিস্মৃতি মুহূর্তে উবে গেল—আমি কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলাম। এসব বীভৎস অভিজ্ঞতার কথা স্বাতী কত সহজে বলে যায়। সব কিছু যেন কালই ঘটেছে। পলাতক একটা যুগ হঠাৎ যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। তার দেহে-বুকে-মুখে রক্ত। সে উন্মাদ হয়ে শুধু জীবন নিচ্ছে অথচ ফিরিয়ে দিচ্ছে না কিছু। আমাদের মনে যখন অন্ধকার নামে, যখন গভীর ভয়ঙ্কর রক্তপাত হয়, আমাদের বুকে ভয় জাগায়, আশঙ্কা তোলে—সেটা কেন জানি আমাদের সরিয়ে রাখে, আমাদের ভুলিয়ে রাখে। অথচ যা ঘটে তাও তো ইতিহাস। ইতিহাস কী সত্যিই মানুষকে পথ দেখায়? তাকে মানুষ সত্যিই কী মনে রাখে?

কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম।

স্বাতীই আবার সূতো ধরালো—কলকাতায় কোনদিন থাকেন নি, আপনি বেঁচে গেছেন।

বলার তখন আমার একেবারে মুড নেই। এই বীভৎস মারামারি-কাটাকাটি-রক্তপাত দেখিনি বলেই এই যারা এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এদের জন্য বুকে ভীষণ ব্যথা। কার দোষে এক একটি তাজা প্রাণ রক্ত নিল, রক্ত দিল? ইতিহাসের কোন ভুলে বা মানুষের কোন পাকচক্রে পড়ে এরা বারবার মরে? তারপর নেতারা নিজেদের গদি সামলাতে বা সুখে থাকতে এদের স্ট্যাচুতে মালা পরিয়ে ঋণ মুক্ত হন। স্বাতীর মত আমার কোনদিন এ

অভিজ্ঞতা হবে না। খুনীকে না দেখলে তার চেহারাটা ঠিক কি ঠাহর করা যায়? এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে আমার। আজ নয়—আজ স্বাতী অন্য কথা শুনতে চাইছে। আমাকে ঠিক প্লেস করতে চাইছে। তাই আবার বিস্মৃতির গভীরে ডুব দিলাম। কিন্তু বলতে সময় লাগছে দেখে স্বাতী বলল—কী হল? কি আবার আবোলতাবোল ভাবছেন?

বললাম—ধাপে ধাপে অভিজ্ঞতায় মানুষ যেমন এগোয় বা একটা উপলব্ধির জগতে পৌঁছয়—একটা দেশও কী তাই? আমাদের দেশে সব কিছু যেন বড় বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে; কারুর সঙ্গে কারুর যোগ নেই। দৃষ্টির তফাত, বুদ্ধির তফাত, অনুভব শক্তির তফাত। অথচ কেউ যে এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করবে, প্রবাহিত করবে এক লক্ষ্যে—এমন লোক নেই, মানুষ নেই, নেতা নেই।

স্বাতীর ভাব দেখে মনে হল ও এখন তর্কে আসতে নারাজ। আমিও যে এসব কথা এখন বলতে চাইছি তা নয়। স্বাতী ওর অভিজ্ঞতার টুকরো একটা কাহিনী না বললে ভাবনাটা অন্য রাজ্যে ঘুরছিল। রোদ এখন রঙ পালটেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথায় বেশ কয়েকটা শকুন। কেউ মরল, না মরবে? কাকগুলো কা-কা ক'রে ডালে এসে বসছে আবার তৎক্ষণাৎ উড়ে যাচ্ছে। যেমন কর্কশ স্বর, তেমনি তৎপরতা। একটা মালি ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে। আরও কয়েকজন আশেপাশে কথা বলছে। হয়ত একটা ছুঁচো মেরেছে কিংবা রাস্তায় কোন বেওয়ারিশ কুকুর মারা পড়ল। রগড়ে হাসি হাসছে। সূর্যের রঙ লেগেছে আম গাছের ঝোপে, শিরীষ গাছের হালকা পাতায়, আর ছোট্ট লেকটার টলটলে জলে। দূরে—ঘাটের কাছে সান-বাঁধানো বেদীর নীচে কলকাতার কোন তরুণ প্রকাশ্য দিবালোকে ষাঁড়ের কোলে শুয়ে। অন্য একজন ভাড়াখাটা মেয়েমানুষ কাছে বসে হাসছে আর চারিদিকে দেখছে। হাসিটা বড় কুৎসিৎ। তরুণটা অজগর সাপের মত পেচিয়ে ধরছে পয়সার স্ফূর্তিকে, তার লোভী ঠোঁটে বকের মত মাছ ধরছে ষাঁড়, ঝুঁকে চুমু খাচ্ছে, উঠছে, দেখছে আবার চুমু খাচ্ছে। না দেখার চেষ্টা করছি কিন্তু চোখটা ওদিকেই গিয়ে পড়ছে। স্বাতী উল্টো দিকে বসে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ভাগ্যিস, উন্মত্ত তরুণকে সে দেখতে পায় নি। আরও যারা চারিপাশে—এদিক-ওদিক—ঘাটের কোণে বা ঘাসে, ওদিকে-ওপাড়ে দু'একজন বুড়ো বা মেয়ে বা দাড়িওয়ালা তরুণ—কেউ এ

দৃশ্যে বিচলিত নয়। যেন রোজকার ঘটনা—হয়েই থাকে। পয়সা দিলে বকের 'ছোবল' পাওয়া যায়। আমার কিন্তু ঘিনঘিন করে উঠল গা-টা। উঠে পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু পাছে দৃশ্যটা স্বাতীকে দেখাতে হয় সেই সঙ্কোচে আমিও চুপ ক'রে বসে আছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন উঠলে হয়। তাই বললাম—চলো যাই।

—না, আরও একটু বসবো। আপনার কথা কিছুইতো বললেন না।

—আমার কথা? শেষ হবে না স্বাতী, শেষকালে বোর হয়ে যাবে।

—বলুন শুনি।

—দেশের কথা বলছিলাম না! কিছু কিছু মনে পড়ে। যেমন দুর্গাপূজার বলিকাঠ। মা দুর্গার জ্বলজ্বলে মুখ। বাবা পূজো করছেন, চোখ দুটো তাঁর ভেজা—সেই দৃশ্যটা। নৌকো ক'রে বাবা পরিবার নিয়ে খুলনায় যাচ্ছেন সেই রাতের কথাটা। নদীর পথে মস্ত বড় একটা জামরুল গাছ ছিল, জানো—অসংখ্য জামরুল হয়ে থাকত। খুলনায় আমরা মাঠে-ঘাটে চরে বেড়াতাম। কখনও নদীর পাড়ে বসে থাকতাম। সন্ধ্যা হয়ে আসত। দূরে ওপারে লণ্ঠন হাতে কেউ যেন দাঁড়িয়ে, নদীর বুক কাঁপিয়ে ডাকছে—টু—লু—রে—কোথায় গেলি? কেউ কী নদীতে ডুবে গেল? বা কেউ কী বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি?

—বাঃ ছবির মত সব। এসব অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু লিখুন। লোকেরা পড়বে—

—কদাচ নয়, লোকেরা আজকাল রেভোলুশনারী হয়ে গেছে। বিপ্লব বা বারুদের গন্ধ উপন্যাসে না থাকলে কেউ আর নিতে চাইছে না।

—যা শুনতে চাইবে তাই-বা আপনি শোনাবেন কেন? যা আপনার নিজস্ব জিনিস, তার স্বাদই আলাদা। তারপর?

—তুমি কী মায়ের কোলে শুয়ে রূপকথার গল্প শুনছো, যে বারবার বলছো, তারপর—

—হ্যাঁ, শুনছি, বলুন।

—আমাদের পকেটে পয়সা থাকতই না। আগেই বলেছি। তবু আনন্দের অভাব ছিল না। আমাদের ক্লাস-মেট্ ছিল গিরীশ। একটা চোখ অন্ধ। ঐ বিরাট প্রান্তরে একদিন একটা সাইকেল চালিয়ে ঘুরছে তো ঘুরছে। ভারি শখ হল, সাইকেল শিখবো—সাইকেলে চড়ব। সারা খুলনায় ক'টা

সাইকেল আমি তখন হাতে গুণে বলতে পারি। এখন যেমন অ্যাম্ব্যাসাডার, তখন তেমনি ছিল সাইকেল। গিরীশকে বলতেই রাজী হয়ে গেল। বললো—নে, উঠে বোস। পড়ে যাই, হুঁটি-হুঁটি পা-পা ক'রে আবার উঠি। পায়ে চোট লেগে রক্ত ঝরে, হাতে ব্যথা লাগে। গিরীশ আশ্বাস দিয়ে বলে—এই তো হয়ে এল। কাল আসিস। আবার চড়বি। মনে রাখবি ব্যালেন্স আর কিছু না। সামনের দিকে তাকালে ব্যালেন্স আপনা থেকেই হয়ে যায়। ব্যালেন্স যতদিন না হচ্ছে, দেখবি চোখ দু'টো সামনের হ্যাণ্ডেলের দিকেই পড়ে থাকে—কিছুতেই মুখ উপরে তুলতে পারবি না। গিরীশের সেই মন্ত্রের গুণে সাত দিনেই আমি সাইকেল চালাতে শিখে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে যায় তবু বৃত্তের মত মহা আনন্দে পৃথিবী পরিক্রমা করি। পরে সাইকেল ক'রে বেনারস থেকে এলাহাবাদ গিয়েছি কিন্তু সন্ধ্যার সেই মানুষের প্রথম পরিক্রমার আনন্দ কখনও পাই নি। হুঁস থাকতো না—গিরীশ যেন আমার পেছনে চিরকাল ছুটছে আর ওর সাইকেলে চড়ে আমি একটা মস্ত পৃথিবীর দিকে পা বাড়াচ্ছি। বলেই থেমে গেলাম। ভাবে বলে যাচ্ছি। কোনদিকে খেয়াল নেই। শুধু বললাম—গিরীশ পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়তে মন্ত্রণা দিয়েছিল। কিন্তু ঘরকুনো মধ্যবিত্ত আমি—ঘরেই পড়ে আছি। দেখো, ভারত ঘুরে দেখার কথা ছিল, কিছুই হল না। কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ।

—হবে, আপনার হবে—তারপর ?

—নান্টু ছিল আমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। অদ্ভুত একটা বাড়ি, মা অর্শে ভোগেন, যখনই যাই দেখি আঃ-উঁঃ করছেন। বাবা ছিলেন সন্ন্যাসীর মত। এইয়া বড় দাড়ি, সদাপ্রসন্ন মুখ। মানুষটা বিয়ে করেছিলেন বোধ হয় ভুল ক'রে—কারণ এই দেখি বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন, আর আমাদের খোঁজখবর করছেন আর এই দেখি নেই। —এই নান্টু তোর বাবা কোথায় রে ? নেই, পণ্ডিচেরী গেছেন। আর মা সেই অর্শের যন্ত্রণা নিয়ে সংসারের যাবতীয় ঝামেলা পোহাতেন। পায়েস হলে ডেকে খাওয়াতেন—নান্টুর বাপ বড় পায়েস ভালবাসে রে—তা তিনি তো এখন নেই। তোরাই খা। ওদের বাড়িতে বিরাট একটা জামগাছ ছিল। একদিন পাকা পাকা বড় বড় জাম দেখে সোজা গাছে উঠে বসেছি—আর পেড়ে পেড়ে খুব খাচ্ছি। নীচে নান্টু আর পাড়ার সব ছেলেরা দাঁড়িয়ে বলছে, দে না—দাও না—নিচে কয়েকটা দাও না, অমুদা। যতটা নীচে ছাড়ি খাই তার তিন গুণ—ক্রমে লোভ

বেড়ে যেতে লাগল। আরও উঁচুতে গিয়ে উঠলাম—আর মড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠলো ডালটা। নীচে থেকে 'গেল গেল' রব উঠল। আমিও ভাবলাম, নীচে পড়লে আর রক্ষে নেই—মাথার উপরের ডালটা কোনমতে জাপটে ধরলাম—আর ততক্ষণে নীচে দেখলাম মড়্‌-মড়্‌ শব্দ ক'রে ডালটা পড়ে গেল। সেদিন বুঝেছিলাম জাম ডাল বড় ঠুন্‌কো, পেয়ারা গাছের মত তার শক্ত স্পাইন নেই। মাসিমা এসে বকা দিলেন—এই অমু, নাম্‌, বিপদ বাধাবি নাকি?

—বাবাঃ, খুব বাঁচা বেঁচেছিলেন, না?

—হ্যাঁ খুব। জানো, পুকুরে না সাঁতার কাটলে ঘুম হত না। ছোট-বেলায় পড়াশুনা হয় নি কেন জান তো? বেলা বাড়লে বা ছুটির দিনে পুকুরে স্নান করা চাই-ই। যে বাড়িতে টলটলে পুকুর, সেখানে একটা পাগলি থাকত। সে কী ভয়। ভোরবেলা বকুলদিকে নিয়ে যখন ফুল কুড়তে যেতাম—তখন পাগলীকে অত ভয় করত না। কারণ তখন সে হাতের মুঠোয় একটা জবা ফুল কচলে ধরে থাকতো আর ডাকতো—এই অমু, খুব যে ফুল তুলছিস, বলি, আমাদের পূজো কী ক'রে হবে শুনি? কে কার কথা শোনে। লাইব্রেরী থেকে গল্পের বই নেবার উপায় ছিল না। রায় বাড়ির জমিদারী বলতে তখন বিশেষ কিছু নেই, তবু যা আছে খুলনায় এই বাড়ির খুব নাম। ভেতরের দিকে পাড়ার লাইব্রেরীর জন্য একটা ঘর দিয়েছিলেন এঁরা। বিরাট একটা করিডর পেরিয়ে ঘর। করিডরটা রীতিমত অন্ধকার। বই হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আসছি, হঠাৎ দেখি পাগলী দাঁড়িয়ে বলছে—এই অমু, বইটা দেখি। বুকের রক্ত ছলাৎ ক'রে উঠত। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল পাগলীর হাতে বইটা পড়লে আর রক্ষে নেই। বইটা নিয়ে কোথায় ছুট দেবে কে জানে? ভয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে যেতাম। পাগলি আমার পেছন পেছন ছুটত। ঐ ভয়ে লাইব্রেরীতে আমি যেতাম না। একদিন মহা আনন্দে ডুব সাঁতার দিচ্ছি, হঠাৎ ঘাটের কাছে ভেসে উঠে দেখি, বাড়ির লোকেরা পাগলীকে ধরে স্নান করাবেই আর পাগলী চিৎকার ক'রে রবারের মত ঘাটের দিকে উঠে যাচ্ছে। আবার তাকে ধরেবেঁধে এনে জলে চুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। —মা রে—গেলুম রে, এই অমু আমাকে বাঁচা। বাঁচাব কী! তখন আমি ঘাটে উঠে দৌড়ে বাড়ির দিকে ছুটতে পারলে বাঁচি।

কলকাতার তরুণ তখনও ছোবল খাচ্ছে। বড় কুৎসিৎ কেনাকিনি, বকের মত খাওয়াখাইরি। বললাম—সন্ধ্যা হল, যাবে না?

—স্বাতী বলল—চলুন। উঠে দাঁড়াল বেদীর দিকে চেয়ে, কলকাতাকে সওদা করার হৃদকুৎসিৎ একটা দৃশ্যের আভাস নিয়ে। বোধহয় দেখেই বলল—কলকাতায় আজকাল নিরালায় কোথাও বসা যায় না। কি যে অবস্থা!

—চলুন। বড় ভাল লাগছিল।

রাতের কলকাতায় স্বাতীকে নিয়ে চলা আমার পক্ষে অসাধ্য। কলকাতায় তখন অনেক আলোকসজ্জা, রেস্তোরাঁয় আর সিনেমা হাউসে অনেক ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে স্বাতী আমাকে মিনি বাসে নিয়ে তুলল। মিনি বাসে দু'জনে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম। তবু ত যাওয়া যায়; মিনি বাস মধ্যবিত্তের একমাত্র আশ্রয়।

আমি তখন রীতিমত উদার। ট্যাক্সি ছাড়া আমার মন সরছিল না। স্বাতী বলল—ট্যাক্সি এখন কলকাতার তরুণ-তরুণীকে নিয়ে বড় ব্যস্ত। আপনাকে ঠিক মানাবে না।

আমি ভুলে গিয়েছিলাম আমি তরুণ নই, মধ্যবয়সী ও মধ্যবিত্ত।

॥ সাত ॥

একা ঘরে চুপচাপ বসে আছি। মনের মধ্যে অনেকগুলি চিন্তা বা দুঃশ্চিন্তার মেঘ। মিনিস্টার কলকাতায় জার্নালিস্টদের সঙ্গে একটা ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হতে চান। ব্যবস্থা করে ফেলেছি। বলছেন ত 'ইন্‌ফরমাল্‌ গেট-টুগেদার'। কলকাতার অনেকেই আমাকে সেই কথা জিজ্ঞেস করলেন—ওটা তো বলছেন, আসল উদ্দেশ্যটা কী? তা কী জানি যে বলব? আমার কাছেও যা মিস্ট্রি, সেখানেও দিল্লীর এই মিস্ট্রিয়াস্‌ স্বভাবটাকেই কাজে লাগাই। বলেছিলাম, উদ্দেশ্য কি তা কী সব সময় জানা যায়? তবে রাজা এসে প্রজার সঙ্গে বসে দুটো হাসিগল্প করতে চাইছেন—এটাই তো সোসিয়্যালিজমের পূর্বাভাস। কথাটায় কাজ হয়েছে। দু-একজন ছাড়া সবাই বোধ হয় আসবেন।

আমার মনে হচ্ছে মিনিস্টার আসামের আন্দোলন সম্পর্কেই এঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কি লাভ হবে, না হবে তিনিই জানেন, আপাতত আমার একটু হোম্‌-টাস্ক্‌ করে রাখা দরকার। আসাম আন্দোলনটা বেশ পাক খেয়ে জটিল হয়ে উঠছে। এ আন্দোলনের ব্যাপারে জার্নালিস্টদের মতামত কি এবং কি পজিটিভ দৃষ্টি নিলে এই আন্দোলনটাকে এলিমিনেট্‌ করা যায় সেটাই বোধহয় কায়দা ক'রে তিনি এঁদের কাছ থেকে জানতে চান। পশ্চিমবঙ্গের পার্টি লেবেলের বা সরকার পক্ষের মতামত অত সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বা খুব বেশী জানা বলেই মিনিষ্টারের বোধহয় ওতে আগ্রহ নেই। আসলে পশ্চিমবঙ্গের ধারণা ও বিশ্বাস পালটাবার একটা বড় ভূমিকা যাঁদের হাতে, তাঁদের সম্বন্ধেই ডেমোক্র্যাটিক্‌ মন্ত্রীদের বেশী উচ্চাশা।

আমরা অবশ্য আসাম সম্পর্কে 'টপ সিক্রেট্‌' কতগুলি খবর পেয়েছি। সবটা বলা বারণ। গৌহাটী রেডিওকে এরা আন্দোলনের স্বপক্ষে এতটা কাজে লাগাতে পারছে কি করে সেটাই আপাতত ভাবনার কথা। কতগুলি 'কর্তব্যের' ব্যাপারে আমরা অবশ্য নির্দেশ পেয়েছি এবং সেই 'কর্তব্য'গুলি এরই মধ্যে করতে শুরু করেছি। সব কিছু অবশ্য কেন্দ্র ও জাতীয় স্বার্থে।

যেমন দিল্লীর অনেক চাঁই ব্যক্তিরা এখন সেখানে। প্রথম কথা, নিউজের কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা ভেস্টেড্ ইন্টারেষ্ট-এর হাত থেকে আস্তে আস্তে নিয়ে নিতে হবে, কারণ আন্দোলনের স্বার্থে গোটা বুলেটিনকেই এরা কাজে লাগাতে সফল হয়েছে। কিভাবে এবং কতদিনে, তা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। এর পেছনে কর্মীদের সমর্থন কতটা দায়ী, স্টাফের মধ্যে কারা এই সমর্থন দিচ্ছে, এবং কতটা প্রাণের ভয়ে বা দায়ে পড়ে, সেটাও দেখা দরকার। অনেকে এমন আছে যারা সোচ্চার এবং তারা গোপনীয়তা অবলম্বন করলেও তাদের ইন্‌অ্যাক্টিভ করতে সময় লাগার কথা নয়। যাঁরা আন্তরিক ও সূক্ষ্মাকারে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের বহুদিন ধরে ওয়াচ না করলে কিছু করা সম্ভব নয়। কিছুদিন হয়ত বুলেটিনগুলি দিল্লীর পুরোপুরি সুপারভিশনে রাখা হবে। সেটা কিভাবে কি করা হচ্ছে আমার পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। তবে কলকাতা পর্যায়ের কাজটা আমি অনেকটাই দেখছি। নিউজ যা আসে, তার কতটুকু প্রচার হলে আন্দোলনকে আর উস্কানি দেওয়া হবে না বা কতটুকু কেন্দ্রীয় সরকার বা দেশের স্বার্থে, তা বিচার করার দায়িত্ব আমার। কলকাতার কোন বুলেটিনে আসামের কোন নিউজ আমাকে না দেখিয়ে প্রচার করা বারণ। সব 'টেক্' করেস্পন্‌ড্যান্টদের সব খবর আমাকে আগে দেখান হয় এবং কতটুকু নিতে হবে, না হবে, আমি বলে দি। জটিল ব্যাপার থাকলে অনেক সময় নিজে এ্যাডিট্ করে গোটা খবরটাই লিখে দি। গৌহাটীকে বলা হয়েছে দুবার করে ফিক্সড্ কল্ বুক করে দিল্লীর সঙ্গে কথা বলতে। রেডিওর খবর বিভাগ যে পুরোপুরি ভাবে দিল্লীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম গাফিলতি দেখা গেলে যে কোন স্টাফের বিরুদ্ধে শক্ত কদম ওঠানো যায়, এই মূল কথাটা আন্দোলনের টারময়েলে গড়বড় হয়ে গেছে।

সরকার অবশ্য জানেন, এ আন্দোলন এতটা জোরাল হয়েছে তার কারণ এটা তাদের আইডেন্‌টিটি খুঁজে পাবার প্রশ্ন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা রেডিওকে ঘেরাও ক'রে বা থ্রেট্ দিয়ে গেলে সরকার ত বেশীদিন আর মুখ বুঁজে থাকতে পারেন না। আসাম ত আর স্বাধীন দেশ নয় যে, যা তারা চাইবে, তাই করবে বা তা মেনে নিতে হবে। এর মধ্যে দিল্লীতে বেশ কয়েকবার মিটিং হয়ে গেল কেন্দ্র ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে। কিন্তু কোন মীমাংসা এখনও চোখে পড়ছে না। আন্দোলনকারীরা বলছেন,

যারা বিদেশী হয়েও আসামে জাঁকিয়ে বসেছে তাদের নির্দিষ্ট করতে ১৯৫১ সালকে 'কাট-ইয়ার' ধরা হোক। কিন্তু এটা মেনে নিলে যে বহু লোকের ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়। আবার এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ৭১ সালের মার্চ মাসের পরের সময়সীমাকে মাপকাঠি ধরতে রাজী—এর পিছনে যেতে রাজী নন। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি ঃ ১৯৬১ সালের পরে যারা পূর্ববাংলা থেকে আসামে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে তারা অনেকেই এরই মধ্যে নাগরিকত্ব পেয়ে গেছে। তাদের কী আর টেনে ফেলে দেওয়া যায়? বিদেশী নির্ধারণের মাপকাটি হিসেবে আন্দোলনকারীরা ১৯৬১ সালকে সম্পূর্ণ মেনে নেন নি বটে কিন্তু এ পর্যন্ত হয়ত এঁরা উঠতে রাজী—এর বেশী নয়। অর্থাৎ গণ্ডোগোলটা এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৬১ সাল থেকে ৭১ সাল, এই দশকের ব্যাপারে। মীমাংসা হবে কিনা বলা মুশকিল। তবে কেন্দ্র এ আশ্বাস দিয়েছেন এখন বাইরে থেকে আর কাউকে আসতে দেওয়া হবে না।

আসাম সমস্যার কিভাবে সমাধান হবে, কত লং রোপে খেলা হবে, রিজিওন্যাল অ্যাংগেল্ থেকে সমস্যাটাকে কিভাবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিয়ে যাওয়া হবে—সেটাই প্রশ্ন। দু'পক্ষই অনড় ও নিজেদের বিশ্বাসে অবিচল। প্রধান মন্ত্রীর মনোভাব কী এবং কিভাবে তিনি যে এ সমস্যার সমাধান করতে চান—কেউ তা জানে না। আন্দোলনকে বেশীদিন কই মাছের মত জীইয়ে রাখলে দলের মধ্যে নানা বিভেদ ও ভাঙ্গন দেখা দেবে—সেটাই এর সমাধান কিনা—সে প্রশ্নও উঠেছে। সারা ভারতের দৃষ্টিতে আসাম আন্দোলন খুব যে সাপোর্ট পাচ্ছে, তা অবশ্য নয়; সেটাই এখন সরকারের বড় ভরসা। তবে আসাম যে সারা পূর্ব ভারতকে একটা কেন্দ্র-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আঞ্চলিক জাগরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—এটা নিয়েই, যত দূর জানি, সরকার এখন গভীরভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত।

এসব কথা আমি খুব বিচ্ছিন্নভাবে ভাবছিলাম। সারাদিনের কাজের শেষে যতটুকু ভাবতে ইচ্ছে করে বা কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে যা মনে ওঠে—ততটুকুই। সাধারণ মানুষেরা যা ভাবছে বা বলছে তা সবসময় সরকারী ভাবনা নয়। মন্ত্রীমহোদয় সেসব কথা শুনতে চাইবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। এই যেমন মন্ত্রীমশায় কখনই এ প্রশ্নের জবাব দেবেন না যে এই আন্দোলন এত দিন ধরে চলছে কী করে? কে এবং কারা এই আন্দোলন চালাচ্ছেন এবং কারা এঁদের পক্ষে? গোটা

আন্দোলনের লিডারশিপ্ এখন ছাত্রদের হাতেই বা কি ক'রে গেল? আসামের আপামর জনসাধারণ এঁদের সমর্থন করছেন কী? যদি না করেন, কোন্ শ্রেণীর এবং কোন্ স্তরের মানুষ করছেন বা করছেন না। না করলে এঁদের এই আন্দোলনের সব রকম অসুবিধা ও দুর্ভোগ বিনা প্রতিবাদে বরণ ক'রে নিচ্ছেন কি ক'রে? অনেকে আবার একথাও বলছেন—'অহমিয়াদের মশায়, ঘরে ঘরে পুকুর আর মাছ ও এক টুকরো জমি। জমিতে যা ধান হয় বা পুকুরে মাছ—দিব্যি চলে যায়। তাই ইকনমিক্ ব্লাকেড্ লাগাতার যা হচ্ছে—তারা নিজেরা এতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। ওতে ক'রেই, বুঝলেন না, এতদিন, এরা এদের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পেরেছে। না খেয়ে মরত, তবে দেখতেন ঠেলাটা। এক সময় শুনেছিলাম সি, পি, আই,-এম ওখানে অনেক এগিয়ে গেছে এবং ইলেক্শনে এরাই এবার জিতবে; এখন শুনছি 'বাঙ্গালী-পার্টিকে' ওরা নাকি আর সাহায্য করতে রাজী নয়। আসলে কি যে ব্যাপার, দূর থেকে বোঝা একটু মুশকিল। সেদিন রেডিওতে ব্যাঙ্কের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—তিনি বলছিলেন, সি, পি, এম, পার্টি নাকি এখনও কাজ ক'রে যাচ্ছে এবং দলে নাকি অনেক অহমীয়াও আছেন। সমস্ত পূর্ব ভারতে যেমন, আসামের টাকা ও ইকনমিটাও মাড়োয়ারীদের হাতে। ওদের সমৃদ্ধি দোকানপাট ও শো-কেসের মধ্যে সাজানো থাকে, ব্যবহারে ও কথায় তা ফুটে ওঠে; লুকন মুশকিল। আন্দোলনে কশে টাকা দেয়, অসমিয়া ভাষা বলে আর অবাধে মেলামেশা করে। গোটা আসামই নাকি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। শুধু যে নবজাগরণ এসেছে মানুষের চেতনায়, তাই নয়, রাস্তাঘাট, বাস-গাড়ি ও যাতায়াত ব্যবস্থায়, আসামের সঙ্গে টেক্কা দেওয়া পূর্ব ভারতের অন্য কোন রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙালিরা নাকি আর 'বাঙ্গাল্-খেদাও' আন্দোলনের শিকার হতে রাজী নয়; খুব গণ্ডগোল হলে কলকাতায় বা অন্য জায়গায় তারা চলে আসে, আবার থেমে গেলে, নির্বিবাদে ফিরে যায়। মার খেতে আর কেউ রাজী নয়।

আমি যে অযথা আসাম নিয়ে কেন পড়লাম জানি না—আসলে মন্ত্রীমশায় শুনলাম বহুদিন ইউনিয়ানবাজী করেছেন। হঠাৎ জনতার স্বার্থে প্রজ্বলিত হয়ে কি কথা যে তিনি জিজ্ঞেস ক'রে বসবেন, আগে থেকে অনুমান করা শক্ত। তাই একটু ডেপথ্-এ গিয়ে হোম্ টাস্কটা ক'রে নিচ্ছি। এমনিতে চাপে না পড়লে ভারতীয়রা সব বিষয়ে সব কিছুই জানে, আবার কিছুই বিশেষ

জানে না। আমিও তাই। বাইরে থেকে একটা আন্দোলনের বিষয়ে যতটুকু বোঝা যায়, তার চেয়ে গভীর বিদ্যা নেই। আন্দোলন করতে গিয়ে কে যে কোথায় গুছিয়ে নেয়, তাও বোঝা দায়।

মন্ত্রীমশায় কাল আসবেন কলকাতায়। এয়ারপোর্টে যখন ডি, ডি, জি,-ই যাচ্ছেন, তখন কী আমার না গেলেই নয়? মিঃ ধর বলছেন, আমার নাকি ওটাই কাজ। লোকজনদের সঙ্গে মিশে তার ফিড-ব্যাক্ আনা আবার নেতাদের মনের কথা জেনে বুরোক্র্যাট্‌দের সূক্ষ্মাকারে ফিড্ দেওয়া বা রিলের ছেঁড়া সুতো আবার টেনে এনে সেলাই কলের সূঁচে ভরে দেওয়া। মিঃ ধর আসলে আমাকে খুব স্নেহ করেন, তাই হাসতে হাসতে কথাটা বলেছিলেন। অভিজ্ঞ মানুষ, জাতে কাশ্মিরী বলে ভয়ানক প্রাক্‌টিক্যাল। দূরে বসে টারগেটে নিরিখ করেন, ভুল হবার কথা নয়।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শুধু অফিসের কথা ভাবছি। অফিসের লোকজন, মিটিং আর তার চারপাশে আবর্তিত যে-সব ক্যারেক্‌টার, উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট—তাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের কতগুলি বিশেষ ভঙ্গী, হাসিতে উচ্ছল কতগুলো বিশেষ মুহূর্ত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। গোলামী যে কী ভয়ঙ্কর, এই ফ্রি টাইমেও মনের মধ্যে এদের ঘুরপাক খেতে দেখে বুঝতে পারছি। কিন্তু আর অফিস নয়, অনেক হয়েছে।

আজকে অনেক বেশী জরুরী কাজ কাজলকে একটা চিঠি লেখা। বা স্বাতীকে দেখলেই আজকাল যে নতুন উপসর্গটি হচ্ছে, তা একটু তলিয়ে দেখা। সেটা করব বলেই নিজের মনের কাছে বসেছিলাম, কিন্তু কখন যে অফিস এসে আসল কাজটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে জাঁকিয়ে বসল, টের পাই নি। খুলনার জীবনে আমি আজকাল ঘুরে-ফিরে নস্‌টাল্‌জিয়ার স্নিগ্ধ আবেশে আবর্তিত হচ্ছি কেন—তাও বেশ ভাবনার বিষয়। স্বাতীর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে; মনে মনে ওর সঙ্গ কামনা করি। স্বাতীর টেলিফোন পেলে পার্ক স্ট্রীটের অনেক লোকের অসুবিধা ক'রে আমি একটু বেশী কথা বলি; অমূল্য কোন বই পেলে টক্ ক'রে সেটা দেখে নি, আলোচনায় স্বাতীকে প্রোভোক্ করতে পারব বলে। স্বাতীকে প্রেজেন্ট করব, মাঝখানে তাই কলেজ স্ট্রীটের সেই দোকান থেকে 'ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড রেভিনিউ পলিসি' বইটা কিনেই নিয়েছি। ইচ্ছে ক'রেই স্বাতীকে টেলিফোনে জানাই নি সারপ্রাইজ দেব বলে; বইটা পেলে ওর মুখে যে হাসিটুকু খেলে যাবে সেটা দেখার লোভ। স্বাতী তার

থিসিসের একটা চ্যাপ্টার আমাকে পড়িয়েছে আর সেই থেকে আমিও বাংলার রণতরীর ইতিহাস নিয়ে বেশী ইন্‌টারেস্টেড্‌ হয়ে উঠেছি। কাজলকে সেটা এই মুহূর্তে বলার প্রয়োজন দেখি না। নিজস্ব সার্চের গুণে, আমি নিজেও কিছু বই আর কিছু মূল্যবান তথ্য, যোগাড় ক'রে চলেছি স্বাতীকে বলব বা দেব বলে। কিংবা কে জানে, স্বাতীর থিসিসের মধ্যে ইতিহাস-চেতনার যেটুকু অভাব দেখছি,—না, ঠিক ইতিহাস-চেতনা নয়,—একটার সঙ্গে আরেকটা অদৃশ্য বন্ধনে কিরকম ভাবে জড়িয়ে থাকে সেই পুতুল-নাচের ইতিকথার সূক্ষ্ম বিচারধারাকে সময় ক'রে আমি স্বাতীকে বোঝাতে চাই। ছেলেমানুষ, সব সময় লিংকেজগুলি খুঁজে পাচ্ছে না, বা পেয়েও, তা ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। ওকে ইতিহাসের নানা ঘটনা দেখিয়ে কিভাবে লিংকেজগুলির উদাহরণ দেব, মনে মনে সাজিয়ে রেখেছি। ও এলে কোন্‌ কোন্‌ পয়েন্ট নিয়ে ডিস্‌কাস্‌ করবো, কি বলব, কতটুকু বলব, সব নিয়ে ভাবছি। অর্থাৎ এক কথায়, স্বাতীর চিন্তার জগতের সঙ্গে নিজের অলক্ষেই বেশ জড়িয়ে পড়ছি। এর কতটুকু কাজলকে বলা যায় ভেবে দেখি নি।

আজকাল স্বামীরা অনেক কিছুই গোপন করে। ওটা নাকি যুগের হাওয়া। আমারই বা অত কথা বলার কী দরকার? পৃথিবীটা আর গণ্ডিবদ্ধ নেই। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ভারতীয় জীবনেও আজকাল কত প্রসারিত। যদিও সমাজ এখনও বাধা দেয়, দু'পা আঁকড়ে ধরে, যন্ত্রণা দেয় ও জ্বালা ধরায়। তাও চলতে-ফিরতে আমরা অভিজ্ঞতার এক একটা দরজা খুলে তাতে বসে মুক্ত হাওয়া নিই; মনকে বোঝাই যা আমি পাচ্ছি—তাও আমার বিকাশের ও ব্যাপ্তির জন্য প্রয়োজন; জীবনকে বহুমুখী ও মুখরিত করার পরম উপাদেয় বস্তু।

তাই কি-যেন এক অদৃশ্য কারণে স্বাতীর ব্যাপারে বিশেষ কোন কথা কাজলকে আমি লিখি নি। কেন জানাই নি, কে আমাকে বাধা দিচ্ছে, কোন্‌ গোপন রহস্য আমি মনের গভীরে ধারণ ক'রে রাখতে চাই বা কোন্‌ স্বপ্ন বা মিস্‌ট্রির মধ্যে আমি আলো-ছায়ার রূপ-রস-রঙ্গ খুঁজে পাচ্ছি—সে সব কথা মনে ভেসে উঠছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে, আমি ওসব নিয়ে খুব একটা গভীর ভাবে ভাবতে চাইছি না। ব্যাপারগুলো তলিয়ে না দেখে ভাসা ভাসা রেখে দিলে মনের অনেক বাধা কাটিয়ে ওঠা যায়।

এখনও কাজলকে জানাই নি কতদিন আমি কলকাতায় থাকব। আমি

নিজেও কী জানি? তাতে কাজল লিখেছে—'তুমি যখন লিখছ না কবে নাগাদ ফিরবে—তখন স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারি, ইদানীং গোলামী করার স্বভাবটা তোমার বেড়ে গেছে। দিল্লীর গোলামী কলকাতায় নিশ্চয় আরও বিচিত্রকর।' খোঁচাটা খেয়ে উত্তরে লিখেছিলাম—দিল্লীর সঙ্গে তো কলকাতার ওটুকুই তফাৎ—এখানে গোলামী যে করছি, তাও ভাববার সময় থাকে না। উত্তরে কাজল লিখেছিল—'এখানে দেখেছি সুন্দরী স্টেনো ছাড়া বড় অফিসারদের চলে না। ওখানে কি স্টেনো ছাড়া তোমার অসুবিধা হচ্ছে? —নাকি একটার জায়গায় দু'টো পেয়েছো? তোমার তো আবার হারিয়ে-যাবার রোগ আছে। সেরকম বিপদে পড়লে স্বাতীকে বোল, তোমাকে পথ দেখাতে পারবে। স্বাতীর কথা আমি বেশী জানি না, তোমার চিঠিতেও বিশেষ থাকে না; একদিনই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে। সেমিনারের জন্য ভয়ানক ব্যস্ত ছিল বেচারী, ভাল ক'রে একটু জানা বা কথা বলার অবসরটুকু পর্যন্ত পাই নি। শুনেছিলাম ও আসতে চায় নি, তুমিই জোর ক'রে নিয়ে এসেছিলে। এখন নিশ্চয় অতটা ব্যস্ত থাকে না। তোমার নিশ্চয় সুবিধা হচ্ছে।'

অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে কাজল অনেক কিছুর ইঙ্গিত দিতে পারে। এইসব ইঙ্গিতে আমার বুকে যে পাষাণভার নামে, কাজলকে আমি ঠিক বোঝাতে পারি না। সব কথা গুছিয়ে লিখেছিলাম। চিঠিটা বোধহয় শেষ পর্যন্ত ডাকে দেওয়া হয় নি। এই প্রথম মনে হল, সব পুরুষের সব কথা, সব স্বামীর সব আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ বোঝার সাধ্য কোন স্ত্রীরই বোধহয় নেই।

নিজের চেতনার কাছে নিজেই দ্রুত আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। হলপ করে বলতে পারি কাজল আমাকে দেখতে পেলে বলত, আমার ক্ষমতা বেড়েছে। মাঝে মাঝে গোপনীয়তা মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা রঙিন জাল বোনে। মাকড়শার মত তখন নিজের মনের পোকাগুলোকে তাক করা যায়; ক্ষিদে পেলে সেগুলি খেয়ে ফেলতেই বা আপত্তি কোথায়? স্বাতী আমার মধ্যে কি জিনিস দেখেছে আমি জানি না—আলো কিংবা ঝংকার? যাই দেখুক, আমার উপস্থিতি ওকে বেশ ভরসা দিচ্ছে অনুমান করে নিতে আপত্তি কোথায়? একদিন বলেছিল,—'আপনজন বলতে আমার কেউ নেই, দাদা নেই, ছোট বোন নেই; নিজের মনের কথা মন খুলে কাউকে বলতেও

পারি না।' বন্ধুবান্ধবদের পরিধি স্বাতীর বিস্তৃত ; কিন্তু বুলবুল, দীপঙ্কর বা তরুণ ছাড়া বিশেষ কারুর সঙ্গে মেশে না। নির্ভর করতে পারে এমন লোকের নাকি ভারি সঙ্কট আজকাল কলকাতায় ? প্রয়োজন হলে ফিলসফার বা গাইড হতে পারে এমন ওর কেউ নেই। আমার মধ্যে স্বাতী তবে কী বড় ভাইয়ের নির্ভরতা খোঁজে ? কথাটা কাজলকে কায়দা ক'রে লিখে দিলে মন্দ হত না।

আসলে এই অল্প সময়ের মধ্যে স্বাতী যেভাবে আমাকে আপন ক'রে নিয়েছে, আমাকে নিয়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা বলছে, আলোচনা করছে আবার কখনও-বা বেদম তর্ক—আমি তাতে খুব অ্যানিমেটেড্ হয়ে উঠছি। ব্রজেশবাবু কনসারভেটিভ হলেও বোধহয় দিল্লীর লোক এবং বিবাহিত বলেই, আমার ব্যাপারে একটু বেশী লিবারেল্। এর মধ্যে বেশ কয়েকদিন স্বাতীদের বাড়িতে গিয়ে খেয়েছি, গল্প করেছি এবং ওর থিসিস্ নিয়ে ব্রজেশবাবুর সামনেই আমার বিদ্যা ও দৃষ্টির বিভিন্নতা প্রমাণ ক'রে এসেছি। তারপর থেকে ব্রজেশবাবু আমাকে সাপোর্ট ক'রেই কথা বলেন। স্বাতী বরং বিরুদ্ধপক্ষ নিয়ে আমার যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি খাড়া ক'রে মজা দেখে আর ওদিকে, এভাবে পরিবেশটা যখন বেশ জমজমাট, তখন প্রভাবতী দেবী হাসতে হাসতে চা নিয়ে আসেন, বলেন,—'সারাক্ষণ অমরেশকে তোরা কেন অত বিরক্ত করিস বলতো ?' (বলা বাহুল্য বিরক্ত যে হই না, তা বোধহয় তিনি এখনও টের পান নি।) আমি তখন হয়ত মাসিমার হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করি,—স্বাতী তার মায়ের মুখের আদল পেয়েছে, না বাবার ? আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি, স্বাতী যখন গম্ভীর হয়, তখন ওর মুখে ব্রজেশবাবুর ছায়া পড়ে ; স্বাতী যখন আনন্দে ঝল্‌সে ওঠে, তখন ওর মুখে যেন মা খেলা করেন।

স্বাতীর সঙ্গে আমার এই যে একটা ইনটেলেক্‌চুয়্যাল সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তার কতটুকু কাজল মেনে নিতে পারবে, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। কাজল একসময় আমার দীর্ঘ চিঠি পড়তে খুব ভালবাসত। অনেকদিন অভিযোগ করেছে, সেরকম চিঠি নাকি আমি আর লিখতে পারি না কিংবা লিখতে চাই না এবং সম্ভবত আমি নাকি ইনস্পিরেশন্ পাই না। আমার এ অক্ষমতার পেছনে যে ইঙ্গিত তা নিরসন্ করতেই একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেললাম। শুধু একটা কথা বলা হল না, এই যে চিঠি লিখছি এর পেছনে হয়ত

স্বাতীর অনুপ্রেরণাই সূক্ষ্মাকারে কাজ করছে। ওটা অবশ্য বলতে নেই। ক্ষতি হয়।

কাজল,—

তোমাকে একটা ভারি সুন্দর চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে, যেমন আগে লিখতাম। আজকেই-বা সেই বহু প্রতীক্ষিত সুন্দর চিঠিটা লিখতে বসলাম কেন—রোজ কেন সুন্দর চিঠি লেখার জন্য মনটা অধীর হয়ে ওঠে না—এ প্রশ্ন করা অবান্তর। মানুষ অতীতকে শুধু মনে মনে ফিরে পায়; রোজ কেন সেই মন পাওয়া যায় না, এ প্রশ্ন ক'রে লাভ নেই। ডায়েলেক্টিকাল্ বলে একটা কথা পৃথিবীতে এখন প্রচণ্ড চালু; এর অর্থ,—পরিবর্তন, গতি আর এতে সুপ্ত রয়েছে মানুষের ভেতরে যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা - তারই নিগূঢ় রহস্য।

সেই আদি যুগ থেকে সমাজটা এখনও যে খুব পালটেছে, তা কিন্তু নয়। পৃথিবী, এক একটি টুকরো জ্বলন্ত আগুনের মত এগিয়ে গেছে অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তনের আগুন জ্বালাবে বলে। মানুষ যখন শিল্প জাগরণের যুগে বড় বড় মেসিন দিয়ে পাগলের মত উৎপাদন করতে শিখল—তখন মানুষ, তার উৎপাদন ক্ষমতার বিশাল বৃত্তাকার চেহারা দেখে প্রথমে একটু অবাক হয়েছিল, তারপরেই আবিষ্কার করল, বিস্মিত হবার সময় নেই; নেশার মধ্যে রস আছে। সেই থেকে পৃথিবীটাকে পালটাব বলে সে একদিকে যেমন শোষণ আর লোভ নিয়ে এল—তেমনি অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ অনেক বিস্মিত প্রাণকে হত্যা ক'রে সে নতুন নতুন প্রাণ জন্ম দেবার দিকে হাত বাড়াল। পুরনো অনেক জামা ছোট হয়ে গেছে; মানুষের হাত এখন এত বিস্তৃত জায়গায় প্রসারিত যে, হয় সে আবার নগ্ন হবে—নয়ত, নতুন জামা ও নতুন সজ্জায় নিজেকে সে আবার নতুন ক'রে সাজাবে। আজকে পৃথিবীর যে রূপ, সেখানে পরিবর্তন আসছে বন্যার স্রোতের মত। ভাববার এখন কারুর কোন অবসর নেই, মাথাব্যাথা নেই। পুরনো আর নতুন মিলে কতটা আমরা নেব, সেটা আমরা আর ভাবছি না, বা না ভেবেই যা হাতের কাছে পাচ্ছি, গ্রহণ করছি—এরকম একটা বিভ্রান্তিকর সময়ের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে।

পশ্চিম জগৎ একটু আন্তরিকতার জন্য, একটু ভালবাসার জন্য হাহাকার করে অথচ সুখী হবার যাবতীয় সম্পদ ওদের ঘরে, ওদের হাতের মুঠোয়। সেই দিকে হাত বাড়িয়ে এ বড় আশ্চর্য এক অবস্থার মধ্যে আমরাও আবর্তিত।

এ এক আশ্চর্য মুক্তির আশ্বাস, যেখানে প্রকৃতই মুক্তির নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ। ভেবে দেখ সেন্ট্রাল হিটিং-এ সোনালী রোদের রঙ বোঝা যায় না; দারুণ শীত, তুষার ঝড় বাইরে হচ্ছে—কাঁচের জানালা দিয়ে ওরা তা প্রতিনিয়ত দেখছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশবার শক্তি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। ওরা, ভেবে দেখ কি ভয়ানক কাজের মানুষ। যদি বেরোতে হয়, হঠাৎ নয়, ভেবেচিন্তে প্ল্যান ক'রে। তাই আমি ভাবি, যে শিশুর জন্ম হল এই ভীষণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে, সেখানে আয়াসী জীবনের সব গ্যাজেট অপেক্ষা ক'রে থাকে অভ্যস্ত দাসের মত। সেই শীত যখন এই অভ্যাসে ও বিশ্বাসে বড় হয়ে উঠবে তার কাছে দরিদ্র মানুষ বা পরিপূর্ণ মানুষের জীবনদর্শন আশা করা বৃথা। আজ থেকে কুড়ি বছর পরে যারা হবে পৃথিবীর তরুণ সমাজ, তারা সব পেয়েও জীবনের ভালবাসা বা আন্তরিকতার জন্য ছটফট করবে আরও অনেক বেশী; পৃথিবীর সুস্থ একটু অবসরের জন্য আরও হয়ত হাহাকার করবে।

অথচ দেখ, যেখানে একদিন বিপ্লব এসেছিল—সারা পৃথিবীকে যারা মুক্তি ও বিশ্বাসের মন্ত্র শুনিয়েছিল একদিন—তারা এখন শৌর্য্যে-বীর্যে পৃথিবীর অন্যতম শক্তি হয়ে, মহাবিশ্বে অন্য কোন দূরাগত পৃথিবীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বলবৎ করতে হাত প্রসারিত করেছে; কিংবা কার কত শক্তি তার পরীক্ষা দিতে তারা এখন উন্মুখ। মাঝখানে পড়েছি আমরা—ভারত, তথা এশিয়া বা আফ্রিকা। পুরনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে ভেঙ্গে নতুন কোন পৃথিবী সৃষ্টি করব—এই পণ নিয়ে এগোতে গিয়ে দেখি, আমরা এখনও আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় হতে পারি নি। তাই যে যেখানে বিপ্লব করে, এগিয়ে যাবার মন্ত্র খোঁজে আর পণ ক'রে এগিয়ে যায়, আমরা তাদের দিকে ফিরে তাকাই। আসল কথা কি জান কাজল, আমরা ভারতীয়রা আজকাল বড় সুবিধেবাদী হয়ে গেছি। আমরা বিপ্লব চাই না, কারণ রক্তপাত আমরা দেখতে নারাজ, অথচ মানুষের এগিয়ে যাওয়া দেখতে আমাদের মহা আনন্দ। এই যে এত সুবিধের পৃথিবীতে বাস করছি আমরা, সেখানে একটু সংগ্রামের অভাবে, একটু অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্বাসের অভাবে ঠিক সময়ে ঠিক পথটি বেছে নিতে পারছি না।

চীন যখন নিজের দেশকে গড়ে তোলে—আমরা তাকিয়ে দেখি; চীন যখন নিজেকে আধুনিক দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমের দিকে

হাত বাড়ায়, তখন আমরা আবার চোট খাই। বিপ্লবী দেশ কোন্ অজুহাতে বা কোন্ বুদ্ধিতে সাম্রাজ্যবাদের অর্থে পুষ্ট হতে চায় বা একনায়ক শাসনকে সমর্থন করে? ভিয়েৎনাম চার বছরের বেশী আমেরিকার মত বৃহৎ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল; সেই দেশ কোন্ মুখে নিজের দেশ গড়ে তুলতে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ধাবিত হয়? ইতিহাসের এগুলিই হল নিগূঢ় রহস্য এবং সেই রহস্যে আমাদের অনীহা বলেই এইসব আপাতবিরুদ্ধ ঘটনার অর্থ আমরা খুঁজে পাই না। এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পিছবার একটা সঙ্ঘবদ্ধ ভুল ছায়ার মত আমাদের সঙ্গী হয়ে চলে। তাকে জোর করে অস্বীকার করতে গিয়ে ইতিহাসকেই আমরা অস্বীকার করি।

তুমি নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবে, এত কথা আমি লিখছি কেন—কি আমি বলতে চাই? আমি বলতে চাই, শত শত মানুষ যখন প্রথম বিপ্লব বা পরিবর্তন আনার জন্য সংগ্রাম করেছিল—জীবন দিয়েছিল, তখন হয়ত ভেবেছিল, ইতিহাসের আর্তির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পাবে। কিন্তু যেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে—যত বছর মাঝখানে পেরিয়ে যাক—একদিন মানুষ এগিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করবে—কোন্ পথে এসেছি, এ পথে এগোলে লক্ষ্যে পৌঁছন কোনকালে কি সম্ভব হবে? সেই জিজ্ঞাসার একটা বড় সন্ধিক্ষণে আমরা পৃথিবীর নানা এক্সপেরিমেণ্ট্ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—পৃথিবীর বিকাশ ও পরিবর্তনের ছবিটা পুরোপুরি দেখে আমাদের পথ বেছে নেবার এমন ঐতিহাসিক সময় আর বোধ হয় পাব না। কিন্তু জন্মলগ্নে আমাদের যে ভাসতে শেখান হয়েছে, অপারেশন্ করলে নিরোগ হতে পারি, কিন্তু অত রক্তপাত? না—না, দরকার নেই। রোগ সারাবার কত পথ আমাদের জানা—হোমিওপ্যাথি পছন্দ না হলে, আয়ুর্বেদী। আমেরিকান গাড়ি আর রমণী নিয়ে যেতে বড় সুখ। চলাটাই বড়, কারণ চলতে চলতে তখন পথই পথ বাতলে দেয়।

কিন্তু কাজল, আমেরিকান গাড়ি আর রমণীর লোভে হাজারো স্বভাবের যদি জন্ম হয়, তখন ইতিহাস আবার নিরোকে কবর থেকে তুলে আনে যে—। আবার হাসি-গান ও মত্ততায় পৃথিবী পদদলিত হয়—সেই পথে যুদ্ধ আসে, আসে সভ্যতা ধ্বংসের করাল ছায়া। পৃথিবীর মানুষ বড় বিচিত্র একটা টানাপোড়েনে বাস করছে আজ। সেখানে নিত্যনূতন অভিজ্ঞতায় আমাদের তৃষ্ণা পায়। তৃষ্ণা মেটাতে কলকাতায় ছুটি, দিল্লীকে তখন অপদার্থ ও

কালচারহীন একটা শহর মনে হয়, অথচ কি এক আশ্চর্য দীপ্তিতে এদের হাতেই আমেরিকান গাড়ি, বাড়ি আর রমণী। মধ্যবিত্ত স্বপ্নবিলাস বড় ভয়ঙ্কর। আমাদের সবটুকু অবসর বড় বিপন্ন আজ। আসল কথা কি জান, বর্জন করার শক্তি আমাদের আর নেই ; রীতিমত এক এলাহী বিয়ের আসরে আমরা বড়ই উল্লসিত এবং ভোজনে তৎপর। একটু কালচার, একটু গান-বাজনার সঙ্গে জীবনটাকে ভোগে এলিয়ে দিতে কী যে সুখ বন্ধু, তুমি কাজল ঘরের বধূ, তোমার সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

অনেক রাত হল। আর লিখতে পারছি না। কলকাতার শেষ ট্রাম চলে গেছে। এখন শুয়ে না পড়লে আর ঘুম আসবে না।

—অমরেশ

॥ আট ॥

কলকাতার জার্ণালিস্টদের আমি তারিফ না ক'রে পারছি না। মন্ত্রী-মহোদয়কে প্রশ্ন ক'রে ক'রে এঁরা একেবারে নাজেহাল ক'রে ছেড়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসামে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাঘা বাঘা অফিসিয়াল্‌দের নিয়ে। কাগজের অবশ্যম্ভাবি লিড স্টোরি। এতদিন পরে বোধহয় আসাম সমস্যার একটা সুরাহা হবে। অন্তত এটা মনে হচ্ছে যে আন্দোলনের নেতারা এবার হয়ত একটা সমাধান চাইছেন এবং আর তাঁরা টালবাহানা করবেন না।

একজন জার্ণালিস্ট প্রশ্ন করলেন—এবার কী সমাধান হবে, না প্রতিবার যা হচ্ছে, তাই? অর্থাৎ সমভিব্যাহারে যাওয়া এবং কলকাতা এয়ারপোর্টে এসে হাত নেড়ে বলা, যা ভেবেছিলাম তা নয়। পাবলিক মানির এটা অপচয় নয় কী?

তথ্য মন্ত্রী বসে আছেন। সবাই অপেক্ষা ক'রে আছেন তিনি কি বলেন। তিনি প্রশ্নটার একটু ব্যাপকতর দিক হয়ত তুলে ধরতে চাইলেন। বললেন—আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি দু'কথা বলে নিতে চাই। ধরুন, আপনারা আমাদের কাজের বিচার করেন, কেমন? কেন করবেন না, নিশ্চয় করবেন। আপনাদের ডেমোক্র্যাসির 'ওয়াচ ডগ' বলা হয়; 'ওয়াচ ডগ' আছে বলেই আমরা বাড়ির বাইরে লিখে রাখি: 'বিওয়ার অব ডগস্'। [হাসি।] বাংলার চিরকালই একটা ঐতিহাসিক রোল ছিল। একদিন, আমার মনে আছে সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে বাংলার দিকে আমরা তাকিয়ে থাকতাম। আজকাল অবশ্য শুনতে পাই, আপনাদের শক্তি নাকি কমে গেছে। ওটা দেখার দৃষ্টি, আমরা ঠিক মানি না। তেমনি আমরা অহমিয়াদের বোঝাতে চাইছি, আসাম শুধু অহমিয়াদের নয়। তা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে আমাদের সেকুলার্ ইমেজ যে ভেঙ্গে পড়ে। বাঙালীরা নাকি সবাইকে এক্সপ্লয়েট্ ক'রে কালচারালি এত সমৃদ্ধ হয়েছে—এ যাঁরা বলে বেড়ান—তাঁদের দলে আমি নেই। আমি বলি, আপনারা

যে আলাদাভাবে সব ব্যাপারটা একটু ভাবতে পারেন বা অন্তত ভাবার চেষ্টা করেন, সেটা ঐতিহাসিক সত্য। [হাততালি।] এই তো দেখুন, কলকাতার কত সমস্যা, কিন্তু কেউ কী ভাবতে পারে এটা বাঙালীদের শহর বলে আর কেউ এখানে আসতে পারবে না? তাহলে যে অবস্থাটা হবে তাতে আমরা কী সুস্থভাবে পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রে, ভালবেসে বাস করতে পারব? কখ্খনো নয়। সেটা মনে রেখে অর্থাৎ সর্বভারতীয় একটা দৃষ্টিতে আমরা আসামের সমস্যার একটা সমাধান চাই।

—অহমীয়ারা কী সেটা মানবে? আর একজন জার্ণালিস্ট প্রশ্ন করলেন। এটা কেন্দ্র কী বুঝতে পেরেছেন, অহমিয়াদের পয়েন্ট অব ভিউ পুরোপুরি মেনে না নিলে দুর্যোধনের মত, ওরা আর সূচাগ্র জমি দিতেও রাজী নয়? ওরা বলছে, শুকনো কথায় আর চিড়ে ভেজে না।

মন্ত্রীমশায় এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম দেখে আপনারা যেন না ভাবেন আমি পাবলিক মিটিং-এ ভাষণ দিতে উঠলাম। ওটা করতে হয় কেন জানেন ত? ওটা না করলে আমাদের অস্তিত্ব রাখাই দায়। [হাসির রোল, দু'একজন হাততালি দিয়ে উঠলেন।] আমি দেখলাম মন্ত্রীমহোদয় হাসি-গল্পে ও ঠাট্টায় মানুষকে বেশ আপন ক'রে নিতে পারেন। ওটা মহারাষ্ট্রের চরিত্র, হিউমার সেন্স। —হ্যাঁ, ভাল কথা, মন্ত্রীরা আপনাদের রিপোর্ট পড়েন না, এটা কদাচ ভাববেন না। কলকাতার পেপার আমি দিল্লীর চেয়ে আগে পড়তাম যদি তা পাওয়া যেত। দুপুরবেলা দিল্লী যায়—সেটা আবার নিদ্রা ও নিন্দার সময়। [হাসি।] মধ্যগগনে সূর্য ওঠার পরে যে সব কাগজ আমি পড়ি তার মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেয় কলকাতা। বলতে বাধা নেই, মাঝে মাঝে আমাদের কাজের বা অকাজের চমৎকার এনালাইসিস্ থাকে, যদিও কেন্দ্রকে সুযোগ পেলে ঠুকতে পারার মধ্যে বিরাট বড় কৃতিত্ব। ঐ কমন্ ফ্যাক্টরটা অবশ্য বাদ দিয়েই পড়ি [হাসি]। ঠুকতে পারা আর ঠোকাঠুকি ক'রে মাথা ভাঙ্গা এক জিনিস নয়। কলকাতায় অবশ্য দু'টোই ঘটে; আমরা ঠুকি এবং ঠোকাঠুকি করি—এটা অবশ্য আপনারাই বলেন, আমার জানার কথা নয় [হাসির কলোচ্ছ্বাস]। তবে ওটা নিন্দনীয় মোটেই নয়, যদিও পুলিসের কাজ বাড়ে এবং বোধহয় একটু বেশী খরচা হয়। কাজ বাড়লে বা গুলি চললেও আমাদের তাকিয়ে দেখার কথা নয়, কারণ ওটা স্টেট সাবজেক্ট

[হাততালি], নাক গলানো বারণ। লেফ্‌ট ফ্রন্ট সরকার আমাদের একটু সাস্‌পিশনে দেখেন। আমরাও যে দেখি তা নয়, বলা হয় আমরা দেখি। আমরা নাকি লেফ্‌ট ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিতে চাইছি, তা নয়। চাইলে আমরা পারি, সে ক্ষমতায় আপনাদেরও নিশ্চয় বিশ্বাস আছে, নয়ত বলেন কেন? সে যাক, আপনারা জানতে চাইছেন অহমিয়ারা কী মানবে? দু'রকমভাবে আমরা কথা মানতে বাধ্য হই। এক, এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে আমাদের না মেনে উপায় নেই; তখন মানি, কেমন? দুই, আবার যদি দেখি মানলে আমাদের মান থাকে না, তখন ব্যাপারটাকে জীইয়ে রাখি। বাঙালীরা ত আবার অসুখ-বিসুখ করলে কই মাছ খান বা মাগুর মাছ। জীইয়ে রাখা কাকে বলে নিশ্চয় বুঝবেন। আমি যা বলতে চাই, আমাকে কাগজে মিস্‌কোট্‌ করবেন না, প্লিজ—আপনাদের কাছে অনুরোধ—যে দুর্ভাগ্য আমাদের প্রায় সঙ্গের সাথী অর্থাৎ মন্ত্রী বলে এক, তাঁর মুখে বলান হয় অন্য কিছু। আমাদের ত চাকরী রাখার ব্যাপার-স্যাপার আছে। ওটা একটু খেয়াল রাখবেন, তাহলেই হবে [হাসি]। আপনাদেব রিপোর্টে বেশ একটা আফসোস, হা-হুতাশ বা যাকে বলে নেগেটিভ এ্যাটিচ্যুড্‌, ফুটে ওঠে। ওটা বেশী বয়সে হয়; কলকাতা চিরনতুন, আপনাদের কাছে আমাদের অনেক আশা-ভরসা। কারণ এই পজিটিভ্‌ দৃষ্টি দেশের পক্ষে খুব দরকার। সরকার যেসব ভাল কাজ করছেন, সরকারের 'খারাপ' কাজের সঙ্গে (মানে, যদি মনে হয় সরকার খারাপ কাজ করছে—যদিও সরকার খারাপ কাজ করে, এটা আমি আবার মানি না, [হাসি]) ভালগুলিও যদি একটু উল্লেখ থাকে—তবে লোকেরা উৎসাহিত হবে, তারাও পজিটিভলি ভাবতে শিখবে।

—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অত ছুটোছুটি করছেন কেন? অত ছোটাছুটি করলেই কী সমস্যার সমাধান হয়? কতবারই তো ছুটলেন, কিছু হল? এবারও কিছু হবে না—সেটাই কি আমরা ধরে নেব? বলেই একজন সাংবাদিক বসে পড়লেন। ততক্ষণে মন্ত্রীমহোদয় বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং প্রশ্নটার উত্তর মন্ত্রীর আর দিতে হল না—জার্নালিস্ট্‌রা নিজেরাই দিলেন। গণসংগ্রামের ওটাও ত একটা দাবী—কেন্দ্র ছুটে আসবে, আমরা অত যাব না। অত গেলে প্রেস্‌টিজ্‌ থাকে না। জ্যোতিবাবু অবশ্য প্রয়োজন পড়লে দিল্লীতে ছোটেন, বাংলার আবার প্রেস্‌টিজ জ্ঞানটা একটু কম [হাসির রোল]।

মন্ত্রীমহাশয়ও হাসছিলেন। একটু পরে বললেন—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তো সেটাই জ্বালা। দিল্লী থেকে নানা জায়গায় কতবার তিনি ছুটতে পারেন সেটাই তাঁর এফিস্যিয়েন্সি [উচ্চস্বরে হাসি]। একটা কথা আপনাদের বলা দরকার। মন্ত্রী হলেই যে ফর্মাল্ হতে হবে এমন কিন্তু কথা নেই। তাই ইনফরম্যালি আমি এমন কিছু কিছু কথা বা মন্তব্য করেছি—যা স্ট্রিক্টলি কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল্ এবং যা শুধু ঘরোয়াভাবেই বলা যায়। আমার কথা বলার মাঝে মাঝে খবর থাকবে। বকের মত গভীর জল থেকে মাছটা তুলে নেওয়া আপনাদের কাজ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবার যাচ্ছেন অনেক আশা নিয়ে, যদি কিছু না হয় তবু আমরা নিরাশ হব না। এটাকেই বলছি পজিটিভ্ দৃষ্টি। আমাদের প্রধান মন্ত্রীরও জিনিসটা খুব আছে। সারা ভারতে তিনি শুধু দেশের উন্নতির কথা বলে বেড়ান, আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বলেন, যাতে দেশ ও বিদেশের অবস্থার দিকে আমরা একবার তাকিয়ে দেখি। আসামকে ঠিক কথাটি বোঝাবার ব্যাপারে পূর্ব ভারতের কাগজগুলিরও কিছু দায়িত্ব আছে—সেটাই আপনাদের আজ স্মরণ করাতে এসেছি। একবার ভেবে দেখবেন।

—ভাবব কী? অন্য একজন তরুণ সাংবাদিক বললেন, বাংলায় লিখলে অহমিয়ারা কখনও পড়বে না। আমাদের ওটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় হ্যান্‌ডিক্যাপ—ল্যাঙ্গোয়েজ্ কম্যুনিকেশন্ গ্যাপ্! অহমিয়া ভাষায় সারা ভারতের পারস্পেক্‌টিভ দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

—ঠিক বলেছেন,—মন্ত্রীমহোদয় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন—আমাদের ত ওটাই সমস্যা। এখনও আমরা ইংরেজীতে কথা না বললে কেউ বিশেষ পাত্তা দেন না [হাসি], শোনা তো দূরের কথা। ওদিকে হিন্দিতে কথা বললেই দক্ষিণ ভারত ভাবে এই ফাঁকফোঁকরে ওদের ওপর হিন্দি চাপাবার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ মজা হল, নিজের মাতৃভাষায় কথা বললে হয়ত দু'টো কথা গুছিয়ে বলতে পারি যদিও অন্যেরা না বুঝলেও কোন ক্ষতি নেই। আজকেই ধরুন না, আমার মারাঠী বলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ইন্‌টারপ্রিটারকে আমার খুব ভয়, বলব এক, আর অনুবাদ ক'রে বোঝাবে আর এক।

আর একটা আমার প্রশ্ন আছে, এক সাংবাদিক বেশ উৎসাহিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সব সমস্যা আপনারা কী সব সময় সমাধান করতে চান?

মানে প্রধান মন্ত্রীর যতদূর আমরা বুঝি, ওটাই ওঁর ফাংশন্ করার স্টাইল্। কিছু সমস্যা জীইয়ে রেখে, দু'একটা তাড়াহুড়ো ক'রে সমাধান ক'রে তারপর দেখান যে দেশের অবস্থা দারুণ ভাল।

তথ্য মন্ত্রী হেসে উঠলেন, বললেন—আমাদের নেত্রী, কি বলতে চান, দেশের জন্যে তিনি কী করতে চাইছেন, জনতা পার্টি মাত্র দু'বছর গদিতে আসীন হয়ে দেশটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিল,—ঠিক যেন ছেলে-ধরার মত অবস্থা—তা রিপিট্ করার দরকার নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, আমাদের প্রধান মন্ত্রী এখন শুধু দেশের নেত্রী নন. বিশ্ব-দরবারে তাঁর স্থান। সুতরাং সারা ভারতের পারস্পেক্টিভে অনেক কিছু করতে হয়, যা রীজিওন্যাল্ দৃষ্টিতে অন্যায় বা অনুমোদনের অযোগ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু হিস্টোরিক্যাল্ পারস্পেক্টিভে তার অন্য অর্থ। যেমন ধরুন, সুভাষ বোসের অনেক কাজ সেই যুগে ব্রিটিশ সরকার ঠিক ভাল চোখে দেখতেন না। এবং তাঁরা যে চোখে সুভাষ বোসকে দেখতেন,—সেটাই তাঁরা কাগজে-কলমে, প্রশাসনে ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতেন। তাই বলে কী সুভাষ বোস যা, তা কি সেদিন ব্রিটিশ সরকার প্রমাণ করতে পেরেছিলেন? প্রধান মন্ত্রীর অনেক কাজই অ্যাপারেন্টলি মনে হয় খুব প্রভোকেটিভ্ কিন্তু সেটা বোঝার জন্য একটু চেষ্টা চাই—যা জার্নালিস্টদের মধ্যে খুব একটা দেখি না। এটাই আমি বলতে চাই। আপনারা একটু ভেবে দেখবেন, সমস্যা হলে সাংবাদিকদেরও কিছু করার থাকে, বলার থাকে, পথ দেখাবার থাকে।

এবার চা এল, স্ন্যাকস্ এল। সবাই খেতে খেতে টুকরো টুকরো কথা বলছেন। এঁদের কথবার্তায় এটা বোঝা গেল তথ্যমন্ত্রী বেশ একটা ইম্প্রেশন্ রাখতে পেরেছেন। আসলে সেন্স অব্ হিউমার্ বস্তুটা মন্ত্রীদের পুচ্ছ হিসেবে আর কেউ ভাবতে রাজী নয়; অর্থ ও প্রতিপত্তির সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্ব তেলে-জলে যেন মিশ খেয়ে গেছে। তাই রস ও রসিকতা মন্ত্রীর মুখ থেকে বেরুলে বিস্মৃত হতে হয় বৈকি? সে সব কথাই এঁরা বলছিলেন। একটা চাপা সন্তোষ অনেকের মুখে।

মন্ত্রীমশায় লোক পরিবেষ্টিত হয়ে নীচে নেমে এলেন। আমি আর দু'একজন সোজা চললাম এয়ারপোর্টে। যেতে যেতে মন্ত্রীমহোদয় জিজ্ঞেস করলেন—কেমন হল ঘরোয়া আসরটা? বললাম—আমার তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে, এঁদের আপনি রীতিমত ইমপ্রেস করেছেন। মন্ত্রীমশায় হাসলেন

—কাগজে কি বেরুবে তা অবশ্য বলা যায় না—কি বলুন ? দেখবেন যা আমি বলি নি, সেটাই ছাপা হয়েছে। বলেই তিনি হাসলেন, আমিও সায় দিলাম। ওটা চাকরী রাখতে করতে হয়।

আকাশটা মেঘ করে ছিল। প্লেন্ ডিলে হবে কিনা বুঝতে পারছি না। মেঘের আড়ালে বিচ্ছুরিত মায়াবী আলোতে কলকাতার বয়স্ক রূপ পালটে যায়; রসিক চোখে তখন যেন সে তরুণীর রূপ দেখে। হঠাৎ খেলার ছলে হেসে তাকায়। বৃষ্টি ঝরবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় মিছিল। গাড়ি আটকে দিয়েছে। বহু লোকের হাতে লাল ঝাণ্ডা। ধীরে ধীরে চলছে গাড়ি। মিছিলের টুকরো টুকরো ছবি নানা এঙ্গেলে দেখতে পাচ্ছি। মহিলারাই লাইনে বেশী, অল্প বয়সী থেকে মধ্য বয়সী এবং বৃদ্ধা। আজ লেনিনের জন্মদিবস। বেলা চারটে বাজে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা হয়ে এল। জ্যোতিবাবু ভাষণ দেবেন, অন্য মন্ত্রীরাও বলবেন—লোকেরা তাই মিছিল করে ময়দানের দিকে চলেছে। বহু দিক থেকে অসংখ্য মিছিল এসে মিলিত হবে ওখানে। জ্যোতিবাবু যখন ভাষণ দিতে উঠলেন, তখন আমরা এয়ারপোর্টে। যখন ফিরলাম তখন কলকাতার রূপসী চেহারা ; আলোক-সজ্জায় তার রূপ-বাহার এবং তাকে দেখতে অসংখ্য, অজস্র ভিড়।

॥ নয় ॥

অফিসে ডিউটি চার্ট নিয়ে মহা কোন্দল শুরু হয়েছে। নিউজ এডিটর জনা যা করতে চাইছে সেটা নাকি অথরিটেরিয়ান্ এবং স্টাফ আর্টিস্টরা তা মানতে বাধ্য নয়। খুব চেঁচামেচি ও হাত তোলাতুলি হচ্ছে দেখে নিজের ঘর ছেড়ে আমি নিউজ রুমে গিয়ে বসলাম। হাতে আমার সেই যথারীতি নিউজ পেপার, তা পড়ি অথবা চারপাশের এইসব 'হেড্ লাইনে' চোখ বোলাই। অফিসে তরল গুহ, নিউজ-এডিটর-ইন-চার্জ, উপস্থিত থাকলে আমার বিশেষ কিছু করার থাকে না; আজকে আবার গোদের উপর বিষফোড়া—মিনিস্টার। সুতরাং কি এক অদৃশ্য কারণে তিনি মিনিস্টারের রিপোর্ট, জনা বা করেস্পন্ডেন্ট সুনীত চক্রবর্তীকে করতে দেবেন না, আমি জানতাম ; ওরা কেউ করলেও 'হয়নি' বলে তাতে দু'লাইন যোগ ক'রে বা বয়ানের লিড্-পয়েন্ট চেঞ্জ ক'রে নিজের বলে চালাবার যথেষ্ট স্কোপ্ থাকে। এবং তরল গুহ, এরকম মিনিস্টার-আবেশিত পরিবেশে সে সুযোগ হাত ছাড়া হতে দেন না। অর্থাৎ কোন সময়ে যোগাযোগ করলে দিল্লী তার ইনিশিয়েটিভকে তারিফ করতে বাধ্য হবে—সে হিসাব তরলবাবু, খুব সরলবুদ্ধিতে এবং বহু দিনের আয়াসে আয়ত্ত করেছেন। আমার অত দেখার দরকার নেই। রিপোর্টটা যেই লিখুক, সেটা দিল্লীতে পাঠান হল কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া ; আজ সেটা দেখারও দরকার নেই, কারণ তরলবাবু থাকলে কোন রকম দুঃশ্চিন্তার মধ্যে তিনি দিল্লীকে পড়তে দেন না। সুতরাং ও নিয়ে আর এ মুহূর্তে ভাবছি না। তরলবাবু ভদ্রতা ক'রে অবশ্য রিপোর্টটা দেখিয়ে নিলেন। উৎসাহে বেশ ভালই লিখেছেন। জনসমক্ষে মিনিস্টার ভাষণ দিলে তার যাই হোক একটা লিড্ পয়েন্ট পাওয়া যায় কিন্তু ঘরোয়া বৈঠকে হিউমার করতে করতে যা বলা হয়—তার থেকে 'বোনী' খবরটুকু বার ক'রে নেওয়া একটু শক্ত ব্যাপার। তরল গুহ দিল্লীকে কখনই নিরাশ করেন না।

তরল গুহ মিনিস্টার নিয়ে ব্যস্ত আর এদিকে এরা কাজের চেয়ে ডিউটি চার্ট নিয়ে ব্যস্ত। তা নিয়ে হৈ-চৈ আর গণ্ডোগোল আর হাজরো কথা সরব হয়ে

পাক খেতে লাগল, করিডর বেয়ে ঘরে, ঘর থেকে করিডরে, আবার এ-ঘরে সে-ঘরে হয়ে আবার করিডরে,—তাতে কোন সুস্থ মানুষ সুস্থির থাকতে পারবে না।

তাই লোকনাথ একটু বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন—দেখছেন? এখানে কী কোন ভদ্রলোক কাজ করতে পারে?

রুদ্ধ হালদার এরই মধ্যে কয়েকবারই করিডরটাকে কলরবে ভরে দিয়ে আবার ঘরে এসেছে এবং আবার বাইরে গেছে। শেষবার ঘরে এন্ট্রি নেবার সময় লোকনাথবাবুর কথা হয়ত শুনতে পেয়ে একটু যেন গম্ভীর হল, ঘরে ঢুকে একটু বসল আবার বাইরে গিয়ে কাকে যেন কী বলে এল এবং আবার ঘরে এসে বসে রূঢ় কণ্ঠে বলল—লোকবাবু, কি যেন বলছিলেন অপনি, —তা হ্যাঁ, কলকাতায় ভদ্রলোক আর কোথায়? তবে একটা কথা বলা আমার পক্ষে আস্পর্ধার মত শোনালেও দিল্লীর সামনেই বলতে বাধ্য হচ্ছি—আপনি কোন দিকে মন না দিয়ে, শুধু কাজ করুন, কারণ আপনিই এখানে একমাত্র কাজের লোক। আমরা তো কেউ কাজ করি না! ঘুরে বেড়াই এবং জটলা করি। তবে কী জানেন, দিন কাগজগুলো দিন, রিহারস্যাল্ করতে হবে না? হ্যাঁ, কলকাতায় ভদ্রলোক আছে কি নেই, ওটা দেখার দায়িত্ব কিছুদিন না হয় দিল্লীর ওপরেই ছেড়ে দিলেন—ঐ দেখুন, সময় যে হয়ে গেল—স্ক্রিপ্টগুলো দিন। পাতাগুলো ধরে বসে থাকেন, বড় অসুবিধা হয়।

লোকনাথবাবু পুরো বুলেটিনটা শূন্যে তুলে ক্রুদ্ধ চোখে চিৎকার ক'রে বললেন—কি করেন? লাস্ট মোমেন্টে না এসে একটু আগে আসতে পারেন না? কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় তাতে?

রুদ্ধ হালদারও রেগে উঠল—অত ভাবছেন কেন? আপনার রিটায়ার-মেণ্ট অত সহজে হবে না, দেখবেন। বিশেষ ক'রে দিল্লী যখন আপনার ওপর অতটা সদয় এবং সুপ্রসন্ন।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা আমার ভাল লাগছে না এবং একই কথা নিয়ে নানা ভঙ্গী। বাঙালী বড় একই জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে। আমার একমাত্র অস্ত্র নীরবতা আর গাম্ভীর্য।

লোকনাথবাবু আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না, ফেটে পড়লেন—আমার রিটায়ারমেণ্ট নিয়ে রুদ্ধবাবু, আপনি যেন ইদানীং একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন! ওটা না হয় দিল্লীর ওপরেই ছেড়ে দিলেন।

—না, না। যেটুকু ধরে রেখেছি তাও জানি ছাড়তে বাধ্য হবো। আপনার মত মহামান্য লোক থাকলে ভাবনার কিছু থাকে নাকি? তবে এখন দয়া ক'রে একটু চুপ করুন—রিহারস্যাল্ করছি। হ্যাঁ, আগেও বলেছি, আবার বলি। কাকে কখন কোন্ কথাটা বললে সবচেয়ে এফেক্‌টিভ হয় এবং ইম্‌প্রেস্‌ড করা যায়, সেটা আপনাকে বলে দিতে হবে না—ও গুণটা আপনার যথেষ্ট পরিমাণে আছে, লোকনাথবাবু!

—দেখলেন? লোকনাথবাবু আমাকে শালিসী মানতে চাইলেন—। আমি তখন না শোনার ভান ক'রে বুলেটিনের দিকে চোখ বোলাচ্ছি—আসামের খবরটা একটু বেশী লেখা হয়েছে। একটা প্যারা কেটে দিলাম। গণসংগ্রাম কি করতে চায় সেটা আমাদের আগে থেকে ব্রডকাস্ট না করলেও চলবে। ওঁরা বলছেন, এবার যদি বৈঠক ভেঙ্গে যায়, একটা বড় আকারে গণবিক্ষোভ হবে—আগে হোক না, তখন দেখা যাবে। সংবাদদাতার বয়ান ছিল, তাও কেটে দিলাম।

তরল গুহ নিজের খবরটা দিতে ছুটলেন কিনা জানি না, ঘরে অন্তত নেই। হয়ত চলে গেছেন। উনিও জানেন কখন কোন্ মুহূর্তে কেটে পড়লে ঝঞ্ঝাট এড়ান যায়। ছোটবেলায় আমরা ফ্রেঞ্চ লিভ নিতাম, অনেকটা সেরকম। আমার ঘরে এসে বসলাম। আবার চুপচাপ। নিউজ ডিভিশন্ থেকে কিছু কথাকাটাকাটির গুঞ্জন ভেসে আসছে। ডিউটি চার্ট নিয়ে আরও কিছু লোক একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে এবং একই প্রতিবাদ করছে। হয়ত এরা ভেবে নিয়েছে পর্দার আড়ালে থেকে আমিই সব করাচ্ছি এবং দিল্লীর লোককে কি ক'রে টাইট দিতে হয়—সেটা এরা জানে। আর না থাকলেও চলে। আমি কফি হাউসের দিকে ছুটলাম। স্বাতীর সঙ্গে দেখা হবার কথা।

কফি হাউসে কাউকেই দেখলাম না। চারিপাশে অসংখ্য ছেলেমেয়ে। আমার পাশে এক ভদ্রলোক চুপচাপ বসে শুধু ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লি পড়ে যাচ্ছেন। একেই বলে তন্ময়তা। চারিদিকে যে এত হৈ-চৈ তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনজন তরুণ কলকাতার হালচাল নিয়ে কথা বলছিল, সেটা গিয়ে দাঁড়াল—একটু-আদটু শুনতে পাচ্ছি তাই ধরতে পারলাম—চীন ও রুশ সম্পর্কের বর্তমান অবস্থায়। চারজন তরুণী হেলেন অব ট্রয়ের মত যেন কফি হাউসে ঢুকল। তিনজন তরুণ চেয়ারগুলোকে একটু সরিয়ে আরও

দু'একটা চেয়ার এনে সবার জন্য একই টেবিলের পাশে জায়গা ক'রে নিল এবং হাসি-গল্পের একটা ছোট পৃথিবী তৈরী করল। অর্ডার দিল উদার ও অতিথিপরায়ণ এক তরুণ। তাকে বাধা দিয়ে একজন তরুণী বলে উঠল—না, আমার টার্ন। বিপুল, তোমার বিপুল হৃদয় আর হাত দু'টি গুটিয়ে শান্ত হয়ে বোস। আমি এসবই দেখছিলাম এবং দেখে হয়ত বাঙালী জাতির প্রাণ-প্রাচুর্যের তারিফ করছিলাম মনে মনে। তাকিয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে স্বাতী এবং সঙ্গে কাঁধে ঝোলার মতই একজন তরুণ। স্বাতী বলল—চলুন, উপরে গিয়ে বসা যাক।

স্বাতী আলাপ করিয়ে দিল—এই সেই তরুণ সান্ন্যাল—যার কথা আপনাকে বলেছি। বাংলা নিয়ে পড়ছে। আর ইনি হলেন দিল্লীর সেই মহামান্য লোক—যার কথা তোকে বলেছি তরুণ—অমরেশ রায়।

তিনজনে বেশ জমিয়ে বসলাম। কফির অর্ডার দিতে যাব—স্বাতী বাধা দিল—না, তরুণ বলেছে ও আজ খাওয়াবে। এ ব্যাপারে তরুণ খুব জ্যেনারস্ এবং আমি কোনরকম, জ্যেনারসিটিকে ডিস্‌কারেজ করতে নারাজ, অমরেশদা।

আমি লক্ষ্য করলাম এই প্রথম স্বাতী 'অমরেশদা' বলে আমাকে সম্বোধন করল। স্বাতীকে ভারি খুশী দেখাচ্ছে। জানি না নতুন কোন তথ্য পেয়ে বাঙালী জাতিকে আবার বেকায়দায় ফেলবে কিনা। আপাতত দেখছি কমলা রঙের সঙ্গে খয়েরী রঙের একটা শাড়ী পরেছে, কপালে খয়েরী টিপ। বেশ লাগছে দেখতে। কলকাতার আকাশে সন্ধ্যা-তারা ওঠে কিনা জানি না, কফি হাউসে মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব দেখে সচকিত হয়ে উঠি। তরুণের সঙ্গে স্বাতীর কি সম্পর্ক ঠিক বুঝলাম না—তুই-তোকারি করছে যদিও।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তরুণবাবু, বাংলা নিয়ে পড়ছেন, স্কোপ আছে তো?

তরুণ হেসে বলল—স্কোপ নেই বলেই তো পড়েছি। ওটা এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য। চাকরী আমার অভাব হবার কথা নয়—যাই পড়ি। বাপ-ঠাকুর্দার টাকা নেই তবে পজিসন্ আছে। হেসে উঠলাম।

স্বাতী বলল—তা নয়, তরুণের মস্ত বড় গুণ, ও নিরাশ হবে না পণ করেছে।

—এই তো চাই, খুব ভাল গুণ। আমি তারিফ করলাম—যতদিন একটা পজিটিভ দৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

—মোটেই নয় স্যার, মানে হয় না। আধুনিক তরুণদের কোনরকম পণের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়—পণপ্রথা খুব খারাপ জিনিস।

তরুণ একটু মুচকি হাসল। কথাটার মধ্যে যে ব্যঙ্গটুকু ছিল তার একটা উপযুক্ত জবাব দিতেই বলল—তবে তুই-বা ওরকম পণ করে বসে আছিস কেন? বাংলার একদিন রণতরীর উন্নতি হয়েছিল কিংবা হয় নি—আজকের দিনে তা জেনে কার লাভ হবে, শুনি? তোর থিসিস্‌টা অনেকটা এরকম—ধর পণপ্রথা সমাজটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল—কিন্তু সেই সমাজ এখন অনেক শিথিল। কিন্তু তুই পণ করেছিস সেই বদ্ধ সমাজটাকে দেখিয়ে সমাজ-পতিদের জব্দ করবি—ওতে কোন লাভ নেই, বুঝলি?

ওদের কথাবার্তা আমি বেশ মন দিয়ে শুনছি। দূর থেকে হাটের যেরকম একটা গুঞ্জন শোনা যায়—উপরে তারই তিনগুণ শব্দ ও হাসি ভেসে আসছে। ওতে অত অভ্যস্ত নই! এত লোকের, এত তরুণ-তরুণীর, মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের এত কম্‌পিটিশন্ হয়, এত কথা বলার থাকে এবং এত বিচিত্র বিষয়ে—না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তবে কফির পেয়ালায় বিপ্লব, বাঙালী সমাজের চেতনার বোধহয় মস্ত বড় মাপকাঠি। স্বাতী ও তরুণের তর্ক শুনে সেকথাই মনে হল।

স্বাতী বলল—এই কফি হাউসে আড্ডা দিয়ে, কি লাভ? ধর, এই যে মহামান্য দিল্লীর মানুষটা আমাদের কথা এখন গিলছেন—এঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তিনি কি উত্তর দেবেন?

তরুণ অপরাজেয় ভঙ্গীতে বলল—অমরেশদার কফি হাউস দেখে কি মনে হয় বা ভাবেন, আমি জানি না। তুই বরং জিজ্ঞেস কর, কারণ এর সার্থকতা নিয়ে তোরই সন্দেহ ওঠে, আমার নয়। আমি মনে করি কফি হাউসই কলকাতার প্রাণ—আর জীবনের অর্থই হলো প্রাণস্পন্দন। দ্যাট্‌স দি সাইন্ অফ্ লাইফ্।

বুঝলাম ওরা আমাকে আলোচনায় টানতে চাইছে। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

স্বাতী বলল—সবাই আসে, আড্ডা দেয় তবেই তো তার প্রাণশক্তি। ধর্, কাল থেকে কেউ এখানে এল না—তখন?

—তোর যত সব বিদ্‌ঘুটে কথা—আসবে না কেন শুনি ?

—কেন, মনে নেই এমারজেন্সির সময় যেমন হয়েছিল। কথা বলতো সব মেপে মেপে—পাশের ছেলেটা আমার কথা শুনে আমাকে বিট্রে করবে কিনা —এ যদি মনে হতে থাকে—তুই কী প্রাণখুলে আর কথা বলবি ? কফি হাউসের কথা কেউ যে সিরিয়াস্‌লি নেয় না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, এখানে বিপ্লবের স্ট্রাটেজি কেউ নির্ধারণ করে না—চীন, ভিয়েৎনাম বা রুশের বর্তমান অবস্থাটা যদিও নিশ্চয় আলোচিত হয়—

—হাটেবাটে গোপনীয় কথা হয় না বলে তোর যে বড় আফসোস হচ্ছে—

—না আমার কিছুতে আফসোস নেই, তোদের মত। তবে তুই এক্ষুনি বললি কিনা, কফি হাউসই বাঙালীর প্রাণস্পন্দন—তাই দুটো কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। একটা কথা, তুই নিশ্চয় মানবি তরুণ, প্রাণস্পন্দনের সবটাই যদি কফি হাউসে শেষ হয়ে যায়, তাহলে উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি বলে কিছু আর থাকে না। তাই সহজেই মনে হতে পারে খোলা মাঠে যখন প্রেম নিবেদিত হয়—অন্তত বাঙালী আজকাল তো খোলাখুলি প্রেমই পছন্দ করছে, তখন জানতে চাই ; বিপ্লবের স্ট্রাটেজীই-বা খোলা মাঠে নির্ধারিত হবে না কেন ? মজা হল, কফি হাউসে বিপ্লব ছাড়া অন্য কিছু হয় কিনা, বাঙালী তা ভেবে দেখার সময় পায় নি। আসলে জন্ম থেকেই বাঙালী অন্য রাজ্যের লোকেদের চেয়ে নিজেকে সুপিরিয়ার ভাবে এবং ভেবে নিয়ে, নিজেকে গুরুস্থানে বসিয়ে রাখে। ওরকম গুরুগিরি করতে গিয়ে অতটা সময়ের অপচয়, অন্য কোন রাজ্য—যারা প্রডাক্‌টিভ শক্তিকে মূল্য দেয়—ভাবতেই পারে না।

তরুণ মানতে পারল না—এই অমরেশদাকে জিজ্ঞেস কর, এখনও সারা ভারত ঘুরে এসে টুরিস্টরা কি বলে ? শুধু টুরিষ্ট কেন, নানা রাজ্যের লোকেরা তো আছেই, বিদেশীদের পর্যন্ত আমি বলতে শুনেছি—কলকাতায় এখনও যত কালচারাল্‌ অ্যাওয়ারনেস আছে আর কোথাও নেই। এখনও রোজ এখানে যাত্রা-থিয়েটার, গান-বাজনা, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্লাস হয়। একমাত্র কলকাতায় কবিতা পাঠের আসরে লোক ভেঙ্গে পড়ে। শম্ভু মিত্রের কবিতার সান্ধ্য-আসর হলে টিকিট পাওয়া ভার। এটা কী চাট্টিখানি কথা ? রীতিমত গর্ব করার জিনিস। এই একটিমাত্র শহর, যেখানে ভারতের, শুধু ভারতের কেন, বিশ্বের তাবৎ সমস্যা নিয়ে, পথ নিয়ে, ইসু নিয়ে রীতিমত বিদগ্ধ আলোচনা বা

তর্ক হয় বা লাঠালাঠি। অমরেশদা, আপনি সত্যি বলুন তো, দিল্লীতে কী এ জিনিস দেখা যায়?

কথা বলার চেয়ে শুনতে ভাল লাগছিল। কিন্তু তরুণের একটা জবাব চাই, তাই বললাম—দিল্লীর আনাচে-কানাচে কফি হাউজ—সেখানে লোকেরা যায়-আসে-বসে আর গল্পও করে। তবে তার ফাঁকে পি, আর, করতেও ছাড়ে না। ওখানে বিপ্লবের চেয়ে কি ক'রে টাকা করা যায় সে-কথা হয় বেশী। ওখানে অর্থই আনে সমাজে প্রতিপত্তি। প্রত্যেকে সেই একটিমাত্র ধান্দায় ঘুরছে। দিল্লীতে, কনট্‌প্লেসের কফি হাউসটা বিরাট কিছু হয়ে উঠছিল। একসঙ্গে হাজার লোক বসতো, আর গুলতানি মারত; মাঝে মাঝে সিরিঅ্যাস্ আলোচনাও হত। স্বত্বাধিকারী সরকার হয়ত আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন জলা থাকলেই মশা হবে এবং রাজদরবারে মশার কামড় অসহ্য। তাই এমার্জেন্সির সময় ব্রিডিং গ্রাউণ্ডকেই শেষ করে দেওয়া হল।

—দেখ স্বাতী তরুণ যেন লাফিয়ে উঠল—অপজিশনের প্রতি দিল্লীর কি ভয়ঙ্কর ইন্‌টলারেন্স। পুকুরে মশা হলে যে দিল্লীর স্কাইস্ক্রাপারের এয়ার-কন্‌ডিশন্ ভেদ ক'রে মশা জ্বালাতন করবে—তাই বেষ্ট থিং, আবর্জনা রেখো না—পুকুরটাকেই বুজিয়ে দাও, ঢেকে দাও।

স্বাতী হাসল—তুই একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলি। সবাইকে এখন বলে বেড়া গে যা—হাজারখানিক লোক যেখানে রোজ বসত এবং সরকার বিরোধী হাজারো রকমের কথাবার্তা হত কিংবা সরকারকে নিয়ে প্রহসন—তাকে রাতারাতি বন্ধ ক'রে দেওয়া হল কেন? না, মশা জন্মাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। চমৎকার কথা।

ঠিক বুঝলাম না স্বাতী তরুণকে ব্যঙ্গ করছে কিংবা আমাকে প্রশংসা। বললাম—সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে কাদের জান তো? যারা ওখানে চেস্ খেলত, তাস খেলত রাতের পর রাত—তাদের। এখন শুনি তারা ঠিক মনমত জায়গা খুঁজে পায় না। কোন কফি হাউসে যদি হাজার লোক বসে গুলতানি মারে সেখানে কে-কি করছে, না করছে, কেউ বদার্ করে না; এখন কফি হাউসগুলির সফিস্‌টিকেড্ 'লুক' এড়িয়ে ওসব খেলা মুশকিল। তাই বড় জোর সেখানে কফি খাওয়া চলে। কনট্‌প্লেসের মাঝখানে যে সেন্ট্রাল পার্ক হয়েছে—যেখানে ফুলের সমারোহ, ফোয়ারা আর অজস্র হকার—সেখানে এমন সব অমূল্য খাঁজ বা গর্ত বা আড়াল আছে, যেখানে

রাস্তার আলো এসে পড়ে। ওখানে খেলতে বাধা নেই—লোকজনের খুব একটা ভিড়ও নেই। অনেকে দুঃখ করে—সেই প্রাণ নেই। যে উৎসাহী দলটা ছিল তাদের বয়সও হয়ে গেছে। কারুর আর উৎসাহ নেই।

তরুণ চেপে ধরল—এই দেখুন অমরেশদা—এখানে এই কফি হাউসে বয়স বোঝা যায় না। আপনিও আছেন আবার আমিও। কফি হাউসের বয়স নেই, চিরতরুণ। (আমার কী খুব বয়স হয়ে গেছে? তরুণের কী ধারনা?)

স্বাতী ব্যঙ্গের সুরে একটু হাসল। বলল—ঠিক যেন তরুণের মত তারুণ্য ও কলোচ্ছ্বাস। তার মধ্যে যে প্রচণ্ড হুজুগ আছে তরুণ—বেশী বয়সে তা কী সবসময় মানায়?

তরুণ বলল—দেখ কলকাতার মত কালচারাল্ সিটির আর একটা মস্ত বড় গুণ কী জানিস? একইভাবে যে জীবন যাপন করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই; লোকের সামনে নানা অল্‌টারনেটিভ্। যাকে আধুনিক সংজ্ঞায় তোরা বলিস অল্‌টারনেট্ সোরসেস্ অব্ এনার্জি। আমি অনেক চেস্ খেলোয়াড়কে জানি, যারা এখন গোলপার্কের কালচারাল্ ইন্‌স্টিটিউটে যায়, আর খেলে না। স্বামীজীদের লেকচার, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, গীতা ও ভাগবৎ পাঠে তারা এখন অনেক বেশী আগ্রহী। তাই বলছি কেউ থেমে নেই কলকাতায়। এটাই কলকাতার সবচেয়ে বড় শক্তি।

হেসে বললাম—কলকাতায় আমি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। দিল্লীর স্বভাব নিয়ে যেই একটু রিফ্লেক্ট করতে চাইছি, ওমনি দেখছি অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া আর ধাবমান মানুষ আমার হাত ধরে টানাটানি করছে—ওরে বাবাঃ, এখানে এক মুহূর্ত থেমে থাকার উপায় নেই। কলকাতায় ঢোকা মানেই নাগরদোলায় চেপে বসা—আর সে শুধু ঘুরবে আর ঘুরবে।

স্বাতী সায় দিল—ঘুরবে আর চক্কর দেবে।

তরুণ নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—জীবনটা ওভাবেই ঘুরবে আর চলবে—।

স্বাতী বলল—কলকাতার কেউ থেমে নেই। ঘূর্ণিঝড়ের রীতিমত বিস্ফোরণ—কি বল তরুণ?

বললাম—সেটাই বা কম কী? চলার একটা নেশা আছে তো? থামলে চলবে কেন? আজকে এখানেই থাক, আজ আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। রবি চৌধুরী অপেক্ষা ক'রে আছেন। তোমরা বোস, আমি বরং উঠি।

স্বাতী বলল—তরুণ, আমরাও কী তবে উঠবো ?

তরুণ বলল—না রে, আমার আরও দু'জন বন্ধু আসবে—এবং গৌরী আসবে, রীতা আসবে আর আসবে ঘনশ্যাম। আমরা 'কলকাতায় হ্যামলেট' নাটকটা নামাবো ভাবছি, তুই আরও একটু বোস্ না—আমি পৌঁছে দেবোখ'ন।

স্বাতী বলল—না রে, তোর যেরকম প্রোগ্রাম দেখছি অনেক রাত হয়ে যাবে, আমি বরং অমরেশদার সঙ্গে চলি। তরুণ কৃতজ্ঞতায় মাথা নাড়ল।

আমি বললাম—স্বাতী চলো।

—যাই।

॥ দশ ॥

—শুনলাম আপনি রিসার্চ শুরু করেছেন? বেরুচ্ছিলাম, রবি চৌধুরী বল ক্যাচ করার মত আমাকে যেন খপ্ ক'রে ধরলেন।

একটু অবাক হলাম। বললাম—সে কী? আমি রিসার্চ করছি? কি বিষয়ে? অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি।

—দাঁড়িয়ে থাকলে বা রাস্তায় চলতে চলতে এসব গভীর প্রশ্নের কী উত্তর দেওয়া যায়? রবি চৌধুরী জমিদারী কায়দায় যেন প্রজার ভুল সংশোধন করলেন।

আমার অনেকগুলো কাজ ছিল কিন্তু সেরকম কোন তাড়া নেই। রবি চৌধুরীর আশ্রয়ে থাকব আর তাঁকে চটাব—এ ত হয় না। বা তাঁর মনে আমার বিরুদ্ধে কোন রকম স্যাস্‌পিসানের প্রাচীর উঠতে দেওয়াও ঠিক নয়। তাই বললাম—বেরুচ্ছেন নাকি? আজ না হয় আমার ঘরেই চলুন।

—না মশায়, চলুন, যদি আপত্তি না থাকে আমার ঘরেই বসবেন। একই সঙ্গে তাহলে অনেকগুলো লোকের মনের সংশয় দূর করা সম্ভব। নয়ত নয়।

—সংশয়?

—হ্যাঁ, এই যে আপনাকে খাবার সময় ছাড়া আর কেউ নাকি আজকাল দেখতে পায় না। অথবা গভীর রাতে। কি সাংঘাতিক মিস্ট্রি, মশায়।

আমাকে ঘিরে বেশ কথাবার্তা শুরু হয়েছে, বুঝি। একটু যেন বিব্রত হলাম। রহস্য ক'রে বললাম—তার মানে বলেই ফেলুন না, খেতে আমি এখানেই ছুটে আসি, কেমন?

—না, ভুল বোঝার একেবারে স্কোপ্ নেই। সবাই বলছে, আপনি ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কারণ গভীর একটা বিষয়ে আপনি ও স্বাতী বিশ্বাস নামে অন্য আর একজন রহস্যময়ী নাকি রিসার্চে নেমেছেন? এবং বিষয়টা নাকি সাংঘাতিক; কলকাতার জমিদাররা নাকি কোনকালে প্রডাকটিভ্ কাজ করে নি এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া, সবাই বেলেল্লাপনা ও স্ফূর্তিতে নিমজ্জিত ছিল। আমি ঠিক মানতে পারি নি। এবং যদি অনুমতি করেন

তাহলে রিসার্চের বিষয়টা যে ফর্ম নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে, তার একটা গ্যেস্‌-ওয়ার্ক আপনার সামনে তুলে ধরা যায়। তবে আপনি যদি কিছু না মনে করেন, সেই অ্যাসিওরেন্স দিলেই সেটা সম্ভবপর—। আমরা রবি চৌধুরীর ঘরের দিকে এগোলাম।

রুবি হেসে আমন্ত্রণ জানাল—আসুন, আসুন। আপনার যে দেখাই নেই, রবি চৌধুরী অ্যাকিউজ্‌ ক'রে বলছে, যেহেতু আমি বেশী ঘরে থাকতে পারি না, আপনাকে নাকি আমিই ডুমুরের ফুল করে ছেড়েছি। বলে রুবি হাসল।

—সে কী? একথা বুঝি আপনাকেও শুনতে হচ্ছে? তাহলে তো আমার একটু অপরাধ হয়ে গেছে। আমি হেসে জবাব দিলাম।

—ভীষণ, রুবি মিষ্টি হাসল। বলল—কি খাবেন বলুন? যদি তাড়া না থাকে তবে কফির অর্ডার দি।

চৌধুরী বললেন—ঠিক বলেছো, কফিটা খাবার সব সময় মুড থাকে না। বাঙালীর রোগা শরীরে বা পেট পাতলা স্বভাবে কফিটা নিশ্চয় সহ্য হয় না, তাই মুড বুঝে সে কফি খায়। আজ যেরকম আকাশ মেঘলা হয়ে আছে, পার্ক সার্কাসের গলি দিয়ে কলকাতার আকাশ আবার দেখা যায় না, তবু আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বৃষ্টি ঝরাবে দিনটা। এই মুহূর্তে মিঃ অমরেশবাবু, না—থুড়ি, মিঃ রায়ের যদি অনুমতি থাকে, তবে এই মুহূর্তে আমরা কফিই গলাধঃকরণ করি—

কথা বলার রকম দেখে আমি শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম। বললাম—নানা কারণে কলকাতায় একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছি—তা কফিই হোক—আকাশ যখন মেঘলা। কি বলুন মিঃ চৌধুরী?

রুবি ঘন্টি বাজাল। বেয়ারা এসে দাঁড়ালে বলল—আর কি খাবেন, বলুন? ব্রেকফাস্ট্‌ করেন নি তো—আমাদের সঙ্গে আজকে না হয় ব্রেকফাস্ট্‌ই করুন—

—আমাদের জন্য অতো সময় মিঃ রায় কী ব্যয় করতে পারবেন? তাঁর যে এখন বিস্তর কাজ। দেখো তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রিসার্চের যেন কোন ক্ষতি না হয়!

রুবি হাসল—হ্যাঁ, তিনটে ব্রেকফাস্ট্‌।

বেয়ারা চলে গেলে রুবি বলল—কিসব শুনছি বলুন তো মিঃ রায়?

আমি দেখলাম চৌধুরী ইসারায় কি যেন ইঙ্গিত করলেন; অনুমান করলাম রুবি ওদের মহলে যা শুনেছে, তা যেন হুবহু না বলে বসে তারই সাবধান সংকেত। রুবি তাই নিজেকে সংশোধন করল—আসলে আপনি দিল্লীর গণ্যমান্য মানুষ তো—তাই এই মহলে, অর্থাৎ ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার আর রবি চৌধুরীর মহলে আপনাকে নিয়ে বেশ কথা উঠেছে। যে কথাই উঠুক তার মূলে একটাই প্রশ্ন—মিঃ রায়কে আর আগের মত পাওয়া যাচ্ছে না কেন? রহস্যটা কী?

—রহস্য একটাই, মিঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন—গভীর রিসার্চ—।

আমি খুব মজা পেয়ে হাসতে থাকলাম।

রুবি বলল—মিঃ রায়, কলকাতায় এসে আবার কি রিসার্চ শুরু করলেন? শুনেছি, দিল্লীর লোকেরাই কলকাতা বিষয়ে রিসার্চ করতে আসে এবং যখন ফিরে যায় দেখে রিসার্চের কথা ভুলে গেছে। অবাক হয়ে দেখে যা ভেবে এসেছিল তার কোনটাই আর দাঁড়াচ্ছে না—।

—ঠিক বলেছো রুবি—তোমার ইমাজিনেশনকে রীতিমত তারিফ করতে হয়—।

—চুপ করতো, রুবি ধমক দিয়ে উঠল—বউকে যখন-তখন তারিফ করা তোমার বড় বিশ্রি একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—বিশেষ করে গণ্যমান্য লোকেদের সামনে।

—সরি, চৌধুরী বললেন—আমি খুশী হয়েছি এই কারণে যে গতকালই আসরে আমরা একজ্যাক্টলি এই কথাটা বলছিলাম, এবং যতদূর মনে পড়ে, তুমি তখন হোটেল রেস্তোঁরাতে খরিদ্দারদের সামলাতে ব্যস্ত—অথচ কি ক'রে, কোন্ দৈববলে, এই মুহূর্তে তুমি আমাদের প্রশ্নটাই মিঃ রায়কে ক'রে বসলে? মানে, একরকম ভেবে কলকাতায় আসে কিন্তু কি এক অদৃশ্য মৌতাতে যখন ফিরে যায়, কলকাতাকে রীতিমত ভালবেসে ফেলে—কি বলুন, মিঃ রায়?

আমি একই সঙ্গে কার কথার উত্তর দেব ভেবে পেলাম না—কলকাতাকে ভালবাসা যায় কিনা, অনুরাগের প্রারম্ভে তা অনুভব করা মুশকিল। তাই বললাম—এইতো এলাম—দিনগুলো কিভাবে হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার তো হিসাব রাখাই দায়! এখন এই মুহূর্তে কলকাতার প্রেমে অধীর কিনা ভেবে দেখি নি। একটু থেমে ঘুরিয়ে বললাম—তবে কাকে যে কখন আমরা

ভালবেসে ফেলি, বলা শক্ত।

—ঠিক বলেছেন, চৌধুরী লাফিয়ে উঠলেন,—দিল্লীর মানুষ কি সাংঘাতিক মশায়—ইঙ্গিতগুলো ঠিক যেন র‍্যাডারে ধরে ফেলে—রুবির রিসার্চ,—কথাটা শেষ না করেই শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন রবি চৌধুরী—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বেয়ারা ব্রেকফাস্ট্ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

রুবি বলল—টেবিলে দিয়ে দাও, আমরা না হয় ড্যাইনিং রুমেই যাই—কি বলুন মিঃ রায়?

আমি বললাম নিশ্চয়ই, হেভি ব্রেক্‌ফাস্ট্ ড্রইং রুমের ইজ্জত রাখে না।

—কি সাংঘাতিক,—বলেই চৌধুরী ভাবলেন ঘরে এখনও বেয়ারাটা রয়েছে, তাই চেপে গিয়ে 'সাংঘাতিক' কথাটাই রিপিট্ করতে থাকলেন এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন দিল্লী নামক ভয়ানক মিস্‌টিরিয়াস শব্দটা অর্থাৎ মুখ দিয়ে তখন বেরুতে থাকল—'দিল্লী কি সাংঘাতিক মিস্‌টিরিয়াস'—

রুবি ধরিয়ে দিলে—তুমি যে কথাটা এখন বলছো তা কিন্তু ঠিক বলতে চাও নি, বেয়ারার চোখ এড়াতে 'সাংঘাতিক' শব্দটাকেই রিপিট করছিলে—অরিজিন্যাল কথাটা কি ছিল? মানে কি বলতে চেয়ে তুমি এখন কি বলছো?

হাঃ-হাঃ-হাঃ ক'রে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন মিঃ চৌধুরী, একটু থেমে আবার তারিফ ক'রে বললেন—দেখলেন মিঃ রায়? রুবি মানুষের ইনটেন্‌শ্যন্ কি ভয়ানক তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলে? আপনি অবাক হচ্ছেন, না? আরে শত হলেও হোটেল রেন্‌ভোঁতে ও জয়েন করার পরে ওখানকার খরিদ্দার সাংঘাতিক রকম বেড়ে গেছে। ওর প্রপাইটারের আবার এয়ার লাইন্সের প্রতি একটু যেন বেশী উইকনেস্। ইন্‌সেন্‌টিভ দিতে চাইলে তিনি বলেন, সুইট্‌জ্যারল্যাণ্ড ঘুরে এসো না হয়। এটা বোঝেন না, তোমার প্রেয়সী সুইট্‌জ্যারল্যাণ্ডে আছে বলেই কী দুনিয়া ওখানে যেতে চাইবে? তারচেয়ে বল না কেন, বিলেতে ঘুরে এসো 'ফ্রি টিকিটে' বা এ ফ্রি টিকেট টু ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব্ আমেরিকা? যেখানে লোকেরা যেতে ভালবাসে—ব্যবসাদারেরা মশায়, সাংঘাতিক চিজ্। সাধে কী আর বাঙালী ওমুখো হতে চায় নি? কারণটা বুঝি।

—চলো তো, তোমাকে মাঝে মাঝে বড় কথায় পেয়ে বসে, রুবি ধমক দিল—কে যেন বলেছিলেন,—কলকাতার স্বামীরা দাঁড়ালেই স্ত্রীকে লক্ষ্য

ক'রে বক্তৃতা করেন। চলুন মিঃ রায়, ব্রেক্ফাস্ট ঠাণ্ডা হলে আবার সেগুলি ড্রইংরুমে খাবার মত হালকা হয়ে যাবে।

আমি বুঝলাম, আমার কথাটার উত্তর দিল রুবি। মিঃ চৌধুরীর কথা আমিও মানি, রুবির 'আই, কিউ,' অনেক বেশী এবং বিশ্বাস হবারই কথা যে রুবি হয়ত ফ্রি টিকেটে একদিন আমেরিকাতেই ঘুরে আসবে। কলকাতার কথা বলতে পারব না, দিল্লীতে আজকাল ওটাই ট্রেণ্ড। এয়ারপোর্টে অজস্র ভারতীয়, ভারতের আকাশসীমা পেরোতে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে; এমন কি হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের অজস্র গ্রামের মানুষ, পোষাক-আশাক, দাড়ি-গোঁফ, পায়ে ধূলো, মাথায় পাগড়ি—তাও কতক্ষণে দেশ ছেড়ে যাবে তার জন্য ভিড় ক'রে বসে থাকে। প্রত্যেক চতুর্থ বাঙালী ও তৃতীয় ভারতীয় এখন বিদেশে চলে গিয়ে এখন প্রভূত অর্থ কামাতে চাইছে; সাধে কী কথায় বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

—মিঃ রায় শুরু করুন –আমি কিন্তু শুরু ক'রে দিলাম—রুবি আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে বলল—চৌধুরী আবার আমার খুব বাধ্যের হাস্‌বেণ্ড, আমি না খেলে ও আবার খেতে পারে না—

—বেশ, আমি হেসে চৌধুরীর ভাষায় গলাধঃকরণ করতে থাকলাম। যে যাই বলুক, এরা এই বেয়ারা-খানসামার দল, রান্না শিখেছে আকবর-বাদশার 'কুকের' কাছ থেকে কিনা জানি না—কিংবা হোটেল রেন্‌ভোঁতে গিয়ে মাঝে মাঝে তামিল নিয়ে আসে কিনা তাও অজানা—রুবি ইচ্ছে করলে সেটাও নিশ্চয় পারে এবং ক'রে থাকে—সে যাই হোক, এত উপাদেয় স্যাণ্ডউইচ বা চপ্‌ খেতে আমার দারুণ লাগছে। তাই বললাম—এদের হাতে যাই খাই না কেন অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে কেন—ঠিক বুঝি না!

মিঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন—ওটা রুবি-এফেক্ট, তবে বলা বারণ, তাই যা বললাম, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, আমি কিন্তু বলি নি।

রুবি খেতে খেতে হাসছিল। বেয়ারা ততক্ষণে কফি নিয়ে এসেছে। লোকটার মুখে দাড়ি-গোঁফ আর গাম্ভীর্য দাড়িপাল্লায় যেন বাঁধা। কার শাসনে সব কিছু নিখুঁতভাবে গোছান থাকে তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে আমি আমার ঘরে বসে মাঝে মাঝে ভেবেছি। অথচ রুবির ব্যবহারে তার এতটুকু বোঝার উপায় নেই। ও গম্ভীর না হয়েও ভয়ঙ্কর গভীর কাজগুলো অতি সহজে কী ভাবে ক'রে ওঠে সেটাই মিস্‌ট্রি। এটা নিশ্চয় ওর আশ্চর্য

একটা ট্রেনিং—বা স্বভাবজাত ক্ষমতা—এই যে নীরবে অন্যকে চালান। মেয়েরা চিরকালই অদৃশ্য হাতে স্বামীদের চালায় কিন্তু হাসিমুখে হোটেল বা মেস্ চালান যে বেশ শক্ত ব্যাপার, অভিজ্ঞতা না থাকলেও বুঝি।

—কফি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, মিঃ রায়। —কত দিকে নজর রুবির।

—হ্যাঁ, তাই তো—, আমি কফিতে চুমুক দিলাম।

মিঃ চৌধুরী বললেন—রুবি, দেখেছো, সেই রিসার্চের কথাটা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও মিঃ রায় বলছেন না—।

—বাঃ, সবই যদি তোমাকে বলে দেবেন, তবে ওঁর বলার থাকে কী?

শব্দ ক'রে হাসলেন মিঃ চৌধুরী। বললেন—দেখলেন মশায়, আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করার পর্যন্ত সাহস পায় রুবি। কি বউ রে বাবাঃ। হোটেল রেন্‌ভোঁর চাঁইয়েরা আসে তো এবং তারা মালকড়ি খেয়ে নিশ্চয় কোন-না-কোন সময়ে বেসামাল হয়ে পড়ে নির্ঘাত, তখন রুবি তার সুদর্শন চক্র ছাড়ে। তাই বলে কী রুবি ভেবে নিয়েছে, যা হোটেলে করা যায়—যা হোটেল রেন্‌ভোঁতে বলা যায়—তা বলা যায় আপনাকেও? না-না দিল্লীর হাতে ক্ষমতা। বেশী চটালে সি, পি, এম, গভর্নমেন্ট পড়ে যাবে যে! রাষ্ট্রপতির শাসনে আর যাই থাকুক গৌরব নেই।

আমি বুঝলাম, রুবি আমাকে কেন্দ্র ক'রে কোনরকম ইঙ্গিত করতে চায় নি এবং করেও নি। অথচ কি অস্ফূট ইঙ্গিতের আভাস পেয়ে চৌধুরী রুবিকে আড়াল করতে চাইছেন, ঠিক ধরতে পারলাম না। তাই রুবিকে একটু যেন সমর্থন করার জন্যই বললাম—আমরা পাবলিক সার্ভিস করি—কেমন? আমি কথাটা রুবিকেই বললাম কিন্তু চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে চাইলাম, ওঁর মুখে কথাটার কি ধরণের রিঅ্যাক্‌শন ছড়িয়ে পড়ে—। পাবলিক সার্ভিসের অ্যাকশনে হাসি, মজা বা গাম্ভীর্য—সবটাই কিন্তু আমাদের মনের সাজান রূপ।

উত্তর দিল রুবি। বলল—নিশ্চয়, যেমন নেতারা পাবলিক সার্ভিস ক'রে থাকেন আজকাল—এটাই নাকি জনগনের সেবা এবং জনস্বার্থে। বা উইকার সেকশনের কল্যাণে। মন্দিরে দেখেছেন তো হাতীর মুখ দিয়ে জল পড়ে; তেমনি ক্যাপিটালিস্টদের মুখ দিয়ে সোসিয়ালিজমের জল গড়িয়ে পড়ে। ওভাবেই মনের জ্বলুনী শীতল হয়।

চৌধুরী বললেন—রুবি, তোমাকে আগেও বলেছি এবং এখন এই মুহূর্তে

দিল্লীর এই মহান পুরুষের সামনেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস্ একটু কমই আছে এবং ও লাইনে তুমি বেশী দূরে যাবার চেষ্টা কোর না, প্লিজ। আমি বলছি তুমি পেরে উঠবে না। এই যে বললে, উইকার সেকশন্—ওটা নর্থ ইণ্ডিয়ার জিনিস, ওর দৌড় বড় জোর দিল্লীর নিউজ ডিভিশন্ পর্যন্ত। এখানে, এই পশ্চিমবঙ্গে জনগনের একটিমাত্র আশ্বাস—জনসেবা, মেহনতী মানুষের স্বার্থে স্রেফ্ জনসেবা।

—ও সরি, হঁ্যা,—ঠিক বলেছো—জনসেবা, না? এবং মানুষের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে না? ওসব ঘর্মাক্ত মেহনতী কথা আমার শীতল মুখে বরফ হয়ে যায়। শত হলেও হোটেল রেন্‌ভোঁর একটি বিশেষ কক্ষে মেহনতী মানুষের নেতাদের দেখি তো!

—রুবি প্লিজ্, চৌধুরীর মুখে একটা ডেস্‌পারেট্ অনুনয় শোনা গেল,—আমি তোমাকে অনেকদিন সাবধান ক'রে দিয়েছি,—একটু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি, 'দিল্লী' উপস্থিত থাকলে, 'কলকাতার' কথা বলবে খুব সাবধানে। মিঃ রায় নয়ত সব কিছুই রিসার্চের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন।

—না, রুবি হাসল—আমি বরং যা জানি, যেটুকু জানি—মিঃ চৌধুরীর যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং মিঃ রায় যদি জানতে চান—বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। তোমাদের কমিউনিজমের আমি কিছুই বুঝি না বা এর ভবিষ্যৎই বা কী আমার ঠিক জানা নেই। তবে এটুকু নিশ্চয়ই জানি, কারণ আমি যে দেখেছি অনেক,—এও সেই মধ্যবিত্তের লড়াই। আকারেও তাই, প্রকারেও তাই। বরং আগে যা-বা ছিল একটা অনেস্ট এফর্ট আর এখন? তুমি যাই বল কমিউনিস্টরা যদি কেউ ঘুষ নেয়, আমার গা রি-রি করে।

চৌধুরী তীব্র প্রতিবাদ করলেন—কে কোথায় দলের বা বিশেষ কারো নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কেউ ঘুষ নেয় কিংবা ধরে নাও, দু'পয়সা কেউ যদি করে—তবে তার জন্য মেহনতী পার্টিকে তো আর দোষ দেওয়া যায় না। যদি তা সত্ত্বেও দোষ দাও—তাহলে বলতে আমি বাধ্য হব, রুবি নামক রিঅ্যাক্‌শনারী স্ত্রী, মানুষের একপেশে দৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে—

রুবি একটু ব্যঙ্গের সুরে হাসল, বলল—মেহনতী জনতা, আমি অনেক সময় ভাবি, যেভাবে বুলি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে—যেভাবে পোস্টার হয়ে উঠে আসছে আমাদের চোখের সামনে, মাথার ওপর, দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে

আমি অনেক সময় ভাবি, তোমাদের কাছে সেই মেহনতী জনতা একদিন না শ্রেফ্ খেলার পুতুল হয়ে যায়। উপরে কাঠের পুতুলের মত খেলাচ্ছে কেউ 'শ্যাডো-প্লে'—, মাঝে মাঝে সুতো-ধরা কয়েকটি আঙুল দেখা যায় আবার মিলিয়ে যায়। বুঝলে রবি, —বলেই রুবি হাসতে থাকল।

আমার এক মুহূর্তের জন্য বড় ড্রামাটিক্ চরিত্র লাগল রুবিকে। যেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অদৃশ্য কোন হাত নেড়ে, অদৃশ্য দু'টো চোখ, মুখ নেই শুধু দু'টো চোখ নাড়ছে, নড়ছে আর অদৃশ্য দুটি ঠোঁট কথা বলে যাচ্ছে। মানুষের অবয়ব ছাড়া মানুষেরই কথা বা ভবিষ্যৎবাণী বড়ই বিভ্রান্তিকর। আসলে এসব ভাবছি বটে কিন্তু কথার মাঝখানে আমি কোনরকম মন্তব্য করতে রাজী নই। তাছাড়া জানিই বা কতটুকু যে মন্তব্য করব? সারা দেশের পরিপ্রেক্ষীতে লেফট্ ফ্রন্ট সরকার ত বেশ ভালই রাজ্য চালাচ্ছেন। গ্রামে পঞ্চায়েত লেবেলে যদি তাঁরা তাঁদের ঘাঁটি মজবুত ক'রে থাকেন—করবেন না কেন, শুনি? কে করে না? সরকার চালাতে গিয়ে বর্তমানের এই সিস্টেমকে যেটুকু মেনে নিতে হয়, সেটুকু কনসেশন্ দিলে তাদের সরকার চালনার রেকর্ড ত ভালই মনে হয়। কিন্তু জনসমক্ষে কারুর সমর্থনে বা বিপক্ষে আমার কথা বলা বারণ। পলিটিকাল্ কথাবার্তা বললে আইভরি টাওয়ারে বসে বোকার মত বলব, বুরোক্র্যাট্দের মত দুপুর-দাপুর মন্তব্য ক'রে বসব এবং সেটা খুব কন্ভিন্সিং হবে না। তাছাড়া জানাজানি হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেটা রীতিমত এম্ব্যারেসিং ব্যাপার হবে। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ ক'রে কন্ডাক্ট রুলে পড়তে চাই না। তাই শুনে যাচ্ছি—স্বামী-স্ত্রীর পলিটিকাল্ মতবিরোধ শুনতে আমার ভালই লাগছে।

—তোমাদের ঐ রিঅ্যাক্শনারী কথাটার অর্থ ঠিক আমি বুঝি না। দেখছি, রুবি যখন তর্ক ক'রে, বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কথা বলে। হোটেল রেন্ভোঁর এক নির্দিষ্ট কক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মেহনতী জনতার প্রতিনিধি যদি মদ পান করেন—সেটাকে তুমি কী রিঅ্যাক্শনারী বলবে? রুবি জিজ্ঞেস করল।

চৌধুরী বুঝলেন, কার কথা বলা হচ্ছে এবং তাই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। রুবি এমন একটা জায়গায় কাজ করে যার দৌলতে মানুষ বা নেতাদের অনেক উইকনেস্ জানে বা টের পায়। ব্যক্তিগত দুর্বলতার উর্দ্ধে পার্টির আইডিয়াল্—সেটা কী রুবি অস্বীকার করতে পারে? কথাটা মনে

হতেই মুষ্টিবদ্ধ হাতে চৌধুরী বলে উঠলেন—পার্টি হল নিশান। আইডিয়াল্। বহু লোক সেই নিশানা সামনে রেখে এগোয়। চলার পথে কে কোথায় ঢুকে একটু গলা ভিজিয়ে নিল—ওটাকে অত সিরিয়াসৃলি নেবার মানে হয় না। জল খেলে তুমি কী কিছু ভাব?

—না, মোটেই না। আচ্ছা মিঃ রায়, বলুন তো, জনতার থেকে আলাদা হয়ে জল খাবার কী দরকার? না খেলে কী গলা ফেটে যায়? শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়? যদি যায়, বুঝতে হবে নেশা ধরেছে। ব্যক্তিগত উইক্‌নেস্ আমি মোটেই দেখছি না। কিন্তু পার্টির অন্যতম ক্যাপ্টেন্ যদি বেসামাল হয়ে পড়েন এবং লাল জল খেলে কোন না কোনদিন হবেনই—তাহলে একটু মুশকিল। তখন কী নিশানা ঠিক থাকবে? তুমি বলবে আপামর ক্যাডারদের দিকে একবার তাকাও, তাদের আত্মত্যাগ একবার দেখো। তাহলে বুঝতে পারবে, বিপ্লব সহজে মরে না, মরবে না—ওসব তুমি বক্তৃতার ভঙ্গীতে প্রায়ই বলে থাক, আমি জানি। ওসবে আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই। তবে জানি, বড় গাছেও ঘুণ ধরে এবং ঘুণ ধরলে আর বাঁচার কোন উপায় নেই। একদিন সে মরবেই।

—চৌধুরী আমার দিকে একবার তাকালেন। ভাবখানা আমি যেন একটু সাপোর্ট করি। আমি শুধু এটুকুই ভাবি, কমিউনিষ্ট আন্দোলন আসাম সংকটে মার খাচ্ছে কেন, সেটা নিশ্চয় একটু তলিয়ে দেখা উচিত। যে-কোন পার্টি করত, সি, পি, এম,-ও নিশ্চয় করে। ঠিক জানি না। আমি এও ভাবি, ভাবি আবার কন্‌ডাক্ট রুল সামলে-সুমলে নিয়ে যে সি, পি, এম, পলিট্‌বুরোর দু'চারটে মিটিং ক'রে এবং হিন্দী ভাষাভাষি রাজ্যে ঢুকবার পণ ক'রে সত্যিই কী তাঁরা সারা ভারতে কোনদিন অলটার্‌নেটিভ্ পার্টি হয়ে উঠতে পারবেন? এত বড় দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে যা করণীয় তা কি সত্যিই করা হচ্ছে? যদি হত, তার কর্ম, গতি ও চালচলন এবং দেশের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার দূরদৃষ্টি অন্যরকম হত। কিন্তু যা ভাবা যায়, তা বলে লাভ নেই বা অনেক সময় বলা যায় না বলেই ঘটনা হয় ইতিহাস। ইতিহাসকে যাঁরা পাল্টেছেন, তাঁদের মত নেতা কী ঐ পার্টির মধ্যে আছেন?

চৌধুরী বুঝলাম রুবির সঙ্গে আর এ-নিয়ে আলোচনা করতে রাজী নন। তাই কথা ঘুরিয়ে বললেন—মিঃ রায় নিশ্চয় তোমার অমূল্য মতামত শোনার

জন্য তাঁর অমূল্য সময় এখন নষ্ট করতে নারাজ। নয়ত দেখো, আমাদের আলোচনায় তিনি টু-শব্দটি করছেন না। দিল্লীর লোক কি সাংঘাতি হয়, একবার ভেবে দেখো। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—মাপ করবেন মিঃ রায়, দিল্লীর যাই থাক কোন কমিট্‌মেন্ট্ নেই।

আমি জোরে হেসে উঠলাম। বললাম—আপনাদের কথাবার্তা আমি খুব এন্‌জয় করছি।

চৌধুরী বাধা দিলেন—না মশায়, আমাদের দু'জনের মধ্যে দুটো পার্টি বড়সড় হয়ে বেড়ে উঠেছে। এটা হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু আমরা যে স্বাধীন দুটি সত্তা, এটা তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ও কংগ্রেস আই, আর আমি সেই মেহনতী পার্টির প্রতিভূ। তা মশায়, ঘরে কে আর অশান্তি চায়? তাই পার্টি-ইন্-পাওয়ার-এর গর্জনের কাছে সি, পি, এম, চুপ করে থাকে। শত হলেও ওদের হাতে এখনও পাওয়ার এবং রাষ্ট্রপতির শাসন। মিসেস গান্ধী চটলেন কিনা আমরা থোড়াই কেয়ার করি—? কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের যেখানে প্রশ্ন, তাঁর কথাবার্তা, চালচুলগুলো নিয়ে একটু ভাবতে হয় বই কি? ঐ ভাবনাটাকে ওরা দুর্বলতা ভাবে, জানেন?

রুবি উষ্মা প্রকাশ করে বলল—একশোবার ভাবো না এবং প্রয়োজন হলে ভাবনা ছড়াও, কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে? কিন্তু কফি হাউসে বসে সাহিত্য বা পলিটিক্যাল আলোচনা হতে পারে, বিপ্লব হয় না। তা তো সত্তরের দশক তোমাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাও কী তোমাদের শিক্ষা হয় নি? যখন ঐসব তাজা রক্ত নিয়েছিলে বা ধরিয়ে দিয়েছিলে, কই, ব্যাপারটাকে তো কেউ তখন রিঅ্যাক্‌শনারী বলে নি! যখন গোটা আন্দোলনটাকে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ করে দিলে, যখন তাদের ধরিয়ে দিলে, ক্ষমতায় থেকেও বিশ্বাসঘাতকতা করলে—কিংবা তা দেখে আমরা উৎসাহ পেয়ে বাকি যেটুকু ছিল শেষ করে দিলাম উপায় না দেখে—তখনো কেউ তোমাদের রিঅ্যাক্‌শনারী বলে নি। যখন সব কিছু কম্‌প্রোমাইজ্ করে তোমরা পার্লামেন্টারী ডেমোক্র্যাসি মাথায় করে নিলে—আমরা একবার হেসেছিলাম। ভেবে খুশী হয়েছিলাম, তোমাদের স্বভাব এবার আমাদের মতই পাল্‌টাবে—এবং তোমাদের আন্দোলনের মহিরুহে একদিন ঘুণ ধরবে।

—কি, ভয়ানক পালটে যাচ্ছি—না? চৌধুরী এবার বেশ চটে উঠলেন—গোটা পশ্চিমবঙ্গ কি কংগ্রেস আই হয়ে গেছে? কক্ষনো হবে না।

আমাদের শক্তি আমাদের মেহনতী জনতা।' রাশিয়া পর্যন্ত স্বীকার করেছে আমরাই এখন প্রধান লেফ্‌ট ফোর্স। চীন এখন মার্কিন ইম্‌পিরিয়্যালিজ্‌মের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সেটা আমরা খুব সাস্‌পিশনের চোখে দেখছি। আমাদের দ্রুত গতিতে মার্চ করে এগিয়ে যাবার ঐ শোন পদধ্বনি। অত তাড়াতাড়ি বন্ধু, আমাদের নিরাশ করতে পারবে না। তোমরা বরং নানা রং ধর, নানা ভোল্‌ পাল্‌টাও এবং মেয়েদের মত নানা রূপ ধরে এন্‌ট্যাইস্‌ কর। কিন্তু ইতিহাসের শত টারময়েলেও আমরা অপরিবর্তনীয়, আমরা অমর এবং অমর বলেই অত সহজে আমরা পালটাই না। ওটাই আমাদের শক্তি। একদিন সারা দেশময় আমরা এগিয়ে যাব, ভয়ানক একটা ক্যালকুলেশনের শক্তিতে, যাকে বলে লক্ষ্যভেদ করার ক্ষমতায়। তবে খুব আস্তে আস্তে। তোমাদের মত ইন-ফাইটিং-এ মত্ত হয়ে নয়।

রুবি দেখল, চৌধুরী আর তর্কের মধ্যে যেতে চাইছে না, বক্তৃতা শুরু করেছে। তাই বলল—তোমার ওসব বক্তৃতা আমরা পথেঘাটে শুনি। মিঃ রায়কে অযথা 'বোর' করছো কেন? তোমাদের পার্টি ও নেতাদের লেবেল কনট্রাডিকশনটাকে আমি তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। তা দেখছি তুমি যুক্তিতর্কের মধ্যেই যেতে চাও না। মিঃ রায় আপনিই বলুন, কলকাতার কোন সমস্যা এরা সমাধান করতে পেরেছে? ভেতরে যদি আস্তে আস্তে ফাঁপা হয়ে যেতে থাকে, তখন আর ইমারত গড়েও লাভ নেই, একদিন ধসে পড়বেই। যাইহোক আর নয়, মিঃ রায় আটারলি বোর্‌ হয়ে গেছেন। মিঃ রায়, এবার বলুন আপনার আজকাল দেখা পাওয়া যায় না কেন?

চৌধুরী তর্কের জাল থেকে ছাড়া পেয়ে যেন মুক্তি পেলেন। কথাটাকে লুফে নিয়ে বলে উঠলেন—কি মশায়, শুনলাম খুব রিসার্চ করছেন?

—যে জাত নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে না—তাকে নিয়ে কী রিসার্চ করা চলে, বলুন? বলেই আমি উঠে পড়লাম।

—ঠিক বলেছেন, রবি চৌধুরীর পরিবারের কথা যদি জানেন, অমূল্য রিসার্চ মেটিরিয়েল্‌ পাবেন। বলবো, সব আস্তে আস্তে বলবো। নয়ত কমিউনিষ্ট তো, ওরা আবার আত্মসমালোচনায় চটে যায়।

চৌধুরী বললেন—নিজেকে ডি-ক্ল্যাসিফাই করার জন্য ভয়ানকভাবে নিজেকেই আমি উপহাস করি। তুমি সুযোগমত ভুলে যাও।

বড় দেরী হয়ে গেছে। আমি দ্রুত পদে নীচে নেমে এলাম।

॥ এগারো ॥

আমি স্বাতীর পড়ার ঘরে বসে গল্প করছিলাম। এখন দু'জনেই চুপ।

স্বাতীর থিসিসের এই চ্যাপ্টারটা খুব ক্রিটিক্যালী পড়ছিলাম। পড়া শেষ ক'রে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিকেলের রোদ গলির কোণে, ছাদের আলসেতে। একটা বেড়াল আলসেতে বসে গৃহস্থের চুরি-করা মাছ ও কাঁটা খেয়ে তৃপ্তির আলো ছড়াচ্ছে হাত দু'টো দিয়ে মুখ ঝাড়ছে। আমার মুখের দিকে স্বাতী একবার তাকাল, কিছু বলল না। আমি ইতিহাসের টুকরো টুকরো পাতা মনে মনে জুড়বার চেষ্টা করছি আর ভাবছি, স্বাতী বোধহয় বুঝতে পেরেই চুপ ক'রে গেছে। আজেবাজে কথা জিজ্ঞেস ক'রে ভাবনার সূতো ছিঁড়ে দেয় না; মেয়ে হয়েও এই কমন্‌সেন্সটা স্বাতীর খুব বেশী রকম আছে। আমি বিস্মিত হয়ে যাই। বিস্ময়ের উল্টো দিকেই কি ভালবাসা? বেড়ালের মত সে কী ওৎ পেতে থাকে?

স্বাতীর এটা প্রথম ড্রাফ্‌ট। লেখার সময় বিস্তর স্বাধীনতা নিয়েছে। ইংরেজীর সঙ্গে আছে বাংলায় মন্তব্য। ডান-দিকে টাইপ-করা পাতা, মাঝে মাঝে স্টার বা নানারকম সাইন বা 'রাস্তা রোখো'র মত বড় বড় বোলডার। অর্থাৎ স্ট্রেট্ লাইনে যে টানা পড়ে যাব তা পারছি না; সাপের লুডোর মত উপরে উঠে আবার হয়ত নীচের গহ্বরে নেমে পড়ছি। বাঁ-দিকে দেখলাম স্বাতীর একটা কড়া মন্তব্য বা আত্মবিশ্লেষণ। কখনও মনের দুঃখ. কখনও জ্বালা, কখনও-বা নৈরাশ্য উক্তি। ওর এই আঁকাবাঁকা চিন্তাভাবনাগুলো যেন বিস্মিতির অরণ্যের কাঁটায় তুলোর মত বিঁধে আছে। ওগুলো পড়তে বেশী মজা লাগছে। লুকিয়ে ডায়েরী পড়তে যে মজা।

আমি আবার চ্যাপ্টারটা উল্টেপাল্টে দেখলাম। নতুন কতগুলো কথা চোখে পড়ল। যেমন আমি জানতাম না, জাহাজ নির্মাণ বাঙালীর নাকি বহু পুরাতন ব্যবসা ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সেই বিখ্যাত সপ্তগ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই উৎকৃষ্ট জাহাজ তৈরী হত। মালবাহী জাহাজের বেশ

কিছুটা উন্নতি হলে তবেই রণপোত গড়ে তোলা সম্ভব; দু'টোর মধ্যে কলাকৌশল ও নৈপুণের বিস্তর ফারাক আছে। ভারতের রণপোতকে খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় সেই কলাকৌশল ও নৈপুণ্যের কতটা বিকাশলাভ ঘটেছিল। কারণ রণপোত মানেই ছোট ছোট যন্ত্রপাতী তৈরী করার অসংখ্য উদ্যোগপর্ব। তা থেকে শুরু ক'রে একেবারে জাহাজ তৈরীর কারখানা স্থাপনের বৈভব ও বিকাশের যে পরিপূর্ণতা—তা এ-দেশে ঘটেছিল বলেই ইতিহাসবেত্তাদের ধারণা; যদিও ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা জুড়েই এই ধারণা ক'রে নেওয়া সম্ভব, স্পষ্ট আকারে কোন সাক্ষী-সাবুতের সাহায্যে তা প্রমাণ করা দুরূহ।

এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ তাঁর বই, 'দি আউট্‌লাইন অব হিস্‌ট্রি'তে দেখিয়েছেন, আর্যরা সমুদ্রে নেমেছে অনেক পরে। আদি নাবিক বলতে আমরা সুমেরীয় বা হেমাইটেস্‌দের (Hemites) বুঝি। সেমেটিক লোকেরা এই পথিকৃতদের পথেই এগিয়েছিল। সুমেরীয় জাহাজ খৃষ্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগে পারস্য উপকূল দিয়ে চলত, তার নজির আছে। তোর (Torr) তাঁর কিতাব, 'এনসিয়েন্ট সিপস'-এ বলেছেন, জাহাজ সৃষ্টি হয়েছে সেইসব সমুদ্রে যেখানকার জল অত বেশী উত্তাল নয়; যেমন ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর বা পারস্য উপকূলে। জাহাজ তৈরীর কলাকৌশলটা বহুদিন পর্যন্ত অত সমস্যা ছিল না, যত ছিল নোঙর করার সমস্যা। ওটা মাথার থেকে বেরুতে বহু বছর লেগেছে।

ভারতীয় পুরণো গুহা-চিত্র বা মন্দির স্থাপত্যে অতীত ভারত, মিশর ও অন্যান্য দেশে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। পশ্চিম এশিয়া ও রোমের বন্দরগুলির সঙ্গে ভারতীয় বন্দরগুলির মধ্যে যে প্রভূত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত, তার অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে। থিওফ্রাসটাস (Theophrastus) জানতেন, ভারতে সেগুন কাঠ দিয়ে জাহাজ তৈরী হয় এবং সেগুলি দু'শো বছরেরও বেশী চলে। আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ খৃষ্টাব্দে এক হাজার জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ঝিলম নদী থেকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। ভারতীয় জাহাজ-শিল্পীদের দিয়ে তিনি যে বহু জাহাজ তৈরী করিয়েছিলেন তার নজির আছে। ইউফ্রাটাস নদী দিয়ে সেই জাহাজগুলির যাত্রা নিশ্চয় দেখবার মত ছিল।

সমৃদ্ধ বন্দরই জাহাজ তৈরী ও তার বিকাশের নিদর্শন। রোমিলা

থাপার 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এ লিখেছেন, 'প্রথম শতাব্দীতে পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য সম্পর্কে একটা সামুদ্রিক ভূগোলের বই লেখা হয়—পেরিপ্লাস মারি ইরিত্রি (Periplus Marie Erythrae)। এ থেকে বাণিজ্যপথ ও বাণিজ্য দ্রব্যের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইথিওপিয়া থেকে ভারতে আসত হাতির দাঁত ও সোনা। ওখানে রপ্তানী করা হত ভারতীয় মসলিন বস্ত্র। আধুনিক জর্ডানের পেত্রা শহরে লোহিত সাগরের পথ ও পশ্চিম এশীয় পথগুলি এসে মিলেছিল। সাকোট্রা দ্বীপের ডায়োস্কোরাইডিস বন্দরে ভারতীয় জাহাজগুলি নিয়ে আসত চাল-গম, সুতীবস্ত্র ও নারী ক্রীতদাস। …পারস্য সাগরের দক্ষিণের শহরগুলি ভারত থেকে নিত তামা, চন্দনকাঠ, সেগুনকাঠ ও আবলুসকাঠ। …বহুকাল আগেই হয়ত সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা এই বাণিজ্য পথ ধরে সুমেরীয় সভ্যতার লোকেদের সঙ্গে ব্যবসা করছিল। সিন্ধু উপত্যকার আর একটি কর্মব্যস্ত বন্দর ছিল বারবারিকাম। এখান থেকে রপ্তানী হত মশলাপত্র, নীলা, মসলিন ও রেশমতন্তু এবং বৃক্ষজাত নীল। বারিগাজা (বর্তমান ব্রোচ) যাকে ভারতীয় সূত্রে ভরুকচ্ছ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি ছিল পশ্চিম উপকূলের সবচেয়ে পুরণো ও বড় আমদানী-রপ্তানী কেন্দ্র। এখান থেকে রপ্তানী হত মশলাপত্র, সুগন্ধি তেল, তেজপাতা, হীরে-নীলা, দামী পাথর ও কচ্ছপের খোলা। আমদানী করা হত ইতালী, গ্রীস ও আরবদেশের মদ, তামা, টিন, সীসা, মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। স্থানীয় রাজাদের জন্যে উপহার হিসেবে আসত সোনারূপোর গয়না, গায়ক বালক, ক্রীতদাসী, মদ ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র। কিছু কিছু অনুসন্ধানের ফলে এইসব বিভিন্ন বন্দরের আভাস খুঁজে পাওয়া গেছে।'

মালয় ও চীনগামী জাহাজগুলির যাত্রাপথের অন্যতম একটি বন্দর ছিল আরিকামেদু (পরিপ্লাসে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে 'পডুকে' বলে)। যে সমস্ত পুরণো রোমান মৃৎপাত্র, পুঁতি, কাঁচের জিনিস ও পোড়ামাটির মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে ধারণা হয় খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক পর্যন্ত রোমানরা আরিকামেদু বন্দরই ব্যবহার করত এবং দাম দিত স্বর্ণ মুদ্রায়। তখন ভারত থেকে ৫৫ কোটি রোমান মুদ্রা পরিমাণ মূল্যবান জিনিসপত্র রোমে রপ্তানী করা হত। ভারত পাঠাত দামী পাথর, বস্ত্র, বিলাসদ্রব্য, মশলাপত্র, ময়ূর, বানর ও কাকাতুয়া।

ম্যাকক্রিনডেল তাঁর 'এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' বইতে এক জায়গায় বলছেন, 'খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে স্ট্রাবো (Strabo) সমুদ্রগামী জাহাজকে গঙ্গায় ভিড়তে দেখেছিলেন এবং সেখান থেকে প্যালিবোথ্‌রায় (Palibothra)। এমন কি জাতকের কাহিনীতে বাংলার জাহাজ, কাশী হয়ে চম্পা (বর্তমানে ভাগলপুর) হয়ে দূরে পাড়ি দেবার কথা আছে। সেখান থেকে ধনসম্ভার নিয়ে যেত সুবর্ণভূমিতে। সমুদ্র-বাণিজ্য জাতক ও শঙ্খ জাতকে বিচিত্রগামী জাহাজের উল্লেখ আছে।' পেরিপ্লাসের কথায় বোঝা যায়, বাংলার জাহাজ কত বিচিত্রতর জিনিসপত্র নিয়ে যেত প্রথমে দক্ষিণ ভারতে এবং সেখান থেকে সিংহলের পথে। সেটা মাত্র প্রথম শতাব্দীর কথা। পেরিপ্লাস মন্তব্য করেছিলেন, 'সারা বিশ্বের দুয়ারে যাচ্ছে বাংলার জাহাজ।'

রোমিলা থাপারও বলছেন, 'দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সমুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। ঐ অঞ্চলের সাহিত্যে বন্দর-পোতাশ্রয়, বাতিঘর, শুল্ক বিভাগ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চোলরা নিজেদের জাহাজে ক'রে এদেশের জিনিসপত্র ভারত সাগরের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করত। তারা নানা ধরনের জাহাজ তৈরী করত। ছোট উপকূল অঞ্চলের উপযোগী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি লম্বা লম্বা কাঠ জুড়ে তৈরী হত বড় বড় জাহাজ। বড় জাহাজ যেত মালয় ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়। ঐতিহাসিক প্লিনীর মতে, সবচেয়ে বড় ভারতীয় জাহাজ ছিল ৭৫ টনের। অন্যান্য সূত্রে কিন্তু আরো বড় জাহাজের কথা পাওয়া যায়। পুঁথিপত্রে তিনশো, পাঁচশো এমন কি, সাতশো যাত্রীবাহী জাহাজেরও প্রচুর উল্লেখ আছে।'

এক-একটি শতাব্দীর বিস্মৃত স্মৃতি বহন করছে এক-একটি বন্দর (তার মানে জাহাজের উন্নতি ও বিকাশ)—যার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আসছে ভারতের সমৃদ্ধির ও তার পতনের ইতিহাস। এক সময় ছিল তাম্রলিপ্তি। ঐতিহাসিকরা বলেন, তাম্রলিপ্তি নামের মধ্যে শুধু যে বিশাল এক বন্দর বা সমৃদ্ধ সভ্যতা বোঝায় তা শুধু নয়, সারা ভারতের মিলনকেন্দ্র ছিল বাংলার এই কেন্দ্র। নানা জিনিসপত্র সারা ভারত থেকে এসে এখানে জড় হত, তারপর দূর দেশে পাড়ি দিত। তাম্রলিপ্তির নামের মধ্যে তাম্রের ব্যবহারে বাংলায় ব্যুৎপত্তির হয়ত ইঙ্গিত দেয়। হিউয়েন-সাঙ্‌ সপ্ত শতকে তাম্রলিপ্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছেন, 'তাম্রলিপ্তির লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী। লোকেরা কর্মঠ ও সাহসী কিন্তু রূঢ়াচারী।' তাম্রলিপ্তি যেন

সারা ভারতের বাণিজ্যের একটা এ্যম্‌পোরিয়াম্‌। 'কত বিচিত্র সব দ্রব্য, কত বিচিত্র ধনরত্ন ভূর করা হয় এখানে।' কথা-সরিৎ-সাগরেও তাম্রলিপ্তির প্রাধান্যের কথা উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে, তাম্রলিপ্তি ছিল ধনী বণিকদের ঘর। তারা দূর-দূরান্তে বাণিজ্য করত, যেন সুদূর লঙ্কায় ও সুবর্ণ দ্বীপে। সমুদ্রের হিংস্রলোলুপ রক্তচক্ষু দেখলে তারা ধনরত্ন ও বহু মূল্যের জিনিসপত্র সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে তাকে শান্ত করত—নিরাপদ সমুদ্র-যাত্রার এটাই ছিল তখন একমাত্র বিশ্বাস বা ভক্তি।

তাম্রলিপ্তি থেকে ভারতীয় জাহাজে বাণিজ্য করার তিনটে রুট ছিল। এটা বিচিত্র যাত্রাপথের ইঙ্গিত বহন করে। তাম্রলিপ্তি থেকে একটি রুট ছিল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে—সেইপথে জাহাজ যেত আরাকান উপকূল, বর্মা ও আরও দূরে। এই পথেই পড়ত সুবর্ণভূমি। অন্য আর একটি বাণিজ্যপথ ছিল মালয় উপদ্বীপ ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে। দ্বিতীয় শতকের এই রুটটার কথা প্টোলেমির (Ptolemy) জানা ছিল। তৃতীয় বাণিজ্যপথ ছিল কলিঙ্গ আর করোমণ্ডল হয়ে সিংহলের দিকে। এই পথের কথাই জাতক-কাহিনী ও পেরিপ্লাসের বিবরণীতে পাওয়া যায়। প্রাসিও (Prasioi) থেকে জাহাজে সিংহল পর্যন্ত যেতে তখন লাগত কুড়ি দিন সময়; পরে পাল-তোলা জাহাজের উন্নতি হওয়ায় সময় লাগত মাত্র সাত দিন।

পঞ্চম শতকে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। বিরাট একটা বাণিজ্য জাহাজে ক'রে তিনি চীনের দিকে পাড়ি দেন। সেই জাহাজটা প্রথমে আসে সিংহলে এবং সেই পথে নানা দেশ হয়ে সোজা চীন। তাঁর যেতে সময় লেগেছিল চোদ্দ দিন। ই-ৎ-সিঙের বিবরণী সপ্তম শতকের শেষাশেষি নাগাদ পাওয়া যায়। তাঁর মতে, ভারতের বাণিজ্য জাহাজ ক'রে তখন বহু চীনা পর্যটক ভারত থেকে চীনে এবং চীন থেকে ভারতে আসতেন। ভারতীয় জাহাজ শিল্পের উল্লেখ আছে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক পুঁথিপত্রে।

পড়তে খুব মজা লাগছে। নানা ইতিহাস টুকরো টুকরো ভাবে ছড়িয়ে আছে, তাদের যুক্ত ক'রে ঘটনার একটা মালা গেঁথে নিলে ভারতের সমুদ্র যাত্রা, তার সমৃদ্ধ বাণিজ্য ও সেই বীর যাত্রীদের নানা বিচিত্র ছবি ভেসে ওঠে। অবিশ্বাস্য সব গল্পের কাহিনী যেন। চোল রাজাদের সময়ে রাজারাজা প্রথম (৯৮৫-১০১৬) নৌ-জাহাজ নিয়ে সিংহল ও মালব্য দ্বীপ আক্রমণ করেন। রাজারাজা চেরা, মালদ্বীপ ও সিংহল জয় ক'রে বাণিজ্যের

সমৃদ্ধি চেয়েছিলেন যদিও অতটা সফল হন নি। সফল হলেও বেশী দিনের জন্য নয় তাঁর ছেলে রাজেন্দ্র ছিলেন আরও উচ্চাভিলাষী। তিনি রণতরী নিয়ে বাংলার পাল রাজাদের আক্রমণ করেন। সেই সময় ভারতীয় জাহাজ বাণিজ্য করতে যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, এমন কি দক্ষিণ চীন পর্যন্ত মালয় ও সুমাত্রার পাশ দিয়ে মলুকা হয়ে সেইসব ভারতীয় জাহাজ যেত। সেখানে তখন রাজত্ব করতেন শ্রীবিজয়া। তাঁর বণিকেরা দেখলেন, বাণিজ্যের এই রুটটা যদি অধিকার ক'রে নেওয়া যায় তাহলে তারা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হবে। এদের কাছ থেকে আক্রমণের বিপদ ঘনিয়ে এল। এদের জব্দ করতে চোল রাজাদের কাছে অনুরোধ করা হয়। রাজেন্দ্র রণতরী ও সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে এদের পরাজিত করেন।

ভারতীয় জাহাজ-শিল্পের সমৃদ্ধির পুরনো নজির আরও আছে। ১৮০১ সালেও বিচিত্র ও মনোরম সব জাহাজ কলকাতার বন্দরে শোভা পেত। অথচ ১৯০১ সালে অর্থাৎ একশো বছরের মধ্যে এত বড় একটা শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ব্রিটিশ শাসনের সুনির্দিষ্ট নীতির ফলে এতদিন ভারতীয় বন্দরে বিদেশী জাহাজে বিদেশী পতাকা উড়ছে। বাঁ-পাশে স্বাতীর ছোট্ট একটু বাংলায় মন্তব্য—বিচক্ষণ ইংরেজ জাতের তুলনা নেই। তাঁদের কল্যাণে বাংলার রণতরী আর রইল না বাংলার ভূষণ। আবার ইংরেজীতে টাইপ করা আরও কিছু তথ্য।

বিজয়দুর্গ, কোলাবা, সিন্ধুদুর্গ, রত্নগিরি, অঞ্জনবেল—এ সব বন্দরে মহারাষ্ট্রের সমরপোত নির্মাণের ডক ছিল। মহারাষ্ট্রের নৌ-সেনাপতি আংগ্রের-এর তত্ত্বাবধানে নির্মিত এক একটা জাহাজে, চারশো টন বা ৮ হাজার হন্দর পর্যন্ত মালপত্র বোঝাই করা যেত। ১৬ থেকে ৭৪টি বড় বড় তোপ এক একটি রণপোত সুসজ্জিত থাকত। অন্যতম নৌ-সেনানী আনন্দ রাও ধুলপের তত্ত্বাবধানে পঞ্চাশটি রণপোত ছিল। তাতে সুসজ্জিত থাকত তিনশোটা বড় বড় কামান। প্রত্যেক জাহাজে থাকত তিন থেকে চারশো জন সৈন্য। তারা বীরদর্পে যুদ্ধ করত। সেকালে ইংরেজ ও পর্তুগীজদের যেসব রণতরী ছিল, তাদের তুলনায় দেশের তৈরী জাহাজ শতগুণে উৎকৃষ্ট ছিল।

বোম্বাই-এর ডঃ ব্র্যাইস্ট নামে অন্যতম বিশেষজ্ঞ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে জাহাজ-শিল্পের সমৃদ্ধি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন 'দশ শতাব্দী আগেও জাহাজ তৈরীর যাবতীয় কৌশল ভারতের অজানা ছিল না। এখন

য়ুরোপের বিজ্ঞান যা করেছে তা হল সেই জাহাজগুলির আকার ও আয়তন বাড়ান।' 'The correct forms of ship—only elaborated within the past ten years by the science of Europe—have been familiar to India for ten centuries.' (*Ibid.*, *Notes on India* by Dr. Buist, Bombay)

লেফ্‌টঃ কর্নেল এ, ওয়ারকার ১৮১১ সালে তাঁর বই 'কন্‌সিডারেশন্‌স্ অন্ দি অ্যাফেয়ার্স অব ইণ্ডিয়া'তে বলেছিলেন, 'গ্রেট ব্রিটেনের নৌবহরের জাহাজ বারো বছর চলে। তবে দেখা গেছে সেগুন কাঠে জাহাজ তৈরী হলে তা আরও অনেক বেশী দিন চলে—কম করে হলেও পঞ্চাশ বছর বা তারও বেশী। বোম্বাই-এর তৈরী অনেক জাহাজ চোদ্দ-পনেরো বছর চলার পর (ব্রিটিশ) নৌবহর কিনে নিয়েছে। সেগুলি এখনও দিব্যি মজবুত।' স্যর এডওয়ার্ড হিউজ একটি ভারতীয় জাহাজ 'ইণ্ডিয়ামানে' করে কম্‌সে-কম্ বারো বার সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা যতদূর জানি য়ুরোপের তৈরী কোন জাহাজই ছয়বারের বেশী দূরপথে যাত্রা করতে পারে না। তাছাড়া ভারতীয় জাহাজের আরও একটা গুণ আছে; মজবুত তো বটেই, তৈরী করতেও খরচ কম। বিলেতে একটা জাহাজ তৈরী করতে এক হাজার পাউণ্ড লাগে আর এদেশে মাত্র ৭৫০ টাকায় তারচেয়ে চারগুণ বেশী ভাল জাহাজ তৈরী করা সম্ভব। এত বেশী ব্যয় করেও ইংল্যাণ্ডের জাহাজ বারো বছরের বেশী চলে না। আর ভারতীয় জাহাজ হেসেখেলে পঞ্চাশ বছর চলে যায়। যদি ভারত সরকার এদেশে জাহাজ তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন, তবে ইংলণ্ডের নানা দিক থেকে লাভ হবে এবং খরচও কম পড়বে।' আবার স্বাতীর একটা সাইড মন্তব্য—তাহলে যে এদেশের মানুষেরা একটু খেয়েপরে বাঁচত। ইংল্যাণ্ডের রত্নসম্ভার ফুলে-ফেঁপে উঠবে আর এদেশের লোক হাতের শিল্প নিয়ে, স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম নিয়ে খেয়েপরে বাঁচবে—দুটো এক সঙ্গে কী করে হয়?

কর্নেল ওয়ারকারের দূরদর্শী প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয় নি। কেন মেনে নেওয়া গেল না তারও ঐতিহাসিক কারণ আছে। মিঃ টেলার, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' বইতে লিখেছেন—'ভারতের তৈরী কতগুলো জাহাজ লণ্ডন বন্দরে এসে ভিড়লে সেটা (একসময়) চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। লণ্ডন পোর্টের জাহাজ নির্মাতারা আতঙ্কিত হয়ে ব্যাপারটাকে একটু বেশী দূর টেনে নিয়ে

গিয়েছিল। তারা ঘোষণা করল (ভারতীয় জাহাজকে আরও বাড়তে দিলে) তাদের নিজেদের ব্যবসা পতনের মুখে গিয়ে পড়বে এবং ইংল্যাণ্ডের যেসব পরিবার জাহাজ তৈরী করে নিজেদের পেট চালায়, এবার তারা না খেতে পেয়ে মরবে।' বিলেতের জাহাজী শিল্পীদের এই অযথা চিৎকার, আর্তনাদ ও আন্দোলনের ফলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরবর্তী নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। স্বাতীর আবার মন্তব্য, বিলেতের জাহাজ শিল্পীদের মঙ্গল চিন্তায় কোম্পানীর অধিকর্তাদের রাতের ঘুম ছুটে যায় আর কি! শুরু হল শয়তানী।

প্রথমে দেখা দরকার ভারতীয় শিল্পীরা এত ভাল জাহাজ তৈরী করত কী করে। শুরু হল কোম্পানীর অধিকর্তাদের অনুসন্ধান। কি কি উৎকৃষ্ট উপকরণ তারা ব্যবহার করে? সেগুলি যদি বিলেতে পাঠান যায়, তবে ভারতের কৌশলবিদ্যা ও ইংল্যাণ্ডের প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয় ঘটিয়ে আরও উৎকৃষ্ট জাহাজ তৈরী করা সম্ভব। তখন থেকে ওক্ কাঠে বিলেতের জাহাজ তৈরী করা বন্ধ হল এবং লক্ষ লক্ষ মণ সেগুন কাঠ এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী হতে থাকল। তার ফল তো শুভই হয়েছিল। স্বাতীর মন্তব্য। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল সেগুন কাঠই যাচ্ছে, জাহাজ আর তৈরী হচ্ছে না। শেষকালে জাহাজ তৈরীর বিদ্যেটাও একদিন দেশ থেকে লোপ পেয়ে গেল।

পরবর্তী চুয়াল্লিশ বছরের হিসেব নিলে এদেশে জাহাজ-শিল্পের অবনতির হিসাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালে ভারতে পণ্যবাহী নৌ-জাহাজের সংখ্যা ছিল ৩৪২৮৬। ১৯০১ সালে (ব্রিটিশ সুকৌশল নীতির ফলে) এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় হাজারখানেকে। জাহাজের সংখ্যা শুধু যে কমে যেতে লাগল তাই নয়, এত দীর্ঘদিনের জাহাজ-তৈরীর ঐতিহ্যের ফলে যেসব জাহাজী কারীগর গড়ে উঠেছিল, তাদের কোন কাজে লাগান হল না। কষ্টে আর দুর্দশায় তারা একদিন শেষ হয়ে গেল।

স্বাতী আর লেখে নি, কারণ লেখার মত আর বোধহয় মুড ছিল না। এর পর দেখছি মনের অবস্থাটা বাংলায় লিখে রেখেছে। থিসিসের আবেষ্ঠন থেকে ছাড়া পেয়ে রাগ আর দুঃখ যেন আরও ফেটে পড়েছে। লিখেছে—'এসব পড়লে বা ভাবলে গা-টা রি-রি করে। কখনও ব্যথা, কখনও অশান্তি আবার কখনও-বা প্রচণ্ড ঝড় ওঠে মনে। দাদাভাই নরৌজি, বাংলার আই, সি, এস, রমেশচন্দ্র দত্ত আর গোণাগুণতি দুএকজন ছাড়া, দেশের কোন

দুর্দশাতেই কেউ প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসে নি। বাস্তবিক, ইতিহাস খুঁটিয়ে পড়লে এটাই ধারণা হয় দেশের প্রকৃত অবস্থাটা স্পষ্ট ভাষায় ও ব্যক্তিত্বে ব্রিটিশদের সামনে তুলে ধরতে পারে, এমন লোক সেদিন ছিল কিনা সন্দেহ। মহামান্য কিছু সাহেব নির্ভীক চিত্তে দেশের স্বার্থ ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যেসব স্পষ্ট উক্তি ক'রে গেছেন, সেগুলিই এখন আমাদের কাছে একমাত্র তথ্য এবং সেগুলির সাহায্যেই দেশের প্রকৃত চিত্রটা পাওয়া যায়। কারুর কলি-জার জোর ছিল না বলেই বোধহয় ওরা আমাদের 'নেটিভ' বলত। মহামান্য কিছুলোক সেদিনও ছিলেন, আজও যেমন কলকাতায় আছেন ; কিন্তু সেদিনও তাঁরা থাকতেন পর্দার আড়ালে, আজও তেমনি। বাকি যারা, তারা তামাক খেতে খেতে, মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঠোঁট উল্টে, চোখ দু'টো ঘুরিয়ে এই স্লেভ-বিলাসী 'নেটিভ্'দের গালাগালি দিয়ে এবং সাহেবদের সব রকমে এবং দেশীয় কায়দায় মনোরঞ্জন ক'রে যে হিনমন্নতার পরিচয় রেখে গেছে, তা অতুলনীয়। আসলে শিক্ষায়-দীক্ষায় সমৃদ্ধ হওয়া মানে ত একটু ইংরেজী বলতে পারা নয়—সেটা সেদিন সবাই ভুলে গিয়েছিল। আজও যেমনি ভাবে এরা একটু ইংরেজী বলতে-কইতে শিখে দেশটাকে কিনে নিয়েছে। আর ওদিকে যে কৃষক হারাল তার জমি, জমিদার ও তার পোষ্য-বর্গরা খাজনার নামে তাদের ঘরবাড়ি বেচে, উচ্ছেদ ক'রে, তাদের মেয়ে-বউদের ইজ্জত লুটে, গ্রাম-কে-গ্রাম অকথ্য অত্যাচারের দামামা বাজিয়ে, নিজেরা হয়ে উঠল শহর-বিলাসী, আয়াসী ও ভোগী—সে খবর সেদিন কেই-বা রেখেছিল? সাহেবদের মুখে হাসি ফোটাতে অবশ্য কেউ 'কসুর্' করে নি।

'ইতিহাসের এই যে ফাঁকফোকর দেখছি, তাদের ঠিক মত চিনে নিয়ে অন্য ঘটনার সঙ্গে তার লিংকেজ্ খুঁজে পাবার আমার এই ব্যর্থ চেষ্টা কতদিন চলবে জানি না। অনেক কিছু তথ্য থাকলেই যে গুছিয়ে সুন্দর ক'রে লেখা যায় তা নয়—সেটাই আমি নতুন ক'রে উপলব্ধি করছি। কাউকে মুখ ফুটে এসব কথা বলতে বা লিখতে পারি না। তাই ভাবলাম মনের এই অবস্থাটা লিখে রাখি। তবে থিসিসের বাঁ-পাশে কেন লিখছি জানি না। হয়ত হাতের কাছে ডায়েরীটা নেই বা ডায়েরীতে লিখে রাখার মত মানসিকতা নেই কিংবা এও হতে পারে, এই মুহূর্তে অন্য কোন জায়গায় লিখতে বসার চেষ্টা করলে আর কোনকালেই হয়ত এসব মনের কথা লেখা হবে না—তাই।'

আরও কিছু হয়ত লিখত। কিন্তু এখানেই ছেদ পড়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে হয় কেউ ডেকেছিল কিংবা নিজেরই আর লিখতে ইচ্ছে করে নি।

স্বাতী বাধা দিল—কি অত মন দিয়ে পড়ছেন ? রাখুনতো।

আমি থিসিস্‌টা নেড়ে-চেড়ে বললাম—ভাল লাগছিল পড়তে। বিশেষ ক'রে তোমার শার্প মন্তব্যগুলি।

—অত জোরাল মন্তব্য দেখে ডঃ দাস খুব আমাকে কশাস্‌ ক'রে দিচ্ছেন। বলছেন, ইতিহাস দেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি থাকলে ইকনমিক্‌ হিসট্রির একটা অন্তর্মুখী ডাইরেক্‌শন্‌ বোঝা যায়। 'ন্যেভার বি ক্যারেড্‌ ব্যাই ইমোশ্যন্‌স্‌। খুব ক্ষতিকারক।' তিনি আরও কি বলেছেন জানেন ? বলেছেন, 'থিসিস্‌ লিখে তুমি বাঙালী জাতটাকে প্রডাক্‌টিভ্‌ এফার্ট শেখাতে পারবে এমন কথা স্বপ্নেও ভেবো না।' সত্যি ডঃ দাস ঠিকই বলছেন। মাঝে মাঝে বড় নিরাশ হয়ে পড়ি। এমন একটা সাবজেক্ট নিয়েছি, যা সমস্ত কিছুর সঙ্গে এক নিগূঢ় যোগসূত্রে আবদ্ধ। বুঝলেও বোঝান শক্ত। কোথাও যেন আটকে যাচ্ছি। বলেই স্বাতী গম্ভীর হল। বিষাদে বা অক্ষমতায়, ঠিক বুঝলাম না।

—আটকে তো যাবেই। কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। তবে একটা কথা তোমাকে বলি ঃ ইতিহাসের সত্যমূল্য বাঙালীদের একদিন দিতে হবে—তুমি দেখো।

শব্দ ক'রে হাসল স্বাতী—আমার থিসিস্‌ পড়ে একজন অন্তত ইন্‌স্পিরেশন্‌ পাচ্ছেন এবং এখন তিনি বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছেন—এটা আমার পরম ভাগ্য।

আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম। বলাম—বক্তৃতা নয় স্বাতী, বিশ্বাস। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। ধরো, মাও, ত্রিশ বছর ধরে শুধু চীনের ইতিহাস, ভূগোল, মানুষ ও শিল্পের স্ট্রাটেজী নিয়ে শুধু যে ভেবেছেন তাই নয়, রীতিমত এক্‌স্‌পেরিমেন্ট ক'রে গেছেন। তবেই চীন এতটা এগিয়েছে, আজ সে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মাও-এর পথ ধরে চারু মজুমদার সত্যিই কী বেশীদূর এগোতে পারলেন ? তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও রেড আর্মি গড়ে তোলার মৌলিক সার্থকতাটুকু পর্যন্ত ধরতে পারলেন না, মূল্য দেবেন কি। যখন বুঝেছিলেন, তখন ভুল সংশোধন করার সময় আর নেই।

স্বাতী বলল—এখানেই আসে ইতিহাস-চেতনা বা ট্রাডিশন্। তোষামোদ-প্রিয়তাই আমাদের ট্র্যাডিশন। আপনি হয়ত মানতে চাইবেন না, কিন্তু তোষামোদ-প্রিয়তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস ও ঘটনা যদি আপনার মাথায় থাকে, তবে বুঝবেন চারু মজুমদারের চারপাশে বিপ্লবী-ধ্বজাধারী মোসাহেবদের এত ভিড় বেড়ে গিয়েছিল কেন? এবং তিনি এত সহজে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন কেন? আপনি নিশ্চয় জানেন যখন অন্ধ্রপ্রদেশের নক্সাল বিপ্লবে বিপ্লবীরা লাগাতার পুলিশের ও মিলিটারীর হাতে মার খাচ্ছে এবং বিস্তর ধরপাকড় হচ্ছে—তখন তাঁরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে কলকাতায় এসে চারু মজুমদারের কাছে, পুলিশ ও মিলিটারীর কাছ থেকে গোলাগুলি ও বন্দুক কেড়ে নেবার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই অনুমতি দেওয়া হয় নি, কারণ চারু মজুমদার তখন ভাবছেন, সাবল আর কাটারী দিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়া যায় এবং যেহেতু বিপ্লব ঘরের দুয়ারে, বিপ্লব আর একটু চালিয়ে গেলেই সিদ্ধি। বাঙালীর কত দূরদৃষ্টির অভাব—একবার ভাবুন। বলেই স্বাতী থেমে গেল। বলল—আমিও বক্তৃতা শুরু ক'রে দিলাম, না?

আমি বললাম—চলো, বেরিয়ে পড়ি।

—স্বাতী বলল—চলুন। আপনি বরং ততক্ষণে বাবার সঙ্গে একটু কথা-বার্তা বলুন, আমি তৈরী হয়ে নি।

ব্রজেশবাবু কি একটা বই পড়ছিলেন—বোধহয় রাজশেখর বসুর 'মহাভারত', হেসে মাথা তুললেন—কিরকম বুঝলে?

তিনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্বাতীর থিসিস্‌্রে ব্যাপারে যদি তিনি জানতে চান, আমি মন্তব্য করার যোগ্য ব্যক্তি নই, তাছাড়া এই নিয়ে দশটা চ্যাপ্টার মাত্র পড়েছি। তবে এই থিসিস্-কে কেন্দ্র ক'রে আমার মনেও একটু রঙ ধরেছে কিনা, সেটা যদি উনি জানতে চান, প্রথম কথা আমি বলব না কারণ ইমেজ্-রক্ষার ব্যাপারটা আমি বুঝি। তাছাড়া আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করেন বাঙালী বিবাহিত পুরুষদের দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়তে নেই। সমাজ ছি-ছি করে।

তাই বললাম—কোন্‌টা?

—এই যে স্বাতীর থিসিস্?

—আমি কি ক'রে বলবো? মন্তব্য করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে ডঃ দাস যখন উৎসাহ দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু পাচ্ছেন—

—ডঃ দাসও যে ওরকম মানুষ, সবসময় বাজারদর বুঝে কথা বলেন না। এত ক'রেও শেষ পর্যন্ত যদি কিছু না হয়, কষ্ট হবে। আমার যেমন অনেক কিছু করার সখ ছিল, চেষ্টা ছিল উদ্যম ছিল, কিন্তু কিছুই হল না। এখন মহাভারতের মধ্যেই ডুবে থাকি।

আমি ভরসা দিলাম—ভাল কাজ এত সহজে স্বীকৃতি পায় না। তবে কোন কিছু ফেলা যায় না মাষ্টারমশায়, ওটুকুই বুঝি। (আমি কিছুদিন 'ব্রজেশবাবু' ডাকছিলাম। দেখলাম নিজের কানেই কথাটা লাগছে। তারপরে ডাকতে শুরু করলাম 'মেসোমশায়'। স্বাতী তা শুনে একদিন মুচকি হাসল। তখন আমার খেয়াল হল, মাসিমা-মেসোমশায় ডেকে তাঁদের আপন ক'রে নেবার ছলে যেসব তরুণ কলেজে-পড়া মেয়েদের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যায়—সেই বয়স আমার নেই। তারপর থেকে মাষ্টামশায় ডাকতে শুরু করেছি। এই সম্পর্ক পাতাবার কোন চেষ্টাকেই অবশ্য ব্রজেশবাবু হেয় চোখে দেখেন নি ; দিল্লীর মানুষদের একটু অন্য টাইপের সরল-বুদ্ধি, ওরকমই হয়ত কিছু ভেবে নিয়েছেন তিনি। দিল্লীর লোক বলে আমি নানা কারণে বেঁচে গেছি।)

ব্রজেশবাবু বললেন—তাই তো আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। বিদ্যেটা বাবা, অনেক কষ্টে আয়ত্ত করতে হয়—জীবন দিয়ে বুঝেছি। আজকালতো আবার ডক্টরেটের ছড়াছড়ি। তার মধ্যেই আবার ভাল-মন্দ আছে বইকি কি বল বাবা! আমি অবশ্য নিরাশ হই না। শক্ত সাবজেক্ট্ নিয়েছে তো—তাই বুঝতে পারছি হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। আচ্ছা দেখোতো বাংলা বা ভারতের তরী ছিল কিংবা নেই, তরী ডুবলে সে কি কারুর খেয়াল থাকে? তবুও খেয়াল করতে হয়—সব ইতিহাস যদি আমরা ভুলতে দি—বাঙালীর আর উঠবার কোন উপায় থাকে না। কি বল অমরেশ?

আমি মাথা নাড়লাম।

স্বাতী এসে বলল—বাবা, আমি অমরেশদার সঙ্গে বেরুচ্ছি। মা এলে বোল, অমরেশদাই আমাকে পৌঁছে দেবেন মা যেন কোন চিন্তা না করে।

আমি আবার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

॥ বারো ॥

স্বাতীর হাত ধরে আমি অনেক হেঁটেছি। আজও হাঁটছি। অনেকটা নাটোরের বনলতা সেনের রোমান্টিকতার মত। কখনও রূপসা নদীর পার দিয়ে হেঁটে গেছি দিগন্তের নবযৌবনের পারে—যেখানে বটবৃক্ষে আলো-ছায়া খেলা করে জীবনের রঙ ছড়িয়ে, যেখানে নবযৌবন রোদের ঝলকানিতে বিষাদ-মুখর হয়ে নড়েচড়ে ওঠে—যেখানে স্বাতীর আকাঙ্খার চেয়ে আমার ছড়ান-ছিটান দাবী প্রতিশ্রুতির মত আশ্বাস দেয়।

রূপসা নদীর রৌদ্র-ছায়ায় স্টীমারটা এসে দাঁড়িয়েছিল। বহু দূরে নিয়ে যাবে বলে ছোটবেলায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে প্রতিশ্রুতি রাখে নি। এক্ষুনি ভোঁ-পা শব্দ তুলে আমাকে না নিয়েই স্টীমারটা দূর দেশে পাড়ি দিল। রূপসা নদীর ঢেউ রাজধানীর মরুভূমির মাটিতে সব শুকিয়ে গেছে। যে একদিন গাছে গাছে, ফলে-ফুলে, পুকুরের পাড়ে, পুকুরের পাশে ভুর-করা ধানের শীষের ঘ্রাণ ও আশ্বাস নিয়ে ফিরত—প্রাণোচ্ছ্বাসের সেই দাপট আর নেই। পূর্ব বাংলার ছেলে দিল্লীতে এসে পরবাসী হয়ে গেছে।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাবেন ?

স্বাতীর কথায় রূপসা নদীর সেই স্টীমারের ভোঁ-পা শব্দ আবার যেন শুনতে পেলাম। মধ্য বয়সে রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি, ওকে নিয়ে যে আমি কোথায় যাই, জানি না। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি-পলিটিক্যাল করাপ্‌শন্‌-মস্তানী-দুর্নীতি এবং অনিশ্চিয়তায় ভারতবর্ষের এই প্রচণ্ড দুঃসময়ে, স্বাতীর মত রত্নকে সুরক্ষিত রাখতে পলিটিক্যাল 'দাদাদের' হাত ক'রে পুলিশকে মোটা রকমের ঘুষ খাওয়ান উচিত ছিল কিনা, বুঝে উঠতে পারলাম না। মানুষের জন্যও বোধহয় একসময় 'লকার' দরকার হবে।

স্বাতীর হাতটা শক্ত ক'রে ধরে আছি ; কোন প্রতিশ্রুতি আর হাত-ছাড়া হতে দেব না। স্বাতীকে নিয়ে আমার সঙ্কল্পের মুহূর্তে কাজলের আহত মুখ দেখতে পাচ্ছি। সেদিন দীপার চিঠি পেয়েছি, লিখেছে—'তুমি কবে আসবে বাবা ? অনেকদিন তোমাকে দেখি না। তোমাকে না দেখলে আমার বড়

কষ্ট হয়।' ওদের ছেড়ে এসেছি অনেকদিন; ওদের দেখার জন্য বুকটা টন্‌টন্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি এক রাস্তা পেরিয়ে অন্য রাস্তায়, মানুষের পাশ দিয়ে করিডোরের ছায়ায় আমি কাজলের মুখ ঢাকতে চাইলাম। কিন্তু কার ঘ্রাণে বা স্পর্শে আমি ইদানীং বয়স লুকতে চাইছি, কার জন্য আমার এই তন্ময়তা—কি এক অদৃশ্য কারণে কাজল যেন সব টের পেয়েছে। কাজলের শীতল ছায়া আমাকে যেন ঘিরে থাকে, আড়াল ক'রে রাখে। তখন ভাবতে থাকি, আমি যেন মস্ত বড় এক জমিদারের সুযোগ্য সন্তান এবং অদৃশ্য বন্ধনে তাঁরই সুযোগ্য বংশধর। অনেক রাতে টাল্‌মাটাল্ অবস্থায় বাড়ি ফিরলেও হয়, না ফিরলেও চলে; রাস্তার গলি আর ঘরের মায়া রঙিন নেশায় একাকার যেন। গভীর রাতে আমারই পদক্ষেপ বা পদস্খলনের জন্য কাজলের তখন অনন্ত প্রতীক্ষা। আমি বুঝি কে যেন আমাকে প্রলুব্ধ করে, আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধে—আমি আর থাকতে না পেরে বাগানবাড়িতে ধাওয়া করি, ঘ্রাণ নিই, সহবাস করি, টাকা ওড়াই, সোনালী তৃষ্ণায় অবগাহন করি, গান শুনি আর উন্মত্ত হই। কৃষ্ণনগরের কোর্ট-কালচারের এক রাতের দৃশ্য আমার মনে ভেসে ওঠে—এক রাতে এক রাজবাড়িতে এক অপূর্ব রূপসী রাতের অতিথিদের গান শুনিয়ে একেবারে বিমোহিত ক'রে দিয়েছিল। সুরা পান ক'রে সবার হৃদয় তখন বড় উদার, বড়ই প্রফুল্ল ছিল। কেউ একজন প্রস্তাব করল, এই রমণী সুন্দর খেমটা নাচতে পারে। তখন সেই সুন্দরী একটা কালপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরে অবতীর্ণা হলেন। কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ—সবাই তার নৃত্যে বিমোহিত হলেন—তাঁদের ঢুলু-ঢুলু চোখে মনে হল যেন 'স্বর্ণ বিদ্যাধরী' অবতীর্ণা হলেন।

বাংলার কোন শিল্প আমার হাতে কেন গড়ে ওঠে নি, আমি যেন ঠিক ধরতে পারি; আমার অত্যাচারের কারণগুলি স্পষ্টতর হয়। ঢুলু-ঢুলু চোখে, ছলে-বলে-কৌশলে আমার বিশ্বস্ত লোকলস্কর দিয়ে কৃষকদের ঘটি-বাটি-বিছানা-বউ আর তার ইজ্জত লুটেছি কেন, —কেন আমি এত নিষ্ঠুর, এত কঠিন, ক্ষিদের জ্বালায় মানুষ চোখের সামনে মরতে দেখেও কেন আমার খাজনা মকুব ক'রে দেবার কথা মনে হয় নি, নিজেকে দেখে নিজের সুযোগ্য পূর্বপুরুষদের আমি যেন ঠাহর করতে পারি। কারুর কথা আমি এতটুকু ভাবি নি, কারুর জন্যে বুকের পাঁজর আমার টন্‌টন্ করে নি। যে ভোগী, সেই প্রকৃত যোগী—বাউল বেশধারী এই কথাটা সমাজের কাছে প্রমাণ করার

জন্যই আমি নবকৃষ্ণের মত মায়ের প্রতি ভালবাসা দেখাতে মায়ের শ্রাদ্ধে ১৯ লক্ষ টাকা উড়িয়েছি আর আমার ছেলে রাজকৃষ্ণদেব মুসলমান বাইজীর জন্য মসজীদ গড়ে দিয়েছে। মন্দির-মসজীদ গড়ে আমি বহুজনের মঙ্গল করেছি, মা। আমার পাপ-টাপ একটু ক্ষমা ক'রে দিস্ মা—তোকে জ্যান্ত পাঁঠা বলি দেব। কাজল যেন সুখে থাকে মা, অতি এ্যালিভেটেড্ বউ, খেয়াল থাকে যেন, মাগো! সেই টাকা কোথা থেকে আসে? দাওয়ায় বসে কোন্ কৃষকের বউ কাঁদে?

স্বাতীকে নিয়ে আমি তখন কলকাতার ভিড়ের মধ্যে হাঁটছি। রাস্তায় চলতে পারছি না; এই যে কলকাতার এই নাভিশ্বাস—এর জন্যে দায়ী কে? মন্দির আর ঘাট ছাড়া আর যে কিছু করি নি ওটুকুই আমার কীর্তি। প্রয়োজনে কলকাতাকে শুষে নিয়েছি, কিন্তু প্রতিদানে আমি কী কিছু দিয়েছি? স্বাতীকে আমি কোথায় নিয়ে যাব বুঝে উঠতে না পেরে এসব কথাই ভাবছিলাম। যেখানে যাই, লক্ষ লোক আমার পেছনে ছোটে। রাস্তায় ভিড়, রেস্তোরাঁয় ভিড়, ক্লাবে জটলা, বাসে-ট্রামে-বাড়িতে ধর্‌ধর্‌-মার্‌মার্‌-কাটকাট। আর ওদিকে আমারই টাকায়, পশ্ হোটেলে ক্যাবারের নগ্ন নৃত্য—আমার ঘরের আশেপাশে ঘোষ-বোস-মল্লিকদের ভিড়। ভীরু মনের আয়নায় তখন আমার স্বাতীর নগ্ন স্কালপ্চার দেখার লোভ—। অথচ কি আশ্চর্য, আমারই অবহেলায় ও দুষ্কর্মে স্বাতীকে নীরবে ও নিরালায় নিয়ে যাবার সূচাগ্র জায়গা নেই কলকাতায়।

স্বাতীর অনুমতির আদেশ না ক'রে আমি ওর ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে বলের মত চেপে ধরেছি। হাতের স্পর্শে ব্যাটারির মত চার্জ ক'রে রেখেছে সমস্ত সত্তা অথচ যেখানে যাই, লোকের ছায়া, আমার ছায়া, আমার বুকের ভেতরে বিবেকের ছায়া। স্বাতী পাশাপাশি হাঁটতে পারছে না—ক্লেদাক্ত ভিড়ে ঘন ঘন ছিট্‌কে পড়ছি, আর তারই ফাঁকে স্বাতীর খরস্রোতা শরীরের ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম আমি।

বহু মানুষের কৌতূহল অগ্রাহ্য ক'রে তখন রেস্তোরাঁর এক কোণে নিরালায় এসে বসেছি। চারিদিকে তরুণ-তরুণী—হাত ধরাধরি ক'রে হাত-পা—শরীরের ঘ্রাণ নিচ্ছে, বিবেকের টুটি চেপে ধরে স্পর্শকাতর শরীরটা এগিয়ে দিচ্ছে নাটকীয় ভঙ্গীতে। এখানেও নিরালা কোন কোণ নেই; লোকজন আসছেই, তরুণ-তরুণী আসছেই—তাদের মুখরিত হাসি শুনতে পাচ্ছি।

একজন তরুণ অন্য তরুণীকে জড়িয়ে ধরল গভীর ভালবাসায়। বসতে বসতেই টের পেলাম—তরুণী বাধা দিচ্ছে—এই যাঃ, কি করছ? বুঝতে পারলাম, তরুণীর বাঁধ ভাঙ্গছে সাহসী তরুণ। কেউ আবার তর্ক করছে—চীন-ভিয়েৎনাম-রুশ-অফগানিস্থান নিয়ে। কেউ-বা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ছুঁয়ে ইমপিরিয়ালিজম্ হয়ে বর্তমান বিপ্লবের অবস্থা নিয়ে তর্ক করছে, পাল্টা যুক্তি দিচ্ছে চিৎকার ক'রে। এরা দু'দণ্ড আমাকে অবসর দেবে না, —এমন এদের তাড়া।

স্বাতী জিজ্ঞেস করল—কি খাবেন?

সাহস পেয়ে বললাম—কাট্‌লেট্। স্বাতীর গায়ে লেগে বসেছি। হালকা নরম-গরম একটু স্পর্শে তখন আমি একটু যেন বিহ্বল। শরীরে কোন অদৃশ্য জমিদারের রক্ত যেন টগ্‌বগ্ ক'রে নেশা ধরায়। ভূত চাপে। স্বাতীকে আমি জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে চাইলাম। আমার মত সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড পুরুষের শরীরে ওর বোধহয় অরুচি। ততক্ষণে আশেপাশের অনেক তরুণ-তরুণী চুমু খাচ্ছে—আমি বেশ টের পাচ্ছি। ঘাড়ে মুখ গুঁজে—হাতে-বুকে হাত রাখছে। বুকের স্পর্শে তারা যখন নস্‌টাল্‌জিয়ার স্নিগ্ধ আবেশে অধীর, আমি তখন স্বাতীর শত যোজন দূরে বসে ভদ্র ও গম্ভীর হবার চেষ্টা করছি।

আমার সংযম দেখে নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। কিংবা এও হতে পারে, স্বাতী আমার সংযমের পরিচয় পেয়ে হয়ত রীতিমত ইমপ্রেসড্। পরিবেশের যা এফেক্ট, জোর ক'রে স্বাতীকে চুমু খেলে কিছু হয়ত বলত না; কিংবা কে জানে, ও যা মেয়ে, সাপের মত হয়ত ফোঁস ক'রে উঠত। হয়ত বলে উঠত—কি করছেন? চারপাশে ভালবাসার ছড়াছড়ি দেখে কী ভালবাসতে ইচ্ছে করছে? কী উত্তর দিতাম? স্বাতী আমাকে বড় বিশ্বাস করেছে। সেই বিশ্বাস দায়িত্বহীনের মত ভাঙ্গলে ওর কী অ্যাটিচ্যুড্ হবে ঠিক ধরতে পারছি না। তাই নপুংসকের মত মনে মনে স্বাতীকে আমি ঘন ঘন চুমু খেতে থাকলাম। আর ঠিক তখনই খেয়াল হল, স্বাতী কমলা রঙের একটা শাড়ী পরেছে, কপালে কমলা রঙের টিপ। মনের অসংখ্য রূপসা নদীর ঢেউ স্বাতীর খরস্রোতা শরীরের প্রবাহে আছাড় মারে। আমি তখন (কড়া শাসনে) অক্টোপাসের হাতগুলির সঙ্গে ভেতরে ভেতরে অবিরত যুদ্ধ ক'রে চলেছি। আশেপাশের অর্থপূর্ণ শব্দ আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচল বিহ্বলতা আমাকে প্রতি মুহূর্তে বিহ্বল ক'রে রেখেছিল। আমি গম্ভীর হয়ে নিজের

জান ও মানকে স্টিয়ারিং ক'রে প্রতিটি দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এড়িয়ে চলছিলাম।

স্বাতী জানতে চাইল—অন্যমনস্ক হয়ে কী অত ভাবছেন?

যা ভাবছিলাম তা ওকে কোনদিন বলা যাবে না। কনডাক্ট রুলে পড়ে যাব। চাকরী যাবে।

ততক্ষণে আমি মন দিয়ে কাটলেট খাচ্ছি এবং স্বাতীর গা ঘেঁসে। আমাকে ও বাধা দিচ্ছে না। হালকা মেজাজে কথা বলছে। মাঝে মাঝে হাসছে। চোখের তারায় আলো ছড়াচ্ছে।

—কিছু বলবেন—? স্বাতী যেন এ পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল।

—কি বলব? খুলনার সেই স্টীমারটার কথা?—যে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোন প্রতিশ্রুতি রাখে নি?

স্বাতী আবার উৎসাহিত হয়ে উঠল—তারপর? জীবনের নস্‌টাল্‌-জিয়াকে স্বাতী দেখছি খুবই মূল্য দেয়।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আবার কেউ যেন চুমু খেল। এখানে কী নস্‌টাল্‌জিয়ার কথা বলার অর্থ হয়? ভেতরে ভেতরে আমি অশান্ত হয়ে উঠলেও বললাম—সেদিন রূপসা নদীর ঢেউ দেখতাম আর ভাবতাম—বলেই থেমে গেলাম। বেশ বুঝতে পারছি ভেতরে অত ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়লেও বাইরে আমার শীতল চাহনী—বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসে আছেন যেন।

আমার অশান্তির কারণ স্বাতী কী টের পেয়ে গেল? আমি চাইছিলাম, ঘরে ঘরে এই যে অবক্ষয়, এই নিয়ে স্বাতী এই মুহূর্তে দীর্ঘ একটা লেকচার দিক। মানুষের বিবেক যখন মরে যায়, যখন কোন রকম ইনহিভিশন্‌ আর থাকে না—তখন থেকেই কী অবক্ষয়ের জন্ম?

স্বাতী বলল—কী, থেমে গেলেন যে!

—না, বলছি। তবে কী জান, সেদিন এমন একটা অপূর্ব পরিবেশ ছিল যে খুলনার স্বপ্নময় দিনগুলো যেন ছবির মত ভেসে উঠছিল—কিন্তু এখানে? —কথাটা শেষ না ক'রে ওর হাতটা টেনে নিলাম অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়ে।

আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম—অনেকটা যেন মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যাবার মত—তুমি কী কাউকে ভালবাস স্বাতী?

আমার মুখের দিকে স্বাতী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না। খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। কথাটা জিজ্ঞেস করা হয়ত উচিত হয় নি। হয়ত ও কথা আমার মুখে সাজেও না। অনুগত স্বামী আমি, একমাত্র কাজলকে ছাড়া কাউকে আমার ভালবাসা উচিত নয়। অন্তত সমাজের চোখে সেটা শোভনীয় নয়। রীতিমত নিন্দনীয়।

আকাশের মত স্বাতীর মুখে প্রতিমুহূর্তে যে রঙ পাল্টাচ্ছিল—তা আমি লক্ষ্য করছি। ঐ মনে হল, বড় রহস্যজনক ওর মুখ, দুর্ভেদ্য ওর চিন্তা, রহস্যজনক ওর ঐ তাকানোর ভঙ্গীটা। বোঝার ক্ষমতা থাকলে হয়ত বুঝে নিতাম—চোখের ঐ দৃষ্টিতে অনুরাগের কুঁড়ি ফুটেছে; ফুলে রঙ ধরেছে। কলকাতার মানুষ হলে ভালবাসার এই দৃষ্টিকে ঠিক চিনে ফেলতাম। ঠোঁটে চুমু খেয়ে ফুলের রঙ ধরাতাম। কিন্তু দিল্লীর লোক কলকাতার অন্দর মহলে যেতে সাহস পায় না।

তবুও মনে তখন একটা বিশ্রিরকম জেদ চেপেছে। আবার জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কাউকে ভালবাস না, স্বাতী?

স্বাতী আমার দিকে এবারও তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিল না।

—কি, বলবে না?

—চারিদিকে যেরকম ভালবাসা নিলামে বিক্রি হয়, বিশ্বাস করুন, ওরকম কিছু আমি চাইলে আমার সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারত না। তবে কোথায় যেন বাধে, এটা ঠিক মেনে নিতে পারি না।

—তবে তুমি কিরকম ভালবাসা চাও? আমি ওর হাত ছেড়ে দিলাম। ভাবলাম, চারিপাশের এইসব তরুণ শিভ্যালরাসদের সঙ্গে স্বাতী আমাকে না আবার এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত ক'রে বসে। তাতে আমার প্রেসটিজ্ খোয়া যাবে। কথাটা ভেবে আমি বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম।

তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিতে দেখে স্বাতী একটু মুচকি হাসল, বলল—এদের সঙ্গে কম্পিটিশনে আপনি কিন্তু পেরে উঠবেন না, আপনি সোজা হয়ে বসুন।

স্বাতী আবার দু'টো কফির অর্ডার দিয়েছে। আমার খেয়াল ছিল না, যারা এখানে রোজ আসে-যায়, তাদের দলে আমরা নই। এখানকার নিয়ম অনুসারে কফির দাম খুব বেশী—যথাসময়ে তারুণ্যের খেসারত দিয়ে যেতে হয়।

কফি এল। কফিতে চুমুক দিয়ে মনটা অনেক হালকা লাগছে। অনেকগুলো চিন্তা মাথায় ঘুরছিল। খুব রিলিফ্ পেলাম। যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়ল, অফিসে একবার যাওয়া জরুরী ছিল, আজকে আসামে ৩৬-ঘন্টা 'রাস্তা রোখো' আন্দোলন শুরু হয়েছে। লোকনাথবাবুকে আমি বলে এসেছি, উনি না দেখে বুলেটিনের যেন কোন নিউজ না ছাড়েন, তরল গুহ দেখে দিলেও, উনি যেন একবার দেখেন। রিটায়ারমেন্টের সময় হওয়ায় দিল্লীর ওপরে লোকনাথবাবুর আনুগত্য একটু যেন বেড়ে গেছে; তা ছাড়া যা দায়িত্বশীল, ঠিক করবেন, আমি জানি। তবু মনটা খচ্‌খচ্ করছিল। নানা দুঃশ্চিন্তায় স্বাতীকে নিয়ে নির্ভার হয়ে বসে থাকতে পারছি না বলে মনটা একটু অশান্ত হয়ে উঠল। পুরুষের কতগুলো দায়দায়িত্ব আছে যা ছারপোকার মত কামড়াতে থাকে, তখন মনের সহজ ভাবটা কেমন যেন খোয়া যায়। তবুও আজ এখুনি ছুটতে পারছি না; গোলামও স্বাধীন অবসর চায়। স্বাতীর সঙ্গে আমিও নাকি রিসার্চ করছি—এরই মধ্যে ঘোষ-বোস-চৌধুরী-মল্লিক মহলে আমি একটা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছি। আমাকে নিয়ে রীতিমত স্পেকুলেশন্ শুরু হয়েছে। লোকের গালাগালি বা পরনিন্দা আমি যে খুব একটা তোয়াক্কা করি, তা অবশ্য নয়; তবে অনেককেই ঠিক খোলাখুলি বলা যায় না, জীবনটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে আমার একটা আদিম লোভ।

একটু আগে স্বাতীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে চেয়েছিলাম—এখন সেই ইচ্ছেটা যদিও মনে বারবারই ঢেউ তুলছে, তবু আবেগটাকে আর বাড়তে দিচ্ছি না। এটাকে ঠিক সাহসের অভাব আমি বলব না—এর পেছনে অনেক সূক্ষ্ম চিন্তা কাজ করছে এবং আমাকে বাধা দিচ্ছে। স্বাতীকে হয়ত ঠিক খুলে বলা যায় না।

তবু আমি নাছোড়বান্দা—কই, বললে না তো, কাউকে ভালবাস কি না—

—না, কাউকে আমি ভালবাসি না। স্বাতী বেশ কঠিন স্বরে বলল।

—আমাকেও না? আমি যেন মরিয়া হয়ে উঠেছি।

স্বাতী একটু মুচকি হাসল—সে কথা তো আপনি জিজ্ঞেস করেন নি! আপনাকে ভালবাসা—।

কথাটা শেষ করল না স্বাতী। মাঝে মাঝে একটা ক্রুশিয়াল্ সময়ে স্বাতী থেমে যায়। তখন ওকে বুঝতে খুব অসুবিধা হয়। কখন থেকেই ত নিজের

প্রেসটিজ্ বাঁচিয়ে যতটুকু সম্ভব ভালবাসার আকার-ইঙ্গিতগুলো ক'রে যাচ্ছি। স্বাতী বোধ হয় এখনও টের পায় নি, যাদের নিয়ে ওর রিসার্চ এত জমেছে, কোন এক অদৃশ্য কারণে, আমি তাদেরই বংশধর। ঘরের অনুগত বউকে অপমান ক'রে স্বাতীর ভালবাসার জন্য আমি প্রায় কাঙ্গাল হয়ে উঠেছি। এ বংশগত রোগ নয় তো কি ?

এসব ভেবে কেমন যেন বোকার মত হেসে উঠলাম—আমাকে ভালবাসা যায় না, না ?

—মধ্য গগনের সূর্যের দিকে কী তাকান যায় ? স্বাতী রহস্যজনক হাসল।

—গগলস্‌টা পরে তাকাও, ঠিক পারবে।

—গগলস্ আজ বাড়িতে ফেলে এসেছি—

আবার শব্দ ক'রে হাসলাম। বললাম—তোমার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠবো না—। আচ্ছা স্বাতী, তোমার কী মনে হয় না, মানুষ একাধিক বার ভালবাসায় পড়তে পারে ?

—নিশ্চয় মনে হয়—যেমন আপনার এখন অবস্থা—

—আমার অবস্থা তুমি বুঝবে না, স্বাতী। আমি—।

—থাক্, স্বাতী বাধা দিল। —আজ ওসব থাক্। আজ শুধু খুলনার কথা বলুন।

—আমার আজ খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করছে—অথচ ভাবছি, এই অ্যাট্-মসফিয়ারে—।

—কলকাতায় আজকাল এরকমই ভালবাসা—হয় ট্যাক্সিতে, নয় রেস্টুরেন্টে, না-হয় ভাড়া-করা বাড়িতে—তাই আমি কোথাও যাই না। এসব জায়গায় কক্‌খনো নয়।

—তবে যে এলে ? আমি লজ্জায় পড়লাম।

—দিল্লীর লোকের দাবী সবসময় ঠেলা যায় না, অমরেশদা !

—দিল্লীর লোক যদি আরও কিছু দাবী ক'রে বসে ?

—আগে দাবী করুক—তখন ভেবে দেখবো।

—তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি স্বাতী—

—আমি জানি।

—তুমি জান ? আমি একটু অবাক হলাম।

—হ্যাঁ, সাহস ক'রে যখন আমার হাতটা টেনে নিয়েছিলেন, আমি টের

পেয়েছি। আমি বুঝতে পারছি, ঘরকুনো মানুষ আপনি, আপনার পক্ষে অন্যকে ভালবাসা কত শক্ত।

—জানো নিজেকে সিম্‌বলাইজ ক'রে ভাবতে চাইছি—পূর্বপুরুষের সেই জমিদারের রক্ত প্রবাহিত আমার ধমনীতে—যারা তাদের স্ত্রীদের একদণ্ড শান্তি দেয় নি—তিলে তিলে দগ্ধ করেছে, মেরে ফেলেছে, অপমান করেছে—।

—ওরে বাবাঃ, অত দূর যাবেন, আমি কিন্তু ভাবতে পারি নি। আমি ভাবছিলাম পুরুষকে যখন দু'বার ভালবাসতে হয়, কত কষ্ট পায়—।

—তুমি এত সহজে এত গম্ভীর কথা ভাবতে পার কি করে? ভীষণ সেন্‌স্যেটিভ তুমি, —।

—আর আপনি? আপনি বুঝি সেন্‌স্যেটিভ নন?

—কি জানি, আমার মনে হয় ভীরু মধ্যবিত্ত আমি। সাহস নেই অথচ বীরত্ব দেখিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করতে আমি ওস্তাদ। অযথা দ্বন্দ্ব আমার সেই কারণে। নিজের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে যাই। আমি যে কি নই—

—সাহস দেখানো আধুনিকতা হতে পারে—ওটা আমার কাছে খুব ভাল্‌গার লাগে।

—কোন্‌টা?

—এই যেমন মানুষের সাধারণ বিবেকটুকু নেই। রিফ্লেক্‌শন্‌ নেই—দুম্‌দাম্‌ কাজ করা। মেয়েদের একাধিক পুরুষ চাই—কেননা ও না হলে আধুনিকা হওয়া যায় না—কিংবা পুরুষ একাধিক মেয়েমানুষের অভিজ্ঞতাকে সাংঘাতিক কিছু সঞ্চয় বলে ভাবে—ঐ জাতীয় সাহস।

শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম। খুব বেঁচে গেছি আজ। স্বাতীকে জড়িয়ে কতবার চুমু খেতে চেয়েছিলাম আমি। ভাবছিলাম চুমু খেতে পারি নি বলে আমাকে নিশ্চয় ও ভীরু ভাবছে। সাধারণ মেয়ে নয় স্বাতী, ওর অসাধারণত্ব দু'একটা কথায় এরকম হঠাৎ আলোর মত ঝল্‌সে ওঠে। আমাকে ভরসা দেবার জন্যই বলে কিনা তা অবশ্য জানি না।

—তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? একটু স্পষ্ট ক'রে নিতে চাইলাম আমাদের সম্পর্কটাকে।

—এই দাঁড়াল যে অমরেশদার সঙ্গে এখন থেকে আর অত মেলামেশা করা চলবে না, সাবধান হতে হবে। এবং ওঁর মনে এখন দু'জন নারী—কাকে

ছেড়ে কাকে ভালবাসবেন বুঝতে পারছেন না। সাহিত্যিকদের ওরকম হয় শুনেছি—ওটা এমন কিছু নয়—।

স্বাতীর গভীরতার পরিচয় পেয়ে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কাজলের ইজ্জত খোয়া যাচ্ছে ভেবে চুপ ক'রে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে বললাম—তোমার কথা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি—তুমি সত্যিই কী কাউকে ভালবাস নি ?

—কলকাতায় আছি, ভালবাসতে না-পারা নিশ্চয় অপরাধ, কি বলেন ?

—হ্যাঁ, মনে হয় বই কি ? ভালবাসায় পড়ার এত সুযোগ কাউকে ছেড়ে দিতে দেখলে—বিশেষ ক'রে তোমার মত রূপেগুণে এত—।

—মহীয়সী নারী, কেমন ? না, তা মোটেই নয়। এই যেমন তরুণ, ওকে আমি ভাই ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। ও সেটা জানে, যদিও এই মানসিকতাকে ও ঠিক স্বাভাবিক ভাবতে পারে না। যেমন দিলীপ মুখার্জী—আমার সঙ্গে রিসার্চ করতে শুরু ক'রে এখন আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে—কিন্তু, না। গভীরতা নেই, অভিজ্ঞতা নেই—। ওরকম ভালবাসা আমার কাছে কেমন যেন ছেলেমানুষি। আমি কলকাতায় অনেকদিন ধরে একটি দার্ঢ্য ছেলে খুঁজছি। পাই নি বলে কাউকে ভালবাসতে পারি নি। ইতিহাস পড়ে আমার দৃষ্টিটা বোধহয় একটু অন্যরকম হয়ে গেছে অমরেশদা, ঠিক জানি না।

দিলীপ মুখার্জীর কথা স্বাতীর মুখে আমি এই প্রথম শুনলাম, যদিও ডিপার্মেন্টে ওকে আমি দেখেছি। তার চোখের দৃষ্টি আমার খুব একটা ভাল লাগে নি। স্বাতীর শেষ কথাটাই আমার মনে তখন রিপিট পারফরমেন্স দিয়ে যাচ্ছিল—কলকাতায় আমি একজন দার্ঢ্য ছেলে পেলাম না, যাকে ভালবাসা যায়। কথাটা কেমন যেন ট্র্যাজেডীর মত আমাকে আবিষ্ট করে রাখল, আমি বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটাকে চেলে দেখছি—প্রত্যেকবার নতুন নতুন অর্থ পাচ্ছি কথাটার মধ্যে। বাঙালী সমাজ যে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আজকের অবক্ষয়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মাথা উঁচু ক'রে, স্প্যাইন্ শক্ত ক'রে দাঁড়াবার মত পুরুষের বড় অভাব। আমার মধ্যেও কী সেই দার্ঢ্য ভাবটা আছে ? সন্দেহজনক। আমি গোপনে স্বাতীর সঙ্গে প্রেম করছি অথচ তার কোন রকম জ্বালা বা সংশয় আমি কাজলকে জানাবার প্রয়োজন মনে করি নি। যেন যা পাওয়া যায় তাতেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার

পূর্ণ হবে। জানি না, স্বাতী আমাকে বাদ দিয়ে এসব কথা ভাবে কিনা। আমার তো মনে হয় আমার ইমেজ্ স্বাতীর কাছে আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে—আমি দিল্লীর এক মহামান্য গোলাম—ইতিহাসকে পালটাবার মত সাহস বা দূরদর্শীতা আমার নেই—। আমি চোরের মত স্বাতীর ভালবাসা পাবার জন্য কাঙ্গাল হয়ে উঠেছি—অথচ বাইরে দেখাচ্ছি—আমি ভয়ানক বিবেচক এবং ভারতবর্ষের উন্নতির ও অবনতির সমস্ত কার্যকারণ আমার হাতের মুঠোয়—।

স্বাতী আমার চিন্তার হঠাৎ সূতো ছিঁড়ে বলল—চলুন, রাত হল।

আমি উঠে পড়লাম—। বললাম—হ্যাঁ, চলো।

কলকাতার অনেক আলোর ঝলকানিতে আমি তখন একজন দার্ঢ্য ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—যাকে গ্রহণ করা যায়—ভালবাসা যায়। স্বাতীর ট্র্যাজেডীটা আমি ঠিক ঠিক অনুভব করতে পারি।

॥ তেরো ॥

এক একটা মন্দিরের দেবতা বহু মানুষের পূজো পেতে পেতে যেমন জাগ্রত দেবতা হয়ে যায়,—কলকাতা রেডিওর এস্, ডি, তেমনি এক জাগ্রত দেবতা। ব্রিটিশদের এক কালের রাজধানী, কলকাতা বৈভব হারালেও যেমন বিত্তহীন নয়, ডি, ডি, জি, (ইষ্ট) পোস্টটা সৃষ্টি হবার পরেও ষ্টেশন ডিরেক্টর প্রায় সর্বময় অধিকর্তা। তাছাড়া কালচারাল সেন্টার হিসাবে কলকাতার এখনও সুনাম, তাই দেশের ৮৫টি স্টেশনের মধ্যে কলকাতা স্টেশনের একটা অন্য আভিজাত্য।

এস্, ডি,-এর বিরাট সুসজ্জিত ঘর। একদিকে আরাম বা বিরামের জন্য সোফা সেট। দেয়াল আলমারীর কাঁচে রেডিও ম্যানুয়াল সমেত ষষ্ঠ পরিকল্পনার দু'কিলো ওজনের খসড়া। চতুর্থ পরিকল্পনার অ্যানুয়াল অ্যাপ্রেইজাল্ এবং 'ইণ্ডিয়া টু-ডে 1982'। পশ্চিমবঙ্গ যোজনা—ইত্যাদি অতি দরকারী বা অদরকারী কিছু রেফারেন্স বই। নারায়ণ সামন্ত পড়ুয়া লোক—বইগুলোতে যতটা ধুলো পড়বার কথা, ততটা পড়ে নি। মনে হয়, সময় পেলেই তিনি এগুলি নেড়েচেড়ে দেখেন। রামকৃষ্ণের কথামৃত, বাইবেল, শ্রীচৈতন্য -বোধহয় অচিন্ত কুমার সেনগুপ্তের এবং সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল', সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', সুনীতি চাটুজ্যের 'ভাষাতত্ত্ব'—ইত্যাদি নানা জাতের ফুলের তোড়া আলমারীর মধ্যে সাজান। নানা বিষয়ে নারায়ণ সামন্তের ইন্‌টারেস্ট। ঘরের এই কোলাজ-এ ধরা পড়ে।

ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হ'ল একটা জ্যান্ত স্কালপচার দেখছি আমি। জ্বলজ্বলে মুখে জ্বলজ্বলে দু'টি চোখ, সাদা-পাকা চুল, ভারি ও ভরাট চোয়াল (রেগে গেলে তিনি চোয়ালটাকে গাড়ির ব্রেক্ হিসেবে ব্যবহার করেন; চামড়ার আস্তরণ ভেদ ক'রে ভেতরের চোয়ালের হাড় তখন নড়েচড়ে ওঠে), ভাবনায় পড়লে কপালে বলিরেখা জানান দেয়, বালির ওপরে অদৃশ্য হাতের ছোঁয়াচের মত। পুরু ঠোঁট, বিদ্রূপের সান্-দেওয়া হাসি; হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠুকে চোখের পাতা নড়ে, চোখের বলগুলো তখন আবার জ্বলজ্বল ক'রে

ওঠে। এক কথায় নারায়ণ সামন্তের মনটা তাঁর মুখের প্রতিফলন কিনা, বেশ সন্দেহ হয়। সুতরাং চরিত্রটা ভালবাসার চেয়ে শঙ্কা উদ্রেক ক'রে বেশী। নারায়ণ সামন্ত যদি-হেসে মিষ্টি ক'রে কারুর সঙ্গে কথা বলেন, তার যে ভাল সময়, এমন কথা হলপ ক'রে বলা যায় না। হাসির ছটায় বেশ খুশী খুশী মনে নিজের টেবিলে গিয়ে হয়ত দেখতে পাবে, একটা কোন গুরুতর 'ল্যাপ্‌সের' জন্য তার কাছে হয়ত এক্সপ্লানেশন্ চাওয়া হয়েছে।

নারায়ণ সামন্ত কি যেন একটা বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। আমার তখন তাঁকে ঠিক প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মনে হচ্ছিল ; সারা দেশের ব্যয়বরাদ্দ ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি যেন চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছেন—এমন একটা মুখভঙ্গি। আমি প্রায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, ভাগ্যিস হেসে আমাকে গ্রিট্ করলেন। তাই অভ্যাসবশে হঠাৎ ভয় পেয়েও নিজের মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে ধপ ক'রে বসে পড়তে চেয়েও দাঁড়িয়ে রইলাম।

—আসুন, মিঃ রায়। কলকাতায় এরই মধ্যে অপনার তো বেশ সুনাম হয়েছে। এবং রেডিওতেও। খুব ভাল, খুব ভাল। বসুন। এক্ষুণি ডি, ডি, জি, ই, মিঃ ধর আসবেন।

আমি ভাবলাম একটু বিনয় করা উচিত—তাই হেসে বললাম—কলকাতায় বেশী কাজ করতে যাওয়া একটু বোধহয় মুশকিল। তাছাড়া আজকে যাঁরা ভাল বলছেন, —তাঁদের মুখেই যে পরনিন্দা শুনবেন না—এমন কথা—।

কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলেন না নারায়ন সামন্ত। বললেন—কি জানেন, রামকৃষ্ণ বলতেন না, লোক না পোক। আমি সবসময় কথাটা মনে রাখি।

এস্, ডি,-ও আবার রামকৃষ্ণ ভক্ত হয় নাকি ? ঠিক জানা ছিল না, কারণ ভক্তিতে গদগদ হবার তাঁর সত্যিই সময় নেই। আমি বিমোহিত হলাম। শ্রদ্ধা হতে থাকল। ওদিকে আবার তরল গুহের কথা ভেবে আমার তখন ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল, কারণ নিউজ ডিভিশন্ নিয়েই আজকেই সিক্রেট্ মিটিং—অথচ নিউজের ইন-চার্জ হয়ে তরল গুহ এখনও এলেন না—। সব সময় লেট্ করেন, বড় বিশ্রি ব্যাপার। রেডিওর এত পুরনো লোকের দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। কিছু বললেই বলেন—আরে মশায়, দিল্লীর কত লোককে আসতে-যেতে দেখলাম! আপনার কথা বলছি

না, মাপ করবেন। সময় মত এলেই যে বেশী কাজ হয়—ওটা বুঝলেন, আমি ঠিক মানি না। —বহুদিন ধরে নিউজ করেছি, পড়েছি, কেন, কি, —কেউ বলতে পারবে নিউজ যায় নি? পনেরো বছর ধরে সমানে বাহবা পেয়েছি মশায়, তাই আজকাল সময়মত কিছু করতে হলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। করুক না—অন্যরা করুক। এখন তো ওদের সময়। আমি অনেক করেছি। রেডিওর রীতিমত ইতিহাস হয়ে গেছি।

কথাগুলো মনে পড়ে গেল। এদিকে এস্, ডি, বোধহয় স্কালপ্চার হয়ে আবার দেশ নিয়ে ভাবছেন! কারণ তাঁর মুখে দেখলাম, দিল্লী, বোম্বাই ও কলকাতার নানা সমস্যার ছবি। কপালে বলিরেখা। ভাবছেন। হয়ত আজকের মিটিং-এর কথাই। এ, এস্, ডি, মিঃ বিশ্বনাথ দে এসে এক কোণে বসে পড়লেন। হাসি ছড়িয়ে এলেন কৌন্তেয় সিংহ। এবং এক্ষুণি হয়ত আসবেন ডি, ডি, জি, ই, মিঃ ধর। মিটিং শুরু হয়ে গেলে যদি তরল গুহ হন্তদন্ত হয়ে আসেন, আমার পক্ষে খুব এমব্যারেসিং ব্যাপার হবে। অবশ্য কলকাতায় সময় মত মিটিং অ্যাটেণ্ড না করলে দিল্লীর বুরোক্র্যাট্দের মত এঁরা কেউ চটে যান না—এই যা একটু বাঁচোয়া।

তরল গুহ বোধহয় এঁদেরই প্রশ্রয় পেয়ে অতি সহজে এখন ইতিহাস হয়ে গেছেন। তাঁর কথা শুনলেই আমার মনে হয়, ইতিহাসের পাতা বাতাসে নড়ে। ওদিকে যে দেশের ভূগোল পাল্টে গেল বা যাচ্ছে, কারুর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তরল গুহ শুনেছি কোনকালেই মন দিয়ে ভূগোল পড়েন নি। তরল তো, হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গেলেই পার পাওয়া যায়। কত সুবিধে। এরই মধ্যে আমি বুঝে গেছি ওঁর অত প্রেসটিজের মূলে রয়েছে আজকের দুনিয়ার সুবিধেবাদীর রাজনীতি; এবং রাজনীতির আজকাল সবচেয়ে বড় মুখোশ এই কালচার। তরল গুহ শুধু যে নিউজ পড়েন তাই নয়, তিনি নানা কালচারও ক'রে বেড়াচ্ছেন। এগ্রিকালচার অবশ্য বাঙালীর অত আসে না—কি আর করা! বাকি যা কিছু রইল, সবটাতেই তরল গুহ ওস্তাদ। প্রিসাইড্ করেন, বক্তৃতা দেন, প্রয়োজন হলে অ্যামেচার কোন থিয়েটার গ্রুপের নাটক পরিচালনা করেন এবং কবিতার আসরেও ইদানীং তাঁকে দেখা যায়। অল্প বিস্তর এসব জায়গায় ঘোরেন রেডিওর প্রায় প্রত্যেকেই; দূর দূরে মফঃস্বলে কবি পক্ষের সময় অনেকেরই ডাক পড়ে। না যাবার মানে হয় না বলেই ত যাবার এত হিড়িক।

মিঃ ধর এলেন—গুড্ মর্ণিং জেন্‌টেল্‌মেন্। নারায়ণ সামন্ত উঠে দাঁড়ালেন। —বসুন, বসুন। আরে, মিঃ রায়ও এসে গেছে দেখছি। হাউ ডু ইউ ফাইণ্ড ক্যালকাটা, মি রায় ? মিঃ ধরের ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ির ফাঁকে মুখের হাসিটা আন্তরিকতার রঙ ছড়াল। আমি এগিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ড শেক্ করলাম। বললাম—আই ডোন্ট নো ক্যালকাটা ভেরি মাচ। ইট্‌স লাইক্ ফলিং ইন্ লাভ ইন মিড এজ !

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ ধর। —ঠিক বলেছেন মিঃ রায়। আপনি ভাল কাজ করছেন শুনলাম, ভেরী গুড।

আজকের মিটিং-এ হয়ত তিনি কলকাতার দায়িত্বের কথাই ইনডাইরেক্টলি স্মরণ করাবেন। এর তাৎপর্য আমি কিছুটা বুঝতে পারছি ; কারণ মিনিস্ট্রি থেকে আমি কাজের দায়িত্বের বিষয়ে একটা টপ-সিক্রেট চিঠি পেয়েছি। তাতে সরকারী নীতিটার মোটামুটি একটা ছক কাটা আছে। আমার মনে হল, তারই কপি সহ অন্য কোন চিঠি হয়ত আরও বিশদভাবে ডাইরেক্টরেট থেকে লেখা হয়েছে—যা নিয়ে হয়ত আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেছেন মিঃ ধর।

মিটিং শুরু হবার আগে মিঃ ধর একটু এগিয়ে গেলেন নারায়ণ সামন্তের কাছে। হয়ত অফিসের কোন সিক্রেট্ কথা আছে। আমি ভাবছিলাম কৌন্তেয় সিংহ যে-কোন মুহূর্তে তরল গুহের দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করে আমাকে হয়ত অস্বস্তিতে ফেলবেন। মিঃ ধর কিংবা নারায়ণ সামন্তও তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করতে পারেন ; তাঁরা এখনও করেন নি কেন তাতেই ত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। সব কিছুই যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে—

হঠাৎ ঝড়ের মত তরল গুহ ঘরে ঢুকে একটা নাটক ফেঁদে বসতে পারেন। কি যে ঘটবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কৌন্তেয় সিংহ এ, এস, ডি,-এর সঙ্গে কথা বলছেন। কৌন্তেয় আমাকে একবার গ্রিট্ করেই সরে বসেছেন, হয়ত ভেবেছেন দিল্লীর লোকের সঙ্গে একটু দূরত্ব রাখাই শ্রেয়। আমি জানি, যে-কোন কারণেই হোক, তিনি রেডিওর সবচেয়ে পাওয়ারফুল মহিলা। নিন্দুকরা অনেক কথাই বলে। সব কথায় কান দিতে নেই।

প্রোগ্রাম কার্যাধ্যক্ষ স্বপন লাহিড়ী মাথা নেড়ে বলে উঠেছিলেন—উঁঃ-হুঁঃ, হলো না, গোড়ায় গলদ রয়ে গেল যে ! গোড়ায় গলদ থাকলে, মশায় বড় বড় ইমারত পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়তে পারে। পাওয়ারফুল শুধু রেডিওতে কেন, সমস্ত

কূলে বলুন। কূল বলতে সাহিত্যের একূল-ওকূল দু'কূলই বোঝায় অবশ্য। তা আমরা তো আর সাহিত্যিক নই যে আঁচলের তলায় 'কি আছে যে মোহ', ঠিক বুঝবো। ওটা অন্য লাইনের ব্যাপার। তবে ওঁকে আমরা চটাই না, হট্ হতে দিই না। সবচেয়ে সেফ্ কী জানেন তো? লাহিড়ী এক টিপ নস্যি নাসিকা গহ্বরে টেনে নিয়ে বলেছিল—সবচেয়ে সেফ্, শ্রেফ্ ছিপি এঁটে বসে থকা। জানেন তো বোবার ওটুকুই সুবিধে, শত্রুমুক্ত। দ্বিতীয় কথা, —সব রকম কৌতূহল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। তৃতীয় সেফ্ পথ—কোনরকম প্রশ্ন না করা। কলকাতায় এজন্যে দেখবেন, যাঁরা লাইনের ভেটারেন্ লোক, কোন প্রশ্ন করেন না, হাসিটি মুখে সেঁটে শুধু মাথা নেড়ে যান। যা হচ্ছে, হোক না, —হতে দিন না. তোমার বাপের কী? এরকম একটা নির্বিকার ভাব, বুঝলেন তো। চতুর্থ পথ, চোখ খোলা রাখা; অন্যমনস্ক হয়ে কলকাতার রাস্তায় চললে অকালে নিজেরইতো প্রাণটা যাবে, কি, যাবে না? কে কোন্ প্রোগ্রাম্ ক'রে কোন্ ডক্যুমেন্টারিটা বাগাল, মানে গলা দিয়ে বা গলা বেচে কিছু ম্যানেজ করল কিংবা ইভিনিং পার্টিতে গিয়ে মালকড়ি খেয়ে এল, অথবা ধরুন, বহুরকমের একটা ট্রিপ্ বাগাল, —তাতে তোমার কী? তোমার চোদ্দপুরুষের কী কিছু ক্ষতি হল? তবে অযথা তোমার শরীরে বা বুকে জ্বলুনি হয় কেন, শুনি? হিম্মত থাকে তো তুমিও লড়ে যাও না বাপু—কে বাধা দিচ্ছে? না, তা না। করতেও পারবে না, আবার জ্বলবেও, কি জ্বালাতন! বাঙালী যে কি জাত মশায়—কী বলবো? বাঙালী জাতের কতটা উন্নতি হয়েছে, দেখতে চান? সব ছেড়েছুড়ে রেডিওতে এসে দু'ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকুন, একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কারণ রেডিও মশায়, আধুনিক ভারতের মস্ত বড় আয়না। কি, অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কি দেখছেন? পছন্দ হল না কথাটা—না? হ্যাঁ, রেডিও আয়না, তাই রিফ্লেক্শন্ ছাড়ে। রেডিও বাঙালী জাতের কালচারাল ইন্ডেক্স—বলে দিলাম লাখ কথা। আসলে এত কথা আমি কখনই বলতাম না, লাহিড়ী নিজের সাফাই গাইল। আমার আবার যেমন কথা তেমনি কাজ—ছিপি এঁটে থাকি। এত কথা বলছি কেন জানেন? আপনি দিল্লীর আনকোরা মানুষ হিনট্স্গুলো হয়ত কাজে লাগতে পারে। তবে দিল্লীর মানুষদের হাতেই ক্ষমতা কিনা, তাই ইগো প্রব্লেম্ থাকে। ইগো স্যাটিস্ফাই করতে হয়ত একদিন প্রশ্নই ক'রে বসলেন—ওমুক লোকই বা

মাসে তিনবার প্রোগ্রাম্ পায় কেন? ওমুক যোগ্য লোকের রেডিওতে স্থান হয় না কেন? লাহিড়ী রুমাল দিয়ে নাক ঝেড়ে বলল—আচ্ছা, ধরে নিলাম এই প্রশ্নটা কৌন্তেয়কেই ক'রে বসলেন। আর রক্ষে নেই। রণমূর্তি হয়ে আপনার পেছনে পড়ে যাবে।

কৌন্তেয় সম্পর্কে আমি অগেও অনেক কথা শুনেছি। খুব কন্‌ট্রো-ভারসিয়াল মহিলা। সবার সব কথার সারমর্ম এই: কৌন্তেয় সিংহকে কোন প্রশ্ন করা যায় না—। প্রশ্ন করলেই তিনি চটে যান এবং চটে গেলে আর রক্ষে নেই। বড়কর্তা পর্যন্ত তখন সিট্ ছেড়ে সোফায় বসতে বাধ্য হন। প্রোগ্রাম্ করা বা প্রোগ্রাম্ দেবার ব্যাপারে কৌন্তেয়র প্রচুর ক্ষমতা, এইটুকুই আমি বুঝলাম। এবং ক্ষমতাটা হয়ত নানা দুর্বোধ্য কারণে অনেকের চেয়ে বেশী। আমি সব নোট্ ক'রে রাখছি, অনেক সময় মনে মনে, মাঝে মাঝে সিক্রেট্ ফাইলে।

কৌন্তেয়ই প্রশ্ন তুললেন—তরলবাবু যে এখনও এলেন না? মিঃ রায়, আপনি কী কোথাও পাঠিয়েছেন?

ততক্ষণে মিঃ ধর নিজের জায়গায় এসে বসেছেন। নারায়ণ সামন্ত মাথা নেড়ে সায় দিলেন কৌন্তেয়কে। এবং মিঃ ধরের কাছে তরল গুহের ইমেজ্ অক্ষত রাখতেই হয়ত বললেন—ওর না থাকলেও চলে—কি বলুন, মিঃ রায়? নিউজ আর ভিউজ নিয়ে আজকাল যিনি মাথা ঘামাচ্ছেন—মানে ডাইরেক্টরেট্ থেকে যাঁকে এখানে পাঠান হয়েছে—হ্যাঁ, মিঃ রায়, আপনিই বরং আরও একটু এগিয়ে বসুন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কৌন্তেয় সিংহের সঙ্গে আপনার আলাপ ও আলোচনা হয়েছে শুনেছি—কিন্তু আপনি কী এঁর অন্য পরিচয়টাও জানেন? দিল্লীর লোকতো, হয়ত নাও শুনতে পারেন—তাই বলছি, ইনি একজন প্রকৃত আর্টিষ্ট এবং চমৎকার লেখেন।

বাঙালীরা খুশী হলে বড় সুপারলেটিভে কথা বলে—'খুব চমৎকার' না বললেও বুঝতাম, ভাল লেখেন। সেই প্রতিভার কথা স্মরণ করেই আমি আবার নমস্কার করলাম। আমাকে নমস্কার জানাতে দেখে মিঃ ধর একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—বাট্ আই হ্যাভ সিন ইউ টকিং উইথ হার। ইয়েস্, সী ইজ দি মোস্ট ট্যালেনটেড আর্টিস্ট অব আওয়ার রেডিও—কি বলেন মিঃ সামন্ত?

মিঃ সামন্ত হেসে মাথা নাড়লেন। ভাবখানা এই যে আমি যাকে খাতির

করি তার মধ্যে ট্যালেন্ট না থাকাই আশ্চর্যের। জেরা শুরু করে দিতে পারতাম। তার প্রয়োজন দেখি না। কৌন্তেয় যে ভয়ানক ট্যালেন্টেড তা ত বুঝতেই পারছি। এক, সব মিটিং-এ তিনি থাকেন। দুই, প্রশংসার ফুলঝুরি যখন বস্‌দের মুখে—তখন এঁর এবিলিটি সম্পর্কে ডাউট হওয়া উচিত নয়। আসলে আমি এ মহিলা সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তাতে ঠিক করেছিলাম, গুণী ও জ্ঞানীদের ঘন ঘন নমস্কার করতে হয়—এবং সেটা আমি করেও থাকি। করিডোরে বা কামরায় যতবার দেখা হয়, আমি কৌন্তেয়-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নমস্কার করি—। আমার ধারণা—তাতে শত্রুতায় ও ষড়যন্ত্রে বাধা পড়ে।

তরল গুহ ঠিক হন্তদন্ত হয়ে এলেন। মিঃ ধরের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা জরুরী অ্যাসাইন্‌মেন্ট ছিল স্যর, সরি, দেরী হয়ে গেল, না? মিটিং কী আরম্ভ হয়ে গেছে?

নারায়ণ সামন্ত আগ বাড়িয়ে সবার হয়ে ক্ষমা করলেন অর্থাৎ মিঃ ধরের আর কিছু বলার স্কোপ রইল না। সঙ্গে সঙ্গে মিটিং শুরু হয়ে গেল। অল্প একটু ভূমিকা করলেন নারায়ণ সামন্ত, মানে বলে রাখলেন, সহকারী ডাইরেক্টার মিঃ বিশ্বনাথ দে-ও কিছু বলবেন। তিনি কখন এসে সেই যে এক কোণে বসে আছেন—কেউ টেরও পায় নি। বড় নীরব ও নিরীহ মানুষটি। কিছু না বলতে হলেই যেন বেঁচে যান। বিশ্বনাথ দে মাথা নাড়ছিলেন অর্থাৎ তোমরাই বল, তাতেই হবে। —হ্যাঁ, কৌন্তেয়, তুমিও তো কিছু বলবে নিশ্চয়। মিঃ ধর, আপনি ব্যাপারটা আগে সবাইকে ব্যাখ্যা করে বরং বলুন।

মিঃ ধর খুব ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন—না, আমি যা বলতে চাই, তরল গুহ-কে আমি এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বলেছি, কি তরল—বলি নি? মনে আছে তো? আমি লক্ষ্য করলাম, মিঃ ধর সবার সঙ্গে বেশ একটা ইন্‌ফরম্যালি ব্যবহার করেন। প্রকৃত ডেমোক্র্যাট। মানুষের কথা শোনেন বেশী, অন্য কেউ বলতে শুরু করলে শেষ না হতে কদাচ বাধা দেন না। দিল্লীর অনেক বুরোক্র্যাটরা এধরনের ইন্‌ফরম্যাল মিটিং কল্পনাও করতে পারবেন না।

তরল গুহ দাঁড়িয়ে উঠলেন উত্তেজনায়—আলবৎ মনে আছে স্যর। নর্থ-ইস্টার্ন স্টেট্‌সের কথা বলছেন তো? আসাম আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

যা-কিছু দরকার—মানে, যা আপনি বলেছেন—আমরা তো করছিই। মিঃ রায় ক'দিন আর এসেছেন? আগে কী কাজ হয় নি? কখনও কোথাও কী কম্‌প্লেন্‌ পেয়েছেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দিল্লীও সে কথা জানে। আসাম আন্দোলন যদি এভাবে বাড়তেই থাকে, তবে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির ওপর তার কি ধরনের এফেক্ট পড়তে পারে—এ নিয়ে শুধু যে সমীক্ষা-পরিক্রমা করেছি তাই নয়—দিল্লীতে আমি চিঠিও কম লিখি নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেইসব চিঠির জন্যেই মিঃ রায় প্রায় ডেপুটি ডাইরেক্‌টারের ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের কাজের মনিটর করার দায়িত্ব পেয়েছেন। এ অধমের জন্যই এতটা হয়েছে—এটা আমি জোর গলায় বলবো।

নারায়ণ সামন্ত তরল গুহকে বাঁচাতেই বোধহয় কথাটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, হেসে বললেন—মানে তরল বলতে চায় যে—না-না, সে আমরা জানি—তবে কী জান তরল, পলিটিকাল্‌ ক্লাইমেট্‌ সে-আর নেই। সুন্দর, সহজ ও নিরাপদ অবস্থা এ নয়। রীতিমত একটা টারময়েলের মধ্যে আমরা বাস করছি। এটা কক্ষনো ভুলো না। তাছাড়া যতদূর জানি, মিঃ রায়, ঘটনাগুলো, এই পলিটিকাল্‌ পারস্পেক্‌টিভে ওভারসি করার চেষ্টা করছেন, তোমাদের কারুর কোন কাজে ইন্‌টারফেয়ার্‌ করছেন না।

—নিশ্চয় মানি স্যার। নয়ত আমাদের মত যারা ব্রডকাস্টিং ইতিহাসে প্রায়, মাপ করবেন, যদি কথাটা আত্মপ্রশংসার মত শোনায়—ইতিহাসে আমরা যারা স্মরণীয় হয়ে গেছি—আমাদের কাজ এখন এফেক্‌টিভ্‌ হচ্ছে কিনা—তা মনিটর্‌ করতে কিংবা ঐ তো কৌন্তেয় সিংহ—কলকাতার রেডিওতে আজকে যার এত সুনাম—এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের কোন ষ্টেশন, মিঃ ধর মাপ করবেন, ইফ্‌ আই অ্যাম্‌ অ্যালাউড্‌ টু সে সো—আমি একশোবার বলবো—যাঁরা রেডিওকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসে স্মরণীয় ক'রে তুললেন—তাঁরা পড়ে থাকবেন পেছনে, তাঁদের কোন কাজ অ্যাপ্রিশিয়েটেড্‌ হবে না—আর, এই তো দেখুন, এই মুহূর্তে নীচে রিসেপ্‌শনে পঁচিশ-ত্রিশ জনের ভিড়—রেডিও, এই টেলিভিশনের যুগেও, কি ভয়ঙ্কর পপুলার একবার কল্পনা করুন—এরা তবে কী চায়?

মিঃ ধর সম্মতিসূচক মাথা নাড়ছিলেন এবং তরল গুহ আরও উৎসাহে বলে যেতে থাকলেন—আমার দেরী হবার মস্ত বড় কারণ, মিঃ ধর, এদের মধ্যে ছয়-সাতজন এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে—কি-না, দু'দিন

আগে যে পরিক্রমা করেছি—ওরা মুগ্ধ। শিক্ষা ব্যবস্থা যে স্তরে পড়ে আছে এবং আজকে যে করাপ্‌শনের শিকার—যেমন ধরুন, সময়মত পরীক্ষা হয় না 'ঘেরাও' লেগেই থাকে, ছোরা ও গোলা-বারুদ সমভিব্যাহারে চলে—কি-না, গণ-টোকাটুকিতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। শুধু কি তাই, এই যে আবল-তাবল মার্কিং, ছেলেমেয়েদের রীতিমত মার্ক্‌-শিট্‌ চ্যালেঞ্জ করতে হয়, এতে—এই অসুবিধার মধ্যে—ধরুন, ভীষণ কন্‌জারভেটিভ্‌ দৃষ্টিতে নম্বর দেওয়া হয় পশ্চিম বাংলার সব ক'টি ইউনিভারসিটিতে, কিন্তু একবার গুণী-জ্ঞানী মানুষের পোঁ-রা কী ভেবে দেখেছেন, আপনাদের এই অ্যাটিচ্যুডের জন্য বাঙালী ছেলেমেয়েরা পড়ে পড়ে কিরকম মার খাচ্ছে—সেদিকে কী বিন্দুমাত্র হুঁস আছে কারো—? নেই। তোরা নম্বর দিতে চাস না—দিস না, কিন্তু যেন ভেবে দেখা হয়, এই কারণে, শুধু এই কারণেই বাঙালী ছেলেমেয়েরা সারা ভারতের সঙ্গে ওপেন্‌ কম্‌পিটিশনে পেরে ওঠে না। পারবে কী ক'রে বলুন—? এই তো মিঃ রায়কে জিজ্ঞেস করুন, গোটা উত্তর ভারতে, কেউ এইট্টি পার্সেন্ট ছাড়া নম্বর পায় না। তবে আমাদের কলকাতার মেডিকেল স্টুডেন্টদের নিশ্চয় সুনাম আছে; আমি দিল্লীতে দেখেছি, কলকাতার ডাক্তাররা প্রফেশনাল্‌ ফিল্ডে বেশী পাত্তা পায়—হয়ত ভীষণ স্ট্রিক্টভাবে এঁদের নেওয়া হয় বলেই—কিন্তু সংখ্যাকে যদি তোমরা এত সীমিত রাখ—এটা কী রাজ্যের ক্ষতি নয়? সেটাই আমি বিস্তৃতভাবে, এই যে হালে সি, পি, এম,-এর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি একটা বিমাতৃসুলভ অ্যাটিচ্যুড এবং তারা যখন-তখন পুরনো কমিটি আর কাউন্সিলগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে নিজেদের লোক দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ডেমোক্র্যাসি যে প্রায় শেষ করে দিচ্ছে—তাতে যদি কংগ্রেস-আই প্রতিবাদ করে, যদি সেই আন্দোলনে, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মত সর্বশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা প্রমথ বিশী বা অন্নদাশঙ্করের মত বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা প্রতিবাদ করেন—'সহজপাঠ' আন্দোলনে যদি অন্যান্যের মধ্যে তাঁরা এসে রাস্তায় দাঁড়ান—তবে, কেন আমি লিখবো না, বলুন? আর যদি লিখি এবং সেটা যদি রুলিং গভর্ণমেন্টের পছন্দ হয় নি বলে তারা কায়দা করে মিঃ রায়কে আমার বিরুদ্ধে লাগায়—তবে আমি কী করতে পারি বলুন?—

আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বুঝলাম মিঃ ধরের সামনে তরল গুহ প্রমাণ করতে চাইছেন আমি যদিও মিনিস্ট্রি ও ডাইরেক্টরেটের লোক, আমি কংগ্রেস-আই-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বাম ফ্রন্টকেই প্রেফার করছি এবং

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কেন আবোল-তাবোল লিখেছেন বলে যে প্রতিবাদ বা মন্তব্য করেছিলাম,—তারই এক জোরাল বয়ান তিনি খুব কায়দা করে মিটিং-এর সামনে পেশ করলেন। তরল গুহ-র মাথায় এত বুদ্ধি—মনে মনে তারিফ না করে পারছি না।

মিঃ ধর বললেন—না, তোমার লেখার আমিও সুখ্যাতি শুনেছি। কৌস্তেয়ও প্রায়ই বলে—তোমার মত লিখতে এবং সবচেয়ে বড় কথা, তোমার মত বলতে কেউ পারে না। আই থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ ফর দ্যাট। কিন্তু আজকে যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই—আসাম খুব গণ্ডোগোল করছে। আপনারা সবাই জানেন, ওখানকার ষ্টেশন ডিরেক্টরের কি অবস্থা! অনেক কষ্টে আমি তাঁকে ঠেকিয়ে রেখেছি। স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার সেদিন এসেছিলেন—বললেন, নিউজ ডিভিশনের ওপর আমাদের কোন কন্‌ট্রোল তারা মানতে চাইছে না। দিস্ ইজ্ এ ভেরী রিডিক্যুলাস্ সিচুয়েশন্, তরল। ক্যান্ ইউ ইমাজিন্ দি পলিটিক্যাল্ এণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ ইমপ্যাক্ট্ অব দিস ?

নারায়ণ সামন্ত বললেন—অবস্থা এখন অনেক নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু ডাইরেক্টরেট্ নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। আমরা ধরে নিতে পারি, মিঃ রায়কে যে এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, নিউজ বা ভিউজ দেখার—তাকে কন্ট্রোল করার—বুঝলে তরল, ওটা এই পলিটিকাল সিচুয়েশনের ফসল (ফসল শব্দটা আমার কানে টক্ ক'রে লাগলো, কিন্তু আমি চুপ ক'রে রইলাম)। তাছাড়া তোমরা নিউজ কর। নিউজের ব্যাপারে অনেক পলিসি সম্পর্কে ডি, এন, এস, তোমাদের আলাদাভাবে বলেন, এটা ঠিক—যা অনেক সময় আমরাও জানতে পারি না—কিন্তু একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি সিচুয়েশন্ হলে পলিসিরও যে পরিবর্তন ঘটে—সেটা বোঝাতেই আজকের মিটিং।

আমি লক্ষ্য করছিলাম মিঃ ধরকে এঁরা সবাই বড় আপন ক'রে নিয়েছেন। মানুষটা নিরহঙ্কারী, তাঁর কথা বলার মাঝখানে বাধা দিতে কারুর কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ দেখি না। আমার অবশ্য খুব খারাপ লাগে—একটা কথা কেউ শেষ করার আগেই বক্তার চিন্তাধারাকে বাধা দেবার মধ্যে যে আত্মশ্লাঘা আছে—সেটা আমাকে বড় পীড়া দেয়।

তরল গুহ মুখ ফুটে বলছেন না কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার এই মনিটারিং তাঁর ঠিক পছন্দসই হচ্ছে না এবং অনুমান ক'রে নিলাম—

আমার বিরুদ্ধে ইনি অনেক কথাই মিঃ সামন্ত ও মিঃ ধরকে লাগিয়েছেন। —'আমি আগেও বলেছি, তরল'—মিঃ ধরের ঐ কথাটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এবং পাছে কৌন্তেয়-র ক্ষমতা সম্পর্কে দিল্লীর লোকের মনে কোন সন্দেহ জাগে—এই জন্যে বোধ হয় তাঁকে 'ট্যালেনটেড্' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত ক'রে আমাকে সাবধান ক'রে দেওয়া হল।

তরল গুহ এবং কৌন্তেয় দু'জনেই কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। মিঃ ধর বাধা দিলেন। লেট্ মি স্পিক্, তরল। রেডিওর জন্যে তোমরা যা করছ—আমি জানি। ইট্ হ্যাজ্ বিন ভেরী হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড্ ইন দি ডাইরেক্টরেট্। লাস্ট টাইম হোয়েন আই ওয়াজ ইন্ দেল্হী, আই হ্যাড অ্যান্ অকেশ্‌ন টু স্পিক্ এবাউট বোথ অব ইউ—দি জুয়েলস্ অব আওয়ার ভাইট্যাল্ স্টেশন। দ্যাট ইজ নট্ টু বি কন্‌ফিউজড্ উইথ হোয়াট মিঃ রায় হ্যাস বিন্ ডুইং হিয়ার। হি ম্যাষ্ট হ্যাভ ফুল কোঅপারেশন্ ফ্রম্ বোথ অব ইউ।

কৌন্তেয় সিংহ একবার নারায়ণ সামন্তের দিকে আড়চোখে তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সামন্ত বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—নো, মিঃ ধর, ইউ স্ম্যড্ হ্যাভ নো সাচ্ আইডিয়া। আপনার এরকম একটা ধারণা হবার কারণ কি, আমি ঠিক জানি না—তবে মিঃ দে হয়ত আমার সঙ্গে একমত যে ওরা দু'জনেই যতদূর সম্ভব মিঃ রায়কে সাহায্য ক'রে যাচ্ছে—কি তরল, ঠিক না? কৌন্তেয়, তোমার কিছু বক্তব্য থাকে তো, আই থিং, দিস্ ইজ্ দি টাইম্ হোয়েন্ ইউ ক্যান্ স্পিক্ আউট্—।

কৌন্তেয় বলল—(আমার মনে হল, মিঃ সামন্ত জোর না করলে কৌন্তেয় হয়ত কিছুই বলত না)—কলকাতাকে না চিনলে কলকাতার জন্য কিছু করা যায় না, করা সম্ভবও নয়—এটাই আমি মিঃ রায়কে বলতে চাই। টুরিষ্টের দৃষ্টি পার্শিয়াল্, এটাই আমার ধারণা। মিঃ ধর আমার এই কথাটার অর্থ নিশ্চয় বুঝবেন, কারণ এখন তিনি কলকাতার নানা সিচুয়েশন্ কলকাতাবাসীর মত বোঝেন বলেই, আমি বলবো, এখন তিনি এত এফেক্‌টিভ্।

মিঃ ধর বাধা দিলেন—আই এগ্রি। বাট্ নোয়িং ক্যালকাটা ইজ্ ওয়ান থিং, বাট্ টু ফিল্ এ স্টেক্ অব্ হোয়াট্ ইজ্ হ্যাপেনিং ইন্ ক্যালকাটা, ইজ্ এনাদার। আমি যা বলতে চাই—অনেক সময় অনেক ব্যাপার না জানলেই বিচার করতে সুবিধে হয়। সারা ভারতের স্বার্থ সামনে রেখে নর্থ-ইষ্টার্ন

ষ্টেট্গুলির স্বার্থ বোঝার ক্ষমতার জন্য যে ব্যাকগ্রাউণ্ড দরকার, মিঃ রায়ের তা আছে। সেটাই আপনাদের মনে রাখতে বলি। মনে রাখতে হবে, আসাম যে আন্দোলন শুরু করেছে—ইট্ হ্যাজ্ এ ডেন্জারাস্ ইম্প্লিকেশন্ ইন্ ষ্টোর। দেয়ার ইজ্ অলরেডি অ্যান এভিডেন্স অব রাইজিং অ্যাওয়ারনেস ইন্ দিজ্ ষ্টেটস্। ইউ হ্যাব্ টু বি ভেরী কেয়ারফুল। মিঃ রায়ের কাজ দেখার যতটুকু আমার সৌভাগ্য হয়েছে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হি হ্যাজ্ নো স্টেক্ ইন্ ক্যালকাটা এবং ওই পারবে বলতে, দেখিয়ে দিতে যা ওর কাছ থেকে আমরা আশা করছি। ও-কে, জেন্টেল্মেন, আই থিং আই নিড্ নট্ সে এনি থিং মোর। এক্সকিউজ মি। বলেই ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। এ যেন সার্কাসের সেই আগুন নিয়ে খেলার মত।

তরল গুহ আমার ওপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন—কি, মিঃ রায়, আমি আপনাকে সাহায্য করছি না? আপনি বানিয়ে বানিয়ে আমার বিরুদ্ধে এসব কথা মিঃ ধরকে লাগিয়ে এসেছেন?

নারায়ণ সামন্ত বললেন—না, না, তা নয় তবে—।

কৌন্তেয়ও ফেটে পড়ল—দেখলেন স্যর, আমাদের সম্বন্ধে মিঃ ধরকে কী ইম্প্রেশন্ দেওয়া হয়েছে? এতদিন ধরে মিঃ রায়কে যেভাবে সহযোগিতা ক'রে আসছি—তা যদি আর সম্ভব না হয়—আমাকে দোষ দেবেন না মিঃ সামন্ত।

আমি আবার সহযোগিতার অর্থে অন্য কথা বুঝি। এই যেমন কৌন্তেয়কে বলেছিলাম, গত তিন মাসে আপনি কাদের প্রোগ্রাম দিয়েছেন, আপনার অ্যাসিস্টেন্টকে দিয়ে তার একটা লিষ্ট তৈরী ক'রে দেবেন। কৌন্তেয় মাথা নেড়েছিলেন।

যখনি জিজ্ঞেস করি—কই, আমার লিস্ট কই? বলেন—জানেন, একেবারে সময় পাচ্ছি না। অ্যাসিস্টেন্টকে বলে রেখেছি, আমাকে বলছিল, সব কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না—একটু সময় লাগবে।

—কি, ফাইলপত্র রাখা আছে, না কেউ গুম্ ক'রে দিয়েছে? কৌন্তেয়র মুখ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। পরে এস, ডি, আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন—আপনি ওরকম একটা লিস্ট চাইছেন কেন? খুব যদি দরকার না থাকে তবে ও নিয়ে আর ইন্সিষ্ট করবেন না।

আমি বললাম—না, ও লিষ্ট আমার চাই। আমি যা করছি বা করতে

চাইছি আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়, ডাইরেক্টরেটের স্বার্থে। কাজটা তো আমাকে করতেই হবে। তা কৌস্তেয় বুঝি আপনাকে এ বিষয়ে কিছু বলেছে?

বলেছে জানতাম, তা না হলে মিঃ সামন্ত কথাটা জানতে পারলেন কী করে? কি উত্তর দেন সেটাই তখন আমার জানার কৌতূহল।

—না, ঠিক যে বলেছে তাও নয়; একদিন একটা জরুরী কাজ সময়মত করে নি বলে খুব বকেছি তখন বলে কী, চব্বিশ ঘণ্টা যদি দিল্লীর লিষ্ট তৈরী করতে সময় যায়, তবে আপনার কাজ করবো কখন শুনি? তখন শুনলাম, আপনি ওরকম নাকি একটা লিষ্ট দিতে বলেছেন।

আমি একটু মুচকি হেসে বলেছিলাম—ও লিষ্ট কিন্তু আমি এখনও পাই নি।

তরল গুহ বা কৌস্তেয় ভাবছিল, ওদের প্রভোকেশন্ পেয়ে সহযোগিতার নমুনাটা আমি চোখের সামনে তুলে ধরব। আমি এটা বুঝে গেছি এঁরা একজন আর একজনের সঙ্গে সূক্ষ্ম সুতোতে বাঁধা—এসব জায়গায় বেশী কথা বলতে নেই। আমাকে বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে দেখে ওঁরা বোধহয় আরও কিছু প্রভোকিং কথাবার্তা বলার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন,—আর ঠিক সেই মুহূর্তে মিঃ ধরের মতই ড্র্যামেটিক্যালী বললাম—সহযোগিতার সংজ্ঞা যে কলকাতায় একটু অন্যরকম, তা আমার জানা ছিল না, মাপ করবেন। আমাকে এক্ষুণি একটু নিউজ ডিভিশনে্ যেতে হবে। আপনারা বরং ততক্ষণ একটু আলোচনা ক'রে নিন, কাকে আপনারা সহযোগিতা বলেন। বলেই আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

॥ চোদ্দ ॥

এই যে কিছুর মধ্যে কিছু না, অথচ পেছনে গরম হাওয়া ছড়িয়ে আসি, আমার যা কাজ খুব ক্ষতিকারক। বিপদে পড়লে আমিও খুব ডিপ্লোম্যাটিক হতে জানি। আমার সঙ্গে অনেকেই তখন পেরে ওঠে না, অথচ বিপদ ঘটাই অনেক সময়ে নিজেই, খেয়াল থাকে না। কৌন্তেয় ও তরল গুহকে চটান আমার হয়ত উচিত হল না। চলতি হাওয়ার সঙ্গে যদি নিজেকে একটু ভাসিয়ে দিতে পারি বা স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে যদি ভেলায় ভাসি—তাহলে কিন্তু আমার কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু সাধারণ একটা জিনিসকে রবারের মত অনাবশ্যক স্ট্রেচ্ ক'রে যদি কেউ আপার হ্যাণ্ড নিতে চায়—নিজেকে তখন আর সামলাতে পারি না। আমার প্রতিবাদী সত্তাও হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে। এতদিন সংগ্রাম ক'রেও আমি তাই সরকারী হাইঅ্যারকিতে খুব একটা কেউকেটা হয়ে উঠতে পারি নি; কনডাক্ট রুলগুলি লালিপপের মত পরম সুস্বাদু জ্ঞানে চুষে চুষেও আমি মাঝে মাঝে এমন কটু বাণ ছাড়ি যে লোকেরা আমার ব্যবহারে অধৈর্য ও ঔদ্ধত্য খুঁজে পায়। গোলামীর বন্ধন কি ভয়ানক, গোলাম হয়েও সব সময় তা মনে থাকে না, এ বড় দুঃখের কথা। অনেকবার এরকম সমস্যা হয়েছে—বুঝতে পারছি কৌন্তেয় ও তরল গুহকে যেভাবে চটিয়ে এলাম—কলকাতার সফরটা মোটেই সুখের হবে না। তারই প্রথম পূর্বাভাস পেলাম।

নিউজ ডিভিশনে এসেও কতগুলো যা দৃশ্য দেখলাম, উচিত ছিল, চোখ খুলে রেখেও চোখ বন্ধ ক'রে রাখা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি বোধহয় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে আছি। সাপের ফণাটা নিজেরই অজান্তে ফোঁস্ ক'রে উঠছে; বুঝতে পারছি ক্ষতি হচ্ছে, তবুও—।

রুদ্ধ হালদার রোজই যা করে আজও তাই করছিল। রুদ্ধকে আমার বড় সিম্‌বলিক চরিত্র মনে হল। গোটা পশ্চিমবঙ্গে রুদ্ধরা ভরে গেছে বলেই আমাদের বোধহয় এই হাল। মজা হল, কড়া ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই; আমাদের আইডিয়েল্‌গুলোর কোথায় যেন ভীষণ

গণ্ডগোল হয়ে গেছে; আমরা যেসব কাজ ক'রে বুঝেছি ভীষণ ভুল করেছি, অন্যভাবে অন্য খাতে জীবনটা প্রবাহিত করতে পারলে বেঁচে যেতাম—ওরা যেন, এই রুদ্ধরা সব টের পেয়ে গেছে। এবং আমাদের ভুলগুলো এক অদৃশ্য শক্তিতে জেনে নিয়ে এখন সেই কাজগুলো আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ইচ্ছে ক'রে করে এবং আগে থেকে জানে, আমাদের কি রিঅ্যাক্‌শন্ হবে। আমরা তখন নিজেদের রিফ্লেক্‌টেড্ হতে দেখে বোবা হয়ে যাই; আমাদের আর কিছু করার থাকে না। এই অবস্থাটা কলকাতায় যত দেখছি, ভারতের অন্য জায়গায় অতটা ঔদ্ধত্য বা ইউনিয়নবাজী দেখি না। এখানে দেখছি এবং তার পরিণাম কোথায়, বুঝেও ছিপি এঁটে থাকতে হচ্ছে। রুদ্ধের ব্যাপারেও রোজ যখন একই ব্যাপার ঘটছে, তখন ধরে নিতে বাধ্য হলাম, কিছু করার নেই। তবে একদিন হয়ত আর সহ্য করতে না পেরে ভীষণভাবে বার্স্ট করব। সেদিন সামলান দায় হবে। আমার প্রথম রিঅ্যাক্‌শন্ হল, ইগোটাকে বা বলা ভাল নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে ভুলিয়েভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দি—সেটাই শ্রেয়স্পদ। বোবা-কালা হয়ে থাকার এই সুযোগ। নিষ্কর্মা ও আলস্যে ভরপুর সত্তাটাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়ে শুধু গতির চমক লাগিয়েই চলে ইউনিয়নবাজী (পশ্চিম-বঙ্গের মেহনতী জনতা, এ কথাটা শুনলে আমাকে নিশ্চয় রিঅ্যাক্‌শনারী বলবে, কিন্তু উপায় নেই)। একে মাথায় তুলে লেক্‌চার দেবার মধ্যে একটা করুণ বিশদৃশ্যতা আছে; আসলে যাতে আমার বিশ্বাস নেই তাতে আমার বিশ্বাস থাকা উচিত, এই ঔচিত্যের আপাতবিরুদ্ধ মানসিকতাকে প্রমাণ করতে ঘন ঘন সংগ্রামী হাত তোলার ব্যাপারটার মধ্যে আমি কেমন যেন একটা ভাল্‌গারিটির্ গন্ধ পাই। আমার সহ্য হয় না।

এরা এখানে ঠিক অনুবাদ করে না, নানা এজেন্সির কপি থেকে সারমর্মটা অল্প কথায় তুলে নেয় এবং সরকারী নীতিটা মাথায় রেখে। আমরা একে বলি 'প্যুল' কপি। দিল্লীতে 'প্যুল' কপি হয় ইংরেজীতে, এখানে সরাসরি বাংলায়। লক্ষ্য করলাম রুদ্ধ নিজের কাজ সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নয়; অনুবাদটুকু যে ভালভাবে করতে পারে সেই অহঙ্কারেই মরে যায় অথচ সরকারের নীতিটা সম্পর্কে, যাকে বলে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক্; ইউনিয়ন লিডারদের সব সময় সব কিছু মনে না রাখলেও চলে।

স্বাগত জনা, তরল গুহের পরেই বড় অফিসর; ওর ওপরেই বেশী দায়িত্ব।

তরল গুহ পলিসি পর্যায়ে উঠে গেছেন, এখানে আসার পরে অনেকটা আমার সঙ্গে টেক্কা দিতেই। পলিসি-বাজ হবার সুবিধে রোজকার কাজ নিয়ে অত মাথাব্যথা থাকে না।

ইদানীং তিনিও তাই ; আমাকে ডিঙ্গিয়ে পপুলারিটি গেইন্ করতে হলে কর্মীদের জেহাদেও তলে তলে যে সাহায্য করতে হয়! রুদ্ধ হালদারের চোখে এরা সব ভাগ্যবান জীব। তাই অফিসর হলেই যে রুদ্ধ হালদার মেনে নেবে কদাচ নয়, বরং এঁদের সম্পর্কে ওর অ্যাটিচ্যুডটা মারমুখী। প্রায়ই দেখি, জনার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে আসামের স্টোরি নেবে কিন্তু ওতে কিছু কাটাকাটি করলেই হৈচৈ ক'রে প্রতিবাদ ক'রে উঠবে। ওরকম একটা কিছু ব্যাপার হয়েছিল বোধহয়। আমি আসার আগেই একটা দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেছে। সেটা না জানলেও ব্যাপারটা সুখকর হয় নি অনুমান ক'রে নিলাম। যেটুকু দৃশ্য আমার দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হল, তা আমার কাছে অন্তত সেই মুহূর্তে বড় ইরিটেটিং লেগেছিল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, স্বাগত জনা ও রুদ্ধ হালদারের মধ্যে এরকম একটা ডায়লগ্ চলছে ঃ

—কাটলেই যদি মাথা কাটা যায়, তবে টেনেটুনে আসামের খবরটাই বা নেন কেন ? স্বাগত জনা ঠাণ্ডা মানুষ, তাও দেখলাম বেশ তেতে আছে।

—নিরপেক্ষ কোন খবর দেওয়া কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় বলেই আমার ধারণা।

—তাহলে আমি উঠি, আপনিই বরং এ চেয়ারে এসে বসুন।

—আপনার মত চেয়ারের রোয়াব্ যখন আসবে না—বসে লাভ নেই। (রুদ্ধের নির্বিকার বিদ্রূপ উক্তি)।

—আপনি আসামের খবরগুলি দেখেশুনে লেখার সময় ওরকম ছট্ফট্ করেন কেন ? ওটা রীতিমত সন্দেহজনক।

—কলকাতায় ওদের আমি প্রতিনিধি। আমার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারী অ্যাক্শন্ নিন, দেখি আপনার কত ক্ষমতা।

কিন্তু থেমে গেল দু'জনেই। আমি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে ?

লোকনাথবাবু ডিউটিতে ছিলেন না। জনা সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা মেরে গেল। বলল—না, কিছু না, রোজকার ঐ একই সমস্যা।

আমি ভাবলাম, রোজ রোজ কিসের এদের এত সমস্যা? এরা এত কেন ঘোঁট পাকায়? তাই বললাম—হালদার মশাই, কি ব্যাপার?

হালদার বিরাট চুল আর বিরাট মুখখানা একটু শূন্যে তুলে বলল—ভুল করেছি, মাপ করবেন।

—কিসের ভুল, জনা?

—না, তিনি আসামের স্টোরিটা ওঁর মত ক'রে লিখবেন, তাতে আমি আপত্তি করায়—জনা কথাটা শেষ করতে পারল না বা চাইল না।

—জনা, রুদ্ধ দীপ্ত কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ করল—আপনি কি মনে করেন, আপনিই কাজ জানেন, আর কেউ জানে না? কেন মঙ্গলবার আমি আসামের স্টোরি করি নি? লোকনাথবাবুর মত ফ্যাস্টিডিয়াস্ লোকও একটু আঁচড় বসান নি। কাজ শেখাতে আসবেন না, প্লিজ্। বহুদিন হল নিউজ ডিভিশনে কাজ করছি, তবে অফিসর হতে পারিনি, জীবনে মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেছে।

—আপনার যে কোথায় লাগে, আমি জানি। তা কি করবেন বলুন, ওটা ভাগ্যের ব্যাপার।

এই 'নেভার-এন্ডিং' ব্যাপার দেখলে আমার ছোটবেলার খুলনার কয়েকটা দৃশ্য মনে পড়ে। প্রথম শট্—রামমোহনবাবু 'বদমাশ্' ও 'চোর' ভাইপোকে ধরে রাস্তার মাঝখানে পেটাচ্ছেন। শম্ভু 'বদ্দি ঘরের ছেলে' অথচ গোল্লায় গেছে, যিনি সেই 'ইউনিক' ছেলের জনক শ্যামদাসবাবু, তিনি ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখেন, কিন্তু কিছু বলা বা বাধা দেবার সাহস নেই। ছোটভাইয়ের রোজগারে সংসার চলে, শ্যামদাসবাবু নিজে অত পড়াশুনাও করেন নি, কোন কাজকর্মও করেন না। অতঃপর ঘাটে বসে 'ছেলেটা গোল্লায় গেল' বলে আফসোস। শম্ভু অন্য বাড়ির নারকেল পেড়ে বাজারে বিক্রি ক'রে দেয় এবং বলরামের দোকানে বসে থাকে। এবং নানা ফাই-ফরমাশ খাটে; বলরাম পুকুরে স্নান করতে গেলে দোকান সামলায়। ওরকম একটা অবসরে একদিন ক্যাশ বাক্স থেকে পঞ্চাশ টাকা গায়েব হয়ে গেল। কিছু-না-কিছু এরকম রোজই ঘটে; নালিশ শুনে রামমোহনবাবু লাঠি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে ভাইপোকে ধরে পেটান, শ্যামদাসবাবু ছাদের ওপর থেকে দেখেন, ঘাটে গিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে আফসোস করেন—'ছেলেটা আমার গোল্লায় গেল'। যেন আফসোস করাটাও সামাজিক এক

বড় কর্তব্য। দ্বিতীয় শট্—পড়ন্ত জমিদার গিন্নির সঙ্গে আশ্রিত কামিনী বুড়ির 'নেভার-এন্‌ডিং' লড়াই। ঝি হলেও বহুদিন একই বাড়ির সেবা ক'রে কামিনী বুড়ির বিরাট অধিকার বর্তেছিল। এ লাঠি নিয়ে ছুটে আসে তো অন্য জন লাঠি ধরে বলে—আমাকে মারবি? মার, কত মারবি মার। মেরে ফেল। তারপরেই চার দশকের নানা ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং তুমুল ঝগড়া। ছোটবেলায় এদের ঝগড়া শুনে অবাক হয়ে যেতাম। কেমন যেন ভয় করত।

রুদ্ধ হালদারকে এখনও আমি ঠিক সাইজ-আপ্ ক'রে উঠতে পারি নি। স্বাধীনচেতা মানুষ, এটা বুঝি। আমার মতই বাজে ধরণের একটা প্রতিবাদী মন আছে। তবে একেবারেই ট্যাক্টফুল নয় এবং সমস্ত ব্যাপারে বড় সোচ্চার। মাথা ধরে যায়। জনার জীবনটা পড়ে আছে; অফিসর হলে তাকে কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট নিয়ে ভাবতে হয় বৈকি! কিন্তু হালদার জানে, কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট ভাল পেয়েও লাভ নেই, কোনদিন সে অফিসর হতে পারবে না; সারা জীবন স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই থাকতে হবে। ওর ঠিক পেছনে ছায়ার মত আছে ন্যায্য বা অন্যায্য অসংখ্য হাত এবং প্রবল শক্তি। অন্যায় ক'রেও যারা জানে শত হাত উঠে আসবে ন্যায় বিচারের সোচ্চার পতাকা তলে। সেরকম সিচুয়েশন্ হলে এস্, ডি.-ও ব্যাপারটা নিয়ে হিম্‌সিম্ খাবেন; ডাইরেক্টরেট্ থেকে লোক আসবে ছুটে। মিটিং হবে, চেঁচামেচি হবে এবং 'নানা অভিযোগ' সামলাতে একটা কমিটি খাড়া করা হবে। তখন ইউনিয়নের পতাকা গর্বের হাওয়ায় উড়বে। ক'দিন ক্যান্‌টিনে অকারণ সিগারেট উড়বে কিংবা চা, 'মেহনতী' মানুষগুলো বিজয়ের আনন্দে চা-মিষ্টি পরিবেশন করতে করতে হাসবে আর রুদ্ধ হালদার 'দিল্লীকে' কেমন জব্দ করেছে—সেই একই কাহিনী সবার কাছে একই ভাষায় এবং একই ভঙ্গীতে বলতে বলতে অনেককে ক্লান্ত করবে। লোকেরা সেই সব 'রুদ্ধ' দুয়ারের অতীব বিস্ময়কর কথা শুনে শুনে অকারণে বাহবা দেবে। নেতাকে দু'কাপ চা খাইয়ে ধন্য মনে করবে তারা এবং এদের শক্তিতে অন্যায্য কাজ করার আস্কারা পেয়ে রুদ্ধ নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাস শোনাবে।

এমন একটা মাস্ রেভোল্যুশনের যুগে আমরা বাস করছি, রুদ্ধ হালদারকে অন্য নামে কলকাতার সর্বত্র আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বিপ্লব চক্রবর্তীর কোটটা রাইটারস্ বিল্ডিং-এর চেয়ারে রাখা আছে

অথচ তিনি নেই। কোথায় গেছেন? প্রশ্নটা শুনে সেক্‌শন্‌ অফিসর বিরক্ত হলেন। বললেন—বললাম তো নেই। কাজ করতে দিন। তিনি কাজে মনোনিবেশ করলেন। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম—বিব্রত হয়ে বললাম—বড় কাজ ছিল। অন্য সীমান্ত এলাকার দিকে ইসারা ক'রে বললেন—তবে ওখানে যান। কোটটা তো আছে দেখছি, লাঞ্চের আগে হয়ত আসবে। তিনি আবার কাজে মন দিলেন। বুঝতে পারি, একজন যখন কোট ঝুলিয়ে পার পেয়ে যায়, অন্যকে দ্বিগুণ কাজ করতে হবেই এবং ভদ্রভাবে কথা বলার জন্য যেটুকু অবসর দরকার—সেটুকু সময়ও তার থাকতে পারে না। কোটের দেবতার দেখা নেই কিন্তু দেবতার প্রতীক্ষায় বসে রইলাম। বড় দরকার ছিল। একজন বলল—লাঞ্চেও আসবে কিনা ঠিক নেই। বরং আপনি ফোন ক'রে আসবেন, তাহলে অযথা ওয়েট্‌ করতে হবে না। কোথা থেকে আসছেন?

বললাম—দিল্লী থেকে।

—ওঃ, দিল্লীর একটা গ্ল্যামার আছে বুঝি। সহানুভূতি দেখালেন দেবতার সহকর্মী—তবে বসুন, কোথায় আর কলকাতায় ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরবেন? রাস্তাঘাট অচেনা, না? বড় ঘুরতে হয়, না? জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বিরক্ত হয়, না? তবে বসুন। লাঞ্চ আওয়ারের পরে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠে পড়লাম। রাইটারস্‌ বিল্ডিং-এ ফাইল নড়ে না কেন বুঝি, দিল্লীর প্রায় অফিসের অভিযোগ, কলকাতা কোন চিঠি বা এনকোয়ারির উত্তর দেয় না। অনেক বড় বড় প্রস্তাব তাই হাতছাড়া হয়ে যায়। কে উত্তর দেবে? শিল্প প্রসার কী অত সহজে হয়, চাট্টিখানি কথা? আর চিঠির এনকোয়ারির জবাব দিলেই কি সব হয়ে যায়, অ্যাঁ? আমরা বুঝি না? ওসব চালাকি! সেন্টারের ডিস্‌ক্রিমিনেটিং অ্যাটিচ্যুড্‌ আমরা বুঝি না—? রুদ্ধ হালদাররা ওটুকুই বোঝে; প্রয়োজন পড়লে বইপত্র ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দের পরিসংখ্যান দিয়ে কথাটা প্রমাণ ক'রে ছেড়ে দেবে। ওদিকে কোট ঝুলিয়ে রেখে দেবতা তাঁর পুজো সারেন। যিনি নেই, অথচ যাঁর কোট আছে—তিনি আবার যে-সে লোক নন। একজন লিডার বলেই আমার একটু দরকার ছিল। লেফ্‌ট্‌ ফোর্সের তিনি একজন দারুণ ফোর্স। নাটক করেন, বিদ্রোহের আগুন জ্বালেন, সমাজের প্রতি অনেক দায়িত্ব পালন করেন, মানুষকে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন—সবই সরকারী কস্টে। এত যাঁর কাজ, তাঁর

কোটটা যে অফিসে আছে সেটাই তো বিপ্লবী চেতনার মহা ভাগ্য।

কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল্‌ রিপোর্ট খারাপ হলে রুদ্ধ হালদার তাই পরোয়া করেন না। ইন্‌ক্রিমেন্ট বন্ধ হলেই বা কী? ভবিষ্যৎ আছে? ভবিষ্যৎ যাদের খোয়াবার ভয়, তারাই শুধু পরোয়া করবে—ওতে রুদ্ধের মাথা ব্যথা নেই।

তবুও জিজ্ঞেস করলাম— আপনার প্রবলেমটা কি, রুদ্ধবাবু? সব সময় অত খিঁচিয়ে থাকেন কেন?

—এদের খিঁচুনি দিতে বারণ করুন, দেখবেন আমার মত ভদ্রলোক আর নেই। এরা নিজেদের যে আহামরি ভাবে, সেখানেই যত গণ্ডগোল।

জনা রেগে উঠল—হয়েছে, হয়েছে। কথা না বলে কাজ করুন। সময় হয়ে যাচ্ছে।

—আমার হাতে কিছু নেই। সবই তো আপনি করছেন। দয়া ক'রে যখন পাতাগুলো দেবেন, পড়ে নেবো।

—আমি জিজ্ঞেস করলাম—আর কেউ ডিউটিতে নেই?

রুদ্ধ কি বলতে যাচ্ছিল, জনা বাধা দিয়ে বলল—আছে, আসেনি।

—ও, ক্যাজুয়াল্‌ লিভ? জিজ্ঞেস করলাম।

জনা সামলে নিল—না, টেলিফোন করেছিল পিনাকী ব্যানার্জী—বলেছে, আসতে দেরী হবে।

রুদ্ধ হাসছিল—টেলিফোন করেছিল বুঝি? না, —কি, আপনি ধরে নিচ্ছেন, দেরী হচ্ছে যখন, তখন নিশ্চয় টেলিফোন করেছিল। বলেই আমার দিকে তাকিয়ে একটু বিদ্রুপের হাসি ছড়িয়ে বলল— আসলে, মিঃ জনা যেটা আপনাকে বলতে পারছেন না, তা হল পিনাকী মাঝে মাঝে ওরকম কিছু না বলেই ডুব দেয় এবং আমরা তখন ধরে নিতে বাধ্য হই,—দু'জনের কাজ একজনকেই করতে হবে।

—কি, বলছেন কি, মিঃ হালদার? যখন যা মুখে আসে তাই বলবেন? আপনার আস্পর্ধা এত বেড়ে গেছে? জনা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—আপনি যে মিথ্যে কথা বললেন, দিল্লীর লোকের সামনে সেটা বুঝি আস্পর্ধা নয়? যদি টেলিফোন না করেই থাকে—আচ্ছা সরি, আপনি যখন বলছেন, —আপনি আবার একজন অফিসর—তখন ধরে নিচ্ছি, টেলিফোন করেছিল। আমি বলি কি, তাহলে কি আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে

গেল ? অর্থাৎ পিনাকী আসছে না বলে কি নিউজ বুলেটিন্ যাবে না ? মাপ করবেন, আমার দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ বলল—আপনি দিল্লীর লোক মিঃ রায়, স্যার ; আমার কিছু বলা সাজে না। তবে এই ভাবেই চলেছে। আমরা যে প্রতিবাদে সোচ্চার শুধু এই কারণেই।

—পিনাকী, যতদূর জানি আপনাদের ইউনিয়নের জয়েন্ট সেক্রেটারী।

—তা হলেই-বা। তা বলে কী সে ডিসিপ্লিনের ঊর্দ্ধে উঠে গেছে—অ্যাঁ ? তবে যে আমি জেনারেল সেক্রেটারী—ছুটি নিতে বাধ্য হলে একদিন আগে জানিয়ে দি কেন, শুনি ? কতদূরে থাকি তবু আমি সময়মত অফিসে আসি কি করে ? সেটা তো কোনদিন বলেন না, জনা !

পিনাকীর অনেক ব্যাপার আমি নোট ক'রে যাচ্ছি। অনেক কথা কানে এসেছে। ভাল ক'রে ওয়াচ করার আগে কিছু বলা ঠিক নয়। ওর প্রতিটি স্টেপ আমার কাছে আপত্তিজনক মনে হচ্ছে। রুদ্ধ হালদার যা বলে সামনাসামনি বলে ; ও-ব্যাপারে ওর কোন কারচুপি নেই। পিনাকীর শক্তি আরও অনেক গভীরে ; বড় বড় পার্টিবাবুদের সঙ্গে দহরম্-মহরম্। বুক চাপড়ায় কিনা জানি না, তবে মাঝে মাঝে পলিটিক্যাল পাওয়ারের শ্যাডো প্লে রেডিওতেও দেখিয়ে ছাড়ে। শুনি অনেকের অনেক কিছু করিয়ে দেয়, নিজেরটা অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজনের মত সবার আগে। আমি শুনতে পাই, পিনাকী শুধু খবর দেয় না, খবর নেয়ও। রেডিওর মাধ্যমে কারুর পলিটিক্যাল ইমেজ বাড়াতে হলে পিনাকীকে ধরতেই হবে—বাজারে এরকম একটা কথা চালু। ওর রোজগারপত্রও ভাল হয় না কি ?

বলতে বলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে পিনাকী ঘরে ঢুকল। বলল—ভীষণ দেরী হয়ে গেল, স্বাগতদা। মাপ করবেন মিঃ রায়। এই রুদ্ধ, কোন কাজ আছে ? শীগ্‌গির দিন। আমার পড়ার কথা, না ? দিন, পাতাগুলো এগিয়ে দিন।

জনা বেশ গম্ভীর হয়ে বলল—আজকে হালদারকে পড়তে বলেছি।

রুদ্ধ কোন কথা না বলে পাতাগুলো কারেকট্ করছে। একটা সাদা কাগজ টেনে, খস্ খস্ করে কি যেন লিখল পিনাকী। পড়বে না বলে বোধ হয় একটু অসুবিধা হয়ে গেল। নয়ত অনেক কাগজের মধ্যে নিজের খবরটা ঢুকিয়ে নিলেই তো চলে ! সব জিনিস যে অফিসরকে দেখাতে হবে বা জানাতে হবে এমন তো কোন দাসখত্ লেখা নেই। ওটা একটা ইমেজ বা

ইগোর ব্যাপার। হালদার পড়লে বা অন্য কেউ পড়লে তখন আস্তে ক'রে খবরটা লিখে ধীরেসুস্থে অফিসরের কাছে এগিয়ে দিতে হয়, যেন কিছু না, এমন একটা ভাব। পিনাকী কি যেন লিখে টেবিলে রাখল। পেপার ওয়েটে চাপা দিল। আবার উঠে গেল। আবার এল। আবার উঠল। বুঝতে পারছি একটু অসুবিধা হয়ে গেছে, ও পড়বে না, রুদ্ধ কি পড়তে পারে? কেন যে জনা ওকে পড়তে দেয়? আবার এল, আবার গেল, এবার বোধ হয় বাথরুমে। আমি কিছু না দেখার ভান ক'রে কাগজটা দেখছিলাম। পিনাকী ভাবল, আমি অন্যমনস্ক আছি, সেই ফাঁকে কাগজটা হালদারকে দিয়ে বলল—নিন, এটাও দেখে নিন্। রুদ্ধ খুব মন দিয়ে পাতাটা দেখল,—মাথা নাড়ল। মনে হল যেন ইচ্ছে ক'রেই পিনাকীর কম্‌প্লিকেশন্ বাড়িয়ে দিল। দেখে রুদ্ধের অনেস্টিতে আমি খুব খুশী হলাম। 'না' বলার সঙ্গে সঙ্গে পিনাকী বুঝল—মহা বিপদ। ততক্ষণে ওর পক্ষে আর কাগজটা লুকিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না।

জনা মুখ তুলে তাকাল—ওটা কী?

পিনাকী একবার বলল—কিছু না। কিন্তু রুদ্ধের আজকে যেন অনেস্টিতে পেয়েছে, শট্ ক'রে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল—পিনাকী এই নিউজটা দিতে চায়—।

জনা দেখল, নিউজের চেয়ে নামই বেশী, বলল—ওটা আজকে যাবে না, রেখে দিন।

আমি বুঝতে পারলাম পিনাকী যেখানে গিয়েছিল (পিনাকী কোথায় কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে, কাদের কথায় ওঠে-বসে আমার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে) তারা হয়ত ধরেছে, খবরটা দেওয়া খুব জরুরী। এবং পিনাকী কত রোজগার করে জানি না, পিনাকী মাথা নেড়েছে। এসে দেখে—বিপদ। এসব বুঝেও না বোঝার ইনোসেন্ট্ ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলাম (অর্থাৎ আমি যে কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, কিছুই দেখি না, তারই কন্‌ফারমেশন্)—কি?

জনা চেপে গেল—না, কিছু না। আমাকে ব্যস্ত রাখার জন্য কতগুলো পি, টি, আই, ও ইউ, এন, আই, 'টেক' দিয়ে বলল—আপনি বরং আসামের এই টেক্‌গুলো দেখুন, আবার নতুন ক'রে লিখতে হবে মনে হচ্ছে।

পিনাকী এই মুহূর্তে কি খবরটা দিল, সেটা কায়দা ক'রে গোপন করল

জন্য। পলিটিক্যাল পাওয়ারের সুবিধে এই যে, সে অফিসে বিস্তর কন্‌সেশন্‌ পায় এবং নানা জনের কাছে নানা ভাবে। এবং অনেক সময় নিজেরই অজান্তে। নিউজ ডিভিশনের ভেতরে রোজ যে কত ব্যাপার ঘটে বাইরে থেকে তা বোঝার সাধ্য নেই। আসামের টেক্‌গুলি খুব ইম্‌পরট্যান্ট। মিসেস তৈমুরের সরকার হয়ত টিকতে পারবে না, সি, পি, এম, আর সাপোর্ট দিচ্ছে না। জনাকে বললাম, গৌহাটী ও দিল্লী লাইন বুক্‌ করুন। দিল্লী কোন কন্‌ফারমেশন্‌ পেয়েছে কিনা আগে দেখুন। ব্যস্ততার একটা যেন ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গেল। আমাদের লাস্ট মোমেন্টে লিড্‌ চেঞ্জ হয়ে গেল। মিসেস তৈমুর বিধানসভায় মেজরিটি সাপোর্ট হারিয়েছেন এবং রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। রাজ্যপাল সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ ক'রে বলেছেন পরিপূরক কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি যেন সরকার চালিয়ে যান। বুঝতে পারছি রাতের মধ্যে আসামে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা চালু হবে।

আমি ততক্ষণে ঘরে এসে বসলাম। তাড়াহুড়োর মধ্যে সময়টা কোন্‌ ফাঁকে বেরিয়ে যায় টেরও পাওয়া যায় না। তরল গুহ ছুটতে ছুটতে এলেন —কি, আনওয়ারা তৈমুরের সরকার নাকি পড়ে গেছে? ভোটে নাকি হেরে গেছেন?

হাতে ক'রে একটা খবর এনেছেন, সেদিকে নজর ছেড়ে বললাম—শহরে আপনিই ঘুরছিলেন, আপনারই তো আগে জানার কথা।

—না, হাতে যেটা দেখছেন, আসামের কিছু নয়। ব্যাঙ্কের লোনের খবর। কাল সকালে গেলেও চলবে।

পড়ে দেখলাম স্টেট ব্যাঙ্ক উইকার সেক্‌শনের জন্য গত বছর কি করেছে তার একটা ফিরিস্তি। বললাম—হ্যাঁ, এখন জায়গা নেই। পরে গেলেও চলবে। ওদের গ্রামীণ ব্যাঙ্কটার ওপরে জোর দিয়ে স্টোরিটা একটু রিকাস্ট ক'রে দেবেন।

তরল গুহ মাথা নেড়ে জনার কাছে গেলেন—আসামে কি হল, তার ডিটেল্‌স্‌ এই মুহূর্তে না জানতে পারলে ওঁর যে ইজ্জত নিয়ে টানাটানি—ওরকম একটা মুখের ভাব। আমি থাকলেই এঁদের অস্বস্তি হয়। স্বাধীনতায় বাধা পড়ে। আমি উঠে পড়লাম।

॥ পনেরো ॥

উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলকাতার রাস্তায় হাঁটছিলাম। মনটা বড় অশান্ত। সব কিছু যে দেখছি তা অবশ্য নয়। মাঝে মাঝে কোন মুখই চোখে পড়ছে না; অসংখ্য মাথা এগিয়ে আসছে, সেগুলি মুণ্ডু হয়ে, এক একটি ভঙ্গী হয়ে মহা-জাগতিক কর্মসমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সামনের পার্কে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ধর্মকথা হচ্ছে। গেরুয়াধারী এক মহারাজ নিবৃত্তিমার্গ বোঝাচ্ছেন। যাঁরা নিবৃত্তিমার্গের সঙ্গী—তাঁদের কারুর চেহারার মধ্যে নিবৃত্তিমার্গের চিহ্ন নেই। তবু মানুষের ভেতরের স্রোতের মুখে ভেসে না গিয়ে গেরুয়াধারী হয়ে বা ব্রহ্মবাদ আওড়ে যদি মনের মধ্যে ছোট ছোট বাঁধ দেওয়া যায়—মন্দ কী? ভিড় জমেছে সংসারী মানুষদের। সবার মুখেই বড় ক্লান্তির ছাপ। বাঁচার সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য কারুর মুখে যেন আর নেই; জীবনকে বয়ে বেড়াবার ক্লান্তি যেন চতুর্দিকে। এই যুগের ঘাড়ে এখন চতুর্গুণ বোঝা। নিবৃত্তিমার্গ এই অবস্থায় ঘায়ে মলমের কাজ করে বা মাথা ধরলে ঠিক যেন অম্রৃতাঞ্জন।

কারুর মুখের দিকে তাকাচ্ছি না। ভঙ্গীটুকু মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে। নানা ধরনের মানুষ। নিবৃত্তিমার্গের পাশেই একজন পুরুষ এক ভাড়াটে মেয়েমানুষের উরুতে হাত রেখে বোকার মত হাসছে। তাল গাছটায় হাওয়া আটকে যাওয়ায় কেমন যেন সাঁ-সাঁ আওয়াজ ক'রে উঠল। দু'একটা পাখি ডাক দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মিনি বাসগুলি অসংখ্য মানুষকে বোঁচকার মত বেঁধে চিৎকার ক'রে ছুটে চলল। ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত বাঙালীরা সব বোঁচকা বেঁধে চলত। ষ্টিমারেও বোঁচকা, বোঁচকা খুললে জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে পড়ত। আবার বেঁধে নিয়ে বগলে। ট্রেনে যেতে টিনের সুটকেস, বিছানা আর একটি বোঁচকা। যুদ্ধের সময় বাঙালী জীবনে এক এক ক'রে কম ধাক্কা আসে নি। এক ধাক্কায় বোঁচকা উঠে গেল, এল থলি। থলি হাতে বাঙালী প্রথম লাইন দিতে শিখল—সে কিউ-এর ঠেলায় বাঙালী জীবনের মোটা একটা সময় ঘাম হয়ে ঝরে যায়; বহু শরীরে, বহু মনে ক্লান্তি আর অবসাদের

চিহ্ন রেখে যায়। একটা কাক হঠাৎ ডেকে উঠল। দোতলা বাসগুলি পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। তার উপর তলার মানুষও জায়গার অভাবে দাঁড়িয়ে আছে; সমাজের উপরের তলাতেই যে সুস্থিরতা, সামন্ততন্ত্রের সেই সরলরেখা-গুলো আজকাল যেন অঙ্কের জটিল প্রশ্ন তোলে। প্রাইভেট্ বাসগুলি ভারতীয় জনসংখ্যার প্রতীক চিহ্ন হয়ে চেঁচাচ্ছে। জনগনের পোটেনশিয়ালিটি বোঝে; মানুষগুলোর দাম আজকাল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ পয়সা। তাই বোধহয় দাঁড়াবার সূচাগ্র জায়গা নেই।

আমি তিনটে ট্রামে উঠলাম আবার নেমে পড়লাম। অপরিচিত পথের অনিশ্চয়তা বড় ভয়ঙ্কর। যেখানে এসে দাঁড়ালাম, কিছুই চিনতে পারছি না। ট্রাম লাইন দিয়ে হাঁটলে হয়ত ন্যাশনাল্ লাইব্রেরীতে পোঁছে যাব। আকাশটা মেঘ ক'রে ছিল। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। ছোটবেলায় কলকাতায় ভোর হতে না হতে বড় বড় হোস্ পাইপ দিয়ে গঙ্গার জলে রাস্তার ধূলো সাফ করা হত। তখনও সাহেবরা দেশ ছেড়ে যায় নি। এবং তাদের বাঙালী একটু ভয় ক'রে চলত বলেই বোধহয় করপোরেশন তখনও অত করাপ্‌ট্ হয়ে যায় নি। কিছুটা কাজ হত। এখন বিস্তর স্বাধীনতা পেয়ে সবাই বড় স্বাধীন হয়ে গেছে। কাজ না করলেও মাসের শেষে মাইনে পাওয়া যায় এবং মাইনে না বাড়লে আবর্জনা জমিয়ে রেখে পৌর-জীবনকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্র চলে। দাবী মানতে মানতে শেষ পর্যন্ত হয়ত ভবিষ্যতে ঘরে বসিয়ে সবাইকে মাইনে দিতে হবে।

আজকাল কলকাতার ধূলো বা ধোঁয়াশা চতুর্গুণ বেড়েছে বলেই বোধহয় হোস্ পাইপের প্রয়োজন পড়ে না। গঙ্গার জল যেভাবে পল্যুটেড্ হয়ে উঠছে ওগুলো দিয়ে খুব যে লাভ আছে তাও নয়। মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্বিকল্প সমাধি যখন দেখছি, আর তার নির্বিকার কঠিন একটা স্বরূপ নিয়ে যখন ধ্যান করছি—তখন দেখি ঝির্‌ঝির্ বৃষ্টির মধ্যেই সূর্যের কমলালেবুর রঙ। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

সারা কলকাতার বুক চিরে অপারেশন চলছে। মানুষকে পাতাল রেলে নিয়ে যাবার আশ্বাসে ভরপুর ক'রে রাখা হয়েছে। শুনলাম চারশো কোটি (না কি আরও বেশী?) টাকার বিনিময়ে কলকাতাকে পাতালে নিয়ে যাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ; অন্তত শেষ হয়েছে খোঁড়াখুঁড়ি এবং প্ল্যানিং। এক অবাঙালী ম্যানেজার—কলকাতায় যিনি চোদ্দ বছর কাটিয়েছেন, তাঁর

মন্তব্য মনে পড়ে গেল। বলেছিলেন—কি জানেন, বেস্‌-এ গণ্ডোগোল। কাজ বেস্‌-এ যদি মজবুত না হয়, পরের ধাপে কাজ করতে গিয়ে বেস্‌-এর ফাঁকি ধরা পড়ে তখন আবার প্রথম থেকে সাপের লুডোর খেলা শুরু হয়। পরের ধাপ করতে গিয়ে আবার দ্বিগুণ খরচের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়। কলকাতায় এইজন্যে কিছু করা মুশকিল। খোঁড়াখুঁড়ি করলে অতীত ইতিহাসের অনেক আবর্জনা বেরিয়ে পড়ে; তাই হয়ত কাজের চেয়ে অকাজের বোঝা বাড়ে। আর অকাজেই তো 'নিঃস্বার্থ' দেশপ্রেমিকরা টাকা করে ও টাকা ছড়িয়ে চাঁই-বাবার ফটোতে ফুল চড়াতে পারেন। ওতে টাকাও হয়, আবার বাঙালীর প্রিয় কালচারও। কলকাতার এক মহামানব (এরকম কত মহামানব আছেন কে জানে?) খোঁড়ামাটির ভস্ম রোজ একটু জিভে ছোঁয়ান—কারণ মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তিনি চল্লিশ লক্ষ টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। মাটির মধ্যে যে সোনা লুকনো থাকে, কতিপয় বাঙালী মহামানবের সেটা বোধহয় উনিশ শতকে জানা ছিল না।

এদিকে বেশী খোঁড়াখুঁড়ি নেই, আবার জলও দাঁড়ায় নি। অর্থাৎ মাথায় পাকা চুল হলে কী হবে, মানুষটাকে ঠিক তরুণ তরুণ লাগে। একদল লোক বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একটা বাড়ির বাইরের দিকের বারান্দার খাঁজে আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা যেমন একসঙ্গে ট্রেনে ওঠে, একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজে, আবার একসঙ্গে মাথা বাঁচায়—আমিও তাই মাথা বাঁচাতে ছুটলাম ভিড়ের খাঁজে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের মুখে কলকাতার পদোন্নতি শুনছিলাম—টালিগঞ্জের দিকে, এই ধরুন বাঁশদ্রোনীর দিকে আগে বৃষ্টি হলে রক্ষে ছিল? কাজ হয়, মশায়,—কাজ হয়। আমরা বাঙালীতো—বাঙালীর কোন ভাল জিনিস দেখতে পারি না। স্বামিজী বলেছেন—পরশ্রীকাতরতাই জাতটাকে শেষ ক'রে দিল। অনেক রাস্তাতেই আজকাল জল জমে না। এখানেও তো জল জমে নি—কে বলে, কাজ হচ্ছে না? কাজ করতে আমরা দিচ্ছি? যোগসাজস নেই, করাপ্‌শন্‌ নেই? অন্য জন বলল—ব্রিজের কি রকম কাজ হচ্ছে দিল্লীতে গিয়ে দেখে আসুন। সবই চলছে, সবাই টাকা ওখানেও লোটে কিন্তু কিছু কাজ হয়—এখানে পাঁচ বছর ধরে ছুতোরের মত আমরা খুট্‌খাট্‌ শুরু করেছি।

বৃষ্টি একটু থেমেছে। আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে বসলাম। বইয়ের জগৎ বড় অদ্ভুত নিরাপদ। বৃষ্টি নেই, ভিড় নেই আর হাজার কথা,

নেই। উনিশ শতকের বাংলা—আর, সি, মজুমদার। তখন বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মুসলীম। দু'শো বছর ধরে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে আসছে। দু'টি দলের মধ্যে তখনও গভীর বিভেদ। সাহিত্যেও তার চিহ্ন। ঢাকা ও কলকাতায় ইংরেজী পড়ুয়া লোকেদের সংখ্যা বাড়ছেই। য়্যুরোপীয়রা শুধু উঁচু মহলের মসনদে যাতায়াত করেন এবং তাঁদের সঙ্গেই সামাজিক যোগাযোগ রাখেন। বাংলার অবস্থা তখন মোটেই ভাল নয়। বাঙালীদের লোকেরা ভীরু ভাবত—সাহস নেই, শরীরে শক্তি নেই। অনেক য়্যুরোপীয় তাদের 'বর্বর ও অসভ্য' বলেই জানত। ১৭৭২ সালে চার্লস্ গ্রান্ট্ একটা বই লিখে বাঙালীদের ধুইয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—য়্যুরোপে যত অনুন্নত শ্রেণীর লোক আছে—তাদের চেয়েও বাঙালীরা হীনবুদ্ধির জাত। কোর্টকাচারীতে দুর্নীতির ছড়াছড়ি। পড়ছি আর এগুলি নোট ক'রে নিচ্ছি। বাইরে বোধহয় বৃষ্টিটা জোর নামল। বহু পুরনো যুগে ফিরে গেছি। ভিড়ভাড়াক্কা আর হাজার শব্দে আর পাতাল যাত্রীদের সম্ভাবনা থেকে অনেক দূরে, দূর অতীতের টুকরো টুকরো ছবি। স্বাতী বলেছিল, বইটা পড়ে কিছু নোট ক'রে নিতে। মিঃ চৌধুরী ঠিকই ধরেছেন, একজন রিসার্চ করছে আর অন্য জন খুঁজে বেড়াচ্ছে আর কোথায় কী পাওয়া যায়!

হেস্টিংস্ও বাংলার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। তার কুড়ি বছর পর তিনি দেখেছিলেন, বাঙালীরা প্রায় জন্তুর মত থাকে। ১৮১৩ সালের উক্তি। জন্তুরা যেভাবে থাকে, বাঙালীরা সেই একই ধরণের কাজ ছাড়া আর কিছু করে না। অথচ বিশপ্ হেবার নিশ্চয় লোকেদের সঙ্গে আরও হয়ত বেশী মিশতেন, তাই বাঙালী তাঁর কাছে এক বুদ্ধিমান, প্রাণবন্ত জীব। মেলামেশা করলে মজা লাগে, কৌতূহল জাগে। রামমোহন রায় ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, দাওয়ায় কৃষক, মাঠে কর্মরত কৃষকের মুখে সরল হাসি, ঠাণ্ডা মেজাজ আর সহনশীলতা। সহনশীল না হলে কী তারা শহরের অত অত্যাচার অত নির্বিকার ভাবে আর ভগবানের নামে শতাব্দীর যন্ত্রণা ওভাবে উড়িয়ে দিতে পারত? রামমোহনের আন্দোলন অবশ্য দাওয়ায় বসা কৃষকদের দিয়ে নয়—'সরল' লোকেদের নিয়ে কোনকালে কী আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে? শহরে তখন পণ্ডিতকুলের আধিপত্য—তাঁদের অনুশাসন থেকে সমাজটাকে একটু টেনে বার করতেই রামমোহনের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মন্তব্যগুলি লিখছি কার্ডের বাঁ-পাশে। তথ্যের সঙ্গে মন্তব্য থাকলে স্বাতীর

তথ্য-ব্যবহারে অসুবিধা হতে পারে। পরিশ্রম বৃথা না যায়—সেদিকে আমি খুবই সচেষ্ট। রামমোহন মুসলমানদের দেহের শক্তি দেখে খুশী হয়েছিলেন। বলেছেন, ওরা অনেক বেশী কাজ করে, ওদের পরিশ্রম করার অনেক বেশী ক্ষমতা। হিন্দুরা অত পেরে ওঠে না।

তবে মুসলমান খানদানীরাই শুধু লেখাপড়া করতেন। এই যা মুশকিল। এবং নবাবী হিন্দুরাও। বিষয়বস্তু সংস্কৃত, পার্সী, স্মৃতি আর একটু ব্যাকরণ—ব্যস। পড়াশুনা শেষ। জীবনে চলতে গেলে যা-যা জানা দরকার—তাও তাঁরা সেদিন পড়তেন না। আইন ও নীতিশাস্ত্র যদিও বিষয় ছিল। মেয়েরা ভূগোল পড়তে এসে হেসে কুটোপাটি হত। শিক্ষা ছড়াচ্ছিল কচ্ছপ-গতিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অ্যাডামের রিপোর্টে তখনকার বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার একটা স্পষ্ট ছবি চোখে পড়ছে। পুরোপুরি টুকে নেওয়া ভাল, দ্বাতীর হয়ত কাজে লাগতে পারে। তখন বাংলায় পড়ান হত। বাংলা তখন হিন্দু-মুসলমান, দুই সম্প্রদায়েরই ভাষা। তবে বাংলা-বিহারের শিক্ষিত ও খানদানী মানুষেরা হিন্দুস্থানী বা উর্দুতে কথা বলতেন। সেখানেও স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। স্কুল মানে সব প্রাইভেট ব্যাপার; বেশীর ভাগ কুঁড়ে ঘর, তাও আবার গোণাগুণতি। স্কুল তৈরী করার খরচও কম ছিল, সওয়া টাকা থেকে নিয়ে দশ টাকা। বাংলা-বিহারের শিক্ষকদের মাইনেও খুব কম ছিল; (এখনও কি তাঁদের অবস্থা ফিরেছে? নিচের তলার অবস্থা, ভারতবর্ষে কি এক দুর্বোধ্য কারণে, কোনকালেই ফেরে না। সেদিন কিউতে বাবুরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে দেখে এক গরীব বউ রেগেমেগে বলেছিল—বাবুরা সব খেয়ে নেয়, আমরা পাব কী?) মাসে তিন টাকারও কম। অর্থাৎ যারা কলকাতায় সেদিন খেটে খেত বা যারা চাকরবাকর, তারাও এরচেয়ে বেশী টাকা পেত। শিক্ষকরাও তেমনি ছিলেন। অন্য কোন জায়গায় যাদের কিছুই হল না, তারাই শিক্ষক—সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনুপোযোগী। এঁদের নৈতিক প্রভাব ছাত্রদের ওপর প্রায় ছিল না বললেই হয়। দেশীয় ভাষায় বই বলতে কিছুই বিশেষ ছিল না; শিক্ষকরা স্মরণশক্তির পরীক্ষা দেখিয়ে যা পড়াতেন—ওটুকুই। বই বলতে ছিল দেব-দেবীর প্রতি নিবেদিত শ্লোকগাথা বা দাতা কর্ণের মত ঘটনার ওপরে লেখা কিছু কিছু বই। শিক্ষকরা ছাত্রদের ধরে ধরে মারতেন। স্কুল মানেই রাম চিমটি বা মাথায় গাট্টা। ছাত্রদের কাছে স্কুল ছিল বিভীষিকা, যেন কারাগারের মত।

মেয়েরা পড়তই না। মুর্শীদাবাদে অ্যাডাম মাত্র নয় জন মহিলার দর্শন পেয়েছিলেন, যারা লিখতে-পড়তে ও নিজের নাম সই করতে পারে। অন্য কোন জেলায় মহিলাদের কেউ তখনও পর্যন্ত নিম্নতম শিক্ষাও পায় নি। ও ভাগ্য ছিল জমিদার ও কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পত্রপত্রিকায় শুধু এই তর্ক আর বাদ-বিসম্বাদ—মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া শাস্ত্রসম্মত কিংবা শাস্ত্রবিরোধী। ধর্ম নিয়েও বাঙালী কম দলাদলি করে নি। দল ভাঙ্গান থেকে শুরু ক'রে আবার দল গড়া এবং আবার তাকে ভাঙ্গা—এভাবে লোকবলের যে কিভাবে সর্বনাশ হয়েছে ভাবা যায় না। কোন্ আন্দোলন এ দেশের পক্ষে উপযোগী, তা নিয়ে আত্ম-জিজ্ঞাসায় বা দুর্ভাবনায় এখন যেমন সময় নষ্ট। সমাজটার সেদিন কতটা অধঃপতন হয়েছিল, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হবে কি হবে না—এ নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে সুস্পষ্ট। পুরুষরা সেদিন তো সব কুলীন হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল (স্বাতীকে বলতে হবে) সাহেবদের দরবারে অবিরত পিটিশন্ ছাড়া। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হলে তারা বিধবা হবে বা সেটা সমাজের গুরুতর অধঃপতন ডেকে আনবে, সেটা বোঝাতেই তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা মাথা ঠোকাঠুকি করেছিলেন এবং রক্ষাকর্তাদের কাছে পিটিশন্ ছেড়েছিলেন। অতীত ইতিহাসের এ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, আমরা সিঁড়ি বেয়ে কোথায় নেমে গিয়েছিলাম। এ বিষয়ে এক হাজার ছেচল্লিশটি পিটিশন্ পড়েছিল। করেছিলেন একশো কুড়ি জনের মত পণ্ডিত, হিন্দু সমাজের সব বড় বড় মাথা। মানুষের মন-বুদ্ধি ও শক্তির কি ভয়ানক অপচয়! কুলীনরা তখন সব কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছরের মেয়েদের কুমারিত্ব ঘুচিয়ে পরকালের জায়গা করতে ব্যস্ত। সবাই বৃদ্ধ, তবু তো পরম পূজনীয় স্বামী। প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মের পঞ্চাশটি বউ বা কখনও ষাট—এ না হলে কী কুলীনত্ব বজায় থাকে?

উঠে পড়লাম। স্বাতীকে নোটগুলি দেখাতে হবে, মন্তব্য সমেত। বিশেষ ক'রে ঐ পিটিশন্ দেবার ব্যাপারটা। নিজেদের আত্মমর্যাদা খুইয়ে পরজাতীকে উদ্ধারের 'রাজা' ভাবার মধ্যে মস্ত বড় একটা হীনমন্যতার ভাব আছে। বুঝতে পারি দুই দশক ধরে শুধু মানুষের চেতনা জাগাতেই বিবেকানন্দের সব শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল কেন?

বিকেল পাঁচটা। এখনও মেঘলা আকাশ। প্রাইভেট বাসে চেপে

বসলাম—এদিকটা ভিড় হলেও অত বোঝা যায় না। রেড রোডের দু'পাশের মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। সার বেঁধে গাড়িগুলো চলেছে; একটু সবুজের ছোঁয়া ও দূরত্বের ব্যবধানে মানুষের চলাফেরা আর গাড়ির গতির মধ্যে একটা প্রাণবন্ত ছবি ফুটে উঠছে। এস্‌প্ল্যানেডে এসে ভাবলাম—একবার অফিসে যাই। ভাল লাগছে না, প্রয়োজনও খুব একটা নেই। সকালে ঢু মেরে এসেছি। স্বাতীকে বাড়িতে পাব কিনা জানি না। বলছিল, একবার ইউনিভারসিটি যাবে। সকালবেলা ফোন করার কথা ছিল। ফোন করার ঠিক অবসর হয় নি। ভেবেছিলাম স্বাতী ফোন করবে—করে নি। দু'চার দিন এরকম হয়—দেখা করার ইচ্ছে থাকলেও কিছুতেই হয় নি। মিঃ চৌধুরী রাতে একটা পার্টির আয়োজন করেছেন। বলছিলেন, দু'চারজন পার্টির লোক আসবে, দু'একজন সাহিত্যিক—আমি যেন তাড়াতাড়ি ফিরি। এবং পারলে যেন স্বাতীকে নিয়ে আসি। স্বাতীর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবেই জিজ্ঞেস করতে পারি। যাবে বলে মনে হয় না।

ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অনেক কিছু চোখে পড়ছে। নানা লোকের জটলা নানা জায়গায়। অনেক তরুণ সাহিত্যিক চা-মিষ্টি খেতে মোড়ের দোকানে ঢুকল; দু'একজনকে চিনি। দাঁড়িয়ে হাত মেলাল। দু'একজন ওদের সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করল। গেলাম না। একটা নাট্যদলের কয়েকজন পরিচিত মুখ। ধর্মতলার মোড় থেকে রাস্তা পেরোতে গিয়ে চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে গেল—আপনি? কলকাতায় এসেছেন শুনেছি, চলুন—চা খেয়ে আসি। এদের নাটকের রিহার্সালে দু'একদিন গিয়েছিলাম। দূর দূর থেকে আসে অফিসের পরে; নাটক করার নেশা কি ভয়ঙ্কর, ভাবলে অবাক লাগে। কলকাতায় কেউ দল ছাড়া নেই। নান্দীকরের সৌমিত্র বউ নিয়ে রাতে বোধহয় রেস্তোরাঁর দিকে যাচ্ছিল। আমাকে ডাকল—চলুন, একটু গলা ভিজিয়ে আসি। হেসে হাত মিলিয়ে বললাম—দু'একদিন ফোন করেছো, আমি অফিসে ছিলাম না, কিন্তু খবর পেয়েছি। ভাল আছ তো? সৌমিত্র বলল—অনেক কথা আছে অমরেশদা, কবে আসব বলুন? বললাম—কাল, অফিসে।

আর দেরী করা যায় না—ট্রামে উঠে পড়লাম। স্বাতীর সঙ্গে আজ দেখা হবার চান্স নেই। ট্রামের ভেতরে যেন নিঃশ্বাস নেবার জায়গা নেই। কোনমতে গায়ে-গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভিড় বাড়ছে। এখন লোকেরা

বাঁদরঝোলা হয়ে যাচ্ছে। বড় অবাক লাগে। রেগে গেলে মানুষের টোপোগ্রাফি কী বদলে যায়? যেমন দেখেছি মানুষ শয়তানী করতে করতে শেয়াল হয়ে বনে-বাদাড়ে (এবং স্কাইস্ক্র্যাপারের লিফটে) হুক্কা-হুয়া ডাকে। মানুষ বস্‌-এর সামনে বেড়াল-ছানা হয়ে মিউ মিউ করে। কখনও ইঁদুর হয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়ে গৃহিনীর ঝাঁটা খায়। বাঘ হতে গিয়ে বেড়াল হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ খায়। বাঙালী আবার পাওয়ার আর প্রেস্‌টিজ্‌ ও অর্থের দাপটে বাঁদরের মতই সমাজের উঁচু স্তরে লাফ-ঝাঁপ মারে। ট্রামে-বাসে কলকাতার প্রকৃত সাম্যবাদী চেহারাই চোখে পড়ে। কত রিস্ক নিয়ে লোকেরা যে যাতায়াত করে! এর থেকে পরিত্রাণ পাবার কী কোন উপায় নেই? পাতাল রেল হলে লোকেদের কী এরকম আর ঝুঁকি নিতে হবে না?

ট্রামটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে—মাস মাইনের দিন। পকেটমারের মরশুম। একটা লোককে ধরে বেদম প্রহার দিল কলকাতার জাগ্রত মানুষ। দিল্লীতে যা ভাবা যায় না; আঁচল ধরে ওখানে সব ক্যারিয়ার সামলায় আর রিটায়ার্ড ক'রে ব্যাঙ্কের টাকা গোণে। তাই জাগ্রত হওয়া দিল্লীতে একটু মুশকিল। হৈ-চৈ, হট্টোগোল—আবার চুপ। জনসমুদ্রের জাহাজে যেন কালবৈশাখী ঝড়। এদের মত হতে গেলে সামান্যমাত্র ইগো থাকলে চলে না। দিল্লীর বাস কনডাক্‌টারের ইগো দেখলে ভড়কে যেতে হয়; কেউ বসতে পারুক আর না পারুক, তিনি সমুন্নত আসনে সমাসীন।

কফি হাউসে বসে ছিলাম। স্বাতীর সঙ্গে দেখা হবার চান্স মিস্‌ হয়ে গেছে। ধর্মতলার মোড়ে বড় বেশী সময় নষ্ট করেছি। ভাল লাগছিল লোকজন দেখতে। কলকাতার লোক, এসব জিনিস দেখতে আবার এতটা সময় নিশ্চয় নষ্ট করে না; অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে অভ্যস্ততার মধ্যে নতুন জিনিস চোখে পড়ে না। ব্যস্ত মানুষ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ছুটতে গিয়ে ক্যান্‌ভাসে কী নানা রকম ফর্ম ছড়ায়? কেউ কেউ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—হাসছে, আবার দল বেঁধে রেস্তোরাঁয় ঢুকছে, সিনেমা ভাঙ্গল, রাস্তাঘাট-ট্রাম-বাস উপচে পড়ছে মানুষে। কত ধূলো উড়ল কে জানে? এরকম পরিবেশে চলতে চলতে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বোঝা মুশকিল, মানুষ প্রকৃতই প্রগতির পথে এগোচ্ছে কিংবা এক জায়গায় থেমে আছে।

কফি হাউসে তরুণ-তরুণীরা মহা সোচ্চার। গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি,

ঠিক বুঝতে পারছি না, কি বিষয়ে তারা আলোচনা করছে। বোঝার দরকারও নেই। একসঙ্গে আসে, বসে, কথা বলে, হাসে, চিৎকার ক'রে— মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানায়, তখন হাতের চুড়ির আওয়াজ হয়—কোণে একা বসে দেখতে ভারি মজা লাগছিল। চারিদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম,—না, স্বাতী কোথাও নেই। এখন আসার সম্ভাবনাও কম। পরিচিত কোন মুখেরও দর্শন পেলাম না। কফি হাউসে বেশীক্ষণ একা বসে থাকতে খুব খারাপ লাগে।

হাত তিনেক দূরে যে দু'জন বসে আছে এবং তাদের দলে এই মুহূর্তে আরও কয়েকজন এল—বসল, কফির অর্ডার দিল। এঁদের চিনি। একজন তরুণ লেখক ও পাবলিশার্স, হাত তুলে ডাকল। স্বাতীর জন্য আরও একটু অপেক্ষা করব, না এদের দলে ভিড়ে যাব, বুঝতে পারছিলাম না। 'সৃজনী-সংবাদে'র সম্পাদক হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছিলেন, প্রকৃত সাহিত্য কাকে বলে। আমাকে ডাকলেন। উঠে গেলাম। এঁদের দলটা 'মনোপলি' সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে সোচ্চার। লেখক মানে কি বেশ্যা? চিত্ত সিংহ বেশ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্নটা করেই খেয়াল হয়েছে— আমি হয়তো সবাইকে নাও চিনতে পারি। অন্য কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সব উঠতি লেখক বা কবি, কারুর লেখাই সেরকম পড়ি নি, তবে বুঝলাম এরাও মনোপলি বা এস্‌টাব্লিশমেন্ট্ সাহিত্যের বিপক্ষে।

চিত্ত সিংহ কাউকে বলার সুযোগ দেন না—নিজেই জিজ্ঞেস ক'রে নিজেই তার উত্তর দিলেন। —কি লেখা হচ্ছে শুনি? এগুলোকে লেখা বলে? আমরা বুঝি না? আমরা সাহিত্য করছি না? একে বলে বাজারী সাহিত্য, সস্তা সেন্টিমেন্ট্ আর সর্বযুগে যা বিকোয়—সেক্স্। মেয়েমানুষ নিয়ে জমিদাররাও পড়ে থাকত একদিন, কিন্তু এখনকার সাহিত্যিকদের সে সাহসও নেই। ছুঁক ছুঁক করে—ভোগ করার সাহস নেই, মশায়। লেখাতেও সেই ছুঁক ছুঁক ভাব। রেনেসাঁস বাজে বুলি। ওসব ভুয়ো। যা কিছু সাহিত্যের নামে চলছে, শ্রেফ্ অনুকরণ। অনুকরণে কখনও রেনেসাঁস আসে না। আসতে পারে না।

ক্রমেই কফি হাউসে একটু যেন গণ্ডোগোল পাকিয়ে উঠল। অন্য টেবিলের কিছু ছেলে চিত্ত সিংহের সঙ্গে কথা বলতে চায়। ছাত্র নেতার

মত একজন ভারিক্কি, তরুণ—দাড়িভরা মুখে বাধা দিচ্ছে। একজন দূত এল চিত্ত সিংহের কাছে। এরা কিছু বলবে। চিত্ত সিংহ তাদের ডাকলেন—তিনিও কথা বলতে রাজী। অল্পেতেই গরম হয়ে উঠল হাওয়া। চিত্ত সিংহ নাকি গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁস এসেছে এ ভুয়ো বিশ্বাস। কথাটা কেন লিখেছেন, অত সিমপ্লিফিকেশন্ সম্ভব কি না—অন্য ছেলেদের এটাই বক্তব্য। চিত্ত সিংহ শুনে গরম হয়ে উঠলেন—বললেন—তোমরা কি বলতে এসেছো আমি জানি। তোমরা বলতে চাও রবীন্দ্রনাথের জন্যই আজকে বাংলা সাহিত্যের এত উন্নতি। আমি তোমাদের সেই ভুলই ভাঙ্গাতে চাইছি। আমি বলতে চাইছি পূজো করার স্বভাব ছেড়ে যদি একটু বিশ্লেষণের মধ্যে যাও, তোমরা আমাকেই হয়ত সমর্থন করবে। যেমন ধর রামমোহন স্ব-স্বার্থেই ইংরেজকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং সাহেবদের তোষণ ক'রে ক'রেই বড়লোক হয়েছিলেন। তোমরা বলবে, প্রমাণ কী? আরে, পড়াশুনা করেছো যে জানবে? ঐ সব বাজারী সাহিত্যই তো পড়। আমি যে রামমোহন সম্পর্কে ভয়ানক একটা বিস্ফোরণসূচক কথা বললাম, আমি জানি আমার হাতে আছে ইতিহাস, হাতে আছে আমার দলিল-দস্তাবেজ। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনেরই ভাবশিষ্য। দেবেন্দ্রনাথ পারিবারিক স্বার্থ বজায় রাখতে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কি, তোমরা আঁতকে উঠছো যে, হ্যাঁ, ইতিহাসকে একটু অন্যরকমভাবে দেখতে শেখো। আজ যখন আমাকে চ্যালেঞ্জ দিতে এসেছো তোমরা, আমি কিছু সত্য উক্তি করবই। ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ত্যাগ করতে রাজি হন নি, এবং পারিবারিক সম্পর্কের গণ্ডী বাড়াতে ব্রাহ্মণ সন্তানদের অর্থ-মূল্যে ক্রয় ক'রে ঘরজামাই করেছিলেন।

একজন বলল—আপনি তো ব্যক্তিগত কথা তুলছেন, সেটাই কী ইতিহাস? চিত্ত সিংহ বিরক্ত হলেন। বললেন, কথার মাঝখানে কথা বললে যে খেই হারিয়ে যায়, তাও কী তোমাদের বলতে হবে? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথ নিজেদের পারিবারিক ইতিহাসের দৈন্যের খবর রাখতেন, তিনি জানতেন অর্থও সম্যক আভিজাত্য দেয় না, বিশেষতঃ সেই সময়ে। তিনিও হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন কন্যাদের পাত্রস্থ করতে। সেদিন ধনাঢ্য কলকাত্তাই সমাজে আমাদের চিরন্তন চর্যা-সংস্কারের অপমৃত্যু হল; আমরা দেখলাম

রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মুখেই বাংলার ঐতিহ্য, তার সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কার *বিকৃত হল।

—তোমরা আরও ক্ষেপে উঠবে আমি জানি। কিন্তু বলতে যখন বাধ্য করেছো, আমি আজকে বলে যাবই। তোমরা কান দুটো চেপে থাকলেও, বলব রবীন্দ্রনাথ পৈতৃক ভাবনার হাত ধরে বাংলার জল-মাটি-আবহাওয়াকে ডিঙিয়ে, হয়ে গেলেন একেবারে ভারতীয়। এ বাঙালীর ইতিহাসের, বুঝলে, এক দুঃসহ ট্র্যাজেডি। অথচ তিনি বাংলার হয়ে গান গেয়েছেন, গল্পও লিখেছেন। আজ বিস্ময়ে দেখি, সে সব সৃষ্টি, সাংবাদিক দৃষ্টিতে ভরা, সাহিত্যিক আবিষ্কার বলতে আমরা যা বুঝি, তার গভীরতা এতে বড় অল্প। তিনি কলকাতায় থেকে উপরতলার মানুষদের নিয়ে উপন্যাস ফাঁদলেন, ধিক্কার দিলেন সন্ত্রাসবাদীদের, গোরা কিন্তু আইরিশ্ জাত আর সুচরিতা তার প্রেমে মুগ্ধ। সেই গোরাকে দিয়েই তিনি ভারতীয়তার মহাউদ্বোধন ঘটালেন। কি, কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? আমার প্রত্যেকটি কথা ভেবে দেখার মত, কারণ আমিও রবীন্দ্রনাথ কম পড়ি নি, তোমরা মনে কোর না, আমিও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবি নি। আরও আছে, জীবনের পরতে পরতে পুঁতে দিলেন তিনি ঔপনিষদিক শুদ্ধতাবোধ অথচ মৃত্যুর কিছুকাল আগে লিখলেন— কি লিখলেন? লিখলেন, যা আজকাল পড়া যায় না, সেই নক্কারজনক 'ল্যাবরেটরী'র মত গল্প। গল্পটা পড়েছো তো? আজকাল যা গল্প লেখা হচ্ছে এবং যা পড়ে পড়ে আমরা ক্লান্ত ও বিদ্রোহে সোচ্চার, তার থেকে রবীন্দ্রনাথের এ গল্পটা কী খুব বেশী ভাল বা খারাপ, বল? অন্তিমে 'সভ্যতার সংকট'এ ও 'শেষ লেখায়' আযৌবন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি করলেন তীব্র ঘৃণার বিষোদ্গার। রবীন্দ্র-জীবনে এসব কনট্রাডিকশন্ কী তোমাদের চোখে পড়ে, অ্যাঁ? পড়ে না, কারণ তোমরা সব না-পড়ে রবীন্দ্রভক্ত। জান তো, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর চুল নিয়ে টানাটানি পড়েছিল? এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের আমরা ভক্ত এবং রবীন্দ্র-এক্সপার্ট হয়ে দু'পয়সা কামাচ্ছি যখন, তখন এসব আত্মবিশ্লেষণ শুনতে কার-বা ভাল লাগে বল? আমি যে কথাটা সম্পাদকীয়তে বলতে চেয়েছিলাম, দেখছি তোমরা কেউ সেটা ধরতে পার নি। আমি বলতে চেয়েছি, জাতীয় শেকড় থেকে বিচ্যুত হলে তার যে কি মর্মান্তিক পরিণাম, রবীন্দ্রনাথ তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।

আমি এরকম বিদগ্ধ আলোচনা শুনে হক্‌চকিয়ে গেলাম। তবে কি বাংলার শেকড় বলতে চিত্ত সিংহ চর্যা-সভ্যতায় ফিরে যাবার কথা ভাবছেন? দিল্লীর লোকের কাছে এসব বৈপ্লবিক কথাবার্তা অনেকটা যেন ভূকম্পন-বোধ আনে। তাই আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। রাত হয়ে যাচ্ছে। এসব আলোচনা আরও কতক্ষণ চলবে বলা মুশকিল। আজকে আর ভাল লাগছে না। তাছাড়া মিঃ চৌধুরীর পার্টিতেও যেতে হবে। বেশ দেরী হয়ে গেছে। চিত্ত সিংহ রবীন্দ্রনাথ হয়ে তখন আবার হাল-আমলের এস্‌টাব্লিশ্‌-মেন্ট্‌-ঘেঁষা বাজারী ও বেসাতী লেখার ইতিহাসে ফিরে এসেছেন। আমি উঠে পড়লাম।

মিঃ চৌধুরী বলতে পারবেন না আমি লেট্‌। গোলামী সামলাতে আমি মাঝে মাঝে 'লেট-ফি' দিয়ে থাকি। 'পরহিতায় চ' স্বভাবটাও অনেকটা অভ্যাস।

॥ ষোল ॥

আমি রবি চৌধুরীর সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে যা দেখলাম, প্রথমটায় মনে হ'ল, স্বপ্ন দেখছি। ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী-দস্তিদার যথারীতি গ্লাস নিয়ে গোল হয়ে বসে গেছেন—পরিচিত-অপরিচিত অভ্যাগতদের সঙ্গে এবং মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে হাসি-গল্পে মশগুল। অন্যদিকে স্বাতীর পাশে রুবি, রুবির পাশে একজন তরুণ—কবিও হতে পারে কিংবা রবি চৌধুরীর পার্টির লোক। মাঝখানে বসেছেন তিনজন সাহিত্যিক; এঁদের সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় আছে, অতটা ঘনিষ্ঠতা নেই। স্বাতীর অন্য দিকে আর একটি পরিচিত মুখ—তরুণ।

ঘরে ঢুকতেই আমার দিকে সবাই মুখ তুলে তাকাল। রুবি সারা মুখে খুশী ছড়িয়ে বলল—আসুন, আপনার দেরী দেখে রবি, এইতো, একটু আগে নীচে নেমে দেখতে গেল—ওর তো আবার সবটাতেই একটু তাড়া কিনা! বসুন এক্ষুনি আসবে। হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দি—ইনি হলেন স্বাতী বিশ্বাস, আপনার কাছেই এসেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে আমার অতিথি। তার পাশে আশীষ মুখার্জী, স্বাতীর বন্ধু—ওদিকে আবার রবির পার্টির লোক—স্বাতীর অন্য দিকে আমাদের তরুণ। এদের সবাইকে আপনার ঘর থেকে রবি ধরে এনেছে। আপনার হয়ত জানা নেই, স্বাতী বিশ্বাসকে আমি চিনি, কিন্তু বুঝতে পারি নি এই সেই স্বাতী বিশ্বাস, কলেজ জীবনে যার একটু অন্যরকম ভাবনারাজ্য দেখে আমরা রীতিমত ঠাট্টা করতাম—বলতাম তোর যেরকম মতিগতি, দেখিস জীবনটা যেন 'শুষ্ক কাষ্ঠে' ব্যারান্ না হয়ে যায়। কি স্বাতী, মনে আছে? স্বাতী হেসে মাথা নেড়ে বলল—তোর জানা উচিত ওদিকেই এগোচ্ছি—কিন্তু। সবাই হেসে উঠল। রুবি বলল—এখনও আলাপ করান শেষ হয় নি—যাঁদের আসরে পেয়ে আমরা রীতিমত ধন্য তাঁদের কথা তো বলাই হয় নি। এই যে ইনি, ইনি হলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক নীল গাঙ্গুলী, তাঁর পাশে দু'জন নামী কবি—সনৎ চ্যাটার্জী ও নবারুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা সবাই রবিকে সমঝদার মনে করেন এবং

মাঝে মাঝে অসাহিত্যিকের বাড়িতে এরকমভাবে ধুলো ছড়িয়ে সাহিত্যের অকল্যাণ করেন। আর ওদিকে আছেন ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী ও দস্তিদার—যাঁদের আপনি নিশ্চয় চেনেন, যেমন কলকাতায় এঁদের অনেকেই চেনে—এঁরা কলকাতার অপরিবর্তনীয় কালচারের প্রতিভূ। আর যিনি ঘরে ঢুকে পরিচিত এতোগুলো মানুষ দেখে কিছুটা বিভ্রান্ত এবং হয়ত কিছুটা আনন্দিত—আলাপ করিয়ে দি—ইনি অমরেশ রায়—রেডিওর স্বনামধন্য লোক। ইংরেজীতে বললে আরও সুন্দর শোনাত—এ নোটেড্ পারসন্ অব দিল্লী রেডিও, নাউ স্টেশনড্ ইন্ ক্যাল্‌কাটা।

আলাপ করিয়ে দেবার ভঙ্গীটা রুবির সুন্দর; কোন আড়ষ্টতা নেই, একটু ভ্রু নাচিয়ে হাসলেই যেন পরিচয়ের বন্ধ দরজা খুলে যায়।

আলাপ করাতে না করাতে মিঃ চৌধুরী এলেন এবং রুবির কথাটা বলের মত মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন—এবং কলকাতায় যখন মিঃ রায় এসেছিলেন, তখন আমরাই ছিলাম একমাত্র সঙ্গী—এখন এঁর পরিচিত সার্কেল বিস্তৃত। এত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ পটানোর গুণ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় (এরকম সময়ে সবাই যা ক'রে থাকে, আমিও তাই করছিলাম, হেসে মাথা নাড়ছিলাম পরম কৌতুকবোধে)। গুণীকে গুণী বলাই শ্রেয়, পরিচিত গণ্ডি বিস্তৃত করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত বিকাশ—সে যাক। কি মশায়, অত দেরী কেন? ভেবে মরছি—স্বাতীরা এসে ঘরে বসে ছিল, আমি এদের ধরে এনেছি, মস্ত বড় ক্রেডিট্ কিনা বলুন? তা দেখছি স্বাতী বিশ্বাস রুবির কলেজ জীবনের বন্ধু। এ না হল কী বউ? শত-শাখায় প্রসারিত হয়ে তিনি এই 'রবি' নামক আজব মানুষটাকে রীতিমত উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন [সবার হাসি]।

মিঃ চৌধুরীর মস্ত বড় গুণ—সবাই যে যার গণ্ডিবদ্ধ হয়ে এতক্ষণ যে বসে ছিল, সেই গণ্ডি এক মুহূর্তে ভেঙ্গে দিলেন তিনি। দেখলাম স্বাতী আলাপ করছে নীল গাঙ্গুলী ও কবিদের সঙ্গে। আমি আলাপ করছি আশীষ মুখার্জীর সঙ্গে। মুখের মধ্যে একটা বুদ্ধির ছাপ, আর টল্‌টলে স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি। অল্প বয়সে জীবনটাকে হয়ত 'বল' ভেবে ধড়াধড় পিটিয়ে ভাবছে, গোল ক'রে ফেলবে। আশীষ সিচুয়েশন্ বুঝে কথা বলে, বোধহয় পার্টির হয়ে নেতাগিরি বা বক্তৃতা করার অভ্যাস আছে। কোন রকম ভূমিকা না ক'রেই বলল—স্বাতী অনেকদিন থেকেই বলছে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দেবে। আশীষের কথা বলার ফাঁকে 'রুবি এক্সকিউজ্ মি' বলে উঠে গেল। সবাইকে বেয়ারা ড্রিংক্স্ সার্ভ করছে কিনা সেটা দেখতেই বোধহয় উঠল আর সবার টেবিলের সামনে ড্রিংক্সের অন্য আনুষঙ্গিক জিনিস আছে কিনা, সেটাও হোস্টেসের দেখার কথা, হয়ত তাই।

—এসে দেখি, আশীষ বলল, আপনি নেই, কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতেই রবিদা আমাদের এখানে টেনে নিয়ে এলেন—রবিদাকে আমি অবশ্য চিনি।

ওদিক থেকে মিঃ চৌধুরী ড্রিংক্সে চুমুক দিয়ে বললেন—গুরু, আসল কথাটাই-বা চেপে যাচ্ছ কেন? বলেই ফেল না—পার্টি লাইন থেকে বিচ্যুত হলে, ঐ গুহ্য কথাটা—ওঃ-হোঃ, বুঝি বলতে চাইছ না—বিনয় ক'রে বলতে চাইছ না, —'পথ দেখাই'—।

আশীষ হাসল—হাসলে আশীষের মুখ আলোকিত হয়ে ওঠে।

তরুণ বলল—কোথায় গিয়েছিলেন? আমরা আপনাকে গরু খোঁজা খুঁজেছি। অফিসও বলতে পারল না—সকালেই নাকি আপনি অফিস থেকে উধাও হয়ে গেছেন।

যেখানে যেখানে চক্কর দিয়েছি, এখানে বলা নিষেধ। তাই তোমাদের পেয়ে খুশী হয়েছি এরকম একটা মুখের ভঙ্গী ক'রে আমি তরুণের পিঠে হাত রাখলাম আর আশীষের দিকে চেয়ে বললাম—আমিও তোমাদের খুঁজছিলাম। আমি কিন্তু 'তুমি' বলছি আশীষ। যাক্ যে যখন যাকেই খুঁজুক, একসঙ্গে রুবি ও মিঃ চৌধুরীর অতিথি হবার মধ্যে যে আভিজাত্য আছে—।

স্বাতী একবার আমার দিকে তাকাল—কথাটা তাই শেষ করা হল না। বুঝে উঠতে পারলাম না, তিনি আমার অনুপস্থিতিতে এত সব কাণ্ড হওয়ায় খুশী হয়েছেন কিংবা ভয়ানক অখুশী! তবে এখানে এসে তার কোনরকম অস্বস্তি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

মশায়—ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী ও দস্তিদার একসঙ্গে বলে উঠলেন—আভিজাত্য শব্দটা না হয় নাই উচ্চারণ করলেন। অনেক শুনেছি। কান পচে গেল। এখন একটু মাটির কথা শুনতে চাই। এই যে লেখককুল—এঁরা আজকাল পপুলার হয়েছেন কি ক'রে বলুন তো? পপুলার হয়েছেন, শুধু মাটির কথা লিখে—কি গাঙ্গুলী, ঠিক কিনা?

নীল গাঙ্গুলীর এর মধ্যে দু'গ্লাস হয়ে গেছে। হেসে বললেন—বাস্তবই আভিজাত্য কিংবা আভিজাত্যের জন্যই বাস্তব, জানেন, আমি মাঝে মাঝে বড় গোলকধাঁধায় পড়ি। অনেক সময় মনে হয়, কলকাতায় আমরা বড় বেশী বাস্তবের সম্মুখীন—। সকাল থেকে একই রকম মুখ, একই রকম সিচুয়েশন্, কাজ, অফিস, লেখা—তখন একটু নির্জন আভিজাত্যের জন্য ছট্‌পট্ ক'রে ওঠে মন। আমি তখন স্রেফ্ কলকাতা থেকে কেটে পড়ি। কেউ জানে না কোথায়। বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা ক'রে বলে—নীল তো হাওয়া হবেই—দেখো না, নীল আকাশের কত রঙ—।

মিঃ চৌধুরী মাঝখানে এসে বসে পড়ে বললেন—ওটুকু বলে দাও, তখন নীল আকাশে মেঘ জমে—আমরা বুঝে উঠতে পারি না, বৃষ্টি ঝরাবে কিনা—

সবাই হেসে উঠল। মিঃ চৌধুরী বললেন,—নীল, স্বাতী শুনলে তো, আমার বউয়ের বন্ধু, তাই আমার একটু লিবার্টি নিতে বাধা নেই, কি বলুন স্বাতী? তাই বলছিলাম, শুনুন অমরেশবাবু, আপনারা দু'জনে মিলে যে রিসার্চ করছেন, তার অনারে, নীল আসুন, আমরা আজ পান করি—। আবার সবাই হেসে উঠল। আমি বুঝলাম রিসার্চের কথাটা এত প্রাইভেট ব্যাপার না হলেও জনসমক্ষে এভাবে অর্থপূর্ণভাবে ইঙ্গিতময় ক'রে তোলা মিঃ চৌধুরীর ঠিক হচ্ছে কিনা—! কিন্তু বল ততক্ষণে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেছে।

ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী আর দস্তিদার বলে উঠলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয়, স্বাতী আপনি কিছু বলুন। বাঙালী নাকি প্যারাসাইটিক জাত? পরগাছা এবং পরজীবী? বাঙালীরা যদি কোনদিন টের পায় আপনি তাদের পূর্বপুরুষদের টিকি ধরে এভাবে টানাটানি করছেন, আপনার জীবন মিজারেবল্ ক'রে ছেড়ে দেবে।

নীল বললেন—হ্যাঁ, আপনার বিষয়েই কথা হচ্ছিল, অনেকটাই এখন আমরা জানি কিন্তু যেটুকু জানি না—আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

সনৎ চ্যাটার্জী ও নবারুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব উৎসাহ দিলেন। সনৎ বললেন—কলকাতায় সাহিত্য আসরে নতুন নতুন জিনিস চালু করার ব্যাপারে আমাদের রীতিমত কন্‌ট্রিবিউশন্ আছে। আপনার রিসার্চের ব্যাপারটা এত ইনটারেস্টিং যে আমরা ভাবছি—আজ রাতেই, মালকড়ি খেয়েছি যদিও, হবে কিনা জানি না—কবিতার ব্যাপারটা অত হট ক'রে আবার হয় না—

তবুও বলছি, দু'টো কবিতা লিখে ফেলতে পারি কিনা সিরিঅ্যাসলি ভাবছি শ্রেফ্ আপনার অনারে—।

স্বাতী আমার দিকে তাকাল। আমি ভাবলাম, ওর বিষয়টা প্রচার করার ব্যাপারে আমার যে বিন্দুমাত্র হাত নেই—এখন কী স্বাতী তা বিশ্বাস করবে? ঘরোয়া ব্যাপারটাকে মিঃ চৌধুরী কিভাবে আসরে টেনে আনেন, ও তো নিজের চোখে দেখল। এখন ভরসা পাচ্ছি, এ নিয়ে স্বাতী আমাকে নিশ্চয় পরে দোষারোপ করবে না। সব কিছু নিয়ে আমার ওপরে রেগে আছে কিনা তখনও আমি ঠাহর করতে পারছিলাম না—তবে বল্‌তে-টল্‌তে স্বাতীর কোন নার্ভাসনেশ্ নেই। কিছু-না-কিছু বিষয়ে ওকে ইউনিভারসিটিতে প্রায়ই বলতে হয়; সেমিনার বা ওয়ার্কশপেও ভাগ নিতে হয়, স্বাতী তাতে পেপার পড়ে, বলে আবার তর্কও করে। এখানে এখন ওর নিজের বিষয়ে বলবে কিনা, তা অবশ্য ওর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। বড় ইলুসিভ্ স্বাতীর মুখখানা।

স্বাতী বলল—আপনারা বিষয়টাকে যেভাবে ড্রইংরুমে টেনে আনলেন, এখন যদি আমি কিছু বলিও, মনে হবে জনসভায় দেশনেত্রীর মত বক্তৃতা দিচ্ছি [সবার হাসি]। কিংবা এও মনে হতে পারে—নক্সাল আন্দোলনের সময় কফি হাউসে যেরকম আমাদের অভিজ্ঞতা হত—মনে হত, ঘরের দুয়ারে বিপ্লব। মনে হত, অন্যের ঘাড়ে কফি বা সিগারেট খাবার মতই সহজ ব্যাপারটা।

নীল গাঙ্গুলী হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠলেন।—ঠিক বলেছেন। তখন তো মনে হত বিপ্লব এসে গেছে। এবং আমরা যা এতদিন লিখেছি সব ভুয়ো। ভাবতাম, কলমটা আরও ঝাঁঝালো করা দরকার। নয়ত কল্কে পাব না।

ঘোষ-বোস-মল্লিকদের পেটে বোধ হয় ততক্ষণে বেশ কিছু পড়েছে। কিংবা বক্তৃতাকে তাঁরা তখন খেম্‌টা নাচ ভাবছেন কিনা তাই-বা কে জানে? তাঁরা হৈ-চৈ ক'রে হাততালি দিয়ে উঠলেন। মিঃ চৌধুরী বাধা দিয়ে বললেন—অত হাততালি দিও না মল্লিক! বাঙালী যদি সত্যি প্যারাসাইটিক জাত হয়, এবং ব্যাপারটাকে যদি সত্যি সত্যি প্রমাণ করা যায় এবং ইতিহাস-সম্মত হয়,—আশীষ, তুমি ভাবতে পারছো—? যদি প্রমাণ করা যায় আমাদের পূর্বপুরুষ শুধু বসে বসে খেয়েছেন, কেউ কাজ করেন নি, এবং

আমরা যতই কাজ করি—আসলে আমরা কাজ করছি না, কারণ কাজ করার কোন ট্রাডিশন আমাদের নেই—কি সাংঘাতিক। আশীষ, তবে তো আমাদের যা-কিছু এগিয়ে যাওয়া—যাকে আমরা 'লাল সেলামের' অগ্রগতি ভাবি,—তাও যে তখন একটা জায়গায় এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে থাকে—না, কই বেয়ারা, গ্লাস ভ'রে দাও, আমি আর বেশী ভাবতে পারছি না—। রুবি, তুমি শামি-কাবাবের প্লেটটাকে ভরে দিয়ে যেতে বলো—ভাগ্যিস, বাঙালীরা খেতে শিখেছিল—নয়ত অকারণ দুঃশ্চিন্তায় এতদিনে হয়ত একেবারে মরেই যেতো।

'লাল সেলামের' কথায় আশীষের হয়ত একটু দায়িত্ব বেড়ে গেল। ও একটু মুচকি হাসল এবং একটু ভেবে নিয়ে বলল—ইতিহাসের কাছে নীরবে মাথা নত ক'রে থাকার অর্থ নেই ; মানুষই ইতিহাস্ পালটায় ; পালটেছে আবার পালটাবেও। দেশে দেশে এবং যুগে যুগে। সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা পড়ে আছি, আমাদের মত অনেকেই পড়ে আছে এবং কুকুরের মত এরা বিশ্বাসকে আঁকড়ে পড়ে থাকবে, তবু বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেবে না।

স্বাতী বলল—বিশ্বাস বড় জিনিস আমি মানি। কিন্তু বিশ্বাস যদি ইতিহাস-চেতনাকে উল্টো পথে নিয়ে যেতে চায়—তাহলে চলাটা দেখবার মত হয় ঠিকই, তবে ওটা ভঙ্গী, চলার স্টাইল, এগোনো নয়।

নীল বললেন—আমরা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এই চলার ভঙ্গীটাই পালটাতে চাইছি। ট্র্যাডিশনকে উল্টেপাল্টে দেবো বলে একদিন কলম ধরেছিলাম—অনেক কিছু পালটে গেছে। সব কিছু যে আমরাই করতে চেয়েছি বা করতে পেরেছি এমন কথা বলবো না। কল্লোল যুগ যেমন একটা নব যুগের সূচনা বা চ্যালেঞ্জ ছিল—সেরকম কিছু হয়ত আমরা করতে পারি নি। অতটা আমরা আবার ক্লেমও করছি না—কিন্তু অন্যরকম ভাবে চলার সাহসে অনেকগুলো নতুন ধারার জন্ম হয়েছে। সেটা বাংলা সাহিত্যের চিন্তার জগতে নতুন একটা ধারা বই কি ? অন্তত আমরা যারা অন্যরকম ভাবে একটু ভাবতে চেয়েছি, আমরা মনে করি ভাবনার ক্ষেত্র বেড়েছে, এক্সপেরিমেন্টের সাহস বেড়েছে এবং বিকাশের পথ খুলেছে।

আমি ভাবছিলাম চুপ ক'রে সবার কথা শুনব। আশীষের কথায় বিশ্বাসের একটা ধ্বনি তখনও আমার মনে অনুরণন তুলছিল। ভাবছিলাম, বিশ্বাসই কী ইতিহাস-চেতনার জন্ম দিতে পারে ? কিন্তু সাহিত্যের ট্র্যাডিশন

পাল্টাবার কথা শুনে এখন ভাবছি, যাকে আমরা ভঙ্গী বলি, স্টাইল বলি, তা কী সাহিত্য ? নাকি শুধু বিপর্যয় ? মাস্ স্কেলে হরিজন বিয়ে দেবার যে ব্যাপারটা আজকাল প্রায়ই দেখি—ওতে কতটুকু প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত বা বিশ্বাস আছে ? সমাজ এবার থেকে হরিজনদের মাথায় ক'রে নাচবে ? না। ওঠা ভুল। সমাজচেতনা শুধু ফাঁকা অনুষ্ঠান নয়—ভেতরের জিনিস। শুধু অনুষ্ঠান বা অনুকরণ-প্রিয়তায় চরিত্রের সে সবলতা গড়ে উঠতে পারে না। উপড়ে ফেলতে পারে না সমাজের শেকড়। এত কথা ভেবেও শুধু বললাম—আপনারা অন্যরকম ভাবে বলার চেষ্টা করছেন, এটা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এও মানি, বলার কায়দাটা অভিনব। তাতে এতটুকু বাহুল্য নেই ; সেলুনে গিয়ে এই মুহূর্তে যেন চুল ছেঁটে এলাম এবং স্বচ্ছ আয়নায় নিজেকে দেখতে এখন দারুণ স্মার্ট লাগছে। তবে আখেরে সত্যি কিছু পেলাম কিনা, তা ভেবে দেখার সময় কি আসে নি ? হ্যাঁ, এটা মানি কোন কালেই সমসাময়িক কালের সে সময় হয় না। নর্থ বেঙ্গলের ডাকবাংলোয় বা সুন্দর বনের গভীর অরণ্যে অন্যরকম যে জীবন, নানা অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে সাহিত্য নিশ্চয় সমৃদ্ধ হয়, এটা মানি। কিন্তু বলার কায়দাতেই যদি সব শক্তি নিঃশেষিত হয়, কিছু বলার থাকে না। এটাই আমি বলতে চাই।

ঘোষ-বোস-মল্লিকের ভ্রূ' ত্রিভঙ্গ হল। বোধ হয় ব্যাপারটা কী দাঁড়াল বুঝবার চেষ্টা করছেন। আর মিঃ চৌধুরী কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। অপূর্ণ গ্লাসটা রুবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি বসে অত মন দিয়ে কী শুনছো বলতো। এসব গ্রেভ্ জিনিস। তোমার মাথার বাইরে। বরং উঠে দেখো, খানা কতদূর এগোল—তার আগে গ্লাসগুলি ভরে দেবার ব্যবস্থা কর। রুবি উঠে গেল এবং তরুণও। বোধহয় বলছে, তাড়াতাড়ি যাবে ; ওকে আবার স্বাতীকে পৌঁছতে হবে। রুবি কি যেন একটা ঠাট্টা ক'রে ওকে নিবৃত্ত করল।

স্বাতী বলল—সাহিত্য অবশ্য আমি কিছু বুঝি না, তবে এটা মনে হয় ফ্যাশনের মধ্যে অনেকটাই অনুকরণপ্রিয়তা লুকিয়ে থাকে ; মানুষের আত্ম-বিশ্বাসকে নষ্ট ক'রে দেয়। যুগের প্রয়োজনে সাহিত্যের নামে তখন পণ্যের হাট-বাজার বসে। ভালো বিকোনো মানেই নয় মৌলিক সৃষ্টি। যেমন ধরুন, কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের খিস্তি-খেউড়ী ও কবিতার প্রতি অত অনুরাগ দেখে সেদিন নিশ্চয় আমরা ভেবেছিলাম, বাংলা সাহিত্যে কবিতার

মোড় একেবারে ফিরে গেল। কিন্তু এতদিন পরে সেই খিস্তি-খেউড়ীর হাট বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, সেই সাহিত্যচর্চার মধ্যে জমিদার শ্রেণীদের খুশী করার, এনটারটেইন্ করার একটা তাগিদ ছাড়া আর কিছু ছিল না। অর্থাৎ খুশী ক'রে, সমাজের মাথাদের তোষামোদ ক'রে কিছু দল গড়ে তোলা—যাতে দু'পয়সা হয়। কিছুটা পেটের দায়ে, কিছুটা বাঙালীর নেশা বা সখ—তার তাগিদে। অথচ দেশের একশো বছরের আবর্জনার মধ্যে দু'টি মাত্র উজ্জ্বল চরিত্রের পরিচয় পাই। এক ভোলা ময়রা, অন্য এণ্টনী কবিয়াল। ভোলা ময়রার কথা বলি। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার জাড়া গ্রামে জমিদার বাড়ীতে কবিগানে ভোলা ময়রা গেছেন। যজ্ঞেশ্বর ধোপা তাঁর রাইভ্যাল্। তিনি জমিদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছিলেন—'জাড়া গ্রাম যেন গোলক বৃন্দাবন।' অমনি ভোলা ময়রা ক্ষেপে উঠলেন। কী উত্তর দিয়েছিলেন, মনে আছে তো? বলেছিলেন—'কেমন ক'রে বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন / এখানে বামুন রাজা, চাষা প্রজা / চৌদিকে তার বাঁশের বন।' তারপর যে উক্তি তাঁর মুখ দিয়ে শোনা গিয়েছিল, তা আরও ভয়ঙ্কর। এবং সেখানেই ভোলা ময়রা বিশিষ্ট। বললেন—'ওরে বেটা, কবি গাবি, পয়সা লবি / খোশামদি কি কারণ?' আর এণ্টনী কবিয়াল, সমাজের তখনকার সব রকম হীনমন্যতার ও চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে দুর্বার এক প্রতিবাদ। দু'টি মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন শুধু বিশ্বাসের জোরে।

—ঠিক বলেছিস স্বাতী—আশীষ আলোচনার একটা নতুন দিগন্ত খুঁজে পেয়ে বলল—অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এঁরা—এইসব কবিয়ালদের দল, দু'পয়সা বেশী রোজগারের ধান্দায় এবং লোভে পড়ে, কলকাতায় এসেছিলেন, যেমন আজও আসছে নানা জাতের মানুষ, জীবিকার সন্ধানে। বাংলার লোকশিল্প ও লোক-সংস্কৃতির এঁরাই ছিলেন ধারক ও বাহক। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিল না বললেই হয়। শ্রেণীবিহীন একটা সমাজের প্রতিনিধি ছিলেন এঁরা। কিন্তু শ্রেণীগত কোন গৌরব ছিল না। 'বাবুদের' ফাঁকা বাহবাতে শেষ হয়ে গেল এই প্রকাশ ও চেতনা। ফ্যাশন জিনিসটা কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটায়, একবার ভেবে দেখ। সেদিন মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, চব্বিশ পরগণাতেও তো রাজা-মহারাজা বা ধনী

জমিদারদের অভাব ছিল না। এঁদের চিত্তবিনোদন ক'রেও দু'পয়সা হত। ওখানেও নানা জায়গায় মেলা হত, গ্রাম থেকে গ্রামে এঁরা ঘুরে বেড়াতেন—। যতদিন এঁরা কলকাতা মুখো হন নি—ততদিন এঁদের মধ্যে একটা প্রাণপ্রাচুর্য ছিল—। তোষামোদপ্রিয়তা ততদিন অতটা সর্বস্ব হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যখন গ্রাম-কে-গ্রাম ভেঙ্গে শহরে আসা শুরু হ'ল, তখন সেই লোকশিল্প ও লোক-সংস্কৃতির কত বড় সর্বনাশ হল—একবার ভেবে দেখ। শহরে এসে এঁরা আর সেই মাটির মানুষ রইলেন না—টবের ফুল হয়ে 'বাবুদের' ড্রইংরুমে শোভা পেলেন এবং একেবারে শেষ হয়ে গেলেন।

সনৎ চ্যাটার্জী বললেন—গ্রামে পেট চলত না, তাই শহরে এরা এসেছিল। এবং শহরে এলে গ্রাম্য স্বভাব পালটে যাবেই। ওরা পাল্টাতে পাল্টাতে শেষ হয়ে গিয়েছিল—তা মশায়, অত আফসোস করার কী আছে, শুনি? ওর মধ্যে কী আপনি শ্রেণী চেতনার গন্ধ পেলেন নাকি? লাল রঙের ঐ এক মুশকিল—ইতিহাসের মধ্যে সারাক্ষণ অর্থ খুঁজে বেড়ায়।

নবারুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—তা খুঁজুক না—ইতিহাস বাইজী বাড়ীর মাসি সেজে কামনা মেটায় না। ইতিহাসের আরও বড় কাজ। এই তো দেখ--আজকেও শহরে আমরা কত ভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছি—। শহরের স্বভাবই হল, হুজুগকে প্রশ্রয় দেয়—আপনার প্রাণশক্তিকে আস্তে আস্তে নিংড়ে নেয়। অথচ আপনি টেরও পাবেন না। বিবর্তনের এটাও ইতিহাস, মশায়। আজকে এসটাব্লিশমেন্ট আমাদের এক্সপ্লয়েট্ করছে না? এরা তো সেই জমিদারদের মতই আমাদের নাচায় আর খেলিয়ে খেলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় একদিন। তবে এটা একটা ঘটনা। আমরা নিরপেক্ষ হয়ে ঘটনাকে দেখি মাত্র। শহরে এই 'ফিডিং ও ফিডলিং' ব্যাপারটা থাকবেই। পৃথিবীর সর্বত্র এই চেহারা। যেমন ফাইভ ষ্টার হোটেলে ক্যাবারে ড্যান্স। যদিও কলকাতা শহরের কল্যাণে বুড়ো থেকে নিয়ে ছোঁড়ারা পর্যন্ত—চার টাকা থেকে চোদ্দ টাকায় আজকাল প্রফেশনাল্ থিয়েটারে ক্যাবারে ড্যান্স দেখে তৃপ্তি পায়, কেমন? এটাকে আপনি কোন্ শ্রেণী চেতনায় বিচার করবেন? শহর মানেই হল এই—নানা ভাবে শেষ হয়ে যাওয়া। কিংবা ভাবুন, আজকের এই যে পাবলিশার্স—এরা কী আমাদের এক্সপ্লয়েট্ করছে না? ভীষণ ভাবে করছে। আমরা মানতে চাই না—অথচ ভীষণ ভাবে মানতে বাধ্য হই। আমি যে পাবলিশার্সদের বিরুদ্ধে জোরাল আন্দোলন করার

চেষ্টা করেছিলাম—কেউ কি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল? একক শক্তিতে আন্দোলন কত দিন টিকে থাকে, মশায়? দুঃখ ক'রে এই জন্যেই লাভ নেই। সেদিন কবিয়ালরা এসটাব্লিশমেন্টের চাহিদা মেটাতেই শেষ হয়ে গেল—আজও তাই। আজকে এক্জ্যাক্টলি সেটাই হচ্ছে। এটাই পয়েন্ট।

ঘোষ-বোস-মল্লিক বললেন—শহরের এই তো মজা। কিছু টেকে না বলেই আমরা নতুন নতুন জিনিস দেখি। যেমন ফ্যাশন প্যারেড। একই রকম ভঙ্গী ক'রে দাঁড়ালে কি, দিদি চলে? বিভ্রান্ত এই যে জলজ্যান্ত সব আধুনিক মানুষ—এদের যদি আকর্ষণ করতে চান—নিত্যনতুন আবিষ্কার চাই যে, বন্ধু। তবেই না তারা ছুটবে, দেখবে এবং ফ্যাশনমত জিনিসপত্র কিনবে! এই যে একটা প্রাণবন্ত ভাব—যা কলকাতাকে প্রায় একটা নগর সভ্যতার মর্যাদা দিয়েছে—চলুক। চলতে দাও। এবং যদি তোমরা চলতে দাও, তবে ঘোষ-বোস-মল্লিক শ'-শ' বছর বেঁচে থাকে। আমাদের তখন মরার খুব একটা আর্জেন্সি থাকে না। আমাদের ট্র্যাডিশনের মূলে আঘাত করলে আপনারাই একদিন ধ্বসে পড়বেন। খেয়াল থাকে যেন।

মিঃ চৌধুরী বললেন—কি যা তা বকছো মল্লিক? —রোসো! হচ্ছিল কবিগান নিয়ে কথা, আর তুমি কোথা থেকে জমিদারী ও সামন্ততন্ত্রের ট্র্যাডিশনের কথা তুলে দুঃখে এখন মরে যাচ্ছ দেখছি। বলি, সকাল থেকেই চালাচ্ছ নাকি—অ্যাঁ?

ঘোষ-বোস-মল্লিক বললেন—না, —না, চলুক। আমরা বলতে চাই যেমন চলছে, চলুক না। এই চলার মধ্যে যে রোমান্টিকতা, বাঙালীর যে প্রাণময়তা এই যে প্রেম বলো, বিষাদ বলো, এমন কি, খানকি নাচ, খেমটা নাচ বলো—যা তোমরা ক্যাবারে ক'রে শেষ ক'রে দিচ্ছ—কোন একটাকে সমাজে তুলতে গিয়ে তোমরা কোন একটাকে অপারেশন ক'রে বাদ দিও না—সমাজ সংস্কারকদের প্রতি আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি আমরা। তাঁরা যেন মনে রাখেন, ওতে কদাচ উন্নতি হয় না। যেমন ধরো, ট্রাম চালাবে বলে যদি প্রাইভেট বাস কলকাতা শহর থেকে বাদ দাও—লোকেরা কী দুর্দশায় পড়বে, বলো বোস? কিংবা ধরো, দোতলা বাস যেন মদ খেয়ে টালমাটাল অবস্থায় রাস্তা দিয়ে রাতদুপুরে চলেছে—ইন্দিরা গান্ধী, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বললেন—তিনি অবশ্য বলবেন না—এমন বিচক্ষণ লেডির তো ভারতবর্ষ আর পয়দা করে নি—কিন্তু দোতলা বাসের টালমাটাল অবস্থা দেখে

দুঃখেকষ্টে যদি চোখের জল ফেলেন—আর বলেন, ওসব বন্ধ করো, মদ খাওয়া আর চলবে না, দোতলা বাস বড় বেশী টানে—প্রহিবিশন্ চাই—ঘোষ, একবার ভাব, দোতলা বাসের হয়ত সুবিধে হবে কিন্তু আমাদের কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে সেদিন—এটুকুই সভাকক্ষে পেশ করলাম। চৌধুরী মহারাজ, ধর্মাবতার, এবার আপনি বিচার করুন—মোরারজী মশায়ের কথা শুনে প্রহিবিশন করলে দেশের রেভিনিউ ভাণ্ডার যে একেবারে ফাঁক হয়ে যাবে— ?

মিঃ চৌধুরী হেসে উঠলেন—ভয় পেয়ো না, মল্লিক। বাঙালীর কিছুই পাল্‌টায় না। যুগ যুগ ধরে আমরা একই বিশ্বাস, ধর্ম আর খাবার দাবারের অভ্যাস আঁকড়ে পড়ে আছি—। সমাজ পাল্‌টাবে তবু আমরা অক্ষত থাকবো। মদ খেতে তো মহাভারতই আমাদের শিখিয়েছে।

বিজয়-গর্বে ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী ও দস্তিদার একটু হাসলেন এবং আশ্বস্ত হয়ে হাসি ছড়িয়ে মদের গ্লাসে আবার চুমুক দিলেন।

নীল বললেন—আশীষ, আপনার কথাটা নিয়ে আমি তখন থেকে ভাবছি—। আমাদের দুর্ভাগ্য, কলকাতা শহরটাই ফুলেফেঁপে উঠছে—কালচার বলুন, সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন—। কলকাতার একটু বাইরে যান—দেখবেন, চেষ্টা আছে, পরিশ্রম আছে। কিন্তু লেখায় যে মননশীলতা থাকা দরকার—সেই ধার নেই। অথচ লিখব বলে, গাইব বলে, আঁকবো বলে সবাই যদি আমরা কলকাতায় ভিড় করি—যা আমরা সত্যিই করছি, কি যে অবস্থা হবে একদিন ভাবতেও পারছি না। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নতি এইজন্য মার খাচ্ছে। সেদিন কাগজে দেখলাম পনেরো হাজারের মত ডাক্তার, কেউ গ্রামে যেতে চায় না। কি সাংঘাতিক শহরকেন্দ্রীক হয়ে উঠছি আমরা—এটাই তার ইনডেক্স।

আশীষ বলল—লোকসংস্কৃতিকে শহর কিরকম এ্যাব্‌জরব্ ক'রে এবং তাকে বিকৃত ক'রে অবশেষে শেষ ক'রে দেয়—সেটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম। সামন্ততন্ত্রের চাহিদা মেটাতে একদিন 'বাবু-কালচার' গড়ে উঠেছিল, আর তাকে ফিড্ করতে করতে আমরা সব কিছু জলাঞ্জলি দিচ্ছি। আন্দোলন, বিপ্লব—এই 'বাবু-কালচার' ছাড়িয়ে কোনকালে দানা বাঁধে নি। এটাই আমার মনে হয়।

আমি বললাম—ইতিহাস চেতনা বাঙালী জাতটার আছে কিনা আমার

খুব সন্দেহ। একটু নজর ক'রে ইদানীং ইতিহাস পড়ে আমার কি মনে হচ্ছে জানেন—বারবার একই জিনিসের আবর্তে আমরা ঘুরছি—অথচ কোনটার কাছ থেকেই আমাদের আর শিক্ষা নেওয়া হয়ে ওঠে না। যেমন ধরুন, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণ সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। সারা ভারতে যেমন, বাংলাদেশেও সোনাদানায় ভরে গিয়েছিল। কিন্তু দু'শো বছরের মধ্যে ভোগের আতিশয্যে ও বিলাসিতায় সমাজটাকে আমরা পঙ্গু ক'রে ছাড়লাম। সেদিনের ঐশ্বর্য গ্রাম-জীবনের বিপুল নিষ্ক্রিয়তা বা বলা যায় অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাকে দূর করতে পারে নি। অথচ বাণিজ্যের যে উপচে-পড়া টাকা তাতে যে ক'টি শহর গড়ে ওঠে, সেখানে সেই একই শারীরিক ও মানসিক অপচয়। আবার দেখুন একই জিনিস ঘটেছে নবকৃষ্ণের যুগেও। সেই একই অপচয়। স্বাতী যাকে প্রডাক্টিভ এফর্ট বলতে চায়, আমি যেন এখন কিছুটা ধরতে পারি, সেখানে শুধু ভোগবিলাস, তোষামোদপ্রিয়তা আর সেই একই ভোগলিপ্সা ও অপচয় কেন। সাহিত্যে ও মননে সেই একই জিনিস আবার দেখছি। এসব দেখে আমার খুব ভয় করে। মনে মনে ভাবি কারুর হয়ত কিছু করার নেই। বাঙালী জীবনে আমরা একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাই। ভুল সংশোধন করার কোন চেষ্টা নেই। আশীষবাবু, কালচার যাকে বলছো ওটার ইতিহাস একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, 'হিস্ট্রি রিপিটস্ ইট্সেল্ফ্'।

স্বাতী বলল—গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তির উত্থান ও পতনের মধ্যে বাঙালী জাতির জাগরণ ও নিষ্ক্রিয়তার আমি একটা অদ্ভুত ছবি পাই। সেটা একটু খুলে বললে আপনারা ধরতে পারবেন, অমরেশদার এ উক্তি আমি কেন সমর্থন করি। এই দুটো বন্দরই সমৃদ্ধ বন্দর ছিল মৌর্য ও গুপ্ত আমল থেকে। ইতিহাস বলে, এঁদের শাসনকালে এঁদেরই রাষ্ট্রব্যবস্থা বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ ভারতীয় দ্রব্য ও কারুশিল্পের নানা বাহারী জিনিসপত্র তখন দূর দূর দেশে যাচ্ছে। রোমে যাচ্ছে, গ্রীসে যাচ্ছে। সোনাদানায় ভরে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নগর সভ্যতা বাড়ছে। এবং বাড়ছে যে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কারণ নগর সভ্যতার প্রচণ্ড বিকাশ ছাড়া এবং অর্থের আনুকূল্য ও অবসর ছাড়া 'কামসূত্র' লেখা সম্ভব নয়। যেমন ফ্রয়েড, আমরা আজকাল বুঝতে পারি, একটা রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশের প্রতীক। অমরেশদা ইতিহাসের

ছাত্র না, তাও তাঁর চোখে পড়েছে যে নগরসভ্যতার যা কিছু ফসল ও উদ্বৃত্ত অর্থ, তা কিন্তু খরচ করা হচ্ছে বিলাসসামগ্রী, ভোগ্যবস্তু ও জৈব প্রয়োজনে। গ্রামের উন্নয়ন বা শিল্পের প্রসার নিয়ে কেউ ভাবেন নি। তাই দেখলাম রোম সভ্যতা যখন ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে ধ্বংস হয়ে গেল, ব্যবসাবাণিজ্যের রুটটাও পালটে গেল আর ফসলও দেখলাম শুকিয়ে গেল। সরস্বতী নদী ছিল লক্ষ্মী, সে গেল শুকিয়ে। তেমনি আবার তাম্রলিপ্তির দ্রুত অবসানের মধ্যে গোটা সোসিয়াল্ স্ট্রাক্চার ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন হতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী। তাম্রলিপ্তির অবসানের পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বাঙালী জীবনে ভূমির ওপরে নির্ভরতা বাড়ছে। পাল রাজাদের আমলে একদিকে ব্রাহ্মণ্য কালচার যেমন আস্তে আস্তে সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ল, সেন-বর্মন্ আমলে দেখলাম যারা উৎপাদন ক'রে, যারা প্রডাক্টিভ্ ফোর্স—সমাজে তাদের কোন স্থান নেই। তাম্রলিপ্তির পরে ব্যবসাবাণিজ্যের যে কতটা অবনতি হয়েছিল তার বোধ হয় সবচেয়ে বড় প্রমাণ, চতুর্দশ শতাব্দীর আগে আর কোন বন্দরই আমরা গড়ে উঠতে দেখলাম না। তাম্রলিপ্তি নদীর বাঁকে হারিয়ে যাবার পরে পরবর্তী শতাব্দীতে গড়ে উঠল পঞ্চগ্রাম। সে পর্যন্ত ছিল হিন্দু শাসনব্যবস্থার কৃতিত্ব। ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পঞ্চগ্রাম তার ব্যক্তিত্ব কিছুটা বজায় রাখতে পেরেছিল। পঞ্চগ্রামের বিলুপ্তির মধ্যেও বাঙালী জীবনের ভূমি-নির্ভরতার নিদর্শন আছে। এর পর বাণিজ্যের কেন্দ্র হুগলীর আগে কোথাও দেখছি না এবং শেষে তিনটে গ্রাম নিয়ে কলকাতার আবির্ভাব।

মিঃ চৌধুরী বলে উঠলেন—কি হে মল্লিক, ইতিহাসকে কি কখনও ইকনমিক্ অ্যাকটিভিটির দৃষ্টি দিয়ে পড়েছো? যদি পড়ে না থাক, গোটা ইতিহাস-পড়াটাই মাটি হয়ে গেল! আমরা পার্টি-ফার্টি কি আর সাধে করি—যদি কিছুটা চেতনা হয়, যদি দৃষ্টি খোলে, ইতিহাসকে যদি একটু খোলা দৃষ্টিতে দেখতে পারি—! স্বাতী, আপনি কনটিনিউ করুন, মল্লিকরা এক্ষুণি হয়ত বলবে—না, না, আর না। অনেক তো হল—কী বল আশীষ, চলুক। হ্যাঁ, বলে যান।

স্বাতী একটু হাসল। হয়ত একটু ভাবছিল ইতিহাসের কচ্‌কচানি সবাইকে 'বোর্' করছে কিনা, কিন্তু মিঃ চৌধুরীর উৎসাহ-উক্তি শুনে বুঝল, সবাই ওর কথা মন দিয়ে শুনছে, এখন মাঝখানে থেমে যাবার উপায় নেই।

বলল—ব্যবসা-বাণিজ্য বলুন, কিংবা বন্দরের উন্নতি এবং তার অবশ্যম্ভাবি পরিণতি এই যে জাহাজ—এগুলো হলো বাইরের প্রকাশ—ভেতরের ইকনমিক্ অ্যাকটিভিটি আরও গভীরে। গোটা একটা দেশ, মানুষ ও সমাজের উন্নতি না হলে, এসব জিনিস গড়ে ওঠে না। এবং যারা গড়ে তোলে, তাদের যদি 'পতিত' ক'রে রাখা যায়, তাহলে যে নিষ্ক্রিয় শক্তি 'প্যারাসাইটিক' অথচ যাদের হাতেই রাষ্ট্রবল ও অন্য ক্ষমতা—তারাই ঠিক ক'রে, সমাজের কোন্ শক্তিকে প্রাধান্য দিলে তাদের স্বার্থ বজায় থাকে। এ কথাটা প্রমাণ করতেই আবার একটু ইতিহাসের কথা বলতে হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূমি-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক জীবন ছিল চিরকালই রাষ্ট্র পরিচালিত। কোনদিনই ভূস্বামী ও ভূমিদাসের তিক্ত সম্পর্ক ছিল না। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ ছিল জমির মালিক। চাষীই জমির মালিকানাসত্ব ভোগ করত, যদিও জমি বিক্রি করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। তাই দেখি পাল যুগে ব্রাহ্মণদের জমি দিয়ে নানা জায়গায় বসান হচ্ছে। এবং রাষ্ট্র দিচ্ছে সেই 'দানপত্তনি'। পাল যুগে ব্রাহ্মণরা এসে দেখল, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র চালানর ক্ষমতা, যাদের আমরা আজকাল 'বুরোক্র্যাট' বলি—সেই ক্ষমতা শুধু কায়স্থদের। কারণ তারাই তখন সর্বত্র রাজকার্য চালায়। ব্রাহ্মণরা পাল আমলে এও দেখতে পেলো—যারা বণিকশ্রেণী ও উৎপাদকশ্রেণী, আগের মত সমাজের মাথা হয়ে না থাকলেও, চারশো বছরের পালযুগের শাসনকালে অত সম্মান ও প্রতিপত্তি না পেলেও, তারা তখনও কোনরকম নিষেধাজ্ঞা বা বেড়াজালের মধ্যে পড়ে নি। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তারাও অন্য ভি, আই, পি,-এর সঙ্গে আমন্ত্রিত হত। তার কারণ ব্রাহ্মণদের 'দু'মুখো' নীতির অনুশাসনে তখনও তারা হেয় প্রতিপন্ন হয় নি, নির্বাসিত হয় নি নিজেদের গণ্ডির আবর্তে। অথচ সেন-বর্মন আমলে দেড়শো বছরের মধ্যে সব যেন পালটে গেল। ভবদেব ভট্ট থেকে শুরু ক'রে অনেক মহাপণ্ডিত সেন ও বর্মন রাষ্ট্রে যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন—তা লক্ষ্যণীয়। এঁরা নিজেরা চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ, অথচ যে ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসন এঁরা লিখে চালু করলেন—তাতে কিন্তু ব্রাহ্মণদের জন্য চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা নিষিদ্ধ হল, 'পতিত' কাজ বলা হল। নিজেরা এঁরা চিত্রবিদ্যায় সুপণ্ডিত অথচ তার চর্চা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ। বণিকরা পয়সা আনে, রসদ বাড়ায়—তারাও 'পতিত'। সমাজের যারা ধন সৃষ্টি

করে, যেমন শিল্পী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক—এরা রাতারাতি সবাই শূদ্র—তবে ভাগ্য ভালো, 'সৎ শূদ্র'। স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, ধীবর-কৈবর্ত ও রাজমিস্ত্রী—এরা হয়ে গেল 'অসৎ শূদ্র'। বৃহদ্ধর্মপুরাণের মতে তো মাঝি-মাল্লারা 'অন্ত্যজ' শ্রেণীভুক্ত। অথচ সাধারণ লোকেরা বাংলাদেশে জলপথে ভেলা, ডিঙ্গা ও নৌকোতেই যাতায়াত করত। চর্যাগীতেও নৌকোর সঙ্গে বাঙালী জীবনের সম্পর্কের নানা ছবি আছে। মাঝি-মাল্লাদের গানে ও লোক-গাথায় রয়েছে বাঙালী জীবনের গোটা ফিলসফিটা। বাংলায় এক সময়ে কৈবর্তদের প্রতিপত্তির মূলেও এদের প্রতি সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধা বোঝায়। দেড়শো বছরের সেন-বর্মন শাসনকালে যে পরিবর্তন নিঃশব্দে এল, যে টার্‌ময়েল্ সমাজে ঘটে গেল তা কত নির্বিকার ভাবে আমরা সব কিছু মেনে নিয়েছিলাম—ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সেন বংশরা ছিলেন কর্নাটকের ব্রাহ্মণ। ইতিহাস বলে, পাল রাজাদের আমলেই এরা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ে এবং এক একজন সামন্ত রাজার মত সম্মান পেয়ে ক্ষমতায় ও রাষ্ট্রবলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কর্নাটকবাসী ব্রাহ্মণ্যধর্মে দীক্ষিত ছিলেন ব'লে, পাল আমলে যা ঘটে নি, এঁরা কিন্তু সেটাই ঘটালেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মাথায় তুললেন এবং অন্য দিকে সমাজে নিয়ে এলেন দেবদাসী প্রথা, এমন কী সতীদাহও। দাসী প্রথাও বাঙালী জীবনে এলো এঁদের অখণ্ড কৃপায়। এত কবি ও পণ্ডিতদের ছড়াছড়ি সেন বংশে অথচ এখনকার মাপকাঠিতে বিচার করলে বোঝা যায় বাঙালী জীবনকে কিভাবে অনুশাসন ও বাধা-নিষেধের ঠেলায় তাঁরা কোথায় নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আত্মপ্রবঞ্চনা ও ভাবের ঘরে চুরির জ্বলন্ত সব নিদর্শন। এক কথায় দেড়শো বছরের মধ্যে আমরা দেখলাম যারা সমাজে ধন ও দ্রব্য উৎপাদন ক'রে তারা তখন অচ্ছুত ও হেয় জীব হয়ে গেছে। পাল আমলেই এটা দেখা যাচ্ছিল যে যারা জমির মালিক তারা সব সময়ে চাষ করছে না। উৎপাদনের মূল উৎসের চেয়ে, উৎপাদনশীল লোকেদের চেয়ে, আস্তে আস্তে ভূমি-নির্ভরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তখন ধনাগমকেই মুখ্য লক্ষ্য ভাবতে শুরু করেছি। যেটা খুব দেখেছি পরবর্তী যুগে, এমন কি ব্রিটিশ আমলেও।

মিঃ চৌধুরী বললেন—কি হে নীল, ইন্‌টারেস্টিং লাগছে না?

নীল বললেন—হ্যাঁ, খুব। তবে আর্য সভ্যতা প্রসারের ধারাই তো এই। বরং বাংলাদেশকে ম্লেচ্ছ জাত বলে উত্তর ভারত ও সিন্ধু সভ্যতা বহুদিন ধরে

দূরে সরিয়ে রেখেছিল। জৈন ও বৌদ্ধদের একটা গোষ্ঠী, শুনেছি, নাকে-মুখে কাপড় দিয়ে বাংলায় ঘুরে বেড়াতেন—সবাই মাছ খায় এবং সবাই ম্লেচ্ছ ব'লে।

ঘোষ-বোস জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে ব্রাহ্মণরা কি বাঙালী ছিল না?

স্বাতী হেসে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল—না, কনৌজের ব্রাহ্মণ, এলাহাবাদ ও বেনারসের ব্রাহ্মণদের আমরা ডেকে ডেকে বাংলার নানাস্থানে জমি দিয়ে দিয়ে সবাইকে বসিয়েছিলাম—যেমনভাবে পূর্ববাংলার সবাইকে উদ্বাস্তু জ্ঞানে নানা জায়গায় আমরা আজ বসিয়েছি, বসাচ্ছি।

ঘোষ-বোস-মল্লিক একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠলেন—কি মশায়, বলি নি কায়েতদের রাষ্ট্রপরিচালনা করার চিরকালই একটা ট্রাডিশন্ ছিল। সেই আমাদের কিনা রাষ্ট্রচ্যুত করা হল? ওসব চলবে না, ভিন্‌দেশীরা কিরকম মাথার ওপর চেপে বসেছে দেখো।

স্বাতী নীলের দিকে তাকিয়ে বলল—আর্য সভ্যতা পূজনীয় কিন্তু আস্তে আস্তে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঢুকে পড়তে ব্রাহ্মণদের কম লড়াই করতে হয় নি। সমস্ত রকম শাস্ত্র—যেমন ধরুন, সমরবিদ্যা, হস্তিচিকিৎসা বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যেকেই আধুনিক যুগের সবচেয়ে আদরণীয় পলিটিক্‌স্ বিশারদ, প্রত্যেকেই রাজনীতিকুশল। প্রত্যেকে যোগ্যতা অর্জন করতে যে সাধনা করেছেন, পরবর্তীকালে ক্ষমতা পেয়ে তা কিন্তু আর মনে রাখেন নি।

ঘোষ-বোস-মল্লিক বলে উঠলেন—যা হবার তা তো হয়েই গেছে,—ব্রাহ্মণরা, রবি, ক্ষমতা ছেড়েও কি ছাড়ছে? বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তারাই এখন আমাদের মাথার 'পরে। তাই বলছিলাম, জাহাজ ছিল, বন্দর ছিল, অর্থ ছিল, সোনাদানা ছিল—ওসব জানলে কী হয়—পেট ভরে?

স্বাতী বলল—পেট ভরে কিনা জানি না, বুঝতে সুবিধে হয় বই কি? সপ্তম ও অষ্টম শতক থেকে বাঙালী সমাজ যখন কৃষিপ্রধান হয়ে ওঠে—ছোট ছোট গৃহশিল্প তখন ছিল একমাত্র ভরসা। তাই সব গিয়ে যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল জমিতে, তখন যারা উৎপাদন করে অর্থাৎ কৃষককুল, তারা কিন্তু বণিকদের মত অত সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয় নি কোনকালে। এটা খুব ভাল ক'রে ভেবে দেখা দরকার। ধন ও ঐশ্বর্য বন্টন ব্যবস্থায় চিরকালই রাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এবং এভাবে কিছু কিছু শ্রেণী আস্তে আস্তে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে। কেন কৃষক বড় হয় না, সম্মান পায় না,

বণ্টন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাক গলাতে গিয়ে অন্য কোন শ্রেণী প্রতিপত্তি-শালী হয়ে ওঠে কেন—এটা জানা খুব দরকার। এটা জানলে বর্তমান সমাজটায়ও বিবর্তনের এই একই ধারা বইছে কেন, তা ধরতে পারা যায়—একই ব্যাপার বারবার ঘুরে আসে কেন—তার একটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি পাওয়া যায় এবং অবক্ষয় যদি সত্যিই সমাজের কোন স্তরে বাসা বাঁধে, সেটা তখন আর ইলুসিভ্ লাগে না।

ঘোষ-বোস-মল্লিকরা বলে উঠলেন—এসব বলে কি লাভ, ব্রাহ্মণরা অন্যদের শিক্ষা দিয়ে আসছে—ওটাই তো ওদের তুরুপ কার্ড। নিজেরা কখনও তাকিয়ে দেখবে না, সমজটার ওরা কি হাল ক'রে ছাড়ল—।

স্বাতী হাসল, বলল—ডিস্ক্রিমিনেশন্, বিশেষ ক'রে উৎপাদন শক্তি ও মেহনতী জনতাকে কার্ভ ক'রে রাখলে শুধু যে ধনসম্পদের ক্ষতি হয় তা নয়—ইতিহাসে আমরা দেখেছি, গোটা সমাজটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। সেন ও বর্মনরাষ্ট্রে যখন একদিকে শ্রেণীভেদ ও সমাজে ধর্মের শাসন, অন্য দিকে সতীদাহের মত সামাজিক বীভৎসতা দানা বাঁধে। অন্য দিকে শিল্পে, আর্টে, সাহিত্যে কামোন্মাদনার বন্যা বয়ে যায়—যা বাৎসায়নের নগরসভ্যতার আবার পুনরাবৃত্তি। চতুর্দশ দশকের মধ্যে বহু বিভীষণ খাড়া হয়ে গেছে; মুসলমানদের এদেশে আসতে কোনরকম কষ্ট করতে হয় নি—কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ার সময় যেমন ফাঁকা মাঠ হয়ে গিয়েছিল, তেমনি সেন মহাবীরদের মন্ত্রীরাও মুসলমানদের আক্রমণের নাম শুনেই বৃদ্ধ লক্ষণ সেনকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। বলেই ক্ষান্ত হন নি, নিজেরাও পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। উপদেষ্টারা যেখানে পরাজয়ী মনোবৃত্তির দ্বারা লাঞ্ছিত এবং রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক যেখানে জ্যোতিষবিদ্যা, সেখানে পলায়নপর সৈন্যদের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ ভাবা যায় না। তেমনি যুদ্ধবিদ্যার কৌশলটাকেও আমরা অত দেখেও পালটাই নি। যখন অশ্বকে যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজী হিসেবে দুর্দান্ত বেগ ও হঠাৎ আক্রমণের কাজে মুসলমানরা লাগাচ্ছে—তখনও আমরা ভাবছি 'গজেন্দ্রগমনই' একমাত্র শক্তি। তাই বলছিলাম ইতিহাসের যে শিক্ষা আমরা পেতে পারি, সেটাই এখন সোনাদানা কেন নেই—তার উত্তর। সমগ্র ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থায় যখন আমরা এক ছিলাম তখন তারই প্রাচুর্যে উপছে পড়েছি আমরা। যোগ-সম্পর্ক চিরকাল এনেছিল ব্যবসাবাণিজ্য, লেনদেন ও জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা।

কিন্তু যখন সমাজের সব স্তরের লোককে অবহেলায় সরিয়ে দিয়েছি, তখনই এসেছে বিপর্যয়। টাকা খাটালে টাকা বাড়ে, এটা কখনও আমরা শিখি নি। ইতিহাস বারবার সে সুযোগ দিয়েছে বাঙালীদের কিন্তু ট্র্যাডিশন্ না থাকলে যেমন সাহিত্য, কৃষ্টি বাড়ে না, ঐশ্বর্যকে বহুমুখী করার শিক্ষাটাকেও শান্ দেওয়া দরকার। অমরেশদা ঠিকই বলেছেন—বাঙালী জীবনে একটিমাত্র কথাই খাটে—'হিস্ট্রি রিপিটস্ ইটসেলফ্'।

রুবি তাড়া দিল—কি, তোমরা কি শুধু কথাই বলে যাবে—খাবে না? ওঠো, এবার সব ওঠো তো!

মিঃ চৌধুরী বললেন—হ্যাঁ দেরী হয়ে যাচ্ছে—স্বাতী, বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু আর নয়, উঠুন, আপনাকে আবার পৌঁছতে হবে। তরুণ, ভয় নেই, আমিই তোমাদের পৌঁছে দেবোখ'ন। ভাল ক'রে খাওয়া চাই কিন্তু।

তরুণ কোন কথা বলে নি, শুধু শুনছিল এবং অনুমান করলাম তাই বোধহয় একটু বেশী ক্ষিদে পেয়েছিল। ওকে আমি গোগ্রাসে খেতে দেখলাম।

॥ সাতেরো ॥

কলকাতায় আজকাল সবাই ইতিহাস হয়ে যেতে চায়। তরল গুহের সঙ্গে যত আমি পরিচিত হয়ে উঠছি তত আমার এ কথাটা মনে হচ্ছে। এই চরিত্রটাকে বুঝলে হয়ত গোটা পশ্চিমবঙ্গের বিবর্তিত ইতিহাসের আধুনিক পরিণতি বোঝা যায়। চারিদিকে এরকম ঐতিহাসিক চরিত্র দেখে দেখে নিজেকে কেমন যেন বড় ক্ষুদ্র মনে হয়; আমারও যে কিছু করার আছে ভুলে যাই। দেখার দৃষ্টি বা আত্মশক্তি আছে কিনা সন্দেহ হতে থাকে। তখন আমি প্রাণপনে আত্মপক্ষকে সমর্থন করতে থাকি বা বলা ভাল, প্রাণপনে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। বাস্তবিক কাউকেই ঠিক ধরতে পারি না; বড় বড় বিশাল গাছে এক একটা ঐতিহাসিক চরিত্র নিঃশব্দে ঝড় তোলে। আমি তাকিয়ে থাকি আমার কুঁড়ে ঘরের দিকে। তখন কোন পুলিশকে অতীতের পর্দা সরিয়ে বলতে শুনি—কলকাতা একদিন বিরাট বৃক্ষ হবে, সেই মহাযজ্ঞ চলেছে। তাই তোমরা শোন, এখানে হোগলা, কুঁড়ে বা কাঠ দিয়ে আর ঘরবাড়ি করা চলবে না—সরে পড়, সরে পড়। কলকাতা একদিন হবে মহানগরী। ভবিষ্যতে আগুন যদি কখনও লাগে মানুষের মনে লাগবে। সাহেবরা দেখছ না, কিরকম সব অট্টালিকা হয়ে গেছে। শহরে এসেছ, মানুষ হও। মানুষ যখন ইতিহাস হয়ে যেতে থাকে তখন, হলপ্ ক'রে বলতে পারি, কাউকেই ঠিক যেন ঠাহর করা যায় না।

তরল গুহ যে ক্লেম করেন তিনি ইতিহাস হয়ে গেছেন এবং আমার চোখ নেই বলে আমি দেখতে পারছি না—অনেকটা বোধহয় সত্যি। সেদিনের স্বাতীর কথাটা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। চতুর্থ শতাব্দীর অসাধারণ বাণিজ্য প্রসারের ফলে আমরা প্রত্যেকে বাৎসায়নের মত উচ্চ কোটীর মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। নগর সভ্যতার কীর্তন করতে করতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই যে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলাম, শহর-সভ্যতা বিকাশের প্রয়োজনীয় কথা তখন আমরা মনেও করতে পারি না। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা কত কিছু গড়লাম আবার ভাঙলাম, আবার হয়ত

গড়লাম। কিন্তু অজন্তা-ইলোরার মত ইতিহাস সৃষ্টি করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠল না। কিংবা কে জানে, ভারতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা হয়ত আমরাই গড়েছি, ইতিহাসে তার ঠিক প্রমাণ রেখে যেতে পারি নি বলে নামটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমাদের শিল্প সাহিত্যে, মৃৎশিল্পে বা ভাস্কর্যে ছোট্ট কথা, ছোট্ট ভাব আর আবেগময়তার ছাপ বেশী কিন্তু কোন কমনীয় বা সুডৌল ঐশ্বর্যশালী দেহী নারীমূর্তি ছাড়া এবং কিছু মন্দির ও দেব-দেবী ছাড়া, আর কিছু গড়ে তুলতে পেরেছিলাম কিনা—জানি না, অন্তত তার নিদর্শন নেই। গড়ে আমরা তুলেছিলাম নিশ্চয়, সবই তো ইঁট-কাঠের অভিব্যক্তি, কালের গহ্বরে হয়ত সব কিছু হারিয়ে গেছে। ভাবময়তা বাদ দিলে, বাঙালীয়ানার বিস্তৃত একটু উদারতা, ও প্রকৃত মানুষের মত প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াবার মত কিছু ঐশ্বরিক মুহূর্ত বাদ দিলে, ইতিহাসে গর্ব করার মত আমাদের বোধহয় আর কিছু নেই। কিংবা ছিল—কে জানে, আমরা জানি না বা লোকেরা জানে না। সেদিন নীরবে হয়ত কাজ করার ট্র্যাডিশন্ ছিল, নামের পরোয়া করে নি, নিজের ঢাক নিজে পেটায় নি। সব সম্ভাবনার মধ্যেও যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা অবশ্য ইমেজ দেবার পক্ষে খুব একটা সহায়ক নয়। কথাটা এই কারণে বলছি আমরা বাঙালীরা বড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে ইতিহাস হয়ে উঠতে চাই ; ইতিহাস তার স্বীকৃতি দেয় না—সেটা বোধহয় ইতিহাসেরই দোষ।

তরল গুহ সেরকম সবার অজান্তেই রেডিওর ইতিহাস হয়ে গেছেন। অনেকেই যখন হয়েছে তরল গুহের-ই বা হতে দোষ কি! ওয়ার টাইমে যেমন জীবন বোস ইতিহাস হয়ে গিয়েছিলেন শুধু খবর পড়ার গুণে। আমরাও তখন ভাবতাম, যদি কোনদিন সেই ইতিহাসের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে পারি, জীবন সার্থক হবে। সেই ইতিহাসের পাশে বসে গল্প শোনার এবং কাজ করার সৌভাগ্য হ'ল একদিন বা বহু বছর। কত ঐতিহাসিক কথা শুনতাম তাঁর শ্রীমুখ থেকে—। যেমন জার্মানী যখন ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা ফেলছে ইংল্যাণ্ডের মাথার ওপর, ওরে বাবাঃ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার—তখন সেদিনকার সেই দুঃসহ ও ভয়ঙ্কর খবরটা জীবন বোসই নাকি দিয়েছিলেন। নাৎসিদের অত্যাচার, পোল্যাণ্ডের পতন, ফ্রান্স যখন পদানত ইন্‌ভিসিবল্ জার্মান সৈন্যের কাছে, ফ্রান্সের এক্সাইল্ সরকার গঠন, চার্চিলের ঐতিহাসিক সব উক্তি, জার্মানীর বিরুদ্ধে অ্যালাইড্ ফোর্সের প্রথম বিজয়, জার্মানীর রাশিয়াকে

আক্রমণ ক'রে বসার সেই ঐতিহাসিক ও মারাত্মক ভুল এবং অবশেষে অ্যালাইড্ ফোর্সের দ্বারা জার্মানীর পরাজয় ও সংহার—সবই নাকি জীবন বোস গলা কাঁপিয়ে খবর দিয়ে দুনিয়াটাকে একেবারে স্তব্ধ ক'রে রেখে ছিলেন।

অথচ মানুষটার কাছাকাছি এসে চরিত্রের মধ্যে ইতিহাসের বিন্দুমাত্র ছায়া দেখি নি। একমাত্র দেখতাম, স্টুডিওতে ইংরেজী স্ক্রিপ্ট দেখে সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ক'রে যেতে পারতেন। অর্থনীতির জটিল জাল কিছুই তিনি বুঝতেন না কিন্তু সরল বাংলা শুনে বোঝবার উপায় থাকত না, ওটা বোঝা নয়, স্রেফ্ অভ্যাস। বাস্তবিক ওটুকুই তাঁর চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য ছিল, অথচ তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র হয়ে গেলেন। বাঙালীর কাছে কে যে কখন ইতিহাস হয়ে যায়, হিসাব রাখা দায়। কারণ মহত্ত্বের আর কোন গুণের অধিকারী ছিলেন কিনা সন্দেহ। যেমন, কেউ ওঁর চেয়ে ভাল পড়লে, তিনি তা বাঙালী কায়দায় কখনও বরদাস্ত করতে পারতেন না এবং কী এক অদৃশ্য মনোবলে 'ভাল গলা' দেখলেই তাকে অডিশনে ফেল করিয়ে দিতেন। খুব সন্তর্পণে। একবার, শুধু একবার, এক অখাদ্য ভয়েস অবশ্য যুগোপযোগী চালে এক হাঁড়ি মিষ্টি ভেট্ পাঠিয়ে পাশ ক'রে গিয়েছিল। ওটা জীবন বোসের কলঙ্ক হয়ে আছে। মিষ্টির লোভ সংবরণ করা হয়ত সম্ভব হয় নি। ঐতিহাসিক চরিত্র বলেই তিনি অবশ্য তা দেখেও না-দেখার ভাণ করতেন, অনেক সময় বলেই ফেলতেন, 'না—পড়তে পারে না'। কিন্তু তখন যদি কেউ তাঁকে পুরনো ইতিহাস শোনাতে চাইত, তিনি মাথা নেড়ে শয়তানের মত হাসতেন। জীবন বোস একজনের সঙ্গে অন্য জনকে লড়িয়ে দিয়ে মহা আনন্দ পেতেন—নিজে অবশ্য বাঙালী কায়দায় ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকতেন। আমি দেখে দেখে ভাবতাম, যে মানুষের এত নাম, তাঁর মনটা অত মলিন কেন?

কিংবা একজনের বিরুদ্ধে অন্য জনের কাছে নালিশ করতে এত সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে আমি অবাক হতাম। এবং কোন রকম প্রোভোকেশন্ ছাড়াই। অথচ এও দেখেছি—প্রতিবাদ যখন করার কথা, রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখন লড়াই করার ঐতিহাসিক মুহূর্ত—তখন ইঁদুর হয়ে গিয়ে এক কোণে বসে লেজ নাড়তেন আর হাসতেন। অর্থাৎ যা হচ্ছে—তা তো হবেই এবং আমি জানতাম বলেই এতদিন ধরে উস্কানি দিয়ে আসছি এবং এখন যখন সেই অন্যায় ঘটে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নেহাৎ অপচয় ছাড়া আর

কিছু নয়। আরও একটা গুণেও তিনি ইতিহাস হয়ে গিয়েছিলেন—কখনও কোন জামা ছাড়তেন না।, একই গেঞ্জি, একই জামা, দশ বছর ধরে 'আধোয়া' একই কোট। গা থেকে বোটকা একটা ঐতিহাসিক গন্ধ বেরুত। পাশে বসা যেত না। আরও অনেক মহৎ গুণ ছিল তাঁর; সেসব ছাড়া অবশ্য ইতিহাস হওয়া যায় না।

যতদূর জানি, তরল গুহ সেরকমই এক ঐতিহাসিক চরিত্র। পশ্চিম-বাংলার ওপর দিয়ে যেসব ঝড় বয়ে গেছে, —এই পার্টিশন বলুন, বি, সি, রায় বলুন এবং আরও যেসব পলিটিক্যাল টারময়েল—সব খবরই তিনি দিয়েছেন। প্রথম ইউনাইটেড্ ফ্রন্টের মিনিস্ট্রির যখন পতন হল—তার দুর্ধর্ষ ঐতিহাসিক খবরটা তিনি দিল্লীকে প্রথম জানিয়েছিলেন এবং কলকাতাকে চমক লাগিয়ে তাঁর মহামন্দ্রিত গলার অহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল। প্রগ্রেসিভ্ ডেমোক্র্যাটিক্ সরকার গঠন, প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রীসভার পতন, ১৯৬৮ সাল। রাষ্ট্রপতির শাসন—সেই ঐতিহাসিক তারিখটাও তরল গুহ স্মরণ করতে পারেন—

—বোধহয় সেটা ১৯৬৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস। দিল্লী রীতিমত আমাকে কন্‌গ্রাচুলেট্ করেছিল! তাই-বা কী বলছেন? সেই বার মিড্-টার্ম্ ইলেকশন হল না—দিল্লী মাত্র দু'জন লোক পাঠিয়েছিল, অত বড় একটা ইলেকশন নিজের হাতে সামলেছি।

আমি তরল গুহের কৃতিত্বের কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। তাঁর ঘরে এসেছিলাম একটা কাজে, এখন ইতিহাস শুনতে হচ্ছে। নিজে তো এসব কিছুই দেখি নি। দূরে বসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে খবর শুনেছি বা পড়েছি। সব যে মনে আছে তাও নয়। কলকাতার কত ঐতিহাসিক ঘটনা তরল গুহের নখদর্পণে। আমি তাঁর কাছে এক টিপ নস্যি।

—হাজার হাজার লোক আমাদের অফিসের নীচে জড় হয়েছিল সি, পি, এম,-এর ছেলেরা বলছে, বদলা নেবে—আমি নাকি ভুল খবর দিয়েছি। বলছে, মাথা নেবে। ভয়ে সবাই তখন কাঁটা—সব কাঁপছে, পুলিশ ডাকতে হয়েছিল মশায়। নীচে একসঙ্গে হাজার লোক ঢুকতে চায়—কিনা, কি এবং কোন্ কারণে ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট মিনিস্ট্রি ভেঙ্গে পড়ল—আমরা তা সঠিকভাবে নাকি বলি নি, পক্ষপাতিত্ব ক'রে বানিয়ে বানিয়ে খবর দিচ্ছি। সেদিন ভয় পেয়ে খবরের নিরপেক্ষতাকে কি আমি খর্ব করতে দিয়েছিলাম? প্রশ্ন ক'রেই তরল গুহ আমার মুখের দিকে তাকালেন। এত কিছু দেখেছেন, এত

সামলেছেন আর তাঁর কাজের বিচার করতে এসেছি কি না আমি ? আমিও অযাচিতভাবে উৎসাহ দিলাম—যে কাজ আমি করতে এসেছি, পরদেশীর মত, আমারও আপনার মত ভয় পেলে বোধ হয় চলবে না। সাহস তো আপনারাই যোগাবেন। বলেই ভাবলাম কথাটা বোধহয় এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না, ওমনি পাল্টে দিলাম বয়ান, বললাম—সত্যি, আপনার অনেক অভিজ্ঞতা, খুব ইন্‌টারেষ্টিং লাগছে, বলে যান। আমি যেন একটু বেশী আগ্রহ প্রকাশ ক'রে ফেললাম।

কিন্তু অনর্গল যে বলে যাবেন ভাবের আবেগে, তার কী উপায় আছে ? প্রতি মুহূর্তে বাধা পড়ছে। কখনও বা টেলিফোন আসছে। কখনও বা কোন শ্রীমুখের আগমনে ইতিহাস-ভূগোল পালটে যাচ্ছে কিন্তু বলার সুযোগ একবার যখন পেয়েছেন, তখন তাকে হাতছাড়া করতে দেওয়া ঠিক নয়। 'আজকে একটু ব্যস্ত আছি—কেমন ? অন্য দিন আসবেন, কেমন ?' বলে তিনি কাউকে দাঁড়াতেও দেন নি বা বসতেও বলেন নি। এমন কী সুন্দর মেয়ে গুণগ্রাহীদেরও না ; ওঁর সমীক্ষা-পরিক্রমার গুণমুগ্ধ ভক্তরাও না। কেউ এই ইতিহাস শোনার সুযোগ পায় নি। আমি রীতিমত ভাগ্যবান ; শুনে যাচ্ছি এক-একটা ইতিহাসের মলিন এবং বিধ্বস্ত ছেঁড়া পাতা। কিন্তু এবার যে বাধাটি এল, তাকে কাটিয়ে ওঠার সাধ্য বোধহয় কী কারণে যেন তরল গুহের নেই। দেখলাম বলছেন—আসুন, আসুন। বসুন। বলার মধ্যে এবং গলার স্বরে লক্ষ্য করলাম সমস্ত ইতিহাস যেন ভুল হয়ে গেল। বললেন—মিঃ রায় আছেন, আলোচনাটা বরং এখানেই সেরে নেওয়া যাক—।

—না—না। প্রতিবাদ ক'রে উঠল কৌন্তেয়—আপনারা কথা বলছেন, এখন চলি, অন্য সময় আসবো।

আমি জানি কেন কৌন্তেয় বসতে চাইছে না। বোধহয় কোন সলা-পরামর্শ বা অন্য কোন 'ব্যক্তিগত কাজ' ছিল, যা আমার সামনে আবার বলা যাবে না, তাই বলছে, অন্য সময় আসবে।

—আরে বসুনই না—তরল গুহ নাছোড়বান্দা। —অত কাজ করবেন না। শত হলেও সরকারী অফিস। কাজ তো কত করলেন—লাভ হয় ?

কৌন্তেয় হাসল—দিল্লীর লোককেই জিজ্ঞেস করুন, লাভ হয় কি না ? শত হলেও দিল্লীর সঙ্গেই তো আমাদের টিকিটি বাঁধা।

—সত্যিই বড়ই দুর্ভাগ্য, মিঃ রায়—তরল গুহ বলে গেলেন—আমাদের যা

কাজ—কাজ ঠিক বলবো না, যেসব চ্যালেঞ্জ আমরা প্রতিমুহূর্তে নিচ্ছি বা নিয়ে আসছি—ঘর নেই, বাড়ি নেই, ঘুম নেই, সোসাইটি নেই—শুধু খবর আর খবর। কত যে প্রবলেম তা আপনাকে কি আর বলবো? এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেও দেখলেন কৌন্তেয় তখনও দাঁড়িয়ে, আবার অনুনয় করলেন—বসুন কৌন্তেয়—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হয়ত আপনার মনে হতে পারে ভাঙ্গা রেকর্ডের মত আমি একই কথা বলে মিঃ রায়কে ইম্‌প্রেস্ করতে চাইছি—কৌন্তেয়ের দিকে চোখের ইসারা বা দৃষ্টি মেলে বললেন—তা মোটেই নয়। কাউকে ইম্‌প্রেস্ করার দিকে যদি এই গুহের নজর থাকত (যত গলা উঠছে, তত হাত নড়ছে)—আরও বড় চাকরী পেয়ে যেতাম। ঐ তো সেবার, মনে নেই, কৌন্তেয়? কোল মাইনস্ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হঠাৎ এসে হাজির—ওঁদের পাবলিসিটি ম্যানেজারের পোষ্টটা নাকি খালি আছে এবং আমিই নাকি তার সবচেয়ে যোগ্য ক্যান্‌ডিডেট্। আমার সমীক্ষা-পরিক্রমা শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছেন, আমাকে তক্ষুনি ওঁদের অফিসে জয়েন করতে বল্‌ছেন। আবদারটি একবার দেখো না। শুধু একটা অ্যাপ্‌লি-কেশন ক'রে একদিন গেলেই নাকি পরের দিন এপয়েন্টমেন্ট লেটার। জানেন, মিঃ রায়, কৌন্তেয় আপনি সাক্ষী আছেন, বলুন ঠিক কি না?—এস, ডি, কী আমাকে যেতে দিলেন? ডি, এন, এস, কী ছাড়লেন? (একটু দম নিয়ে আবার)।

—এখন ভাবি খুব ভুল করেছি, জানেন? এরকম অনেক সুযোগ, বুঝলেন মিঃ রায়, আমি হেলায় হারিয়েছি। কেন? এই কারণে যে লোকেরা বলে আমি ছাড়া নাকি রেডিও অচল। অবশ্য স্টাফরা যখন বলে তখন মনে হয় একটু বাড়িয়েই বলছে। এটা বাঙালীর স্বভাব, জানেন তো যাকে একবার গ্রহণ করবে, তাকে একেবারে বুকে ক'রে রাখবে—বারবার মালা পরাবে, কিছুতেই ছাড়বে না। গুণের কদর যদি বাঙালী একবার দিতে শুরু করে—আর রক্ষে নেই।

কৌন্তেয় একটা চেয়ার টেনে বসে বলল—সত্যি, কতবার এরকম হয়েছে—আমরা শুনলাম, তরল গুহকে যেতেই হবে—ঐ তো সি, এম, ডি,-এর সেই পোষ্টটা—প্রথম চয়েজ ছিল তো তরল গুহ। কিন্তু আমরা যেতে দিলাম না বলেই তো মিঃ অধিকারী পেয়ে গেলেন—এখন তিনি কি চমৎকার কাজ করছেন শুনি—তিনিও তো রেডিওরই লোক। এটা কিন্তু ঠিক, তরল

গুহের মত ব্রড্‌কাস্টার আর বোধহয় জন্মাবে না। এখন যারা আসর জমিয়ে বসে আছে বা নতুন যারা আসছে—আমার অবশ্য মন্তব্য করা ঠিক নয়,—তাও বলছি, কারণ মাঝে মাঝে সত্যি কথাটা বলা খুব উচিত, এবং তাতে যত রিস্কই থাকুক—যদিও জানি, আমার বলা সাজে না—কিন্তু যাই বলুন, পদ্মশ্রী পাবার মত এরা সেরকম কেউ পড়ে নি, পড়ে না। কি বলেন, তরলবাবু? শুধু 'ভাল পড়ি, ভাল পড়ি' করতে করতে দেখলাম একদিন পদ্মশ্রী পেয়ে গেছে। এর মধ্যে কত লোক এল আবার কত লোক চলে গেল, কিন্তু পদ্মশ্রী যার পাবার কথা—সেই তরল গুহ,—তাঁর ভাগ্য কিন্তু আগেও যেমন, এখনও তেমনি। এক একজন মানুষ আছে, যারা শুধু অন্যকে দিতে জন্মায়, অথচ নিজেরা কিছুই পায় না।

বাধা দিয়ে উঠলেন তরল গুহ—ওভাবে বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না, কৌন্তেয়। আসলে আমরা যারা প্রতিষ্ঠানকে ভালবেসে প্রায় শেষ হয়ে গেলাম—এখনকার মত, তখন আমরা কেউ কেরিয়ার্ গড়ার ব্যাপারটাকে সর্বস্ব জ্ঞান করি নি। যা করেছি, দীর্ঘদিন যাবৎ যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি—এখনকার ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতবাক হয়ে যাই—ভাবি কত সহজ হয়ে গেছে পথ। পদ্মশ্রী কেউ যদি পায়—সে তো ভালো কথা। আরও পাক না, তাতে তো নিউজ ডিভিশনেরই সম্মান বাড়ে। তবে নিজেদের স্বার্থে পলিটিকাল লিডারদের বাড়িতে যাওয়া, তাঁদের কাজে আসা, এবং বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে কিছু আদায় ক'রে নেওয়া—এসব ভাল কথা নয়। আমার দ্বারা ওসব হবেও না। আমরা সেই পুরনো আমলের কমিটেড্ লোক। এই দিকটা মিঃ রায় যদি একবার ভেবে দেখেন, তাহলে বুঝবেন, শত বাধা-বিপত্তি সহ্য ক'রেও আমরা এখনও টিকে আছি কেন। পদ্মশ্রী পাই নি কেন—সে ইতিহাস আর একদিন না হয় বলবো—ও তো সেই একই কথা, যেমন ধরুন অ্যাকাডেমীর পুরস্কার আজকাল যেভাবে বর্ষিত হয় শুনেছি—আপনি তো আবার দিল্লীর লোক, সুতরাং আপনি ওসব ভালই বোঝেন বা জানেন। আমার বক্তব্য, কি বলেন কৌন্তেয়, একটাই—দিল্লীর স্বীকৃতির জন্য আমি মোটেই লালায়িত নই। যা-কিছু আমি করেছি শুধু রেডিওকে ভালবাসি বলে, নিষ্ঠা আছে বলে এবং আত্মত্যাগ করার সেই স্থৈর্য আছে বলে।

কৌন্তেয় বলল—অত বিনয় করবেন না তরলবাবু, ঐ ক'রে তো

পদ্মশ্রীটা খোয়ালেন। দেবার কথা ছিল আপনাকে, হঠাৎ দেখলাম এমন একজন মানুষ পেলো—না, আমি কিছু বলতে চাই না, বলা আমার সাজেও না, আসলে লোকেরা তখন এরকমই বলাবলি করছিল। তারা বলছিল—পদ্মশ্রী পেলো এমন একজন মানুষ, বাংলাদেশের যুদ্ধে যার গলা দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ভূমিকা ছিল না। যিনি ওসব অসাধারণ স্ক্রিপ্ট লিখেছেন, তেজোময় সেন অথবা তরল গুহ নিজে—অথচ দেখলাম—তাঁরাই আসল সময়ে উপেক্ষিত। ছিঃ ছিঃ ওসব এখন শুধু লজ্জাকর ইতিহাস হয়ে আছে, জানেন মিঃ রায়? দিল্লীর বুরোক্র্যাটিক অ্যাটিচুড্ কি ভয়ঙ্কর একপেশে—আমাকে মাপ করবেন, মিঃ রায়, সরকারী চাকরী করি—আপনার সামনে হয়ত বলা ঠিক হচ্ছে না। তবে, কি বলেন তরলবাবু, সব সময় কি চুপ ক'রে থাকা যায়? আমরাই বা পড়ে পড়ে মার খাব কেন—এটাই বা কী রকম কথা?

তরল গুহ বাধা দিলেন—ওসব ছেড়ে দিন কৌন্তেয়। কেন, আমি একশোবার বলবো, এই মিঃ রায়ের সামনেই বলব, আপনারও পদ্মশ্রী পাওয়া উচিত ছিল।

(শুনে আমার মুখে অবিশ্বাস্য কতকগুলি বিস্ময়সূচক রেখা হয়ত ফুটে উঠেছিল, সেটা লক্ষ্য ক'রেই হয়ত তরলবাবু বলে উঠলেন)—না, না, অবাক হচ্ছেন বুঝি? ভাবছেন, ওরকম নির্লজ্জ্যভাবে আমরা পরস্পরের প্রশংসা করছি কেন? সবাই যদি ঢাক পিটিয়ে কাজ হাসিল করতে পারে আমরাই-বা ওরকম বোকা থাকি কেন? কি? একথাই ভাবছিলেন কি না?

আমার নজর এড়াল না, তরল গুহ আর কৌন্তেয় যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তারা হয়ে যায় 'তুমি'—কেউ উপস্থিত থাকলে হয়ে যায় 'আপনি'। বুঝতে পারছি একটিকে বাজালে অন্য জন ধ্বনিত হয়ে ওঠে ইথারের কি এক অদৃশ্য টানে। যুদ্ধের সময় বাঙালাদেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে যাঁদের ভাগ্য খুলল, তাঁদের মধ্যে তেজোময় সেন ছিলেন না। তবে সুভাষ সরকার যখন দিল্লীর এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে প্রধান মন্ত্রীর হাসিহাসি মুখের আশীর্বাদ নিয়েছিল, সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। পুরস্কার পাবার সবচেয়ে বড় লাভ বোধ হয়, তাঁর 'কথা' বা 'লেখা'র তখন বাজারদর বাড়ে—বড় তাড়াতাড়ি বিকোয়। ঐতিহাসিক পাবলিশার্সরা তখন সব কুসীদজীবী হয়ে যায় বেশী মুনাফার লোভে। দু'পাতার জন্য

তখন তারা ন'শো টাকা পর্যন্ত উঠতে রাজী, তাও অ্যাডভান্স।

আমি অবশ্য জানি না, পদ্মশ্রী যাঁর বা যাঁদের পাবার কথা, তিনি বা তাঁরা পান না কেন? লোহা কেন চক্করে পড়ে স্ক্রু হয়ে যায়, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার এই পরিস্থিতিটা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না। তবে শুনেছি অনেকের নামই পদ্মশ্রী তালিকায় ছিল কিন্তু কে-যে কার দৌলতে 'দিল্লীর রেসে' জিতে গেছেন, এতদিন পরে খুঁজলে সেই ফাইলও আর বোধহয় পাওয়া যাবে না। তবে সেদিন যে গায়িকা রেডিও ষ্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁর মুখে শুনে আমি হতবাক হলাম, সাহিত্য-রাজ্যে তো বটেই, রেডিওতে তো আছেই—এমন কি গানের রাজ্যেও নাকি আজকাল পঞ্চ কন্যা, সপ্ত কন্যার ব্যাপার চলছে—মানে যাকে বলে রীতিমত রাজকন্যার ব্যাপার।

তবে 'রাজকুমারদের' বাইরে থেকে ঠাহর করা না গেলেও তলে তলে তাঁরা ঠিক বিরাজ করছেন। এরকম একজন রাজকুমার ছিলেন ধীমান দিগম্বর, তিনিও শুনি প্রায় ইতিহাস হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর আহ্বান ও উক্তি বা জবরদস্তি রীতিমত ঐতিহাসিক হয়ে আছে। তিনি বলতেন—স্মরণীয় হতে যদি চাও, নীতিফিতি শিকেয় তুলে রেখে স্বাভাবিক হও। উচ্চাভিলাষের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলে, পেছনে তাকালে কী চলে? খাতির ও খিদ্‌মত ছাড়া গানের রাজ্যে কি অত তর্‌তর্‌ ক'রে ওঠা যায়? সবটাই তোমার ওপরে ডিপেণ্ড করছে। ফিল্ম লাইনে যেরকম। তুমি কি সতিসাধ্বী থাকতে চাও? না কি সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলেই চলে? যদি চলে, তবে কালবৈশাখী হয়ে ঘোর আর ঘোর, বড় বড় গাছ মড়্‌মড়্‌ ক'রে পড়ুক—তবে তো হবে, তবে না হবে! যদি তা না করতে পার, তবে শুধু ফুট-নোট হয়ে থাকতে হবে; বড় জোর সাইড-রোল্‌ বা সাইড-লাইট। গানে নাকি আজকাল এই ট্রেণ্ড চলেছে এবং ধীমানের ধী-শক্তিতে রেডিও যে ঐতিহাসিক পথ দেখিয়েছিল, সেই লাইনে এখন নাকি আরও অনেক বেশী প্রিসিশন্‌।

তরল গুহ আমার চিন্তায় বাধা দিলেন—কি মিঃ রায়, অযথা অত চিন্তায় পড়ে যান কেন? আপনার একটা রোগ দেখছি, হঠাৎ চুপ মেরে যান, যেন দরজায় খিল পড়ল। বুঝতে পেরেছি, এ-ঘরে বসে আপনি হয়ত ভাবছেন, ও-ঘরে ঐ নিউজরুমে অত চিৎকার-চেঁচামেচি হচ্ছে কেন—কি হ'ল আবার?

ভাববেন না—বেশী ভেবেছেন কি ভাবনার পোকাগুলো আপনাকে দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করবে। আমি, জানেন, ওসব নিয়ে একেবারে বদার করি না। তাই দেখুন, কি কৌস্তেয়—আপনারা যে বলেন, এতদিন রেডিওতে থেকে, এত টেন্‌শনের মধ্যে থেকে আমার এখনও চুল পাকে নি কেন? তার উত্তর, যা হচ্ছে, যেভাবে হচ্ছে, হতে দাও। তবে দেখো বাড়াবাড়ি যাতে না হয়। বাস্তবিক তাই, আমি শুধু মাথা নাড়লাম।

কৌস্তেয় উঠে পড়ল। আমিও নিউজ ডিভিশনের দিকে পা বাড়ালাম। লোকনাথবাবু চশমাটা বুলেটিনের বুকের ওপর রেখে বললেন—আপনিই বলুন, এভাবে কি কাজ হয়?

সত্যি, আমিও মাঝে মাঝে ভাবি—ওভাবে কি কাজ করা যায়?

আঠারো

কবি অমিতাভ আচার্য চক্রবর্তী একবার আমাকে বলেছিল, —এই তো দেখ দিল্লীতে আছি, —মেয়ে নিয়ে বউ কলকাতায় থাকে। যখন চিঠি লিখি, একটি লাইন থাকবেই—কলকাতার কি খবর? অর্থাৎ ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার রুবি বা রবি চৌধুরী—এঁরা সব ভাল তো? দেখা হয়, টেলিফোনে কথা হয়? স্বাতীর থিসিস্ কতদূর এগোল, তুমি কি ওর থিসিসের সঙ্গে খুব ইন্‌ভল্‌বড্ হয়ে পড়েছ? না কি তোমার নজর অন্য দিকে? কেমন লাগছে? কলকাতা একটু অন্য স্বাদের নয় কি? তোমাকে বলি নি?'

অমিতাভ-এর চিঠিটা পেয়ে ঘরে বসে ওর কথাই ভাবছিলাম। কলকাতার সঙ্গে ওর জন্মলগ্নের সম্পর্ক; তাই কলকাতা ছেড়ে দীর্ঘ দিল্লী প্রবাস-বাস কল্পনা করতে পারে না। মনে আছে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কিন্তু আমাকে বোঝাও—কলকাতায় তুমি কী পাও, যা দিল্লীতে নেই। উত্তরে অমিতাভ যা বলেছিল, মনে পড়ে গেল। —ভেবে দেখ যাদের সঙ্গে দিন-রাতে কাজের ফাঁকে আড্ডা মেরেছি, ছুটির দিনে আউট্রাম ঘাটে গিয়ে জাহাজের গায়ে সূর্যের রঙ দেখেছি, বা হাজার অনেক লোকের মত কাজের ফাঁকে, চলে গেছি খেলার মাঠে, কিংবা দলে পড়ে কোন ভাল থিয়েটার, রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে বা একটা ভাল পোলিশ্ ফিল্ম। ইতালীর সেই ফিল্মটা, মনে আছে তোমার? নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, কিন্তু থিম্‌টা এমন, কলকাতা-প্রীতি আমাদের অকারণ কেন, অনেকটাই এক্সপ্লেন্ করে। লোকটা ড্রেনের ময়লা ঘেঁটে পোকামাকড় ও মাছের টোপ্ খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে অসুস্থ হয়ে পড়ে—জোর ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বা নিজেই যায়; কিন্তু ড্রেন না ঘাঁটতে পারলে হাস্‌ফাস্ করে, ছট্‌ফট্ করে। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে এক অপ্রতিহত নেশায় সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই ড্রেনে নেমে পোকা ঘাঁটে। সেই অদৃশ্য টান কলকাতার। কি যে তার বাহার আর কেন যে সে নিরাভরণ, জানি না। এরা বলে মিছিল শহর, আমরা বলি অর্থনৈতিক কারণে এখন তার

পড়ন্তি দিন। বাবুরা আজকাল ওখানে বেশী যায় না। কলকাতা একদিন জাগবে হয়ত আশা করা যায় না—কিংবা কে জানে, আবার হয়ত ভূমিকম্পের লাভা ছড়িয়ে পড়বে—কিছুই বলা যায় না। তবে পৃথিবীতে আর কোন শহর নেই, যে আস্তে আস্তে তোমার সত্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে; কলকাতা থেকে তোমাকে তখন আর বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিচ্ছেদে—ভেতর থেকে প্রশ্নটা নাড়াচাড়া করেঃ কলকাতার খবর কী, কলকাতা কেমন আছে?

—'পার্টিশনের পরে চল্লিশ লক্ষ লোক কলকাতায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—। এরা কলকাতার চারপাশে থাকে। কী ক'রে এরা আছে দেখেছ? আমি দেখেছি। চল্লিশ লক্ষ লোক যদি ভিড় ও ক্লেদ নিয়ে শহরের চারপাশে আশ্রয় নেয়—তার কিছু আর অবশিষ্ট থাকে? মলমূত্র বা আবর্জনা জমে জমে কি পাহাড় হয়ে যায় না? একবার ভেবেছ? জায়গা নেই, বাসা নেই, খাটিয়ার নীচে সংগম—এ কী জীবন? পৃথিবীর সমস্ত টেক্‌নলজি নিয়ে এসে যদি মানুষী ও মানসিক আবর্জনাকে সারবস্তুতে পরিণত করতে যাও, তাও দেখবে তার ক্লেদাক্ত প্রভাব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না। আর সেটা যখন কলকাতার লোকেদের ভাগ্য, তখন আর কী করা? ওভাবে শুঁকে আর গুঁজে আর হামাগুড়ি দিয়ে বাঁচতে হবেই। বম্বেতেও স্লাম্‌ দেখেছি কিন্তু কলকাতার স্লামে যেভাবে মানুষ থাকে—ধরো ঐ শেয়ালদায়, এক হাঁটু আবর্জনা নিয়ে, তার বিষাক্ত পরিবেশে থাকা, একটু আগুন জ্বেলে একটু জাউভাত কোনমতে ফুটিয়ে গুষ্টির পিণ্ডি দেওয়া এবং সারি সারি শুয়ে পড়া এবং মধ্যরাত্রিতে বর্ডার পেরিয়ে সংগমসাধন—একে কী বাঁচা বলে? হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চাল বেচে, চাল পাচার করে কিংবা আনে; স্মাগ্‌লড্‌ ট্রেডে পড়ে, গুলি খেয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাও মরে পড়ে থাকে--দেখেছ? আমি দেখেছি। আমি এও দেখেছি দেয়াল বেয়ে উঠছিল, গুলি খেয়ে রক্তাক্ত দেহে আবার দেয়াল সাপটে নামল; কিংবা কোন প্রাণহীন লাশ পড়ে আছে রেল লাইনের ধারে। এরকম নিরর্থক মৃত্যু কোন ইতিহাসে দেখেছ? একদিকে চোখের জল, অন্য দিকে সেই ভয়ার্ত জীবন আঁকড়ে থাকার নিরুপদ্রব চালচিত্র। তাই তো নক্সাল নেতা অসীম চ্যাটার্জী আমাকে একবার বলেছিলেন—অমিতাভ, তুমি যে কলকাতাকে ভালবাসার কথা বলছ—সে কলকাতা কিন্তু আমাদের নয়।

আমরা একটা অন্য কলকাতা গড়তে চেয়েছিলাম—কিছু লোক হতে দিল না বলে ভেব না আমরা শেষ হয়ে গেছি। আমরা আবার জাগব। হামাগুড়ি দিয়ে বাঁচার ষড়যন্ত্র বা সুড়ঙ্গকে আমরা সব বন্ধ ক'রে দেব।'

সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। ভেজা স্যাঁৎ-সেঁৎতে কলকাতা দেখতে বড় হতশ্রী লাগে। যেন বসন্তের দাগ ভরা হাজার গর্ত মুখ। সৌন্দর্যের বৈভব শুধু তখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার মধ্যে নিঃশেষিত। বাঙালীর ঘাড় বড় বাঁকা; কিছুতেই সোজা হতে চায় না; বুনিয়াদ পেয়ে বাঙালী একেবারে বুনিয়াদী বারো ভুঁইয়া। তাও যদি প্রতাপাদিত্যের মত দেশ জয় করার আর সাহস অবশিষ্ট থাকত বাঙালীর। অন্যের চেয়ে সমুন্নত ভাবতে ভাবতেই বাঙালী সেই যে আঠারো শতাব্দীতে ইংরেজের ঘাড়ে চড়ল, নিজের ঘাড় বাঁকা করতে শিখল---এত টানাপোড়েন, এত মার খেয়েও, তার সেই দৃপ্ত ভঙ্গী; এত বিপর্যয়ের মধ্যেও ঘাড় সে কিছুতেই সোজা করবে না, যেন জমিদারী গেছে, ঠাট্‌বাট্ সব গেছে কিন্তু অহঙ্কারটুকু আঠার মত এখনও লেগে। তবুও ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের দিকে একবার দেখবে না (কথাটা স্বাতীকে বললে ওর কী রিঅ্যাক্‌শন্ হত, ওর মুখেচোখে কতটা আলো-অন্ধকার খেলে যেত, প্রতিবাদ বা সম্মতি—ভাববার চেষ্টা করলাম)। জান, এসব কথা ভাবলে কেন জানি বড় আফসোস হয়, অমিতাভ!

বৃষ্টি পড়ছে। ভাল লাগছে না কিছু। এক্ষুনি বাস ঠেঙ্গিয়ে বা মিনি বাসে অথবা ট্যাক্সিতে চড়ে স্বাতীর কাছে ঈশ্বরের মত হাজির হতে মন চাইছে। অথচ ভীষণ আলসেমী লাগছে। অফিসে যাবার তাড়া নেই। বিকেলে একবার মুখ দেখালেই হবে। আসাম এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে; খবর কন্‌ট্রোল্ করার যাদু কিনা. তা অবশ্য জানি না। কিছুটা শান্ত হলেও বারবার সে সিংহের মত গর্জন ক'রে ওঠে। সি, পি, আই, এম, আন্দোলন কি ওখানে একেবারে শেষ হয়ে গেল? আঞ্চলিকতাবাদের স্বীকার? কেন্দ্রীয় সরকারের বাঘা বাঘা কর্মীরা এখন সেই জন্তুটাকে চিনবার চেষ্টা করছেন। কোন একটা রাজ্যের তেল যে শুধু সে রাজ্যের নয়, সারা ভারতের, এটুকু সর্বভারতীয় দৃষ্টি দিতে গিয়ে তাঁদের প্রায় দৃষ্টিহীন হবার অবস্থা। এই জবরদস্ত আঞ্চলিকতাবাদকে শাসনে আনতে রেডিওর ভূমিকা কী—তা এখনও নির্দিষ্ট হয় নি। তবে আসামের আন্দোলন যদি সফল হয় এবং এই আন্দোলন প্রসারে রেডিওর যদি এখনও কোন ভূমিকা থেকে থাকে—তবে

আমি সম্মান নিয়ে দিল্লীতে ফিরতে পারব কিনা সন্দেহ। গোটা উত্তর পূর্ব সীমান্ত তখন ভাবের বন্যায় আন্দোলিত হবে—মিজোরাম বা মণিপুরের যা অবস্থা। এবং আমরা যারা সর্বভারতীয় দৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারগুলি দেখবার চেষ্টা করছি এবং ইতিহাসের অমোঘ শাসন ও পরিণতি নিয়ে ভাবছি—আমাদের এটা স্বার্থ সিদ্ধ করে না বা মনঃপূত হয় না।

শুনছি আন্দোলনের নেতারা আগের মত আর নিঃস্বার্থ নেই। কয়েকজন নাকি এরই মধ্যে ইমারত তুলেছেন। ক্ষমতা নিয়ে পারস্পরিক লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছেন, এটা ভারত সরকারের অবদান ; কেউ বলছেন সি, আই, এ। কেউ বলছেন—ফরেন পাওয়ার, মশায়। দেখছেন না, নিকারাগুয়াতে কি অবস্থা ? ওখানে, বুঝলেন না, আমেরিকার ঘরের দুয়ারে একটা বামপন্থী সরকার গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত শাসনব্যবস্থা চালাচ্ছে। গেরিলাদের কথা শুনলেই মনে হয় লেফ্‌ট উদ্বুদ্ধ কোন দল। তা মোটেই নয়। নিকারাগুয়াতে সি, আই, এ কি করছে—একবার দেখে আসুন, তবে বুঝবেন, আসামেও তারা কিছু করতে পারে কিনা। কলকাতার এই যে মুক্তাঙ্গন বা সেক্স-অঙ্গন দেখছেন—এই যে নাটকের মধ্যে শুধু ক্যাবারে ড্যান্স বা লেখায় শুধু বেড-সিন্‌ বা 'ভিডিও'-তে নানা পোজে সংগমের চিত্র লোকেরা রসিয়ে রসিয়ে পড়ছে বা দেখছে—কিংবা এক কথায়, অপসংস্কৃতি যে গোটা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনকে একটা উগ্রতার আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—গুণ্ডা ও মস্তানদের রকবাজী এবং রাজত্ব—এসবের মূলেও তাদের একটা বিরাট হাত কি খেল দেখাচ্ছে না ? এইসব ষড়যন্ত্রের পেছনে সেরকম কিছু কি দেখতে পান না ? মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞেস করেছিলেন একদিন। আমি কোন উত্তর দিই নি ; বরং মিঃ চৌধুরীকে উস্কে দিয়েছিলাম। ভিজে বেড়ালটি হয়ে থাকলে কি হবে, আমিও কম শয়তান নই ; বলতে বলতে মানুষ যখন একেবারে কাপড় খুলে ফেলে, তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। কিছু কিছু নিশ্চয় টেপ হয়ে যায়—ওটা আমার গোলামীর মতই একটা অভ্যাস, এবং তাই আমি দেখেছি, অনেক সময় এ-সব সাধারণ কথাবার্তাই বেশী কাজে আসে। তখন আমি নিজেকেই নিজে তারিফ করি—অমূল্য সব কথা বা স্বগতোক্তি টেপ হয়ে গেলে নিজের কালেকশন্‌ সমৃদ্ধ হয়। যদিও এসব সিক্রেট্‌ জিনিস করতে মাঝে মাঝে বেশ নাটক করতে হয়, তা হোক—সৃষ্টির ব্যাপারটাইতো ঝামেলার।

কলকাতায় একটা জিনিস দেখবেন, মিঃ চৌধুরী বলেছিলেন, আমরা অনেক কিছু জানি। কখনও পার্টিতে আলোচনা হয়, এই ক'রে গোটা পশ্চিম বাংলার পলিটিকাল হিস্ট্রি আমাদের মুখস্থ। এবং মুখস্থ থাকে বলেই দেশের ও আন্তর্জাতিক অবস্থার একটা অ্যাসেসমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের একটা কমন্ দৃষ্টি আছে যদিও প্রত্যেকের একটা নিজস্ব মতামত থাকা আমরা অপরাধ বলে আর ভাবি না। দারিদ্র্যের মধ্যে, অবক্ষয়ের আবর্তে পড়ে আমরা যদি ভুগি—তাহলে এই অবস্থাতেও, এই র‍্যাভেশিং সিচুয়েশ্‌নেও আমরা যে অন্য দেশ বা অন্য কথা নিয়ে ভাবি—সেটা কী কালচারের একটু আলো নয়? অন্য স্টেট ভাবে? টাকা করছে আর সংগম করছে। ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে সহবাস করবে বলে দশ লক্ষ টাকা দিতে চাইছে—এবং কে, না, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কি, হয় নি? যন্ত্রণায় বউটা সুইসাইড্ করতে গিয়ে রেল লাইনে পা দু'টো খোয়াল। কি, খোয়ায় নি? দশ লক্ষ টাকা যদি দিতেই চেয়েছিলে—তবে কল্ গার্লে কি আপত্তি ছিল? ওরা বরং সেক্স আর্ট-ফার্ট্ জানে; সংগমে বড় তৃপ্তি হয়। না, তা না। ভাইয়ের বউকেই চাই। কি ভয়ঙ্কর সাহসের অভাব। সুসভ্য মুখ্যমন্ত্রী হোক বা কোন ভারতীয় অ্যারেস্টোক্র্যাটিক, ছোঁক্ ছোঁক্ করে কারণ গিয়ে দেখুন ধন হয়ত খাড়া হয় না। মাপ করবেন, ক্রুদ্ধ হলে আমার মুখ দিয়ে আবার আদ্যিকালের খিস্তি-খেউড়ী বেরোয়।

মিঃ চৌধুরী সকালবেলা থেকেই রাম রাম করছিলেন, তাই ভদ্রতায় বাধছিল। জানতে চাইলেন—আমি খাব কিনা? মাঝে মাঝে ওনার যে কি হয়, জানি না। রাম খেয়ে নাম ক'রে বড় বড় চোখে পৃথিবীর দিকে তাকান। ওতে কি পৃথিবীর কিছু হয়? পৃথিবী পালটায়? মানুষের সভ্যতা বদলে যায়? তবে প্রশ্ন ক'রে কি লাভ?

—যা বলছিলাম, এই যে নিকারাগুয়া—ওখানে সি, আই, এ, কী প্ল্যান করছে, জানেন? আমি যেন কাগজে কি সব দেখছিলাম কিন্তু মিঃ চৌধুরী যে এরই মধ্যে তা মুখস্থ ক'রে ফেলেছেন বা খবর দেখলেই এঁরা একটা খবরের সঙ্গে অন্য ইতিহাসের লিংকেজ্ খুঁজে পান—অতটা ভাবি নি। একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনা জুড়ে তিনি যে এই মুহূর্তে একটা যুক্তি খাড়া করেছেন, তা তিনি আমাকে শোনাবেনই। —তা মশায়, যা বলছিলাম—দেখতে শিখুন, শুধু বাঙালীর চরিত্র নিয়ে ভাবলে কী বাঙালী কোনকালে

উদ্ধার পাবে? গোটা ভারত নিয়ে ভাবুন, তাহলে দেখবেন বাঙালীর যে পজিটিভ্ দিকটা আছে—তা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করবে। ঐ যিনি একমাত্র আন্তর্জাতিক বাঙালী কমিউনিস্ট ছিলেন? কি, ওভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? কি, ছিল না মনে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, মশায়, বাঙালীর কোন গুণ নেই বলে আপনি আর স্বাতী যে চেঁচাচ্ছেন, আপনারা এটা কখনও ভেবেছেন ১৯২৭ সালেই এম, এন, রায়,—কি, এবার বুঝলেন কার কথা বলছি—সেই এম, এন, রায়। স্ট্যালিনের মত মহামান্য লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বসলেন। বাঙালী সিংহ আর কাকে বলে! ভেবেছেন? (আমি ভাবলাম বলি মুজফ্‌ফর আহমেদের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' পড়ে দেখুন তাহলে বুঝবেন, বাঙালীর গর্ব এম, এন, রায় রাখেন নি। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের তহবিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছেন। ১৯২২ সালে একটা অঙ্কের পরিমাণ ছিল আঠার লক্ষ টাকা। পার্টিকে দিয়েছিলেন সব মিলিয়ে দু'লক্ষ টাকা। থাকতেন পশ্ হোটেলে, ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ মানে ওনার মনমত লোক—তা পার্টির উপকারে আসুক বা না আসুক। উদ্ভট সব আইডিয়া ছিল। ভারতকে জানতেন না, অথচ ভারতের পার্টি সম্বন্ধে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের ষষ্ঠ অধিবেশনে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। টাকা চুরি, আর অতিরঞ্জিত রিপোর্টের জন্য পার্টি থেকেই বহিষ্কৃত হন। আর যেসব গুণ ছিল, বাঙালী মহাপুরুষ হয়ে গেলেই থাকে, নাই-বা বললাম, সে কথা। কিন্তু এসব বলে লাভ নেই। মিঃ চৌধুরী এখন বলার মুডে আছেন, বাধা দিলে হয়ত বিরক্ত হবেন)। —কি, চুপ ক'রে আছেন যে—আমার যুক্তির কাছে কোন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না তো? কি, এবার তাহলে স্বাতীকে জিজ্ঞেস করবেন, ও যখন দশম শতাব্দীর বাঙালীর বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কাপুরুষতার বা বিভীষণবৃত্তির কথা বলছিল—কি, সেদিন বলছিল না? আমি আর তর্কে যেতে চাই নি,—শত হলেও আমার ঘরে অতিথি হয়ে এসেছে এবং রুবির যখন এত বন্ধু—কিন্তু বাঙালীর যে স্পিরিট ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে—সে সব রত্ন যদি তুলে ধরতে পারেন—তবে তো বুঝি, কি, ঠিক বলছি কিনা?

বড় ছটফট্ ক'রে কথা বলেন মিঃ চৌধুরী। সব সময় ধরতে পারি না। একটা ছেড়ে আরেকটা বিষয় এবং রকেট স্পিডে এবং কোন রকম পটভূমিকা

ছাড়াই। মাঝে মাঝে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে বা ওঁর এই ছট্‌ফটানি দেখলে আমার কেন জানি, কোন জমিদার বা বেনিয়ানদের কথা মনে পড়ে—যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের গায়ে মলম্ মাখিয়ে প্রচুর টাকা করেছিলেন কিন্তু স্বাতীর কথায়, কোন 'প্রডাক্‌টিভ' কাজ করেন নি। যেন বাঙালীর রক্তে একটা অবিচল ধারার মত মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে ইতিহাসের একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র খুঁজে পাই। তাই মিঃ চৌধুরী যখন কথা বলে যাচ্ছিলেন, আমার মনে পড়ে গেল, সেই সব বেনিয়ান বা নবকৃষ্ণজাতীয় নন্দদুলালদের রোজনামচার কথা। অনেক রাত পর্যন্ত বাইজী নাচ, সকাল এগারটা পর্যন্ত টানা ঘুম, মাঝে মাঝে বন্ধুর সঙ্গে খোশ্ গল্প, বুলবুলির লড়াই, ঘোড়ার লড়াই, বাজি রেখে ঘুড়ি ওড়ান, লেহ্যপেয় ভোজনান্তে আবার টানা ঘুম, কখনও-বা খড়দহে রাসযাত্রা। বজরাতে খেম্‌টা নাচ।

ওমনি 'সংবাদ ভাস্করে' প্রকাশিত চিঠির কিছু অংশ মনে পড়ে গেল—'সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কহিব···আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম···মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেম্‌টা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহী বাবুরা নর্তকীদিগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভদ্র সন্তানেরা করিতে পারেন না···।' কিংবা রবিবার ১৮৪২ সাল, 'অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়াছি, আবার—বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও, অদ্য রাত্রিতে অত্যন্ত আমোদ হইবে।' অথচ এই 'বড়মানুষটি' কিন্তু তার আগেই খড়দহে গিয়ে রাসলীলা দেখে এসেছেন। মিঃ চৌধুরীরও সেরকম একটা 'যাইব যাইব' ভাব।

—তা যা বলছিলাম, নিকারাগুয়া। হিসাবটা তো খুব ক্লিয়ার্। কিউবা কমিউনিস্ট দেশ, কেমন? মানে আমেরিকার বুকের কাছে লাল-রঙা একটা দুর্গ। তার মানেই রাশিয়ার কী প্রচণ্ড ইনফ্লুয়েন্স, একবার ভাবুন। সেই ইনফ্লুয়েন্সে গোটা সেন্ট্রাল্ আমেরিকায় আগুন লেগেছে মশায়, আগুন। নিকারাগুয়াতে ছিল স্যামোজার ডিক্টেটরশীপ্। কিউবার লাল দুর্গের সাহায্যে সেই মিলিটারী জনতাকে কাত করল একদিন। বসলো স্যান্‌দিস্তা ন্যাশনাল লিবারেশন্ ফ্রন্ট—মানে কারা? যারা মার্কিন ভাড়া করা কমাণ্ডোদের ষড়যন্ত্র একদিন নস্যাৎ ক'রে দিল। সমস্ত সেন্ট্রাল্ আমেরিকার দৃশ্য তো এই : ভাড়া করা কমাণ্ডোদের ওপর বিপ্লব পাল্টে দেবার ভার;

ক্ষমতাসীন সরকারকে নস্যাৎ ক'রে দেবার ভার। মশায়, এসব জানেন? (কথাগুলো মূল্যবান। টেপ্ ক'রে নিয়েছিলাম। কাজে লাগবে আমার)। এখন দেখতে হবে, গেরিলা বা কমাণ্ডোদের এত লম্ফঝম্ফ কেন? তা হবে না? কাদের হাতে ক্ষমতা? মশায়, ল্যানডেড জেনট্রির হাতে—ঐ যারা অর্থনৈতিক উন্নতি হতে দেয় না, হাত মেলায়, এবং সব আন্দোলনের সর্বনাশ ঘটায়! কারণ পাইপ্ টেনে, গোটা ফিউডাল্ ইনটারেষ্টটা মাথায় রেখে সংগম করতে যা মজা না! এবং পরের দিনে ভরা পেটে লোকেদের বা কৃষকদের পেটাতে যা স্যাডিস্ট্ সুখ না—এবং তার পরমুহূর্তে ঐসব নিরীহ সর্বহারা মানুষদের বিনাবিচারে জেলেপুরে দিতে কি যে তৃপ্তি না! নিকারাগুয়ার জন্য জানেন, কয়েক মিলিয়ন ডলার বাজেট? কি করবে তারা? কেন, যা সব দেশে ক'রে থাকে, যার অস্তিত্ব দেখবেন এই কলকাতাতেও—পাওয়ার প্ল্যান্ট ধ্বসিয়ে দাও, ব্রিজ উড়িয়ে দাও এবং দেশে এমন একটা অপসংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দাও যে সমস্ত দেশটার ইন্টেলেক্চুয়াল্রা যাতে একটা নক্কারজনক সিচুয়েশন্ তৈরী করে। খেমটা নাচ বরং এর চেয়ে ভাল ছিল। জানেন, বড়ই দুঃখ, এরা অনেকে, এমন কি এই আপনার 'সেন্টার'ও, আমাদের কাউকেই সুস্থভাবে বাঁচতে দেবে না, জানেন? কলকাতার রক্‌বাজরা কী কমাণ্ডোদের চেয়ে কিছু কম, অ্যাঁ?

মিঃ চৌধুরী যাই বলুন, আজ বৃষ্টি পড়ছে, মনটা স্বাতীকে দেখার জন্য বড় ব্যাকুল, আজ আমি কিছুতেই নিকারাগুয়া বা সি, আই,এ,-র ধারে কাছে যেতে রাজী নই। জানলা দিয়ে দেখলাম, আকাশটা একটু যেন পরিষ্কার হবার আভাস দিয়ে গেল। স্বাতীর আশেপাশে কোথাও টেলিফোন নেই। নয়ত টেলিফোন করতাম। ওর গলার স্বর শোনার জন্য মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে আছে। স্বাতী মাঝে মাঝে বুলবুলের বাসায় যায়। ভারি মিষ্টি দেখতে বউটা। সাদা মন। দীপঙ্কর সেন, ওর স্বামী। ওকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, অত লম্বা-চওড়া হাসিহাসি মুখ, ভদ্র, বিনয়ী, সর্বদা এলার্ট, দুনিয়াদারী বোঝে আবার আর্ট নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামায়—বুলবুলের স্বামীর মত তরুণ স্বামী, কলকাতায় কত আছে? সবচেয়ে বড় কথা দীপঙ্কর আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং বুলবুলকে দেখে তো মনে হয়, আমাকে পেলে ওরা বর্তে যাবে, এমন একটা ওয়ার্মথ।

সেই বুলবুলের বাসায় যদি স্বাতী সকালে যায় বা বুলবুলকে যদি ফোন

করি বুলবুলকে যদি বলি, বুলবুল তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করছে, আসব? যদি উত্তরে বলে, আসুন, স্বাতীও বসে আছে, বেশ মজা হবে—। তাহলে? —আস্তে ক'রে ফোনটা তুলে ডায়াল্ করলাম—কে, বুলবুল?

—না, আমি বাসনা (বাসনা বুলবুলের বোন)।

—ও, তুমি—তা তোমার কলেজ নেই?

—না, বাসনা টেলিফোনেই খুশী ছড়াল, কি মজা, বৃষ্টি পড়ছে, আর দেখুন, জল-কাদা ভেঙ্গে আজ কল্যাণীতে যেতে হয় নি। আমি টক্ ক'রে বলতে পারলাম না, বুলবুল বাড়িতে আছে? ওকে একবার টেলিফোনটা দাও। তাহলে বাসনার অভিমান হয়ে যেত। আমি ভাল ক'রে কথা না বললে, বাসনা ইনফিরিয়রিটি কম্প্লেক্সে ভোগে। কলেজের লেক্চারার, কত স্বপ্ন, কত সখ, কত উত্তেজনা—তাই বাসনা তার কিছু কিছু পরিচয় আমাকে দিতে চায় এবং আমার রেস্পনস্ পেলে খুব খুশী হয়। —'বুলবুল স্বাতীর বন্ধু, কিন্তু আমিও তো বুলবুলের বোন'—কথাটা বলে একদিন আমাকে রীতিমত বিব্রত ক'রে দিয়েছিল। তাই মহা সন্তর্পণে আমি বাসনার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম—

—হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার রিসার্চের কী হল, বাসনা?

—হোল না, অমরেশদা। জানেন, জীবনে সব কিছু হয় না। নয়ত রিসার্চ নিয়ে যখন মেতেছিলাম, তখন কল্যাণীতে এই চাকরীটা পাবই-বা কেন বলুন? ফলে যদি চাকরী করি, আর ভোর পাঁচটায় উঠে কোনমতে কল্যাণীর দিকে ছুটি—তাহলে কি আর রিসার্চ করার শক্তি থাকে? আমি ভাবছি, ওসব ক'রে আর কি হবে—স্বাতীদি অবশ্য বলছেন, না, ছাড়বি না, নামটা থাক না—নাম কাটতে কতক্ষণ লাগে?

—রিসার্চ করতে পারবে না বছর খানেকের মধ্যে কিংবা সুস্থির হতেও, পারবে না অথচ নামটা ঝুলে থাকবে—সে কি?

—হ্যাঁ, স্বাতীদির কিরকম জেদ জানেন তো। সবার ও গুণটা নেই যে—কি করা? ধরলে শেষ করতে হয়, অতটা মনের জোর যদি থাকত, তাহলে এতদিনে কত উঠে যেতাম। তাছাড়া স্বাতীদির সবচেয়ে সুবিধে কী জানেন তো, একমাত্র মেয়ে, কোন অবলিগেশন্ নেই, চাকরী করার তাড়া নেই। মেসোমশায়ও মোটামুটি পড়াশুনা নিয়েই আছেন। কিন্তু আমরা? আমাদের তো অমরেশদা, চাকরী করতেই হবে। বাবা রিটায়ার্ড করেছেন,

দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, দীপঙ্করদা অবশ্য বলছেন, তুই পড় না, রিসার্চ কর না— আমি তো আছি-রে, না-কি মরে গেছি? তোর দিদির খুব পড়ার শখ ছিল—হ'ল না। যা-হোক গান-বাজনা নিয়ে আছে। তুই না হয় একটু পড়্লি। কিন্তু তা কি হয়, বলুন অমরেশদা? সে যাক, কি খবর আপনার, অফিস নেই?

—আছে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাসনা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল। মেয়েটা বড় সরল। হাসতে পারলে কলকাতার টেলিফোনের রুগ্ন স্বভাবটাকেও পাত্তা দেয় না। এমনিতেই কলকাতায় কোন লাইন পাওয়া যায় না—এই মুহূর্তে হাসির চোটে যদি একবার লাইনটা কেটে যায়—তবে সারাদিন চেষ্টা করেও আর হয়ত লাইন পাব না। কিন্তু বুলবুলকে ডেকে দাও, তখনও বলতে বাধ বাধ ঠেকছে (বুলবুল থাকলে স্বাতীর কথা ঠিক একটু অন্য রকম ক'রে বলত, হয়ত বোঝে আমার মনের অবস্থাটা কি, বা আমার ওটা নেহাৎ একটা নির্ভেজাল আকর্ষণ—ঠিক ধরতে পারে, তাই হয়ত একটু সহায়তা করে—)।

—তা যদি অফিসে না যান, আর আমাদের বাড়িতে আসেন খুব কি ক্ষতি হয়? ধরুন, এখানেই না-হয় দুটো ডাল-ভাত খেয়ে নিলেন। আর তারপর যদি চুটিয়ে আড্ডা মারি, তবে বেশ হয়। কলেজ ক'রে জানেন বড় ক্লান্ত লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় চুটিয়ে আড্ডা মারি—কিন্তু, এই দেখুন দিদি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে (বাঁচা গেল)—বলছে, আপনাকে ডালভাত খেতে নেমতন্ন ক'রে নাকি ভয়ানক অন্যায় ক'রে ফেলেছি—খুব মজা হবে, আসুন। বলেই বুলবুলকে ফোনটা দিল।

—কি ব্যাপার, অফিস নেই? বুলবুল অভিযোগ করল।

—কেন, অফিস থাকলে তোমার সুবিধে হয়—বা না থাকলে—কোন্‌টা তুমি বলতে চাইছ?

—অফিস না থাকলেই-বা কী? এদিকে তো টিকিটি দেখা যায় না।

—সেটাই তো ট্র্যাজেডী। অফিস-সর্বস্ব মন আমাদের, অবসর নেই। বড় আফসোস, বুলবুল পাখি একদিন যারা ওড়াত, তাদের মত যদি অবসর থাকত, বুলবুল। এই মুহূর্তে তবে গিয়ে বলতাম, বুলবুল এসো তোমাকে ওড়াই।

খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল বুলবুল। দু'বোনই হাসতে ওস্তাদ্। হাসতে

পারলে আর কিছু চায় না। বাঙালী মেয়ে বা বউয়ের হাসিটা যে কত স্বচ্ছ, বিদেশী কোন মেয়েকে দেখাতে পারলে হত।

—তবে আসছেন তো, আসুন, স্বাতীও আসবে, খুব জমবে। ইঙ্গিতটা এই যে স্বাতী আসবে বলেই জমবে। আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। স্বাতীও আসবে? মনে যা মাঝে মাঝে ওঠে তা কি সত্যি হয়? আরও একটু পীড়াপীড়ি করুক বুলবুল, নিশ্চয় যাব।

—কি, চুপ ক'রে আছেন যে? কোন ওজর-আপত্তিই শুনবো না। ডুমুরের ফুল হয়েছেন, ও বদনাম ঘোচাতে একবারও কি মনে হয় না একটু উদ্যোগী হই? —আপনি অদ্ভুত জীব।

—বাসনা বলছিল, ডাল-ভাত খাওয়াবে—কিন্তু।

—না মশায়, বড় লোভী তো—ডাল-ভাত নয়, মাছ-ভাতই খাওয়াবো। রান্নায় ভীষণ ব্যস্ত। রাখছি।

—শোন, দীপঙ্কর আছে?

—আছে, তবে এই মুহূর্তে ভাবছে একটা ক্যাজুয়াল লিভ্ নিলে অফিসের দুর্দান্ত ক্ষতি হয়ে যাবে কিনা—

—কই, ডাক তো যুধিষ্ঠিরকে।

—কি ব্যাপার, আজকাল সত্য-মিথ্যার যে ধার ধারে না, তাকে যে খুব আগ্ বাড়িয়ে যুধিষ্ঠির বলছেন?

—না, অফিসে একটা দরকারে আসবে বলেছিল, অপেক্ষা করলাম, যুধিষ্ঠির সত্য ভঙ্গ ক'রে আমার মূল্যবান সময়টা নষ্ট করালো—ডাক যুধিষ্ঠিরকে—।

—এই নিন [এই শোন, অমরেশদা তোমাকে ডাকছেন]। সি, এম, ডি, এ, এমন কিছু করছে না, যে অফিসে না গেলে ক্ষতি হবে। বুলবুল হয়ত চেয়েছিল কথাগুলো আমি শুনি, তাই টেলিফোনের মুখটা বোধ হয় চেপে ধরে নি—সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

—হ্যালো, অমরেশদা।

—কি যুধিষ্ঠির?

—ও, হ্যাঁ, খুব স্যরি। জানেন, যাবো ঠিক, আর বেরুতে যাচ্ছি ঠিক তক্ষুনি একটা কাজ পড়ে গেল। আরে সি, এম, ডি, এ, কাজ করছে বলে কলকাতায় নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াতে পারছেন—তা না হলে কী দশা হত,

আমরা জানি, আপনারাও অত বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা, সে যাক্, বেরিয়ে গিয়ে আবার ঘরে টেলিফোন করলাম, আপনি নেই। কি-যে কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছেন—কলকাতাকে না জেনে না চিনে আপনি দেখছি ছাড়বেন না—। এই দেখুন, বুলবুল কি বলছে, বলছে, কলকাতার ভালবাসায় পড়েছেন? তা যদি হয়, সর্বনাশ কিন্তু, ওর ধারে কাছে যাবেন না—। বুলবুল পাখিটিকে ভালবেসে, আমার যে কি দুর্গতি, আবার খাশ 'ঘটি' কিনা—বিয়ে ক'রে মহা ফ্যাসাদে পড়েছি। দেখছেন না,—নিজে উড়ে বেড়াবে, আবার আমাকে উড়তে দেখলেই খাঁচা নিয়ে এসে বন্দী করতে চাইবে—মেয়েছেলেদের বোঝা দায়।

জোরে হেসে উঠলাম।

—তা আসছেন? যদি আসেন, তবে ক্যাজুয়াল লিভ্ নেওয়া যায় কিনা সিরিয়াস্লি ভাববো। যদিও ফেডারেশনের খেলা আছে—দেখি। কলকাতায় জানেন, খেলা হলে কোন অফিসেই কাজ হয় না। ইদানীং ব্যাঙ্কও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আজকে একটা চেক্ ভাঙ্গাবার আছে আর ওদিকে ফেডারেশনের খেলা—বারোটা থেকেই তো ফাঁকা হয়ে যায়—! আসছেন তো?

বললাম—দেখি।

—না, না, আসুন। দীপঙ্কর টেলিফোনটা রেখে দিল। স্বাতী আসবে। না যাবার মানেই হয় না।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। কফির অর্ডার দিলাম। সেজেগুজে বসে কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতেই কফি এসে হাজির। এক হাতে কাপটা ধরে জিজ্ঞেস করলাম—চৌধুরীবাবু কি ঘরে, না বাইরে? —সাহাব্ বাড়িতে। আপনি আছেন কিনা দেখতে বললেন।

—সেরেছে, ভাবলাম আজ আর রক্ষে নেই। বুলবুলদের বাসায় যেতে পারলে হয়।

দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

আমি তাড়াতাড়ি অনেকগুলো অফিসের ফাইল নিয়ে বগল-দাবা ক'রে ঘর থেকে বেরুবার ভঙ্গী ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম—বললাম,—ইয়েস্ কাম ইন্—।

মিঃ চৌধুরী দরজায় দাঁড়িয়ে হতভম্ব,—কি, বেরুচ্ছেন? আমি ভাবলাম,

বৃষ্টি পড়ছে,—চৌধুরী কষ্ট ক'রে আকাশের অবস্থা অনুমান করার চেষ্টা করলেন,—প্যাঁচপেঁচে কলকাতায় আর বেরুই কেন—ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার এবং মুখার্জীকেও লাঞ্চ আওয়ারে ডেকেছি,—এই একটু আড্ডা মারতাম, মানে খোশ্‌গল্প আর কি—

—আমার একটা জরুরী মিটিং আছে—। আমি মুখটা তাবৎ গোলামদের মত ব্যাজার করলাম। এবং আত্ম-সাফাই গেয়ে বললাম—আর বলেন কেন মশায়, অফিসের ফাইল সামলাতেই চুল পেকে গেল—। কলকাতা আমাকে রীতিমত ঝরিয়ে ছাড়বে। অস্থিচর্মসার হয়ে ফিরে যাব দেখবেন। আপনাদের চেনা তো হলই না, মাঝখান থেকে বদনাম—

—কেন, বদনাম হবে কেন? ভালবাসায় পড়েছেন বলে কি ভয়?

—ভালবাসা, সে কী?

—হ্যাঁ, সব জানি। ছাড়ুন। কেন, অত ইন্‌হিবিশন্‌ কেন? ম্যারেড ম্যান্‌ কি ভালবাসায় পড়তে পারে না? বড় কন্‌জারভেটিভ্‌ তো মশায়—।

আর কোন কথা চলে না।

দু'জনেই ভঙ্গী ক'রে আমরা দাঁড়িয়ে আছি—মিঃ চৌধুরী আমার পথ আগলে, আর আমি একটা ভয়ঙ্কর নাটকের, বলা যায় রীতিমত নায়কের সাপোর্টারের পার্ট করছি। দিল্লীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বুরোক্র্যাট্, মিনিস্ট্রি মিডিয়া সেলের অফিসর অন্-স্পেশাল ডিউটি মিঃ অমরেশ রায় যদি এক্ষুনি মিটিং-এ না যায়—ভারত সরকারের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে যেন—সেই ভাবটা মুখে ফুটিয়ে রেখেছি।

—জিজ্ঞেস করলাম—বসবেন?

—বসতে দিলে তো বসবো? এখন কী আপনার সময় আছে? স্বাতী, বুলবুল, বাসনা—কি, সব কি লাইন ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছে নাকি?

আমি থ হয়ে গেলাম—। তিনটে নাম মিঃ চৌধুরী একবাক্যে উচ্চারণ করলেন কী করে? তবে কি আমার টেলিফোন এতক্ষণ ট্যাপ করছিলেন? ভেতর ভেতর রাগে আমি তখন ফুঁসছি। আচ্ছা লোক তো। অথচ আমি কিন্তু হাসছিলাম। আমার ওপরেও ইন্‌টেলিজেন্স? এঁর কথা টেপ্‌ ক'রে কী লাভ? বাস্তবিক চৌধুরীর শেকড় পাওয়া ভার। হোক না ভালবাসার দাবী—কিন্তু আমারও তো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে একটা ব্যাপার থাকতে পারে।

আমি হেসে বললাম—বসুন, লাইন সব সময় ক্লিয়ার থাকে না।

সিগ্ন্যালের ব্যাপার থাকে এটা আপনার জানা উচিত।

রস পেয়ে মিঃ চৌধুরী হাঃ-হাঃ ক'রে হেসে উঠলেন, —বললেন, পারবেন, মশায়, আপনি নিশ্চয় পারবেন। যারাই আপনাকে এ কাজের জন্য সিলেক্ট করুক—বুঝতে পারছি কেউ ঠকবে না। আমি বলে দিলাম আপনি সসম্মানেই ফিরতে পারবেন। তবে তিনটে নাম উচ্চারণ করলাম বলে হয়ত একটু মিস্‌আনডারস্ট্যাণ্ডিং হতে পারে, তাই একটু এক্সপ্লেন্ করা দরকার। তার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—আমি যে খুব সাদাসিধে লোক নই—এটা নিশ্চয় এতদিনে বুঝেছেন? তবে শ্রেফ্ বন্ধুত্বের দাবী—দেখবেন ভয়ানক এক শয়তান জীব যেন ভেবে বসবেন না। দেখুন মাওয়ের একটা কথা আমি খুব মেনে চলি—যা কিছু ঘটছে, চোখ খুলে রাখবে। সব কিছু বলবে না—ডোণ্ট বেয়ার ইয়োরসেল্‌ফ্—। তাতে নিজের ক্ষতি হয়। এটা আপনি কতটা মেনে চলেন, আমি দেখছিলাম। অনেকটাই পারছেন, মাঝে মাঝে আপনি দেখছি ভয়ানক সিক্রেটিভ্, ভাল, খুব ভাল। কিন্তু এখনও স্ল্যাকনেস্ আছে। মাপ করবেন, আপনার টেলিফোন আমার সঙ্গে ঘটনাচক্রে ক্রস্ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় ওটা হরদম হয়। এটা তো আর বিদেশ নয় যে এসব জিনিস ভাবা যায় না। ধরুন, জেনিভা থেকে আপনি আমেরিকার অষ্টিন, মানে টেক্‌সাসে ফোন করছেন, মনে হবে, যেন লোকাল কল। ওসব জায়গায় ফোনে প্রেম ক'রেও সুখ, মনে হয় ফোনেই চালিয়ে যাই। অথচ কলকাতায় খুব খেয়াল রাখতে হয়, আপনার কথা গোপনে কেউ শুনছে না তো? আমরা অবশ্য একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারি, আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি জানতাম। যা বলছিলাম, তাই নামগুলি একে একে কানে এল—তা আপনি বলছেন মিটিং আছে। তা যান, ফাইলগুলি নিয়ে যে ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন, আমার দেখে মনে হচ্ছে এক সময় নিশ্চয় আপনি খুব ভাল নাটক করতেন। আমি জানি, যে-সে লোক ডি, জি,-র প্রিয়পাত্র হতে পারে না। যোগ্যতা থাকা চাই। মুখেচোখে কখন আলো ফোটে, আমরা বুঝি। ভালবাসা ঢাকতে যাওয়া মূর্খামী বলে আমি মনে করি। স্পেল্‌ন্‌ডিড্, গো এহেড্। গডস্ স্পিড্, মাই ডিয়ার।

ভেতরে ভেতরে আমি রাগে টঙ্গ হয়ে আছি, কিন্তু আমি জানি, আমি তখনও সিচুয়েশন্ ম্যানেজ করার চেষ্টা করছি। এবং চৌধুরী বিশ্বাস না

করুন, মিটিং আমার আছে, সেই দৃপ্ত বিশ্বাস আমি ওঁর মনে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলাম এবং কৃতকার্য হয়েছি বলেই আমার মনে হল। মিঃ চৌধুরী তাতেই আশ্বস্ত হলেন এবং হয়ত ভাবলেন, যতটা আমি ঘোড়েল হলে ওনার অসুবিধে হবার কথা—ততটা ঘোড়েল আমি নই। কিংবা ওঁর চেয়ে আমি আর এক স্টেপ্ এগিয়ে আছি—কিন্তু কমপিটিশনে নেমে লাভ নেই। যে কোন কারণেই হোক দু'জনেই আমরা তখন হাসছিলাম। অকারণে এই যে পরস্পরের হাসি—এটা নিশ্চয় একটা ক্লাসিকাল্ জিনিস।

মিঃ চৌধুরী দরজা ছেড়ে দিয়েছেন—আমি করিডর দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছি। মিঃ চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি। হাতে আর বগলে আমার ফাইল। হয়ত মিটিং-এর পরেই আমি স্বাতীর কাছে যাব। না, মিঃ চৌধুরী, অফিসের ফাইল নিয়েই আমি এখন সোজা বুলবুলদের বাসায় যাচ্ছি। তাতে সুবিধে হবে এই, ওদেরও ইমপ্রেশন্ দেওয়া যাবে।

॥ উনিশ ॥

বুলবুলদের নলীন সরকার স্ট্রীটের বাড়ীটায় গেলে আমার অনেক অতীত ইতিহাস মনে পড়ে। যেমন এক একজন মানুষ ইতিহাস পাল্টায়, এক একটি বাড়ি তেমনি অতীত ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে অনেক জমিদারী আভিজাত্য গুঁড়িয়ে গিয়েছিল ; যুগের দাবী না মিটিয়ে শিল্প-বাণিজ্য থেকে যেসব জমিদার মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, তাঁরা তখন অনেকে রাজবাড়ির এক-একটা অংশে ভাড়াটেদের বসাতে বাধ্য হন।

বুলবুলরা এই রাজকীয় বাড়ির তেতলায় থাকে। বাড়িটার ছাদে মস্ত বড় একটা ঘড়ি ছিল ; ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত নিখুঁত টাইম্ দিত ; তারপর দু'দশক ধরে উল্টোপাল্টা সময়ের হিসাব দিয়ে এখন ওটা একেবারেই বন্ধ হয়ে আছে। ঘড়িটা এখন উঠিয়ে নিলেই ভাল হয় ; অনেকের বিভ্রান্তি ঘোচে।

একদিন এ বাড়ির নিশ্চয় রম্‌রমা ব্যাপার ছিল, এখন পোষ্যবর্গদের হাঁক দিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। দু'একজন নিশ্চয় আছে ; হয় বুড়ো হয়ে গেছে—কিংবা তাদের সেই তৎপরতা নেই। ডাকলেও আসে না। কিংবা তাদের কোন বংশধর এই পড়ন্ত বৈভবের অনুকূল আলোতে থাকে বলে কাউকে হয়ত অতটা পরোয়া করে না। জমিদার বাড়ির বংশধরদেরও বিশেষ কাউকে দেখা যায় না ; আজকাল এঁরা ব্যবসায় নেমেছেন, হাতে সময় কম। সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেলে জমিয়ে বসতে আবার সময় লাগারই কথা। জমিদার বাড়ির সেরেস্তার ঘরটা এখন গুদামঘরে রূপান্তরিত ; আগে রাখা হত পাট বা ঐ জাতীয় পণ্য ; এখন কাগজের দাম বাড়ছে বলে টন টন কাগজ আর টন টন পেস্টবোর্ড।

সামনের বস্তিতে অসংখ্য রিক্সাওয়ালা থাকে, জমিদার বাড়ির ফটকের সামনে গোল হয়ে বসে, দু'একজন হাসি-গল্প করে ; জমিদারবাবুদের কারুর গাড়ি এলে একটু সরে বসে, কেউ উঠে যায়, আবার এসে বসে। দেশে-গাঁয়ের কোন একজন লোকের হয়ত একটা ঘর আছে বা ছিল—সেই গোয়াল ঘরে এখন বিহারের গোটা গ্রাম উঠে আসে। জমিদার বাড়িকে আশ্রয় ক'রে দিব্যি চলে যায় ; শীতকাল ও বর্ষাকালেই যা একটু মুশকিল। ড্রেনের

গা-ঘেঁষে সারি সারি রিক্সা ; সকাল হলেই ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ ক'রে কলকাতার ভিড়ে হারিয়ে যায়।

পাশে আর একটা বিরাট জমিদার বাড়ি। বাণিজ্যশিল্পে টাকা খাটিয়েছিল বলে এখনও এদের বৈভব যুগোপযোগী। দিল্লীতে এদের বিরাট বাড়ি। এরা টের পেয়েছিল, দিল্লীকে কোন একটা সূত্রে ছুঁয়ে না থাকলে উজ্জ্বল হয়ে রঙ ছড়াবার উপায় নেই। চারটে গাড়ি ; দু'পাশের দরজা দিয়ে যুগের অভিজাত তরুণরা কখন-যে-কোন্‌ গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে যায়, কেউ টের পায় না।

রাস্তা দিয়ে আর একটু এগিয়ে আরো কয়েকটা বস্তি ; নক্সাল সময়ে নাকি নক্সালরাও এসব জায়গায় লুকিয়ে থাকত বা কোন বস্তিবাসী তাদের আশ্রয় দিয়ে মুশকিলে পড়ত। এখন অবশ্য এখানে মস্তানদের বেশী দেখা যায়। প্রায়ই দু'টো সাদা উর্দি-পরা পুলিশ গার্ড দেয়। কখনও-বা বোমা ফাটে। সেদিন একটা লোক রিক্সা ক'রে যাচ্ছিল, হঠাৎ বিস্ফোরণে তার একটা চোখ উড়ে গেল, রিক্সাওয়ালার একটা পা। একটু এগোলে মোড়ে খান্না সিনেমা। খুনীরা নাকি ওখানে দিনদুপুরে ঘোরে। অন্য মোড়ে শ্রীসিনেমা, রাধা আর নানা প্রফেশনাল্‌ থিয়েটার।

আমি গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছি। এখান দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগে। রবিবারে হাতিবাগানের বাজারে তরুণরা হাতে হাতে পায়রা কেনে। এরাও কি পায়রা ওড়ায় কিংবা পোষে? প্রস্রাবখানার পাশে অসংখ্য রক্তাক্ত পালক। মহারাজ নবকৃষ্ণ হয়ত বুঝতে পারেন নি, পায়রা ওড়াবার চেয়ে পায়রার মাংস অনেক বেশী সুস্বাদু। জোড়া বাঁদরের দাম ১৪০ টাকা। সব জিনিসের দাম বাড়ছে আর বাঁদরামীর দাম বাড়বে না? রঙ-বেরঙের বাহারী পাখির পসার বসেছে। মুক্তবিহারী পাখিগুলিকে বন্দী ক'রে রাখার একটাই তাৎপর্য ; নানা জাতের পাখি নানা ভঙ্গী দেখিয়ে রঙ ছড়ায়। খাঁচার রঙিন পাখির চেয়ে অবশ্য পায়রা খাবার ধুম বেশী। তার ঠেলায় রাস্তাঘাট জ্যাম হবার উপক্রম। ট্রামের ঘন্টা জোরে জোরে বাজে, বাসের হর্ন সশব্দ আওয়াজ তোলে।

তন্ময় হয়ে এসব দেখতে দেখতে আমি প্রকৃতই মহারাজ নবকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম। 'রাজাবাহাদুর' উপাধি হেস্টিংস তাঁকে পাইয়ে দিয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজদের যেমন ভাগ্য খুলেছিল, নবকৃষ্ণেরও তাই। উপাধি-দান উপলক্ষ্যে হেস্টিংস যে দরবারের আয়োজন

করেছিলেন, মেঠোপথ ও চালাঘরের পাশ দিয়ে লোকেরা যেন উপছে পড়েছিল। সুসজ্জিত হাতির পিঠে নবকৃষ্ণ বসে আছেন, পেছনে সমারোহে চলেছে অশ্বারোহী, গজারোহী আর পদাতিক শোভাযাত্রা। সেদিন অনেকেই মহারাজ হয়েছিলেন কিন্তু ঝালরদার পালকিতে যাতায়াত করার অধিকার ছিল একমাত্র নবকৃষ্ণেরই। সাহেবদের মত তিনি ঘোড়ার গাড়ি ক'রেও বেড়াতে যেতেন। ষড়যন্ত্রে বাঙালীর রাজা ছিলেন তো, তাই সম্মানটা তাঁর সাহেব মহলে একটু বেশী ছিল। তাঁর দুর্গাপূজার সমারোহ দেখবার মত ছিল। হিন্দু, মুসলমান জাত-ফাত ভুলে ছুটে আসত। নবকৃষ্ণই বোধহয় নব্য-নন্-কমিউন্যাল ভারতের প্রথম জন্মদাতা।

বুলবুল এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল—এই বুঝি আপনার এক্ষুনি আসা ?

—গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে নেমে পড়েছিলাম—তোমাদের এদিকটায় এলে বড় পুরনো ইতিহাস মনে পড়ে।

—তাই বলুন, ও অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে এক্ষুনি বেরিয়ে গেল, বলল—অমরেশদাকে বোল, অফিসে গিয়ে একদিন দেখা ক'রে আসবো। বললো বটে অফিসের কাজ—আমার মনে হয়, খেলা আছে তো, তাই। কলকাতার লোকেরা খেলার ব্যাপারে কী-যে পাগল, আরও কিছুদিন যাক, আপনিও হয়ত দলে ভিড়ে যাবেন।

স্বাতী এসে গেছে কিনা জানার জন্য মনটা অধীর হয়ে ছিল। খবর পেয়ে বাসনা ছুটে এল। জমিদার বাড়ির করিডর পেরোতেও কম সময় লাগে না। বুলবুলের বড়দা অনিল সরকার, জার্নালিস্ট। এক সময় বোধহয় পার্টি করতেন, আলমারীতে সাজান আছে লেনিনের কমপ্লিট্ ওয়ার্কস্। নেড়েচেড়ে দেখলাম—মাঝখানে দু'একটা বই নেই। নাম-লেখা দু'একটা অন্যের বই। বাসনা পাশে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করল—বড়দার বন্ধু নিশীথ গুপ্ত পাঁড় কমিউনিষ্ট ছিলেন। ঘরবাড়ি বলে কিছু ছিল না। এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। ইউনিয়ন করতে করতে মুখটা রোদে-পোড়া হয়ে গিয়েছিল। নিজের মাইনের টাকাও শুনেছি পার্টিতে দিতেন। ওঁর সংস্পর্শে এসে দোতলার ভাড়াটে গোরাদি কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বহু পুরনো একটা সোফায় আরাম ক'রে বসলাম।

বাসনা অন্য দিকের সোফায় বসে, হেসে বলল—কি ব্যাপার, আজকাল আসেন না যে ?

সময় পাচ্ছি না। তাছাড়া তোমাদের এদিকে এলে খুব রিফ্লেক্‌টিভ্‌ হয়ে পড়ি, কলকাতার পুরনো ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

—তবে তো সত্যিই মুশকিল। আপনারা দু'জনেই বড় ইতিহাস-পাগল। বসুন, চা নিয়ে আসি।

বাসনা নামটা বলল না বটে কিন্তু বুঝলাম কার কথা বলছে। ক'দিন ধরেই স্বাতী বলছিল আন্দামান যাবে। ওখানে নাকি ভারত সরকারের কোস্ট্‌ গার্ডে ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবের তৈরী করা একটা জাহাজ আছে। জিজ্ঞেস করছিলাম, কে ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব? তখন ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবের ইতিহাস বলছিল স্বাতী।

১৭৭৭ সালে সেই কোম্পানী আমলের সময় ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব একটা জাহাজ তৈরীর কারখানা করার জন্য প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার পাউণ্ড খরচ ক'রে বসেছিলেন। দু'টি উইণ্ডমিল্‌ যন্ত্র তিনি বিলেত থেকে এনে গার্ডেন-রীচে বসিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি যন্ত্র প্রায় ১১৪ ফুট উঁচু; পাঁচ-তলায় শস্য-পেষার আর নিচের তলায় কাঠ-চেরাইয়ের ব্যবস্থা। স্বাতী দুঃখ ক'রে বলেছিল, কেন তিনি করতে পারেন নি জানেন? জমিটা ছিল গোকুল ঘোষালের। ওয়াট্‌সনের সঙ্গে বারওয়েল সাহেবের সদ্ভাব ছিল না; তাঁর মোটেই ইচ্ছে ছিল না ডকইয়ার্ড হয়। গোকুল ঘোষালকে উস্কানি দিয়ে কেস্‌ করিয়েছিলেন। ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব কত বড় কাজ করতে যাচ্ছেন গোকুল ঘোষাল বাঙালী বলেই হয়ত বুঝতে পারেন নি। সবই ক'রে ফেলেছিলেন ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব, জমিটার জন্য আটকে ছিল। তিনি নিজে গিয়ে গোকুলের সঙ্গে দেখা ক'রে কেস্‌ উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করেন কিন্তু বারওয়েল সাহেবকে চটাতে ভয় পেয়েছিলেন গোকুল। ওয়াট্‌সনের পক্ষে অ্যাটর্নি ছিলেন হিকি সাহেব, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন—বিশ্বকর্মার একটা বিরাট কারখানা যেন ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব ফেঁদে বসেছিলেন। ...তাঁর বিরোধী কয়েকজন হীন চরিত্রের লোক তাঁর পরিকল্পনাকে বানচাল (ক'রে দেন), ...নয়ত এমন জাহাজঘাট ও কারখানা গার্ডেন রীচে হলে সারা এশিয়াতে ব্রিটিশ জাতির সম্মান ও গৌরব বাড়ত। ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব কেসে হেরে যান। কিন্তু কত বড় মনের জোর তাঁর, একবার ভাবুন। ঐ অবস্থার পরেও তিনটে জাহাজ তৈরী করেন তিনি। তিনটের নাম ছিল—'সারপ্রাইজ'' 'নন্‌সাচ' ও 'লাউরেল্‌'। জাহাজগুলি ব্রিটিশ সরকারই কিনে নেয়।

লঞ্চ বাঁধা রয়েছে ঘাটে—মোটর লঞ্চের আনাগোনা দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। বেলা পাঁচটা অবধি অস্তগামী সূর্যের কি সুন্দর রং বদলের পালা ঘটে! প্রথমে তো চামড়ার রং, তারপর গেরুয়া বসনের প্রান্তভাগ পড়ে থাকে বাইরে—সেই ফেলে-যাওয়া বসনপ্রান্তের রং বদলের পালা দেখতে দেখতে ছ'টা বেজে যায়। পাহাড়ের ওপর বসে দেখি—তিন চারটে দ্বীপের মধ্যে খাঁড়ির সমুদ্র কালো হয়ে ওঠে, এপ্রান্তে—ওপ্রান্তের জলরাশি ইস্পাতের মত উজ্বল—সারা আকাশ লালে লাল—সাগরের বুকে জেলের মাছ-ধরা নৌকোগুলো, দ্বীপগুলো সব 'সি্যলুট্'—।

করিডর দিয়ে কেউ আসছে, তাড়াতাড়ি চিঠিটা পকেটে ভরে নিলাম। সমুদ্রের গভীরতার ছবিটা অপূর্ব লিখেছে স্বাতী। একটু বোধ হয় আনমনা হয়েছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি স্বাতী। পেছনে বুলবুল।

বুলবুল বলল—কি মশায়, ভাবের ঘোরে থাকলে কি খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবে? বেল টিপলে খানসামা এসে এখানে হাজির হয় না।

—বাঃ আমি কি ক'রে বুঝবো তোমার মাংস রান্না শেষ? বলেই স্বাতীর দিকে তাকালাম—কখন এলে?

বুলবুল স্বাতীর মুখ চেপে ধরল—বলিস না, ভদ্রলোক সেই থেকে শুধু—বুলবুল মুখ টিপে হাসল।

আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, বুলবুল এরকম আকার-ইঙ্গিতে তাকে গৌরবময় ক'রে তোলে।

আমার কিন্তু তখনও বিস্ময় কাটে নি—বললাম, স্বাতী তুমি কবে আন্দামান গিয়েছিলে?

—কি হল আপনার? এখানে বসে আন্দামানের কথা ভাবছেন বুঝি? আমার মত যেতে পারবেন? ওভাবেই যাওয়া হয়!

—না ভাবছিলাম, ওয়াট্‌সন্ সাহেবের ডকইয়ার্ডটা সেদিন যদি হতে পারত? তোমার কাছে শুনে মানুষটার প্রেমে পড়ে গেছি।

আলোচনাটা হয়ত তখ্‌নি জমে উঠত কিন্তু বুলবুল বাধা দিল—ওয়াট্‌সন্ সাহেব আরও একটু অপেক্ষা করতে পারবেন। বলে রাখি স্বাতী কিন্তু আজকে মাংস রান্না করেছে। যে রিসার্চ করে সে চুলও বাঁধে।

আমি হেসে উঠলাম—বললাম—ঠিক বলেছো বুলবুল, নাচতে জানে না বলে উঠোনটাই বাঁকা।

ওরা দু'জনেও হেসে উঠল।

॥ কুড়ি ॥

বাড়ির ভেতরের পর্দা না উঠলে অজানার অন্ধকারের গণ্ডি পেরনো অসম্ভব। বুলবুলদের বাড়ীতে কে যে আসে, আর কে যে যায় বোঝা মুশকিল। সবাই যে ড্রইংরুমে আসে তা নয়; যেন পায়রার খোপ্, ঢুকে পড়লেই হল। সামন্ততন্ত্রের রঙ বদলে নিলে কাউকে যেন আর চেনা ভার। ওদের এখনও একান্নবর্তী পরিবার, সুতরাং কে যে কোন্ ঘরে আছে বা আছেন, বোঝা দায়। বুলবুলের মা-বাবা অথবা কাকা-কাকিমা বাড়িতে আছেন কিনা বুঝলাম না—যদি থাকেন প্রণাম করা উচিত ছিল কিনা, তাও ভাবছিলাম। বুলবুল অবশ্য ও ব্যাপারে বেশ একটু লিবারেল্; ঢিপ্ ঢিপ্ প্রণাম করে না, আবার প্রণাম করতেও বলে না। প্রণাম বস্তুটা উঠে যাচ্ছে। ধূলোয় আর কেউ গড়াগড়ি দিতে রাজি নয়।

ঘরের ভেতরে ঢুকে শুনলাম, বুলবুলের মা অন্নদা ও বাবা শৌর্য সরকার তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। তাই ধরে নিলাম কাকা কাকিমাও নিশ্চয় অন্য কোথাও গেছেন। মোট কথা বাড়িতে নেই। শৌর্য সরকার বেশ রসিয়ে গল্প করতে পারেন দেশের-গাঁয়ের কথা। একদিন বলছিলেন—পূর্ব বাংলার থেকে আমরা এসে কলকাতার জিওগ্রাফিটাই চেঞ্জ ক'রে দিয়েছি। এখন জান, বেরিয়ে না পড়তে পারলে বাঙালীর আর ভবিষ্যৎ নেই। কলকাতাকে আঁকড়ে থাকার অর্থ নেই। বুলবুল বলল—বাবা-মা হরিদ্বার হয়ে রাজস্থান যাবেন, সেখান থেকে কন্যাকুমারী। কাকারা গেছেন নেপালে। বুঝলাম ফাঁকা বাড়ি এবং তাই মহোৎসব চলেছে।

বুলবুলের যে খুড়তুতো বোনটি ক্রিশ্চিয়ান হয়ে যেতে চায়, সে দেখি ধারে-কাছে এল না। লোকজন তার নাকি পছন্দ হয় না। কিছুই ভাল লাগে না। একটা মিশনারী স্কুলে কাজ করে। সেখানে নান্‌দের দেখে ওর তীব্র বৈরাগ্য এসেছে। বয়স হয়ে গেছে বলে সারদা মিশনে জায়গা হয় নি। কথামৃতের চেয়ে অবশ্য বাইবেল পড়তেই তার ভাল লাগে। নান্‌দের নিঃস্বার্থ জীবন দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

—আসলে কি জানেন অমরেশদা, আমরা যতই বলি না এগোচ্ছি, আপনি দেখবেন, বিয়ে বলুন, ধর্মান্তর বলুন, ওসব সময়ে আমাদের সত্যিকারের রূপটা ফুটে বেরোয়। তবে অনুর একটা কথা জানা উচিত, আমরা ক্র্যাইস্টকে যতটা শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, রামকৃষ্ণকেও ততটা। আমাদের বাড়ীতে পঁচিশে ডিসেম্বর ক্র্যাইস্টের এখনও পূজো হয়। ওরা করবে? বুলবুল অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে—উত্তর দেওয়া মুশকিল।

বুলবুল বলে যাচ্ছে অনুর ক্রিশ্চিয়ান হওয়া নিয়ে ওদের বাড়ির নানা অশান্তির কথা, আমি তখন ভাবছিলাম, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন নিজে ক্রিশ্চিয়ান হয়ে তরুণ শিক্ষিত দলকে ধরে ধরে তখন ক্রিশ্চিয়ান করছেন। ১৮৪৩ সালের কথা। ওল্ড মিশন রো-এর গীর্জার এক কোণে মাইকেল মধুসূদন দাঁড়িয়ে। তাঁর ক্রিশ্চিয়ান হওয়া নিয়ে শহরে তখন বিরাট হৈ-চৈ। মধুসূদন ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। গীর্জার কাছে সশস্ত্র পাহারা রাখা হয়েছিল। ধর্মান্তর নিয়ে শহরবাসী না আবার রাগে ফেটে পড়ে! বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। রোজ সে-পথে হেঁটে যান আবার আসেন। কট্টর হিন্দু বলেই বোধহয় চারপাশের এই টারময়েলে বিন্দুমাত্র তিনি বিচলিত নন। সেই ঘূর্ণিঝড়ে বাঙালী অভিভাবকরা—ভয় পেয়ে আর একবার সম্মিলিত প্রতিবাদ করেছিলেন। যেমন করেছিলেন সতীদাহ তুলে নেবার সময়। আশ্চর্য এই বাঙালীর জাত। কোন্‌টা ইস্যু আর কোন্‌টা নয়—হুজুগে জাতের তা কখনই খেয়াল থাকে না। অভিভাবকরা ৪৬০ জনের মধ্যে দু'শো জনকে হিন্দু স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। ওদিকে তারও পাঁচ বছর আগে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক; তাঁর বৈঠকখানায় ইয়ঙ্গ বেঙ্গল তখন নতুন জীবনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে। আলেকজাণ্ডার ডফ্‌ বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তরুণরা দলে দলে ক্রিশ্চিয়ান হচ্ছে তাঁর আহ্বানে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন এক হাতে দাঁড় বাইছেন, অন্য দিকে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও আরও অনেক সভায় সমাজ-সংস্কার ও ধর্মের নানা প্রশ্ন নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছেন আর তা নিয়ে দলাদলি। চারিদিকে একটা নব-জাগরণের ছোঁয়াচ কিন্তু আন্দোলন বলতে শুধু ধর্মীয় আন্দোলন। তবে তরুণরা আর আগের মত ওভাবে বেলেল্লাপনা ক'রে সময় নষ্ট করে না—অর্থাৎ বেশ্যাসক্ত ভাবটা একটু কমেছে। মদ অবশ্য ততদিনে খেতে শিখে গেছে, তবে অত গাঁজা, চরস খাচ্ছে না। ঘটা ক'রে

বুলবুলের লড়াই দেখছে না, বাজি রেখে ঘুড়ি ওড়াবার অত আর সময় পাচ্ছে না এবং বাবরি রেখে মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরছে না। সাতুবাবুর মত কিছু হুজুগে লোক অবশ্য সাহেবদের দেখাদেখি রেসকোর্স করেছিলেন। হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। সাতুবাবুর বাজারে শীতকালে ঘোড়দৌড় হত। মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটান হত। পোস্তার রাজা দেড়শ আর সাতুবাবুও দেড়শো বুলবুলি আনতেন। দুই দলের লড়াই হত। লড়াই-এ যে হেরে যেত, এখনকার ইডেন ময়দানের মতই অন্য দল—'বাঁ-মারা' বলে চিৎকার ক'রে উল্লাস প্রকাশ করত। পশ্চিমী শিক্ষা পেয়ে উন্নতি হয়েছিল বৈকি? মাংস খেয়ে হাড়ফাড় সমাজের কট্টর ব্রাহ্মণদের গায়ে ছুঁড়ে মেরে মহা উল্লাস সেদিন।

বাস্তবিক মাংসটা বেশ সুস্বাদু হয়েছে। স্বাতী রেঁধেছে, না বুলবুল রেঁধে স্বাতীর নামে চালাচ্ছে, ঠিক বোঝা গেল না। খেতে খেতে বুলবুলের জামাইবাবু চিন্ময়বাবু এলেন, পীড়াপীড়ি করতে তিনিও ততক্ষণে টেবিলে বসে গেছেন। তরুণ এল, সেও 'না-না' করতে করতে টেবিলে বসে পড়ল। এ যে একেবারে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার! দাদার বন্ধুরাও নাকি এরকম আসে-যায় এবং খেতে বসে যায়। পার্টি বাবুরাও নাকি বাদ যায় না। ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি, কাদের যায়গা হয় বেশী,—কংগ্রেস আই, কিংবা সি, পি, এম। এককালের নক্সালরাই কি ইদানীং বেশী আসে? সব কথা বলা যায় না।

খেয়ে উঠেছি দীপঙ্করের টেলিফোন। আমাকে ডাকছে। টেলিফোন তুললাম—অমরেশদা ভেরী স্যরি, নিজে উপস্থিত থেকে আপ্যায়ন করতে পারি নি, দেখলাম আপনি আসছেন না, এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে—অন্য আর একদিন আসবেন, কেমন? কিছু মনে করেন নি তো? আর একদিন যেদিন আসবেন, মাংস আমি নিজের হাতে রান্না করবো। হেসে বললাম—দাঁড়াও হে, আজকের নেমতন্নটা আগে সামলে নি। দারুণ খেয়েছি বুঝলে, চতুর্থ শতাব্দী থেকে সেই যে বাঙালীর মুখে রসনা জেগেছিল, বিংশ শতাব্দীর বুলবুল তার মর্যাদা রেখেছে। হাঃ হাঃ ক'রে হাসল দীপঙ্কর। বড় প্রাণবন্ত ছেলেটা। এ বাড়ির ট্র্যাডিশনই এই। এরা দেখছি মানুষকে বড় আপন ক'রে নিতে জানে। টেলিফোন রেখে ভাবলাম—বুলবুল বিয়ের পরে বাপের বাড়িতে রয়ে গেল কেন বোঝা যায়। কলকাতায় আজকাল ভদ্রভাবে থাকতে গেলে যা খরচ—তাতে এরকম একটা লিবার্যাল বাড়ির ঘর-জামাই

হতে আপত্তি কোথায়! দীপঙ্করের মা-বাবা থাকেন বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। ইদানীং তাঁরা নাকি চলে আসতে চান। —সল্ট লেকে বাসা খুঁজছি—বুলবুল বলেছিল—বিহারে ল এ্যাণ্ড অর্ডার বলতে আজকাল আর কিছু নেই। এবার ওঁদের কলকাতায় আনতেই হবে, আর পারা যাচ্ছে না।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আড্ডাটা বেশ জমে উঠল। বাসনা ততক্ষণে লজ্জা লজ্জা ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। হয়ত ভেবেছে অমরেশদার সঙ্গে আগের মত খোলাখুলি গল্প না করলে ওর উইক্‌নেস্ আমি ধরে ফেলেছি, এটাই প্রমাণ হবে। তাই আমি যখন বাঙালী কতটা সময় রান্নাঘরে অপব্যয় ক'রে সেরকম একটা ডিবেটেবল্ পয়েন্ট তুলে স্বাতীর সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেব ভাবছি—এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কথাও 'বত্তিশ আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে / …মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট / ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিষ্ট ইষ্ট ।। / বত্তিশ আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড় / চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড় / পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিঞা'—নিয়ে ভাবছি এবং এও ভাবছি এত ব্যঞ্জন ও এত রকমের আহার চৈতন্যদেব ও ঠাকুর নিত্যানন্দ খেয়ে উঠেছিলেন কি করে, তখন প্রাণকৃষ্ণের কথায় কলকাতার আর একটা ছবি ভেসে উঠল এবং তা সবাইকে রসিয়ে বলব ভাবলাম। 'গৃহে নতুন জামাতা বা বিশেষ কুটুম্ব আসিলে, গৃহিনীরা অনেক প্রকার রন্ধনের বাহাদুরী দেখাইতেন। অনেক রকম ডাল, শুক্ত, ডালনা, ঘণ্ট, ভাজা, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। …নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গ, বিশেষতঃ বিক্রমপুরের মহিলারা অতি সামান্য তরকারি হইতে এতবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া থাকেন যে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না।'

—'এখন কলিকাতার বাজারে যত প্রকার তরকারী দেখা যায়, পূর্ব্বে তত রকম ছিল না।' (তাও আশি-নব্বই বছর আগেকার কলকাতার কথা)। 'বিশেষতঃ শীতকালে নানাবিধ নতুন তরকারীতে বাজার পরিপূর্ণ দেখিতে পাই, তখন পালমশাক, মূলা ও সিম ভিন্ন শীতকালের অন্যবিধ বিশেষ কোন তরকারী ছিল না। এখন গোল আলু লোকের প্রধান তরকারী হইয়াছে, পিতামহেরা (হয়ত ১৭৬৮ সালের কথা) উহার নামগন্ধ জানিতেন না। …১৭৬৮ খ্রীঃ ষ্টাভোরিনাস নামক ভ্রমণকারী কলিকাতার বাজারের যে সকল তরকারীর তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বাঁধাকপি ও কড়াইসুটীর উল্লেখ আছে কিন্তু আলুর নাম নাই।'

...'অনেক বড়লোক, এমন কি, রাজা-জমিদারদিগের মধ্যেও বিস্তর বহুভোজীর নাম শুনা যায়। একটী কাঁঠাল বা একটি বৃহৎ ছাগলের মাংস একাকী শেষ করিতেন, এমন গল্পের অভাব নাই। পৌষপার্ব্বণ ও অরন্ধনের সময় ভোজনের পরীক্ষা হইত। বড় বড় সিদ্ধ পিঠা ও আস্কেগুলি যখন চর্ব্বন করিতেন, তখন তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিত।' ...'এক প্রহর রাত্রে (আবার) গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নের ন্যায় ভোজন হইত...(গৃহিনীরা...পাছে অকুলান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে মনসা দেবীর পূজা মানিতেন)।'

পড়ে খুব মজা লেগেছিল। সেইসব প্রত্যেকটি পয়েন্ট তখন আমি মনে মনে আওড়াচ্ছি, বাসনা ও-লাইন দিয়ে গেলই না। বলল—আপনি অমরেশদা, কেমন যেন আজ অন্যমনস্ক হয়ে আছেন। ঘন ঘন রঙ বদলের পালা চলেছে যেন। কথাবার্তাও কেমন যেন অসংলগ্ন।

—তাই নাকি, আমি হাসলাম—হবে হয়ত। আসলে অনু ক্রিশ্চিয়ান হতে চায় শুনে ভাবছিলাম, (আসলে আমি যে তখন বাঙালীর ভোজন পর্বের কথাটা ভাবছি, সেটা মুখ দিয়ে কেন জানি বেরুল না), কথাটা শেষ না ক'রে আবার একটা উল্টো কথা বলে চার্জ করলাম বাসনাকে—তুমি কি বাসনা, আমাকে ছাত্র ঠাওরালে নাকি? মানুষটাই আমি অসংলগ্ন, তাই স্বভাবের গলি-ঘুবচিতে বা বড় বাড়ির আলসেতে অসংলগ্ন কতগুলো মুহূর্ত মাঝে মাঝে বেড়ালের মত কাঁটা খায়।

—আপনিই দেখুন, আপনাকে ধরা কত শক্ত, লোকেরা কেন বলবে না, আপনার কিছুই ধরা যায় না। ধরুন অসংলগ্ন মুহূর্ত বোঝাতে আপনি বেড়ালের কাঁটা নিয়ে এলেন, আপনি কি কবি, অমরেশদা?

—ও, কবি হলে বুঝি তার অসংলগ্ন মুহূর্তগুলি ধরা যায়? দর্শক বা পাঠক কিছু কিছু জুড়ে নেয়, না? গদ্যকারদের মহা মুশকিল, কি বল? তবে কি জান বাসনা, আমি যে কি, কতগুলো মানুষ আমার মধ্যে আছে এবং তারা কখন যে হালুম্-হুলুম্ ক'রে,—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এই যেমন মাংস খেতে খেতে ভাবছিলাম, হয়ত ভীষণ লোভীর মত মাংস খাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে খেতে দেখে হয়ত ভাবছো—অমরেশদা এত লোভী, জানতাম না তো?

—মোটেই তা ভাবছিলাম না।

—না, কথার কথা বলছি, যদি ভাবতে অন্যায় কিছু হত না। বাস্তবিক আমি বড় লোভী।

—কী যে বলেন। নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করা খুব খারাপ কিন্তু। মানুষ আত্মসমীক্ষার অর্থ না বুঝে দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম। —জান বাসনা, আমার ডায়েরী লেখার রোগ আছে। তাতে আমি নিজেকে আগে এক্সপোজ করি। তন্ন তন্ন ক'রে নিজেকে খুঁজি। আমার দশ বছরের ডায়েরী ঘাঁটলে তোমার একটা কথাই মনে হবে—অনেক সময় আমি অনেক কিছু। আবার অনেক সময় আমি শেয়াল, ইঁদুর বা আরশোলা।

—কি যা-তা বলছেন? ওসব ছাড়ুন, আচ্ছা অমরেশদা, আপনি কী কবি?

—কেন? তখন থেকে 'অত কবি কবি' হবার চেষ্টা করছো কেন, —বলো তো? জান পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে বোধহয় হাজারখানিক বা তারও বেশী কবি আছেন, কবিতা লিখলেও কি তুমি মনে কর, এঁদের সঙ্গে পেরে উঠবো? ও, আচ্ছা বুঝেছি, তরুণ বুঝি দারুণ কবিতা লেখে— ? এতক্ষণে বুঝলাম, কবিতা-প্রীতির কারণ।

—মোটেই না। তবে তরুণ চমৎকার লেখে জানেন? কিন্তু ছাপতে দেয় না, বলে, যদি না ছাপে তখন কষ্ট পাব। ডায়েরীতে ভরা কবিতা—

—এবং তোমাকে নিয়ে, না?

—না, তা মোটেই না। তবে তরুণের অনেক সম্ভাবনা ছিল। আপনি জানেন না, ও কিভাবে সময় ওয়েস্ট্ করে।

—হ্যাঁ, আমি জানি। শুনবে? তরুণ কলকাতার হাওয়া লাগিয়ে পাঁচ বাড়িতে যায়। দেখো ওর রুটিনটা আমার দেখার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে কিনা। একে তুমি অব্জার্ভেশন্ বলবে কিংবা ইন্‌টিউশন্, তুমিই ভাল জান। তোমাকে কষ্ট দিয়ে তরুণ পাঁচজন তরুণী নিয়ে ঘোরে (বাসনা বলল, মোটেই আমি কষ্ট পাই না)। কষ্ট পাও না পাও, তরুণের যে অনেক কাজ। ও থিয়েটার করে, কলকাতার মানুষকে জাগায়, প্রফেশনাল্ থিয়েটারের ক্যাবারে ড্যান্স কদাচ দেখে না, অপসংস্কৃতির আন্দোলনে ও মশ্‌গুল, ওদিকে স্বাতীর মত মেয়েদের শ্রদ্ধা করে এবং প্রয়োজনে তাদের বডি গার্ড হয়, মেসে

থাকে, মাসের মধ্যে একবার দুর্গাপুরে ছোটে—সেখানে ওর এক প্রিয়পাত্র বউদি আছেন, তাঁকে দরকার হলে সিনেমায় নিয়ে যায়, এখানে কলকাতাতেও ওর এরকম অনেক বউদি আছে। এবং বউদিদের সঙ্গে এত দহরম্‌মহরম্‌ বলে সব জায়গাতেই ওর অন্দরমহলে অবস্থান এবং দাদাদের নানা ঘরোয়া কথা সে জানতে পারে। কিন্তু সেসব বলে 'দাদাদের' কখনও চটায় না। কি, মিলছে? বাসনাকে মাথা নাড়তে দেখে আমি বলে যেতে থাকলাম—আরো শোন। এক পাতান বউদি যখন নিউইয়র্কে চলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের বাড়ি সামলাবার দায়িত্ব পড়েছিল তরুণের ওপর। তিন মাস মেসের স্বাধীনতা ভুলে তরুণ এমন একটা ঘরে ছিল, যেখানে অজস্র বই, মাটিতে, আশে-পাশে, কোণে—আলমারীতে। পনেরো বছরের জমানো কাগজ। এবং তারই মধ্যে কোন মতে একটা খাটিয়া পেতে তরুণের রাত্রি যাপন চলত এবং তখনই তরুণ পাঁচ-পাঁচটা গল্প লিখে ফেলেছিল, তার মধ্যে তিনটে ছাপা হয়েছে, একটা আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে ছাপা হয়েছে, একটা 'দেশে', অন্যটা 'অমৃতে'। —কি, আরও বলবো?

—না, থাক। বাবাঃ কি সাংঘাতিক লোক আপনি। আপনার কাছ থেকে সাবধানে থাকতে হবে—।

—নয়ত ধরা পড়ে যাবে, এই তো। হ্যাঁ, 'লিংকেজ' থিওরি দিয়ে মানুষকে কিছুটা ধরে ফেলি। যেমন ধরো, তরুণের মত তরুণ—যারা উঠতি কবি, গল্পকার বা নাটক করিয়ে বা লিখিয়ে—এরা সবাই মোটামুটি তরুণের মতই এবং আমাদের চেয়ে এদের অনেক বেশী অভিজ্ঞতা। তাই এদের লেখার মধ্যে যে পরিবেশ ফুটে ওঠে—আমরা শত চেষ্টা করলেও তা পারবো না। ওর যেটা আছে রেয়ার, প্রাণশক্তি, ওয়ার্মথ্‌।

বলতে বলতেই তরুণ ঘরে ঢুকল। হেসে জিজ্ঞেস করল—কার ওয়ার্মথ্‌ আছে, অমরেশদা?

বাসনা বলল—তোমারই গুণগান করছিলেন অমরেশদা। বলছিলেন, তুমি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এত লোকের খিদ্‌মদ্‌ ক'রে বেড়াও ওয়ার্মথ্‌ না থাকলে এতটা লার্জ স্কেলে সমাজসেবা সম্ভব নয়।

—তাই নাকি? তরুণ হেসে বলল—অমরেশদার সুনজরে পড়ে গেছি—আমার কী ভাগ্য দেখো বাসনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোথায় জানেন অমরেশদা, কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা আমার কোথায় দুর্বলতা, সেটাই খুঁজে বেড়ায়

এবং সুযোগ বুঝে সেখানেই আঘাত করে।

তরুণ ও বাসনার এখন বোধ হয় অভিমানের পর্ব চলছে। বাসনা জানে না, বিশেষ কারুর প্রতি নজর দেবার সময় কলকাতার তরুণের নেই। তুমি যদি শুধু কল্যাণীকে আঁকড়ে থাক আর কফি হাউসে কদাচ না যাও, ভালবাসার হাওয়া হুগলী নদীর তীরে বয় বা কফি হাউসে, অথবা রেস্তোরাঁয়, কিছুই হদিস পাবে না, বাসনা। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের মত সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠে তাদের মনের কথা কেউ আর বলে না, বা গুমরে মরে না--এখন ইউনিভারসিটির ক্যান্টিনে বা অফিস পাড়ায় রীতিমতো পাল্লা দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, ভালবাসা আদায় করতে হয়। তুমি বাসনা, শুধু রাত্তে বা ছুটির দিনে কলকাতায় থাক বলে কলকাতার দ্রুত পরিবর্তন টের পাও নি। কিংবা তোমাদের বাড়ীতে পার্টি পলিটিক্স্ থেকে শুরু ক'রে প্রেম নিবেদন—সবই ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে গেছে বলে, তোমার কন্‌ফিউশনটা ঠিক ধরতে পারছো না।

বাসনা কিন্তু তখনও নিজের সাফাই গাইছিল--আমার বয়ে গেছে। সময় যদি তোমার অফুরন্ত থাকে এবং সময়কে যদি ওভাবে নানা খুচরো কাজে অপব্যয় কর—কি বলুন অমরেশদা, ক্ষতিটা আমার নয়, তোমার।

—আসলে বাসনার রাগ কোথায় জানেন তো? বলুন অমরেশদা, মঙ্গলকাব্য নিয়ে রিসার্চ ক'রে আমার কি হবে, বলুন? বাংলায় এম, এ,-টা ক'রে ফেলেছি এই ঢের। ওসব আমি ছেড়ে দিয়েছি। আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে—মারকেন্‌টাইল্ ফার্মে একটা চাকরী আমার জুটে যাবে? জুটে গেছে, ব্যস। এখন শুধু কবিতা, গল্প বা নাটক। ব্যস। অথচ বাসনা চায়, আমি অ্যাকাডেমিক্ লাইনে আরও এগোই এবং এগোতে এগোতে একেবারে ইউনিভারসিটির রিডার। আরে, কত দেখলাম, অপব্যয়, শ্রেফ্ অপব্যয়; আজকাল লেটেস্ট্ ট্রেণ্ড্ কি জানত? মারকেন-টাইল্ ফার্মে বড় চাকরী। অমরেশদা তো দিল্লীর লোক, জিজ্ঞেস করেই দেখো না—কত ছেলে ভাল ভাল চাকরী নিয়ে দিল্লী-বোম্বাই আর হায়দ্রাবাদে চলে যাচ্ছে। বাঙালী আর কূপমণ্ডুক নেই। স্বাতীকে আমি বলেছি; এটা নোট করে নিতে।

ভেতরে আর কে এল এবং আর কে-কে খেতে বসে গেছে বলতে পারব না। যা দেখলাম অস্বাভাবিক কিছু না। মোট কথা আমিও উঠবো

ভাবছি অথচ যার জন্যে আসা, তাকে কাছে-পিঠে দেখছি না। একান্নবর্তী পরিবারে ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য নেই বলেই বোধ হয় ওতে আমাদের পরাধীনতার ছায়া দেখি। বহু লোককে নিয়ে থাকতে এত অনীহা।

তরুণ ততক্ষণে উঠে পড়েছে—আজ চলি অমরেশদা, স্বাতীকে আপনি কিন্তু পৌঁছিয়ে দেবেন। কথা ছিল আমিই যাব, আজ পারছি না। রিহারস্যাল আছে। বাসনা, যাবে? চলো, দেখে আসবে, একটার পর আরেকটা কি রকম নাটক নামাচ্ছি আমরা—কি দারুণ ইন্‌ভলভ্‌মেন্ট্‌, দেখে আসবে চলো। বলেই তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—। বাসনাও তার পেছন পেছন ছুটল। বুঝতে পারলাম না, তরুণের সঙ্গে আজ বাসনা যাবে কি না। তরুণকে ও হয়ত এ-ঘরে একা পেতে চেয়েছিল। খবরের কাগজ ঘেঁটে সর্বশেষ খবর পাবার মিথ্যে চেষ্টা করছে বাসনা। খবরের সঙ্গে ভেলায় না ভাসলে তরুণকে শুধু হাতড়ে মরবে বাসনা। দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হল বাসনার জন্য।

বুলবুল এসে বলল—অমরেশদা, কথা ছিল তরুণ স্বাতীকে পৌঁছে দেবে, তাই এসেছিল। কিন্তু বলছে পারবে না—কিভাবে পালিয়ে গেল, দেখলেন। আপনি কিন্তু স্বাতীকে পৌঁছে দেবেন। আপনার অবশ্য আপত্তি না থাকারই কথা। বলেই অর্থপূর্ণ হাসল বুলবুল। আমি তা লক্ষ্য ক'রে এবং এ-ইঙ্গিতের মধ্যে যে রূপ-রস-গন্ধ আছে, তা পুরোপুরি আত্মসাৎ ক'রে বললাম—বোস বুলবুল, তোমার সঙ্গে এবার একটু গল্প করি।

বুলবুল হাসি ছড়াল, বলল—মন ভরবে কি?

—খুব ভরবে। তুমি অল্পেতেই মানুষের মন ভরে দিতে জান, বুলবুল।

—তাই নাকি? দীপঙ্কর তো উল্টো কথা বলে।

—তোমাদের সাস্‌পেন্সে রাখতে স্বামীদের আজকাল অনেক ফন্দি আঁটতে হয়।

—কেন বলুন না—এটা কিন্তু আমিও লক্ষ্য করেছি। আজকালকার স্বামীরা বড় ফন্দীবাজ হয়ে গেছে—না অমরেশদা?

—আমাকে দেখো, তবে প্রশ্নটার উত্তর পাবে।

—আপনার একটা ভয়ানক সেনসেটিভ্‌ মন আছে। আপনাকে কিন্তু আমার মোটেই ফন্দীবাজ মনে হয় না।

হেসে বললাম—এইজন্য বলি তোমার মত সরল মানুষ পৃথিবীতে বোধ হয়

দ্বিতীয়টি নেই। তোমাদের মত মানুষেরা শুনেছি অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভাণ করে এবং তাতে গৃহশান্তি রক্ষিত হয়।

—আপনার শুধু এক কথা। আমার মধ্যে কি এমন ভাল জিনিস দেখেন? গানও যে ভাল বলেন, একদিন বসে তো গানও শুনলেন না।

আমি শব্দ ক'রে হাসলাম। বললাম—কলকাতায় সফর তোমাদের দু'চারজনের জন্যই সার্থক। আমার বলতে দ্বিধা নেই, আজকের মত একটা দিন তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে উপহার দিতে পারত না।

—আমার সম্পর্কে আপনার একটু পক্ষপাতিত্ব আছে। বাসনা বলে। আমি অবশ্য একটা কথা বলতে চাই—আপনার মত মানুষের আজকাল কলকাতায় বড় অভাব।

—তবে তো দিল্লীর পাট চুকিয়ে কলকাতায় এসে থাকতে হয়—

—দেখুন না, তা সম্ভব কি না। খুব মজা হত তাহলে—

—তোমার বৌদি গত চিঠিতে কি লিখেছে জান?

—বৌদি খুব ভাল মানুষ, না? আমি যেটুকু শুনেছি তাতেই বলছি। কারণ সে মানুষটা যদি মহীয়সী না হতেন আপনি এত ভাল থাকতে পারতেন না।

—চমৎকার তোমার যুক্তি। আমি ভাল আছি, কারণ অন্য একজন আমাকে বিগড়ে দিচ্ছে না—কেমন? তোমাদের পক্ষপাতিত্ব কোন্ দিকে, একবার ভেবে দেখো।

—কি লিখেছে বৌদি, কোথায়, বললেন না তো?

—না থাক।

—না বলুন না, আপত্তি না থাকলে—।

—আপত্তি নেই, তবে সব কথা বলতে নেই জান বুলবুল, মানুষের ক্ষতি হয়, সমাজ বিপন্ন বোধ করে।

—ওরে বাবাঃ, অত বড় বড় কথা আমি বুঝি না। সপ্তাহে কটা চিঠি লেখেন, শুনি? ভাবুক মানুষ তো, তাই নিশ্চয় ভাবনার বন্যা ছোটে। আপনার চিঠি আমার দেখতে ইচ্ছে করে—

—বোল না—দীপঙ্কর সুইসাইড করবে।

—কেন, এত লোক থাকতে আপনি আমাকেই-বা চিঠি লিখতে যাবেন কেন (বুঝলাম, এবারও স্বাতীকেই ইঙ্গিত করল)? তাছাড়া মেয়েদের

চিঠি লিখলেই কি অপরাধ হয়ে যায়। তবে রবিঠাকুরের অত চিঠি লেখা নিশ্চয় অন্যায় হয়েছে। দিল্লীতে ফিরে গেলে কি আমাদের কথা আর আপনার মনে থাকবে? যদি কখনও লেখেন, স্বাতীকে লিখবেন, আমি জানি (বলেই ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকাল। এরকম মুহূর্তে বুলবুলকে ভারি সুন্দর দেখায়)। দেখেছেন স্বাতীর চিঠি—কি চমৎকার প্রকাশভঙ্গী। আমি ওকে বলি, তুই যদি শুধু লেখক হতে চাইতিস, অনেককে ছাড়িয়ে যেতিস। ওকে দেখে, ওর সঙ্গে এত ঘনিষ্টভাবে মিশে কী মনে হয় জানেন—ওর ধারে কাছে আমরা দাঁড়াতে পারি না। কিন্তু খুব ভয় করে—এরকম একটা ট্যালেনটেড মেয়ের শেষকালে কী যে পরিণতি হবে! যেমন স্বাধীনচেতা, তেমনি অভিমানী আর একগুঁয়ে। যা ভাল মনে করবে, ক'রে ছাড়বে। অনেক সময় ভাবি, এখনও যখন কাউকে পাত্তা দেয় না—কাউকে ভালবাসার নাকি ওর হাতে একবিন্দু সময় নেই—যদি কখনো ওর মনে হয়, জীবনে যা চেয়েছিল—তা কখনও পাওয়া যায় না, কিংবা যা চেয়েছিল আর যা পেল, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক—কলকাতায় যা আকছার হচ্ছে আজকাল—তখন যদি ওর জীবনটা ফাঁকিতে ভরে ওঠে—আমি ভাবতে পারি না, সেদিন ও কী করবে? আপনি বলেই কথাটা বললাম—আপনাকে ও ভীষণ শ্রদ্ধা ক'রে তো এবং বোধহয়—থাক, বলতে বলতেই চিন্ময় ঘোষ ঘরে ঢুকলেন। (এদের বাড়ির জামাইরা সব জাতের এবং সব বর্ণের। শুধু এটাই প্রমাণ ক'রে পণ্ডিতকুলের আবেষ্টন থেকে বাঙালী জাতি কোথায় এগিয়ে এসেছে)।

—আসুন চিন্ময়দা। পেছনে স্বাতী।

—না, বসবো না হে। এই তো স্বাতীর রিসার্চ নিয়ে একটু কথা বলছিলাম। ও আজকাল তো সেরকম আসে না, তাই কতদূর এগোল, জানবার আগ্রহ ছিল। তা দেখছি অনেকটাই এগিয়ে গেছে—কি বল স্বাতী?

স্বাতী মানতে পারল না। —তথ্য জোগাড় করেছি কিন্তু লেখা যে এত শক্ত জামাইবাবু, কোনদিন ভাবি নি।

—না, তুমি পারবে। লেগে আছ তো। আমি আজ চলি, আর একটু গল্প করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু রাইটারস্ বিল্‌ডিং-এ যেতে হবে। এই নিয়ে উনিশ দিন যাচ্ছি। এরা নিজেদের কমিউনিষ্ট বলে না? জান, ক্লার্কটা কি বলল—ফাইলটা যে ডিল্ করে, সে নেই। বললাম—দশদিন ধরে তো মশায়,

একই কথা বলছেন। বলে কি জান—যান অফিসারের কাছে কম্‌প্লেন্‌ করুন না গিয়ে, যান—যে আপনার ফাইল ডিল্‌ করে, সে এখনও ছুটিতে। ছুটির থেকে ফিরলে হবে।

—কতদিন ছুটি ?

—বললাম তো।

—তা দশ দিন বলেছিলেন—এই নিয়ে পনেরো দিন।

—জানি না, একই কথা একশোবার বলা যায় না—এডমিনিস্ট্রেশনে গিয়ে খোঁজ নিন।

পনেরো দিনের মাথায় যদিও আমার ডিলিং ক্লার্ককে ধরতে পারলাম, বলে কি, পরশু আসুন, আপনার ফাইলটা ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ সেই 'পরশু' দিন। এক্ষুনি ছুটতে হবে—নয়ত আবার বলবে 'পরশু' আসুন।

বলেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমিও উঠে পড়তে চেয়েছিলাম—কি স্বাতী, বসবে, না যাবে ?

বুলবুল বলল—না, অমরেশদা আর একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

অতঃপর স্বাতীর দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

—আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে কী দেখেন ? আমার বড় অস্বস্তি হয়। স্বাতী হেসে বলল।

—দেখি, তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ, কিনা !

—রিসার্চ করতে করতে এবার শূন্যে ভাসবো দেখবেন—।

—এবং তখন আমি মহাশূন্যে ধাবিত হব। দু'জনেই হেসে উঠলাম।

স্বাতী বলল—ইয়ার্কি নয়, সত্যি বড় ভয় করছে অমরেশদা, পড়েই যাচ্ছি, পড়েই যাচ্ছি, কবে যে সব গুছিয়ে লিখতে পারবো।

—ভয়গুলো লিখে ফেলো—।

শব্দ ক'রে হাসি ছড়াল স্বাতী। একটু থেমে বলল—বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে অনেকগুলি রেফারেন্স পেয়ে গেছি। আমার আর কোন সন্দেহ নেই যে রণতরীর শিল্প বাংলাদেশে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। ধরুন ১৭৮০ সাল। শ্রীমতী এলিজা ফে-এর চিঠিপত্রে দেখছি, হুগলী নদীতে 'হাঙ্গর মুখো' নানারকম নৌকো তিনি দেখেছেন। ওরকম নৌকো নদীর বুকে অসংখ্য ভাসছে।

সারি সারি, আবার নোঙর করাও রয়েছে। এবং তিনি নিজেই মন্তব্য করছেন যে 'কতরকমের গড়ন এবং কত বিচিত্র আকারের সব নৌকো।' লিখছেন—'সাপমুখো বা হাঙ্গরমুখো নৌকাগুলি কি যে সুন্দর'—

আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, বললাম—চিঠিপত্র তো কম বড় ডকুমেন্ট নয়। এসবগুলোও তোমার থিসিসে জুড়ে দাও, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হয়ে থাক।

—মুশকিল কোথায় জানেন, সাল-তারিখ মিলিয়ে এই সব টুকরো টুকরো ইতিহাসের পাতা জোড়া এবং তার থেকে একটা নির্ভরযোগ্য তথ্য বার করা খুব মুশকিল। এলিজা এসেছিলেন ১৭৮০ সালে—তখন দেখেছেন বড় বড় নৌকো। বজরা নৌকোগুলো বেশ বড় এবং একটি পরিবারের সবাই মিলে আরামে যাওয়া যায়। ব্যবসায়ীদের জন্য তখন যে নানারকম বাণিজ্যতরী ছিল, তারও রেফারেন্স পাচ্ছি এলিজার চিঠিতে। অর্থাৎ আমার জিজ্ঞাসা, এলিজা যখনকার কথা বলছেন, তখন কি বাঙালী রণতরী বানাতে সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছে? তখন কি শুধু নৌকো তৈরী হচ্ছে আর জাহাজ তৈরীর পুরো দায়িত্বটা হাতড়ে নিয়েছে বিদেশীরা? নয়ত দেখুন এলিজার চিঠিতে হদিস্ পাচ্ছি বড় বড় রণতরীর—কিন্তু কাদের তৈরী? বিদেশী, না দেশী? পাশে যেসব রণতরী নোঙর করা—ওগুলো কি সব তখন ব্রিটিশদের? অথচ ঠিক সেই সময়েই ওয়াট্‌সন্ সাহেব ডকইয়ার্ড গড়তে চেয়েছিলেন কেন? তবে কি অসংখ্য এইসব নৌকো-শিল্পীদের দেখেই তিনি ভেবেছিলেন এদেশে জাহাজ তৈরী করতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না?

আমি না বলে থাকতে পারলাম না—তোমার মত আমি তো অত খুঁটিয়ে পড়ি না। কোথায় যেন দেখছিলাম, বাংলা থেকে মহারাষ্ট্র রণতরী করার কৌশল শিখেছিল বা উৎসাহ পেয়েছিল।

স্বাতী বলল—আমারও ওরকম একটা ইম্প্রেশন্ হয়েছে। কিন্তু কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর না ক'রে হুবহু প্রমাণ করা মুশকিল। ১৭৪১-৪২ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যরা বর্ধমান থেকে আলিবর্দী খাঁ-কে হটিয়ে দিয়েছে এবং তিনি সোজা গিয়ে উঠছেন কাটোয়ায়। মুর্শিদাবাদের আকবর নগর অর্থাৎ রাজমহল থেকে মেদেনীপুরের পুরোটা এবং জলেশ্বরের পুরোটা তখন মারাঠাদের অধিকারে এসেছিল। সেইসময় বাঙালী রণতরী শিল্পীদের সঙ্গে মারাঠাদের একটা যোগ-সম্পর্ক হওয়া

আশ্চর্যের কিছু নয়। পরবর্তীকালে মারাঠাদের রণতরীর সঙ্গে ব্রিটিশরাও পেরে উঠত না, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

আমার কেন জানি মনে হ'ল স্বাতী এসব কথা ভাবছে ঠিকই কিন্তু এগুলো থিসিসে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে ও হয়ত অতটা উৎসাহী নয়। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে হয়ত লিঙ্কেজ্ পাচ্ছে না। তাই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম—এলিজার কথা কি বলছিলে ?

—হ্যাঁ, দেখুন আঠারো শতাব্দীর শেষে এলিজা কলকাতায় এসে বাণিজ্য তরী দেখতে পাচ্ছেন। আর অ্যাটর্নী হিকি সাহেব কি বলছেন একবার শুনুন। ১৮৮৭ সালে হিকি পশ্চাশ-দাঁড়ি পানসি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল বন্ধুবান্ধব, খানসামা ভৃত্য সহ বিরাট একটা দল। শ্রীরামপুর হয়ে চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী হয়ে ব্যাণ্ডেলে যাবার সময় তিনি বাঙালী মানসিকতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মাঝখানে ত্ব'একবার বিলেত যাত্রা বাদ দিলে হিকি সাহেব কলকাতার জীবনের সঙ্গে দীর্ঘ ৩১ বছর যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর কিছু মন্তব্য করার অধিকার জন্মেছিল। তিনি বলেছেন—'আমি দেখেছি, বাংলাদেশের লোকেদের যখনই ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে হয়, তখনই যেন তাদের মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে।'

বললাম—খুব ইন্‌টারেস্টিং কিন্তু। ডায়েরী থিসিসের অন্তর্ভুক্ত এভিডেন্স হবার বাধা কোথায় জানি না। সাহিত্যে তার চিরকাল একটা বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। তোমাকে আমি আগেও কয়েকবার বলেছি, অ্যাকসেপটেড্ নরমস্ থেকে অন্য কিছু করতে গেলেই বিপদ, তোমাকে মানবেনা, সমালোচনা হবে। কিন্তু এগিয়ে যাবার সাহস ও চ্যালেঞ্জ ছাড়া কোনকালে নতুন কিছু করা যায় না।

—না, এগুলো আমি ঠিক এভাবেই থিসেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো ভাবছি—দেখা যাক্ কি হয়, নয়ত আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করা মুশকিল। আরও দেখুন হিকি সাহেব যখন এত জন-সমভিব্যাহারে নৌকোযোগে গিয়েছিলেন, তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হিকির-যুগেও নৌকোযোগে যাতায়াত করাই সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। সেটা আমি বলছি না ; যেটা বলতে চাইছি তা হল, নৌকো বা এই জাহাজ তৈরীর ব্যাপারে বাঙালীর নৈপুণ্য ও কুশলতার কথা। যখন কৌশলবিদ্যাটা উৎসাহ ও সুযোগের অভাবে প্রায়

নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, বাঙালীরা যখন প্রায় শুকিয়ে যাচ্ছে—এবং নৌকো ও জাহাজ তৈরীর কৌশলটাকে সাহেবরা সফলতার সঙ্গে হাতড়ে নিয়েছে এবং কলকাতায় একচেটিয়াভাবে পালকী ও নৌকো তৈরী করছে শুধু সাহেব কোম্পানী—তখনও, সেই সময়েও বাঙালী কারিগর সম্পর্কে এক সাহেব কোম্পানী যে মন্তব্য করেছিল, তা ঐতিহাসিক মন্তব্য বলেই মনে হয়। এটা লক্ষ্য করলে বুঝবেন, জাহাজ ও নৌকো তৈরীতে বাঙালী কতটা কুশলতা অর্জন করেছিল।

—কি সেই মন্তব্য, বলো,—আমি এতক্ষণ এলিয়ে বসে কথা শুনছিলাম, এবার অ্যাটেন্‌শন্ ভঙ্গীতে সাহেব-মুখনিঃসৃত এক অমৃতবাণীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে রইলাম।

স্বাতী বলল—মন্তব্যটা বলার আগে, ব্যাপারটা কি হয়েছিল, তার একটু ব্যাকগ্রাউণ্ড দিচ্ছি। হিকি সাহেবের শখ হয়েছিল, স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য বারোজন দাঁড়ির একটা নৌকো তৈরী করাবেন। তখন কলকাতার বিখ্যাত বোট-ব্যবসায়ী গিলেট সাহেবকে তিনি ডেকে পাঠালেন এবং একটি পানসি তৈরী করতে বললেন। গিলেট সাহেব কি বলেছিলেন জানেন? বলেছিলেন, বাঙালী কারিগরদের দিয়ে নৌকোর হাল ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস তৈরী করিয়ে নিতে। অর্থাৎ বেষ্ট জিনিস বানাতে চাও, তো বাঙালী কারিগরের শরণাপন্ন হও। তাঁর কথা অনুযায়ী কাস্টম হাউসের কারিগর দিয়ে হিকি সাহেব নৌকো তৈরী করিয়েছিলেন। নৌকো কত বড় ছিল একবার ভাবুন—৪৮ ফুট লম্বা, সাড়ে চার ফুট চওড়া। সেই নৌকো বাইতে চোদ্দজন লোক লাগত। সোজা ব্যাপার নয়!

—আঃ হাঃ ওরকম একটা নৌকো থাকলে, তুমি-আমি-বুলবুল ও দীপঙ্কর এক্ষুনি পিকনিকে মুর্শিদাবাদে ঘুরতে বেরুতাম—মোটে তো সাত দিন লাগত।

স্বাতী হেসে বলল—ওতে তো সুরক্ষা বা প্রিজারভেশনের ব্যাপার আছে, ওতে আমাদের চিরকাল অনীহা। সে যাক্, নৌকোটা যেদিন তৈরী হয়ে এল, সেই দিন চাঁদপুর ঘাটে লোকেদের ভিড় জমে গিয়েছিল। সুসজ্জিত কাপড়-জামা পরা সব মাঝি। বাস্তবিক, হিকি সাহেবের টেস্ট ছিল। একযোগে নৌকো বেয়ে যাবে চাঁদপুর ঘাট থেকে—সে অভিনব দৃশ্য অন্য জন্মে দেখেছিলাম কিনা জানি না।

—হ্যাঁ,—আমি রহস্য করলাম,—ধরো অন্য কোন যুগে তোমাকে-আমাকে

অন্য নামে ভিড়ের মধ্যে যদি কেউ দেখেও থাকে চিনবে কি ক'রে বলো ?

জন্মান্তর্বাদের রহস্যের মধ্যে যেটুকু রোমান্টিকতা তা যেন বুঝেই শব্দ ক'রে হাসল স্বাতী, বলল—মজার ব্যাপারটা শেষ হয় নি, আরও আছে। হিকি সাহেবের নৌকো নিয়ে কলকাতার হুজুগে শহরবাসী নিশ্চয় একটু বাড়াবাড়ি করেছিল এবং লোকমুখে এই বিরাট কাজটা লাট সাহেবের কানে পৌঁছে যাওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। নয়ত লর্ড কর্নওয়ালিস হঠাৎ কেন ভাববেন, তাঁরও ওরকম একটা বিরাট নৌকোর দরকার। কলকাতা থেকে সেই সুদৃশ্য নৌকো চড়ে তিনি ব্যারাকপুরে তাঁর বাগানবাড়িতে যাবেন—লাট সাহেবের ইচ্ছে তো যে-সে ইচ্ছে নয়। আবার ডাক পড়ল গিলেট সাহেবের। এবার তৈরী করান হলো ছাব্বিশ দাঁড় বোট। লাট সাহেবের নয়ত ইজ্জতই থাকে না। ১৭৮৭ সালের ঝড়ে সেসব অনেক মূল্যবান নৌকো নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য পড়ে থাকলেও এতদিনে উইয়ে খেয়ে শেষ করত। ইতিহাস আমাদের কাছে সৌখিন বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ ঝড়েই তিন চারশো টনী বড় বড় পোত পর্যন্ত ডুবে যায়। এটা অনুমান করা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে যা লোকসান হয়েছিল, বাঙালী আর কম্‌পিটিশনে দাঁড়াতে পারল না ; শেষ হয়ে গেল।

এত মন দিয়ে শুনছিলাম, কখন বুলবুল এসে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। আজ একাডেমীতে শম্ভু মিত্রের কবিতা পাঠ। দীপঙ্কর ফোন ক'রে জানিয়েছে আমার জন্য টিকিট করেছে এবং যথাসময়ে আমি যেন স্বাতী ও বুলবুলকে নিয়ে একাডেমীতে উপস্থিত থাকি।

আর দেরী করা চলে না। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। একাডেমীতে পৌঁছবার আগেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। অথচ সেই দুর্যোগের সন্ধ্যাতেও ভিড় উপছে পড়ছে একাডেমীতে। দীপঙ্কর এসব দেখেই হয়ত জিজ্ঞেস করল—কি অমরেশদা, দিল্লীতে এ জিনিস দেখা যায়? মুষলধারে এত বৃষ্টি মাথায় ক'রে সেখানে কি কেউ শম্ভু মিত্রের কবিতার আসরে পাগলের মত ছোটে ?

হঠাৎ কথাটার উত্তর দিতে পারি নি। স্বাতীও অপেক্ষা ক'রে ছিল আমার উত্তরটা শুনবে ব'লে। বুলবুল হাসিহাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

শক্ত প্রশ্নের উত্তর আমি সহজে দিই না। তাছাড়া শম্ভু মিত্রের কবিতা

পাঠ তখন শুরু হয়ে গেছে। পড়ছেন তিনি সেই ড্রামাটিক গলায়—একটা কবিতা একটা ভাবের প্রতীক, তার ঠিক অনুরূপ ভাবের কবিতা সমুদ্রের গভীর থেকে তুলে আনছেন মেঘমন্দ্র কণ্ঠে। কোন্ পটভূমিকায় কবিতাটা লেখা হয়েছে তার একটু আভাস দিয়ে কবিতার পরে কবিতা পড়ে যাচ্ছেন—আবার হঠাৎ থেমে মেয়ে শাঁওলীকে শুরু করতে বলছেন। এক অতন্দ্র সুধাময় পরিবেশে গোটা বাঙালী জাতটাকে কোথায় যেন উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

কলকাতায় কবিতার আসরে কেউ কথা বলে না। দুর্যোগের রাত্রি মাথায় ক'রে আসার নামও কী কালচার? ঠিক জানি না।

॥ একুশ ॥

বুরোক্র্যাসির নাগপাশে লালিত-পালিত হয়েও এ যে কী চিজ এখনও ধরতে পারলাম না। এ বহুরূপী নানা রঙ ছড়ায়। কারুর চোখে কালো, কারুর চোখে আলো, কারুর-বা হলদে। আবার এ জীব বিশেষটি কখনও বা সবুজ। তাই, কী যে রঙ তা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ঝগড়া। আসলে কারুর কোন দোষ নেই। যে যেরকম দেখে। বহুরূপী যে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়! দেখার দোষ নয়, যে রং বদলাচ্ছে তার দোষ।

বুরোক্র্যাসির অত রং বলেই তার চাকার এত বাহার। চাকায় মানুষ যখন পিষে শেষ হয়ে যায়, আমি ওরকম অনেক মানুষ দেখেছি—রোগী দেখে রোগের ভয়াভয়তা বোঝার মত। ত্রিশ বছর ধরে বুরোক্র্যাসির চাহিদা মেটাতে মেটাতে মানুষ একেবারে লতান গাছ হয়ে যায়—তাই খুঁটিতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতেই পারে না। মিন্‌মিন্‌ ক'রে কথা বলে, ইঁদুরের মত মিট্‌মিট্‌ ক'রে তাকায়, প্রতিবাদ করার সময় ভাবনায় পড়ে, তখন সেই বিরাট ঘূর্ণায়মান চাকার দিকে মনুষ্যত্বের শেষ স্ফুলিঙ্গ নিয়ে শেষবারের মত ভাবে—এখনও সময় আছে স্রেফ পালিয়ে যাই। মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যেতে যেতে অভ্যাসবশে তার চাকাতেই আবার ঘুরতে থাকে।

মিঃ চৌধুরীর ঘরে সেরকম একটা চাকা আমি ঘুরতে দেখি। ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার-ধানধারিয়া-মুখার্জী এই যে গাঁটছড়া কগ্‌হুইল—তাঁদের নিয়ে ঐ চাকাটাকে চতুর্থ শতাব্দীতে আমি রিভার্স' গিয়ারে চলতে দেখেছিলাম। ব্যস, আবার চাকার ভোল পালটেছে; কখনও তার রিট্রেডিং হয়েছে, কখনও অচল চাকাটাকেই পালটান হয়েছে। যে বসে আছে 'মোটিভেশন্‌' হয়ে তার সামনে লক্ষ্যপথ স্থির—সে যেখানে যাবে বলে গোঁ ধরেছিল ১৯৮১ সালে, তাকে সেই পথে এগিয়ে যেতে দেখছি এই ৮২ সালের মধ্যভাগেও। ভেতরের এই 'এসেন্সটা' আমি বুঝে গেছি—মানুষের পোষাক-আষাকের রূপান্তর যাই হোক, তার সৌরভ কিন্তু এক—তা আতরই লাগাই বা বিদেশী সেন্ট।

মিঃ চৌধুরী ভাবেন এঁদের থেকে তিনি আলাদা। যদিও জমিদারের

রক্ত প্রবাহ তিনি বহন করছেন তিন পুরুষ ধরে, এ-পুরুষে তাঁর সৌরভ তিনি পালটেছেন। সবচেয়ে প্রগ্রেসিভ্ দলের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ হিসেবে মেহনতী মানুষদের দুঃখ কষ্ট জ্বালা অনুভব করেন ঘরের ভিডিও দেখতে দেখতে। এবং মদের গ্লাসে দেখেন মানুষের সর্বকালের সর্বযুগের বিপন্ন ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ তিনি যে ড্রিম্‌ল্যাণ্ডে বিচরণ করেন—সেখানে অনেকগুলো সুখের ভোজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলে ভোজহীন ভজনার অনুরণনও তিনি শুনতে পান। গরম লাগলে পাখাটার স্পিড একটু বাড়িয়ে দেবার মতই তিনি তাঁর জিপটা নিয়ে গ্রামে গ্রামে মেহনতী জনতা দেখে আসেন এবং সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা, মাঝে মাঝে চক্কর লাগান সমস্ত ভারতে। বুরোক্র্যাট্‌দের মত ঘরে বসে ভারতবর্ষকে অনুভব করার বুর্জোয়া নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন, তাই মাঝে মাঝেই চৌধুরী হাওয়া হয়ে যান। ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার তখন চৌধুরীর অনুপস্থিতিতেও মিলিত হয়ে ঠাট্টা জুড়ে দেন, বলেন—মেহনতী জনতার দুঃখে চৌধুরীর কাছা খুলে যায় তো—কি বলো রুবি, ভারত-দর্শন না করলে, একটু ধুলো গায়ে লাগিয়ে না এলে, ওর যে আবার ছট্‌ফটানি কমে না। তা যাক, একটু ঘুরেই আসুক। ওর যা কাজকর্ম তা তো আমরা ভিডিওতেই দেখি। বুঝলে রুবি, চৌধুরীর দূরদর্শিতা আছে—ভিডিও এখন কিনতে হলে জান্ বেরিয়ে যেত। শুনছি দেড় লক্ষ টাকা। আমাদের ও দাম দিতে হলে টসে যেতাম। তাই বলছিলাম, আমাদের মধ্যে চৌধুরীই দেখছি সব দিকটা ম্যানেজ দিতে পারে। একেই বলে বাপ-ঠাকুর্দার জোর—বুঝলে, যতই তোমরা সি, পি, এম,-এর দোষ ধর, পার্টি লেবেলে চৌধুরীর মত লোক রীতিমত একটা অ্যাসেট।

রুবি কি আর উত্তর দেবে, মাথা নেড়ে হাসে। মল্লিক উৎসাহ পেয়ে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলেন—সমাজের যে স্তরে চৌধুরী উঠে গেছে, ওখানে 'ক্ল্য-দ্যে-তা' হয় না, বন্দুকটা উঁচিয়ে তাক করতে করতেই নিজের দৌড় ধরা পড়ে। আমরা কত বলেছি, মার্ক্স'-ফার্ক্স' যতই যা কর চৌধুরী—মোদ্দা কথা গায়ের রঙ বা রক্ত, ধমনীর উন্মত্ত প্রবাহ এবং সেই প্রবাহের উজানে ভেসে যাবে, বন্ধু! অযথা অশান্তি এনে অকারণে জ্বলে মর কেন?

বাস্তবিক ঘরে গিয়ে দেখলাম ভিডিও-তে কিসব ছবি দেখান হচ্ছে। এক নজরে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না, তবে বুঝলাম, শুধু 'ক্যালকাটান্' দৃষ্টি নিয়ে চৌধুরী পড়ে থাকতে রাজী নন, একটা সর্বভারতীয় ভাবনা ওঁকে

পাগলের মত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভারতবর্ষ তখন ওর ক'আঙ্গুলে ঘুরতে থাকে—সেখানে আছে তীর্থযাত্রী, ধর্মান্ধ মানুষ, আবার মজদুর মিছিল। দেশনেত্রীর সমর্থনে পুষ্ট সি, পি, আই,-এর ম্যাসিভ্ জমায়েত আর অথরিটেরিয়ান শক্তির বিরুদ্ধে সি, পি, আই,-এম,-এর শক্তি-পরীক্ষা। অপোজিশন ইউনিটির একটা মুখোশী চাল। সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে চৌধুরী তার ভিডিও টেলিভিশন ক্যামেরায় যেসব ছবি তুলেছেন- সেগুলি এখন দেখান হচ্ছে। আমার তলব পড়েছে বোধহয় সেই কারণেই।

—আরে, আসুন, আসুন—। ঘোষ-বোস-মল্লিক একসঙ্গে বলে উঠলেন। ভিডিওটাকে দেখিয়ে বললেন—ঐ দেখুন, ঐখানে নিখরচায় চৌধুরীর ভারতকে আমরা দেখতে যাচ্ছি।

চৌধুরী বেশ গম্ভীর উক্তি করলেন—মিঃ রায়ের এসব দেখা খুব দরকার। বাঙালী নন্-প্রডাকটিভ জাত বলে স্বাতীর কথায় ইদানীং তিনি একটু বেশী নেচে বেড়াচ্ছেন। আমি সব টের পাচ্ছি। তবে তাঁকে আমি সমস্ত ভারত ঘুরে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি। শরীরে না দেয় আমার ভিডিও-তে দেখুন—স্বাতীকে দেখান। তাহলে বুঝবেন জাত হিসেবে বাঙালী অন্যদের চেয়ে কোন অংশে ভাল বা প্যারাসাইটিক কিছু নয়।

—ঠিক বলেছো চৌধুরী—ঘোষ-বোস-মল্লিক একই সঙ্গে বলে উঠলেন—পৃথিবীতে যত বড় বড় অরেটর হয়েছে, হয় তারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্, নয়ত প্রগ্রেসিভ। প্রগ্রেসিভ মানেও তো তাই—ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলার মত ক্ষমতা। নয়ত দেখুন, মিঃ রায়, চৌধুরী না থাকলে আপনাকে এই ভাইট্যাল্ সময়ে আমরা মিস্ করতাম। রিসার্চ যাঁরা করছেন, তাঁদেরও এসব কাজ, মানে চৌধুরীর সিনেম্যাটোগ্রাফিক্ কাজ খুব দেখা দরকার।

মিঃ চৌধুরীর এই ডকুমেন্টারি তোলার যে রোগ আছে এতদিন আমাকে সেকথা কিছুই বলেন নি। ওঁকে ঘিরে সব সময় যে একটা সাসপেন্স তা ওঁর হঠাৎ হঠাৎ মানুষকে চমকে দেবার ক্ষমতায়।

মিঃ চৌধুরী এগিয়ে এসে আমার জায়গা ক'রে দিয়ে বললেন—এখানে, এই ভাল জায়গাটায় আপনি বসুন। আজকে স্বাতী থাকলে বড় ভাল হত। যাক্গে, স্বাতীর অনারে আর একদিন না হয় আমরা বসবো। আপাততঃ আমার ড্রিম্ল্যাণ্ড সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা দরকার। ভিডিও টেপে এক্ষুনি আপনারা ১৯৬৭ সালের সেই বিপুল জনতার ছবি দেখছিলেন—খোলা

জিপে চলেছেন জ্যোতিবাবু ও অজয় মুখার্জী, বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী। হাত জনতার দিকে প্রসারিত। প্রথম ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট গঠন হবার সময়কার পশ্চিমবাংলার নানা চিত্র। পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী লোকের কাছে এই কালেক্‌শন্ আছে বলে মনে হয় না। অনেকের কাছে হয়ত অমূল্য সব ছবি আছে কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক ঘটনাকে জীবন্ত তুলে রাখতে পেরেছে খুব কম লোকই। তাই বলছিলাম, আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ইতিহাস-চেতনা চাই—ডি-ক্ল্যাসিফায়েড্ হয়ে রীতিমত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে। ওরা পারবে? ঐ যারা মেহনতী জনতাকে বুঝে গেছে ব'লে বেড়ায়? পারবে? আই ডাউট্ ভেরী মাচ্। আসল কথা কী জানেন, ভিজুয়্যাল এফেক্টে ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারলে আমরা হয়ত কিছুটা বুঝি—অতীতে কোথায় আমরা ভুল করেছি—ভবিষ্যতে কোন্ পথ নেবো। বলেই মিঃ চৌধুরী ভিডিও বন্ধ ক'রে দিলেন।

ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার চিৎকার ক'রে উঠলেন—কি করছো কি চৌধুরী? আমাদের দেখতে দেবে? অত বক্তৃতা মারলে 'আসল' জিনিসটা দেখতে কি দেরী হয়ে যাবে না?

চৌধুরী বললেন—মল্লিক, রোসো, ধৈর্য ধর। তোমরা অধৈর্য হয়েছ বলেই আমার কথা বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে। অথচ ভেবে দেখো মিঃ রায়কে একটু ব্যাকগ্রাউণ্ড না দিলে তিনি কিছুই ধরতে পারবেন না এবং আমাকে তখন আরও মিস্‌টিরিয়াস্ লাগবে। মল্লিক, আমার কথা বক্তৃতা লাগলেও ঐ রিস্ক নিয়েই মিঃ রায়কে আরও দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। এবং মিঃ রায় যদি কিছু না মনে করেন, ফর দি বেনিফিট অব স্বাতী বিশ্বাস—মিঃ রায়ের ইদানীং কালের ফিয়াঁ্যাসে। তখন কত গ্লাস উড়ে গেছে, ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদারের বোধহয় খেয়ালও নেই, কিন্তু দেখলাম একটু রোমান্টিক কথাবার্তাতেই ওঁরা হাততালি দিয়ে উঠলেন—ঠিক হে, ঠিক। বল হে, বল। তবে একটা কথা মনে রেখো, এটা ময়দান নয়।

মিঃ চৌধুরী বললেন—মিঃ রায়, আমার যে খুব একটা বলার আছে তা কিন্তু নয়। এইসব ছবিটবি তোলা আমার বহুকালের অভ্যাস, অনেকটা নেশার মত। ইতিহাস এমন একটা জিনিস, ডকুমেন্টেড্ হলে ইতিহাস, না হলে ঘটনা। যেমন ধরুন, কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল ১৯২০ সালের মে মাসে, সোভিয়েট রাশিয়ার তাশ্‌খণ্ডে। বহুদিন পর্যন্ত কেউ সেটা মেনেই

নিতে পারেন নি—। কিন্তু সেটা যখন ডকুমেন্টের সাহায্যে বা তথ্য দিয়ে এখন প্রমাণিত হয়েছে—লোকেরাও চুপ। মানতে বাধ্য। যাঁরা স্বীকার করেন নি, তাঁরা হয়ত একটু গিল্‌টি কনসেন্সে ভুগতেন, হয়ত ভাবতেন সুদূর রাশিয়ায় বিদেশে যার জন্ম—সে কি কখনও আমাদের জননী হতে পারে? কেন হবে না? বিদেশীকে আমরা বিয়ে করি না? আমাদের ছেলেপেলে হয় না? গিল্‌টি কনসেন্স বড় পিকিউলিয়ার জিনিস—মানুষের চলার পথে মস্ত বড় বাধা। আমি খুব অ্যামবিশাস্‌, জানেন? আমি চাই সারা ভারতকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারী ফিল্ম তুলতে। আমি ওটা করবই—দেরী করছি, কারণ পার্টি বলছে, এখনও তার সময় আসে নি। আমার কিন্তু ধারণা ভারতবর্ষের আজকে যা ছবি, সেটা আমিও বুঝি, সব সময় চাকাটা ঠিক মেহনতী জনতার স্বার্থে ঘোরে না বা ঘুরছে না—বুরোক্র্যাটরা দিচ্ছেন না বা চান না; হয়ত ভাবেন, ওঁদের স্বার্থে চাকাটা ঘুরলে নিজেদের চাকাটাই না আবার থেমে যায়! মহা-চক্র, জানেন? কে যে কোথা থেকে চাকাটাকে বন্ধ করতে চায় এবং কাদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে, অ্যাপারেন্টলি কিছুই বোঝার উপায় নেই। তাই পার্টি বলছে, সারা ভারতের নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা তার ছবি তুলে ধরলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয় থাকে। পার্টিকে একদিন নিশ্চয় বোঝাতে পারব, দেখার এই যে আমার প্রোগ্রেসিভ দৃষ্টি সেটাই হবে সমস্ত ঘটনা ও ইতিহাসকে জুড়বার মালা—যাকে বলে কানেক্‌টিং লিঙ্ক—এবং আমার কৌতূহল ও জাগ্রত জনতার জন্য আমার—আপনাদের কথায়, 'ফিউডাল্‌ চোখের জল'—সেটা হবে ছবির পটভূমি। কথাটা আমি ঠাট্টা ক'রে বলছি বটে, কিন্তু এটা বোধহয় পার্টি ঠিকই বলে যে নিজেকে ডি-ক্লাসিফাই করা সত্যিই খুব কঠিন। পরিবার, পরিবেশ, জন্মবৃত্তান্ত, শিক্ষাদীক্ষা, স্বার্থসংঘাত, ক্লাস্‌ কন্‌ফ্লিক্ট—ইত্যাদি নানা ইন্‌টারনাল ও এক্সটারনাল ফ্যাক্টরের চাপে পড়ে মানুষ রীতিমত গুঁড়িয়ে যায়। তার শত চক্রে আবর্তিত হয়ে অবিচল থেকে নিজেকে গড়ে তোলা অত সহজ নয়—বিশেষ ক'রে, নিজেকে মেহনতী জনতার স্বার্থে গড়ে তোলা সারা জীবনের একটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষাই আমি দিয়ে যাচ্ছি। তারই একটু নমুনা এই ভিডিও টেপ। সব কিছু দেখবার পরে একটা কথা আপনার নিশ্চয় মনে হতে পারে—ভারতবর্ষের মত এত বিচিত্র মানবসংসারকে একই মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া কী সম্ভব? পার্টি

দেবেনে এ প্রশ্ন তোলার অধিকার কারুর নেই। তাই আমরা চুপ ক'রে থাকি।

ঘোষ-বোস-মল্লিক প্রতিবাদ ক'রে উঠল—থামো, থামো চৌধুরী অনেক হয়েছে। ওসব অনেক প্রশ্ন ময়দানে তোলা হয় এবং আমরা শুনতে না চাইলেও শুনতে বাধ্য হই। এখন ভিডিওটা চালু ক'রে দাও, নয়ত 'আসল' জিনিসটা দেখতে বড় দেরী হয়ে যাবে (এতক্ষণ 'আসল' জিনিসটা কী আমি ঠিক ধরতে পারছিলাম না হঠাৎ স্ট্র্যাইক করল নিশ্চয় ব্লু-ফিল্ম,—যা এ-শ্রেণীর কাছে পরম সম্পদ। ভারতবর্ষের চেহারা দেখতে দেখতে ব্লু-ফিল্ম দিয়ে শেষ করার মধ্যে যতটুকু আত্মসমীক্ষা বা আত্মবল—ওটার দিকেই সভ্যতা দ্রুত তালে ছুটছে)। আমরা কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবো বল ? আচ্ছা একটা কাজ কর না—ওটা দিয়েই না হয় মেহনতী জনতার জন্য তোমার দরদ প্রকাশ করলে—। ওটা ছাড়া বেচারাদের আর কি এন্‌টারটেইনমেন্ট বলে কিছু আছে, বল ? দেখো না, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই অথচ সংগম আছে এবং গুচ্ছের রুগ্ন শিশুর জন্ম দেওয়া আছে। কমিউনিজম ক'রে ওটা বন্ধ করা যায় কিনা খুব ভেবে দেখার মত প্রশ্ন। মানুষ করা যদি ধর একদিন স্টেটের দায়দায়িত্ব হয়—তবে এদের মানুষ করতে স্টেট তো একেবারে ফাঁক হয়ে যাবে চৌধুরী ?

চৌধুরী মুষ্টিবদ্ধ হাতে বললেন—ঠাট্টা কোর না মল্লিক। এ দেশটার ভোল্ কবে পালটে যেত কিন্তু তোমাদের মত ক্ষমতাসম্পন্ন আই, এ, এস, বা বুরোক্র্যাট্‌দের পাল্লায় পড়ে ভারত শুধু গোলকধাঁধায় ঘুরছে। বুঝলে মল্লিক, আমাকে রাগিও না, আমি জানি, তোমরা কতটুকু এগোতে দেবে, কোথায় তোমাদের ক্লাশ্ ইন্‌টারেস্ট। একটা কথা ভুলে যেও না—বাঁচার জন্য যেটা সবচেয়ে দরকার—তা হল, স্বপ্ন ও অভিলাষ। মানুষ যখন অধৈর্য হয়ে ওঠে তখন ও-জিনিসটা মার খায়। তাই ব্লু-ফিল্মটা আমি পরে দেখাব। জান তো মল্লিক, মাল যারা রেগুলার টানে, তাদের স্টেয়িং ক্যাপাসিটি কিছুটা খোয়া যায় এবং শুধু তখনই ওসব করার চেয়ে দেখতেই মজা। তাই বলে ওটা হেল্‌দি সাইন্ নয়।

খিস্তি খেয়ে ঘোষ-বোস-মল্লিক খুব বোকার মত হাসতে থাকলেন। তখন চৌধুরী আবার শুরু করলেন—মিঃ রায়, আপনারা দু'জনে আমাকেও খুব ইন্‌স্প্যায়ার্ করেছেন। বাঙালী ছাড়া অন্যান্য জাত, অনেক বেশী প্রডাকটিভ

সেটা তো আমরা চোখ খুলে রাখলেই দেখতে পাই। কিন্তু বাঙালীর তুলনায় অন্যরা ঠিক কতটা প্রডাকটিভ, তা জানতে হলে ওদের মধ্যে অবশ্য দীর্ঘ দিন বাস করতে হবে—কেমন? সে সুযোগ কি আমাদের আছে? (ঘোষ-বোস-মল্লিক বলে উঠলেন—রাখ তো হে, যা বলে মিঃ রায়কে ইম্‌প্রেশন্ দেবার চেষ্টা করছ, খবর নিয়ে দেখো গে, দিল্লীর লোকের ওসব কিছুই অজানা নয়।) —থামো তো মল্লিক—চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠলেন—যা বলছি তা একটু বুঝবার চেষ্টা কর। সংগম ছাড়াও পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে, বুঝলে? যা বলছিলাম, সুযোগ, হ্যাঁ সে সুযোগ আমাদের না থাকলেও, নানা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ভিডিও-র জন্য নানা ছবি তুলতে গিয়ে বুঝেছি, সুযোগ হারাবার কম্‌পিটিশনে আমাদের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না। সেদিন আপনি একটা কথা বলেছিলেন, অন্যান্য জাতের চেয়ে বাঙালী প্রডাকটিভ ক্ষেত্রে বা শিক্ষাদীক্ষায় মোটামুটি একশো বা তারও বেশী বছর লিড্ পেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বাঙালী ইন্‌ডোলেন্ট, আলসে, এবং যেহেতু সে ইমিডিয়েট প্রয়োজনটাকে নিয়েই ভাবে, লড়াই করে, দলাদলি করে, একে অন্যের পা ধরে টানে, পাওয়ার চায় এবং পরশ্রীকাতর—তাই বাঙালী সেই লিড্ ও লিডারশীপ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করে নি বা করতে পারে নি। আমি এটুকু বুঝতে পারছি আপনারা দেখাতে চান (আমি বাধা দিলাম, আমি নই, স্বাতী)—হ্যাঁ, ঐ একই হল, তা যা বলছিলাম, আপনারা দেখাতে চান, কি এবং কোন্ ঐতিহাসিক কারণে বাঙালী এই লিডারশীপ হেলায় হারাল। ইতিহাসের মধ্যে সেই ফেইলিংগুলির কারণ কী, যদি কেউ আঙুল দিয়ে দেখায়, তবে হয়ত একই ভুল আমরা করবো না। আমার বক্তব্য—বাঙালীকে নিয়েই বা আপনারা পড়লেন কেন? আপনারা বলবেন, বাঙালীদের অনেকটা জানি, আমরা নিজেরা বাঙালী। সেলফ্ রিফ্লেক্‌শনের অধিকার বা স্কোপ্ আছে—তাই। ভীষণ ভুল, মিঃ রায়। এটা হবে একতরফা বা একপেশে স্টাডি। গুজরাটী-মারাঠী-তেলেগু-তামিল-পাঞ্জাবীদের মধ্যে কী প্যারাসাইটিক্ মনোভাব নেই? নিশ্চয় আছে। মারাঠীদের হাত থেকে গুজরাটীদের হাতে ক্যাপিটাল চলে যায় কেন—তারও তো একটা গভীর স্টাডি হতে পারতো? আপনি বলবেন, আলাদা আলাদা জাত, আলাদা আলাদা ভাবনা নিয়ে চলে এবং বাঙালী হিসেবে যে দায়িত্ব আমাদের, তা পালন করতে গিয়ে যদি তাদের উত্থান ও পতনের একটা

ঐতিহাসিক ও ইকনমিক্ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়—তাহলে সেই পারস্পেক্‌টিভ থেকে যে আত্মবিশ্লেষণ বেরুবে—তার হবে অন্য একটা রোল। এবং তা থেকেই অন্য জাতও আত্মবিশ্লেষণের খোরাক পাবে। (মল্লিক বাধা দিলেন—তুমি আটার্‌লি বোর ক'রে দিলে হে—তোমার ঐ সোসিওলজিক্যাল্ ব্যাখ্যা-স্যাখ্যা পেয়ে স্বাতী কী তার থিসিসের লাইন চেঞ্জ ক'রে দেবে বলে তোমার মনে হয়, চৌধুরী? জান না, মানুষের 'স্বভাব যায় না মলে'—) দাঁড়াও মল্লিক—চৌধুরী আবার কাঁচা খিস্তি ঝাড়লেন, সংগম করলেই যে পয়দা বাড়াবার শক্তি থাকে—তা কিন্তু নয়। যা বলছিলাম—এবং আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো—। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, যেমন ফিলিপিন্‌স্, মালএশিয়া, সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের হাতে প্রচণ্ড টাকা—যাকে বলে প্রোডাকটিভ ক্যাপিটাল্। তাদের হাতে আবার প্রচণ্ড ক্ষমতাও। এটাই-বা সম্ভব হয়েছিল কি করে? এখানে, এই ভারতে যারা ভোগে আর শয্যায়, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্রিটিশদের হাতে পড়ে এবং তাদের খুশী করতে উড়িয়ে দিলেন—তাঁরাই আবার অন্য দেশে গিয়ে এত ভাল প্রডাকটিভ এফর্ট দেখাতে পারলেন কী করে? নিশ্চয় তার একটা কারণ ছিল—সেটা আপনারা একবারও কি ভেবে দেখবেন না?

হঠাৎ আলো নিভে গেল। আমাদের পেছনে একটা ডিম আলো জ্বলছিল। ইতিহাসের টুকরো টুকরো পাতা তখন চৌধুরী ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন আমাদের সামনে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন ছবি—কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই কিন্তু তথ্য বা মেটিরিয়াল্ হিসাবে নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। মিঃ চৌধুরী এক্ষুনি বলছিলেন এসব নিয়ে তাঁর নাকি একটা ডকুমেন্টারী ফিল্ম করার ইচ্ছা—একটু লিংকেজ ধরিয়ে দিতে পারলে দারুণ জিনিস হবে। ছবিগুলি যখন দেখান হচ্ছিল, আমি মাঝে মাঝে তার কিছু কিছু ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড দিতে থাকলাম—অবশ্য যতটা বুঝতে পারছিলাম। মিঃ চৌধুরীকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা ক'রে যাচাই ক'রে দেখে নিচ্ছিলাম যা ভাবছি ঠিক কিনা।

গঙ্গার বুকে কালবৈশাখী ঝড়। তোলপাড় করছে ঘর। বাড়িঘর কি তবে পড়ে গেল? সুন্দর একটা ছবি তুলেছেন চৌধুরী। মনে পড়ে গেল ১৭৩৭ সালের কথা। ঝড় আর ভূমিকম্পে সেবার দু'শো বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার জলযান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় দু'ই হাজার মণি বহু নৌকো সেদিন ডুবে গিয়েছিল এবং অন্য জাহাজের মধ্যে

ইংরেজদের আটটি আর ওলন্দাজদের চারটি জাহাজ শেষ। তিন লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল আর অসংখ্য পশু। ওদিকে আবার প্রচণ্ড মহামারী।

ঝড় থেমে গেছে। এবার দেখছি ঘাটের পর ঘাট। নোংরা কাদা এবং পলুশন্। তার মধ্যেই স্নানের ভিড়।

মনে পড়ে ১৮৬৪ সালের কলকাতার কথা। এক সময় গঙ্গার জলে ভাসত শুধু বিষ্ঠা ও লাশ। যে নদীর জলে রান্নাবান্না বা তৃষ্ণা মেটে, সেই জলে প্রতি বছর পাঁচ হাজারের ওপর লাশ ছুঁড়ে ফেলা হত, তার মধ্যে সরকারী হাসপাতাল থেকেই পনের'শ। কথাগুলো আস্তে আস্তে মিঃ চৌধুরীকে বলছি—তিনি আঁৎকে উঠলেন—সে কী? আমি বললাম—হ্যাঁ, এ্যাব্‌নক্‌শাস্। এ প্রথা ব্রিটিশরা অনেক চেষ্টা ক'রেও বন্ধ করতে পারে নি। এছাড়া আছে সারা কলকাতার খাটা পায়খানার বিষ্ঠা। মেডিক্যাল কলেজে শবদেহ ব্যবচ্ছেদের পরে কাটা-ছেঁড়া অবস্থায় ঐসব 'মরদেহ' এই গঙ্গাতেই ফেলা হত। চৌধুরীও চম্‌কে চম্‌কে উঠেছিলেন, যদিও দেহের ভঙ্গীতেই বা চোখের ইশারায় সেটা প্রকাশ করছেন বেশী ; কথা বলছেন দু'একটা, নয়ত ঘোষ-বোস-মল্লিক ডিস্টারভ ফিল্ করতে পারেন। ওঁরাও যে সব কিছু দেখছেন, তা নয়; আমরাও। চৌধুরী বললেন—গঙ্গার তখনই যখন ঐ হালচাল কলকাতার পয়ঃপ্রণালী বা জলের আরও ভাল কোন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না কি? ব্রিটিশরাই বা অত হাফ্-হার্টেড্ কাজ করত কেন?

বললাম—ব্যাপারটা কী জানেন, অনেক সময় আমরাই তাঁদের কাজ করতে দিই নি। তখন মড়া পোড়াতে খরচ লাগত দু'টাকা। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক এত গরীব ছিল যে, মড়া পোড়ানর জন্য সামান্য যে কাঠ বা তেল সেটা কেনার সাধ্যও তাদের ছিল না। টাকার অভাবে মুখে আগুন না ছুঁইয়েই তারা গঙ্গার জলে মড়া ভাসিয়ে দিত। একটা ফাণ্ড্ করে এই গরীব লোকদের উদ্ধার করার চেষ্টা হয়েছিল। কেউ ভেবে দেখে নি, দু'টাকা দিলে গরীব লোকের মড়া গঙ্গার জলকে আর পলুটেড্ করবে না।

চৌধুরী বললেন—ফ্যান্টাস্টিক্। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, এসব কথা আমি জানতাম না।

বললাম—প্রয়োজন হলে বাঙালী কিছুই শুনতে চায় না বা শুনতে পায় না। নয়ত এ ধরনের ব্যাপার ঘটে কেন? ছোট লাট স্যার সিসিল্

বিডন্ নিমতলা ও কাশী মিত্রের শ্মশান টালির নালার ধারে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ১৮৬৪ সালে মিউনিসিপ্যালিটির কাজের দায়িত্ব ছিল 'জাস্টিস অব পিস'-এর ওপর। এই সভার সদস্য ছিলেন বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। সামান্য দু'টাকা দিয়ে এই ফাণ্ড্ করার প্রস্তাবটা তিনি নিশ্চয়ই বড় কাজ বলে বিবেচনা করেন নি। তাই ছোট লাটের প্রস্তাব নাকচ করার জন্য এড্মণ্ড্ বার্কের মত হুঙ্কার ছেড়েছিলেন। তাঁর ওজস্বী বক্তৃতার গুণে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়।

—সে কি? চৌধুরী আশ্চর্য হলেন।

—হ্যাঁ, আসলে বাগ্মী নিজে হয়ত জল ফুটিয়ে খেতেন কারণ পেটের অসুখে ভুগলে কি অত ভাল বক্তৃতা দেওয়া যায়? গঙ্গার জল বিশুদ্ধ করার কোন কল ছিল না সেদিন। সেই জল খেয়ে বিদ্যাসাগর অল্প বয়সে কলকাতায় পড়তে এসে দেড় মাস অসুখে ভুগেছিলেন। সেদিন এখানে অনেকেই অনেক রকম অসুখে ভুগতেন। জলই যে তার কারণ রামগোপালের ওটা নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল না। লিডারের ডিটেলস্ নিয়ে ভাববার কোন কালেই বোধ হয় সময় থাকে না। ছোট লাট নিশ্চয়ই পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন বাঙালীর বাচ্চাকে, কিন্তু বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে সেবার পালিয়ে না গেলে হয়ত মারাই পড়তেন।

এবার নানা ঘাট। সব ঘাট যে চিনতে পারছি তা নয়। সাইন্ বোর্ড দেখে বা অন্য কোন নিদর্শন মিলিয়ে আমাকে চিনে নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মিঃ চৌধুরীও বলে উঠছেন আমার অনেক সুবিধে ক'রে। চৌধুরীকে আমি বোঝাচ্ছিলাম—ঘাটের ছবি আপনি কেন তুলেছেন জানি না, কোন্ পারস্পেক্টিভে এগুলো নিয়েছেন তাও অজানা—তবে একটা কথা নিশ্চয়ই বলতে পারি—ঘাটের ইতিহাসের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দুই শতকের বাঙালী মানসিকতা। বাঙালীদের হাতে টাকা এলেই, দয়ার বিদ্যাসাগর হয়ে, মহামানবরা নিজেদের নামে নামে ঘাট তৈরী ক'রে দিতেন কিংবা মন্দির। ঘাটের কীর্তি তবু-বা কিছু কিছু রয়ে গেছে বা বেঁচে গেছে, মন্দিরের কীর্তি অল্প বিস্তর ছাড়া বেঁচে নেই।

কাশীনাথ ট্যাণ্ডনের ঘাট। লেখা ছিল বলেই পড়তে পারলাম। চৌধুরী বললেন—পাঞ্জাবি হিন্দু লাহোর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। কি ক'রে গেছেন একবার দেখুন। জাতটার কি দারুণ কর্মক্ষমতা ভাবলে

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

বললাম—এঁর সম্পর্কে কতটা জানেন, জানি না। আমি কয়েকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলতে পারি। ডকুমেন্টারী করার সময় এই ঘাটগুলির ফোকাস্‌ বা পারস্পেকৃটিভ একটু চেঞ্জ ক'রে আবার হয়ত আপনাকে ছবি তুলতে হবে। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র কাশীনাথ ট্যাণ্ডন প্রচুর টাকা কামান। সুতানুটিতে তাঁর একটা সামান্য মুদির দোকান ছিল। সেই থেকে বেনিয়ানী ক'রে মস্ত ধনী হন। কলকাতার পোস্তাবাজার থেকে শুরু ক'রে অনেক বাজার কিনে নেন। মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা ও কলকাতার উপকণ্ঠে বিস্তর জমি কিনে মস্ত বড় জমিদার হয়ে বসেন। লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে নানা ষড়যন্ত্রে সহায়ক হবার পুরস্কারস্বরূপ কাশীনাথ কাশীপুরে একশো বিঘা জমি দানস্বরূপ পান। মৃত্যুর সময় ৬০ লক্ষেরও বেশী টাকা রেখে যেতে পেরেছিলেন।

চৌধুরী বললেন—সেদিনের ৬০ লক্ষ, আজকের নিশ্চয় ৬০ কোটি? ভাবা যায়?

ততক্ষণে আরও কয়েকটা ঘাটের ছবি বেরিয়ে গেল। কথা বলতে বলতে যেটুকু দেখা হয়—ওটুকুই দেখছি। —জানেন, এর সমসাময়িক বাঙালী বেনিয়ান ছিলেন কৃষ্ণকান্তবাবু, গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবী সিং। শেষ কীর্তিমান ব্যক্তিটিও ছিলেন পাঞ্জাবী। কোম্পানীর ফোঁকরে সাপের মত ঢুকে পড়ে এঁরা এত টাকা করেছিলেন যে তখন এঁদের 'পঞ্চপাণ্ডব' বলা হত। এঁরা সবাই পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জন্য প্রাণটা দিতেই বাকি রেখেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতায় বাঙালীর রাজা নবকৃষ্ণকে কেউ অবশ্য টেক্কা দিতে পারেন নি। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে ছিলেন নবকৃষ্ণ। সিরাজউদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণ করেন, তখন সাহেব-মেমরা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ফলতায়। নবকৃষ্ণের সবচেয়ে বড় কীর্তি—সেখানে গোপনে 'খবর ও খাবার' দুই-ই পাঠাতেন। আসল কথাটা এই, দু'চারজন অবাঙালী মাত্র সেদিন কলকাতায় এসেছিলেন। অথচ বেনিয়ানীতে বাঙালীর মনোপলিকে ধূলিস্যাৎ ক'রে দিয়ে বাঙালীর সঙ্গে একই পংক্তিতে এঁরা পঞ্চপাণ্ডব হয়ে ওঠেন। অনেক বেশী টাকা খাটিয়ে তাঁরা রীতিমত টাকার পাহাড় হয়ে গিয়েছিলেন। বাঙালীরা, অন্য দিকে টাকা উড়িয়েছে খেয়ালখুশীমত বা বংশধররা সেই টাকায় ভাগ

বসাতে গিয়ে খেয়োখেয়ি করে বা কেস্ ক'রে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

বৈষ্ণব ঘাটের নানা দিকের ছবি তুলেছেন চৌধুরী। ওটা দেখে আমার আবার অন্য কথা মনে পড়ল। বললাম—ঐ যে বৈষ্ণব ঘাট দেখছেন, ওটা তৈরী করান বৈষ্ণব চরণ শেঠ। গৌরী সেন বৈষ্ণব চরণ শেঠের পার্টনার ছিলেন। একবার তিনি গৌরী সেনের নামে কিছু দস্তা কেনেন; দস্তার মধ্যে প্রচুর রূপা পাওয়া গেল। প্রচুর মুনাফা করেছিলেন বৈষ্ণব চরণ। কিন্তু সবটাই দিয়ে দেন গৌরী সেনকে। গৌরী সেন ভাল কাজে সেই টাকা ব্যয় করতেন। ইতিহাসের সেই প্রকৃত উদার বাঙালীর নামটি—প্রবাদ বাক্যে স্থান ক'রে নিয়েছে—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'।

এবার চৌধুরীর ক্যামেরা দুর্গাচরণ মুখার্জীকে টেনে তুলল। মনে পড়ে গেল এটর্নি হিকি সাহেবের উক্তি।

ঘোষ-বোস-মল্লিক বলে উঠলেন—আর কতক্ষণ ঘাট, শ্মশান কিংবা মড়া দেখাবে চৌধুরী? তোমার পাগলামির তুলনা হয় না!

চৌধুরী ওটাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন্ ভেবে লক্ষ্ণৌ-এর কায়দায় একবার সেলাম ক'রে নিলেন—। আমি বললাম—জানেন, এটর্নি হিকি সাহেব বহু দিন কলকাতায় থেকে বাঙালী জাতটাকে হয়ত কিছুটা চিনতে পেরেছিলেন। বহুদিন কলকাতা বাসের পর একবার ঠিক করলেন বিলেত যাবেন। ওঁর বেনিয়ান ছিলেন দুর্গাচরণ। ওঁর কাছে হিকির কত ধারকর্য আছে জানতে চেয়ে ডেকে পাঠালেন। দেখা গেল, টাকার জন্য যে বণ্ড দিয়েছিলেন তা নাকি সুদে-আসলে বেড়ে প্রায় আট হাজার টাকায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনেই তো হিকি সাহেবের ব্লাড প্রেসার চড়ে গেল। একবার বিলেতে গেলে আর নাও ফিরতে পারেন। সেই আশঙ্কায় দুর্গাচরণ হিকি সাহেবের কাছে এসে বেশ কড়া স্বরে বলেছিলেন—টাকাটা যত শীঘ্র সম্ভব ফেরৎ পেলে তিনি খুশী হবেন। কোন্ বাঙালী কায়দায় কথাটা বলেছিলেন ইতিহাসে অবশ্য তা লেখা নেই। তবে মুখুজ্যে মশায়ের কথায় এত ঝাঁজ ছিল যে হিকি সাহেব লোকজন ডেকে বেনিয়ান মুখুজ্যেকে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলেন। বাঙালীর বাচ্চা, অত সহজে অপমান সহ্য করে না। প্রয়োজনে সে রুখে দাঁড়াতেও জানে। কয়েকদিনের মধ্যে মুখুজ্যেকে টাকা ফেরৎ দেবার ধমকী সহ দুম্ ক'রে এল এটর্নির চিঠি। হিকি সাহেব তখন ধার ক'রে মুখুজ্যের টাকা শোধ দিয়ে দেন। এভাবে যিনি সুদে-আসলে বাড়িয়ে সহজ উপায়ে

টাকা করেছিলেন—সেই মানুষটার টাকার দম্ভ দেখবার মত ছিল। ১৮৫৪ সালে 'সংবাদ ভাস্কর' এঁর সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেন তা তখনকার সমসাময়িককালের বেনিয়ানদের অ্যাটিচিউড তুলে ধরে—'এক সময় ৺দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দম্ভে কলিকাতা শহর হতভম্ব প্রায় হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে কলিকাতার এমন কোনো ধনী নাই যাহাকে তিরস্কার করেন নাই।' তাঁর ছেলে শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও লুটপাট করেই বড়লোক হন এবং 'তাঁর অধিকাংশ টাকা লাম্পট্যে নষ্ট করিয়াছিলেন'। বাস্তবিক দুর্গাচরণের সবচেয়ে গুণ তিনি বাঙালীর ঐতিহ্য খর্ব হতে দেন নি।

ঘোষ-বোস-মল্লিক বিরক্ত হয়ে উঠলেন—কি করেছো কী, চৌধুরী? একাধারে ফিল্ম নষ্ট ক'রে গেছো? এসব আজেবাজে জিনিস নিয়ে যদি এত সময় নষ্ট হয়—আসল জিনিস দেখতে কত রাত হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? বলেই তাঁরা খালি গ্লাসগুলি এগিয়ে দিলেন—বললেন—কই, তোমার খানসামারা সব গেল কই? ঘন্টি বেজেই যাচ্ছে,—বেজেই যাচ্ছে, কেউ আর সাড়া দেয় না—চৌধুরী, এ কিন্তু ভাল নয়। তার মানে, তোমার শাসনের মধ্যে আর সেই আই, সি, এস্, মার্কা গ্রিপ্ নেই—এবং যেহেতু জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, লোকেরা নিশ্চয় খুব কষ্টে আছে, চৌধুরী। ওদের এবার ডাক, আমাদের কষ্টটা জানাই। দেখো, ওসব করতে গিয়ে আসল জিনিস না আবার—বুঝলে, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

চৌধুরী খিস্তি ছাড়লেন—আমি চাকর-খানসামাদের সব ছুটি দিয়ে দিয়েছি। একাসনে বসে বাবুদের সংগম দেখবে, সেটাতো খুব ভাল দেখায় না। যদি 'আরও' দরকার হয়—এবং মনে হচ্ছে ওজন্যে গরীবদের জন্য দুঃখে তোমাদের প্রাণ যাচ্ছে—তবে আলমারী থেকে বোতল বার করে খাও। হেলপ্ ইয়োরসেল্ফ্।

—এ না হলে চৌধুরী? মহারাজ, ক্ষমতায় ও ঐশ্বর্যে তুমি যদি দেশের সর্ববরেণ্য সভানেত্রীকে ছাড়িয়ে যাও—ঘোষ বা মল্লিক বিন্দুমাত্র শিহরিত হবে না, আশ্চর্য হওয়া তো দূরের কথা।

ভাবছিলাম ভাববিলাসে আমরা কত সূক্ষ্ম জিনিস এড়িয়ে যাই। ঘটনা তখন আর আমাদের কাছে ইতিহাসের নিদর্শন নয়। প্রত্যেকটি ঘাটের অবস্থা দেখলে মনে হয় বিষ্ঠার মতই বাঙালী মৃত্যুটাকে আবর্জনা মনে করে। নয়ত অন্তর্জলীর মত নির্মম একটা মনুষ্যত্বহীন প্রথা বাঙালী সমাজে এতদিন কী

ক'রে চালু ছিল? ধর্মটা যে কোথায় গিয়ে নেমেছিল ভাবলে গা শিউরে ওঠে। (স্বাতীকে বলা দরকার) ধর্মের নামে সহমরণ, ধর্মের নামে ক্রীতদাস প্রথা, ধর্মের নামে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ৩৬ হাজার সইসহ আপিল, আবার, ধর্মের নামে অন্তর্জলী। মুমূর্ষুকে তার আত্মীয়স্বজনেরা ঘর থেকে বার ক'রে গঙ্গার জলের ভেতর তার দেহের অনেকখানি ডুবিয়ে রেখে দিত। এই অবস্থায় মৃত্যু হলে নাকি সোজা স্বর্গে যাওয়া যায়! রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কষ্ট পেয়ে একদিন বেচারা মারা যেত। তখন মুখাগ্নি ক'রে গঙ্গার জলে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হত। প্যাঁচপেঁচে কাদা, কোথাও ঘাট ভাঙ্গা, ইঁটের পাঁজর বেরিয়ে গেছে, মেরামতি করার কারুর কোন গরজ নেই, ভুঁড়িওয়ালারা পৈতে হাতে গঙ্গা পূজো করছে—এরা যখন পূজো করে তখন কি সেয়ার মার্কেটের দৃশ্য দেখতে পায়, না-কি, কল্পিত কোন ঈশ্বরীর পা—? চৌধুরী, এগুলো রীতিমত ব্লো-আপ্ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন যেন হিন্দি সিনেমার নায়িকার এক একটি মুখ বা প্রলুব্ধকর শরীর!

আমি বললাম—বুঝলেন মিঃ চৌধুরী, ধর্মের নানা শাসনে বিদ্যাসাগরের মত লোকও শেষের দিকে ক্লান্ত—অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন—। অত চেষ্টা ক'রে যখন বিধবা বিবাহ দিতে দিতে ভদ্রলোকের ৩৫ হাজার টাকার মত ঋণ হয়ে গিয়েছিল—তখন তাঁর বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে (সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাবা) লিখেছিলেন—'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না···দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম—'।

—ওরে বাবাঃ, আপনি যে লাইনগুলো মুখস্থ ক'রে ফেলেছেন? হেসে বললাম, মতি শীলের ঘাটের ছবি দেখছি আর কেন জানি বিদ্যাসাগরের কথাগুলো ভেসে উঠল। কারণ বিদ্যাসাগরের মত দু'একজন কীর্তিমান পুরুষই বাঙালী জাতের গর্ব। আর ওদিকে, মতি শীলেরও কীর্তি আছে, স্বাতীর কাছে শুনেছি ভদ্রলোক বাঙালী হয়েও জাহাজী কারবারে নেমেছিলেন। ইউরোপীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধনকুবের হন কিন্তু অন্যদের মত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন নি, যদিও তখনকার দিনের অনেকের মত, শুধু বিনিয়োগের ক্ষেত্র ছিল ভূসম্পত্তি এবং তিনিও তা করেছিলেন। হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর টাকা

দিয়েছিলেন এবং জমি দান করেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য।

এবার বোধহয় ঘাট দেখান শেষ হল। ঘোষ-বোস-মল্লিক 'আসল' জিনিস দেখার জন্য তখন প্রায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে উঠেছেন। চৌধুরীও কলকাতার খেলার মাঠের উন্মত্ততার ছবি তুলেছেন, মানুষটির আর্টিস্টিক্ সেন্স আছে—ঘাট থেকে একেবারে খেলার মাঠ। তারপরেই জ্যোতিবাবু ও অজয় মুখার্জীর বিপুল সম্বর্ধনা। তার মানে, আগে একবার এ-পর্যন্ত দেখান হয়েছিল এবং আমার জন্যেই মল্লিকদের ইতিহাস চেতনার ডোজ দিতে গিয়ে চৌধুরী তাঁদের একেবারে 'বোর' ক'রে ছেড়েছেন।

সোজা এবার গৌড়দেশের ভগ্নস্তূপ। চৌধুরীর ট্যালেন্টকে তারিফ না ক'রে উপায় নেই। নাটকের ক্ল্যাইম্যাক্সের মতই এবার দ্রুত দৃশ্যের পরিবর্তন। দার্জিলিং টাইগার হিলের সূর্যোদয়। শিলিগুড়ির বাজারে আনারস। জলপাইগুড়ির বাজারে পাট, রোদে চিক্‌চিক্ করছে। জলপাইগুড়ির মাটিতে এত ভাল পাট হয়? চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলাম।

চৌধুরী বললেন—আপনি যদি নর্থ বেঙ্গল টুর করেন, তবে বুঝবেন যে-কোন কারণে আমরা 'গ্র্যানারি অব্ বেঙ্গল'কে বড় নেগ্লেক্ট্ করছি। পাঞ্জাবীরা হলে এই উর্বরা জমিতে গ্রিণ রিভলিউশন্ এনে ফেলত। তোরসা নদীর পাড়ে এক মহিলা একটি বালতি নিয়ে স্নান করছে—ঢেউ-এ নামার সাহস নেই। কুচবিহারে মা-দুর্গার বিশাল মূর্তি। বাতাসা ছুঁড়ে ছুঁড়ে লোকেরা পুজো দিচ্ছে—। তোরসা নদীর পাড়ে মা-দুর্গার বিসর্জন। কুচবিহারের বাড়িঘর, সুপুরিগাছ-পুকুর—সব যেন ঠিক খুলনার মত। ক্যামেরা এখন বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে—পাঞ্জাবের ট্র্যাক্টর্, জমি, গম-মাড়াই-গম-বেচার দৃশ্য। লেদ্ মেসিন্। কিন্তু চৌধুরী কি জানেন পাঞ্জাবের লেদ্ মেসিনের চেয়ে এখন মীরাটের লেদ্ মেসিন্ বিক্রি হয় বেশী, যেমন ছিল একদিন হাওড়ার স্থান— প্রিসিশনের রাজা? মহারাষ্ট্রের সমৃদ্ধির নানা দৃশ্য। আহা—বেশ লাগছে; বসে বসে ভারতের সমৃদ্ধ মুখ দেখছি। তামিলনাড়ুর সমৃদ্ধ হস্তশিল্প। কোথায় কোথায় ঘুরেছেন চৌধুরী! একেবারে পাগল মানুষ। ডায়নামিক। দিল্লীর লালকেল্লা, কনট্ সার্কাসের বাজার ও রাষ্ট্রপতি ভবন। দিল্লীর আর্কিটেকচার বড় ব্যক্তিগত সত্তা নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। বম্বেতে সি-বিচ-ম্যারিণ্ ড্রাইভ। দিলীপ কুমার হাসছেন—পাশে

দাঁড়িয়ে জিনাত আমন, তনুশ্রী। ওদিক থেকে আসছেন রাজকাপুর ও ডিম্পল্।

ঘোষ-বোস-মল্লিক বলে উঠলেন—কি দারুণ তুলেছো হে! আলাপ হয়েছিল নাকি? সূর্যের রঙ পড়েছে রাখী গুলজারের শাড়িতে আর মন্তব্য—কি করেছো কী চৌধুরী? ফ্যান্টাসটিক্। হেসে এসে দাঁড়ালো অমিতাভ বচ্চন। ম্যারভেলাস্। কামাল্ ক'রে দিয়েছো। সবাই কি একই সঙ্গে ম্যারিণ্ ড্রাইভে ড্রাইভ মারে নাকি?

এবার আসল জিনিস। উল্লসিত ঘোষ-বোস-মল্লিক-দস্তিদার ও ধানধারিয়া। এসব না হলে কী চলে—বড়ই সুস্বাদু ও মনোরম। আমার অবশ্য সংগম দেখার চেয়ে সংগম করতেই বেশী উৎসাহ।

॥ বাইশ ॥

কলকাতায় এসে একা থাকতে দ্রুত ভুলে যাচ্ছি ; স্বাতীর থিসিসে সাহায্য করতে বই ঘাঁটা ছাড়া নিজের মনের তাগিদে ক'টা বই পড়েছি এই মুহূর্তে মনেও করতে পারছি না। অর্থাৎ বই পড়ার অভ্যাসটুকু পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। রাতে শোবার আগে সারা দিনের কর্মপ্রবাহ সাপের মত খোলস ছাড়ে মনে, তার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ঘুমের সাধনা করি। ভাবনায় ও দুঃশ্চিন্তায় ঘুম খোয়া যায়। এ-পাশ ও-পাশ করি। অবসর মুহূর্তেও কর্মের প্রবল সূক্ষ্ম আবর্তে ঘুরপাক খাই ; বড়ই আশ্চর্য লাগে। কাজ নেই, নিরালা, নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ একা—তবুও কত মুখ ভেসে ওঠে, যে-কাজ খবরের কাগজের মত বাসি হয়ে গেছে, তাও পুতুল নাচের মত সূক্ষ্ম তারের নাচন দেখিয়ে যায়। মানুষের মনেই কি তবে অনেকগুলো অ্যান্টেনা ? টেলি-ভিশনের নানা আকারের যান্ত্রিক পর্দা তবে কি মনের ওপরেই ফিট করা থাকে এবং সুইচ চালিয়ে দিলেই মনের গভীরের জ্যান্ত সব চরিত্র নড়াচড়া ক'রে ওঠে ?

ক'দিন ধরেই আমি একটা ষড়যন্ত্রে মেতেছি। আমি কলকাতায় আসার আগে স্বাতীর ছায়া হয়ে ছিল দিলীপ মুখার্জী। একই সঙ্গে রিসার্চ করছিল এবং তাড়াতাড়ি থিসিস লিখে ফেলার আধুনিক কায়দাকানুনগুলি এমন ভাবে ও রপ্ত ক'রে ফেলেছে যে ওর থিসিস সাবমিট করা হয়ে গেছে এবং ব্রিলিয়েন্ট রেজাল্টস্ হওয়ায় সে ইদানীং ঝাঁপ খুলছে। আমি আসার পরে বেচারী বড় নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল।

জমিদারী ও মহাজনী ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সৈন্যদের সুরক্ষা যেরকম চিরকাল ইতিহাসের পাতায় আলো-ছায়ার খেল্ দেখিয়েছে, আমিও আমার এই মানসিক অবস্থায় সেরকম একটা 'সুরক্ষার' কথা ভাবছি। কারুর প্রটেক্‌শন চাইলে বহু সম্ভাবনাময় জীবন যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেরকম কোন মাথাব্যথা আমার থাকার কথা না, নেই-ও। দিলীপের কথা আমি যতটুকু শুনেছি এবং ওর সঙ্গে আলাপ ক'রেও আমার ওকে ব্রিলিয়েন্ট ছাড়া অন্য

কিছু মনে হয় নি। এই দুটো অবস্থাকে নানা ঘটনা ও পারম্পর্যে যোগ-বিয়োগ করতে গিয়ে দেখি, ও ব্রিলিয়েন্ট হতে পারে, কিন্তু মেরুদণ্ড বলে ব্যাপারটা নেই। আমি ওরকমই একজন মেরুদণ্ডহীন তরুণ চাই—যে কিনা স্বাতীকে ভালবাসে, এবং স্বাতীকে নিয়ে পাগল কিন্তু ও-তরফে কোন রেসপনস্ না পেয়ে হালে বড়ই বিমর্ষ। যে আমার একটু সাহায্য পেতে ভয়ানক উদ্গ্রীব হবে এবং আমি যদি সাহায্য করি—তাহলে তার পক্ষে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে পৌঁছন সুবিধে হয়। এই সুবিধের সংব্যবহার ক'রে যদি সে একদিন স্বাতীকে বিয়ে করার প্রস্তাব ক'রে বসে—তাহলে তো কথাই নেই। আমি তো ওটাই চাই। মধ্যস্বত্ব ভোগীরা কিছু না ক'রে শুনেছি ওভাবেই কমিশন খায় বা দালালি করে। আমি দিল্লীর 'দালাল', আমার স্বরূপ বোঝার সাধ্য আর যার থাকুক, দিলীপ মুখার্জীর নেই। অর্থাৎ স্বাতীকে ভালবেসেও বিয়ে করার কথা ভাবে না বা সাহস করে না—এমন লোক পেলেই তো হয়। কারণ আমার উস্কানি এবং চাপে পড়ে, সে দুম্ ক'রে স্বাতীকে ঘরে নিয়ে আসবে, স্বাতী যেরকম জ্বলন্ত আগুন, ও অতি সহজেই বুঝে ফেলবে কত বড় একটা অবক্ষয়ী চরিত্র তাকে গ্রাস করেছে। এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাতী তার থেকে মুক্ত হবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে। ওতেই আমার কার্যসিদ্ধি। কারণ তাহলে স্বাতীর সঙ্গে মোটামুটি একটা প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক এখনকার মত তখনও (স্বাতীর থিসিস দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে, করলে তাড়াতাড়ি করা দরকার) ওর বিবাহিত অবস্থাতেও, আমি বজায় রাখতে পারব। মাঝে মাঝে ও যখন নানা ঘটনা ব'লে দুঃখ ক'রে চোখের জল ফেলবে, তখন স্বাতীর দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে পুরনো প্রেমের অনুরাগে স্বাতীকে আমি আগের মতই আদর করতে পারব। আদরটা তখন যদি একটু উন্মত্ত হয়ে ওঠে—স্বাতীর রেস্পনস্ কিছু কম হবার কথা নয়। আমি ঠাণ্ডা মাথায় স্বাতীর জীবনের এই ক্রুশিয়্যাল্ মুহূর্তে মোটামুটি এরকম একটা ষড়যন্ত্র ক'রে ফেললাম। মধ্যবিত্ত ভিজে বেড়াল বড় সাংঘাতিক চীজ!

দিলীপের সঙ্গে এখন, এই সাফল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় কথাবার্তা ব'লে আমার যা মনে হয়েছে, তা আগে বলে নিই। তারপর রিসার্চ করার সময়ে যেসব কথা শুনেছিলাম, সেগুলি তখন সিনেমা কাটের মত জুড়ে নিতে পারলে দিলীপের মেরুদণ্ডহীনতার একটা রিয়্যালিস্টিক ছক্ কেটে নেওয়া

আমার পক্ষে সুবিধে হবে। কথা বলার সময় দিলীপ মুখার্জীকে ইদানীং একজন আন্তর্জাতিক ইকনমিস্ট মনে হয়। ভারতবর্ষের 'উইকার্ সেকশন্' বা সোসিয়ালিজম্ নিয়ে মাথা না ঘামালেও ইকনমিক্সটা ও ভালই বোঝে। ঈশ্বরই জানেন, থিওরিটিশিয়ান্ হলেই 'কিনস্' হওয়া যায় কিনা ; 'কিনস্' হতে গেলে লক্ষ্য স্থির রেখে বহুদিন ধরে, দেশের প্রবলেম নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়—সে কথা অনেকের মতই দিলীপকে বলে লাভ নেই। ওর যুক্তিতর্ক বা ইগোইষ্টিক্ উত্তর-ফুত্তর শুনে আমার এটুকুই মনে হল যে অঙ্কের লেজ ধরে ধরে দিলীপ বড় বড় সিদ্ধান্ত এক মুহূর্তে কষে ফেলে। অনেকটা কম্‌পিউটারে ডেটা চড়িয়ে তার তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভের মত, দেশের নানা সমস্যা এক মুহূর্তে সমাধান ক'রে ফেলার মত ব্রিলিয়েন্ট সব যুক্তি। এঁদের হাতে দেশের অর্থনৈতিক দায়িত্ব বর্তেছে বলেই দেশের উন্নতিও আইভরি টাওয়ারে সীমাবদ্ধ। প্ল্যানিং আর পারটিসিপেশনের মধ্যে ফারাকটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। দিলীপকে দেখে আমার মনে হল, ও নিয়ে যত কম ভাবা যায় তত বেশী ব্যক্তিগত উন্নতি বা বিকাশ। দেশকে নিয়ে চলতে গেলেই স্বাতীর মত নানা বাধা ও নিজের অকারণ ফ্রাসট্রেশন্।

আসলে থিসিস লেখা নিয়ে স্বাতীর সান্নিধ্য পেতে পেতে এবং তাতে আমি অভ্যস্ত হয়ে যাবার পরেই হঠাৎ আমার খেয়াল হয়েছে, স্বাতীর অতীতে কে এবং কারা ছিল। স্বাতীর সঙ্গে কথাবর্তা বলে আঁচ করেছিলাম, কেউ নেই। কোনকালে কেউ থাকলেও মনে বিশেষ কেউ দাগ রাখতে পারে নি। আমার আগমনে, আমার ভাবতে ভাল লাগে, দিলীপ মুখার্জীর ছায়া বা মায়া কোনটাই বোধ হয় এতদিন অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং দিলীপের অস্তিত্ব আছে কি নেই—তা নিয়ে আমার বদার্ করার কথা নয় ; কোনকালে করতামও না, যদি প্রয়োজন না পড়ত। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, মনের এই অবস্থায় দিলীপই আমার সবচেয়ে সুটেবল্ ক্যান্‌ডিডেট্। দু'টি বিরুদ্ধ শক্তিকে যদি পোলারাইজেশনের পথে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তার কায়দাকানুন যা হবে—দুটোকে সম্পূর্ণ এলিমিনেট্ করতে চাইলে, কলকাঠি অন্যভাবে নাড়াতে হবে। যেমন মহারাষ্ট্রের আনতুলে বা হরিয়ানার ভজনলাল সমাজের যে যে স্তরে গড়ে ওঠে—সেখানে মানুষের মূল্য কমে যায় বলেই মানুষ পনেরো লক্ষ টাকায় বিকোয়। মানুষ কেনার বাজারে

পলিটিক্যাল্ ট্যাক্স যেমন দরকার—চক্ষুলজ্জায় 'করব করছি' করলেই সুযোগ হাত ফস্‌কে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা। ওটি আমি হতে দিচ্ছি না।

ওদের সম্পর্কটার একটা লজিক্যাল্ কার্যকারণ নিয়ে ভাবতে গিয়ে অনেকগুলো ছবি এক মুহূর্তে ভেসে উঠল। লাইব্রেরীতে দু'জনেই পড়াশুনা করছে। অনেকগুলো তথ্য পেয়েছে দিলীপ, স্বাতীর থিসিসে হয়ত কাজে লাগবে, দিতে গেছে, স্বাতী বলেছে,—আমি এখন অন্য একটা গভীর বিষয় নিয়ে ভাবছি, ব্রিটিশ পারস্পেক্‌টিভ্ প্ল্যান—খুব ইন্টারেষ্টিং—তোমাকে পরে বলবো—তুমি যা এনেছো, আমি পরে দেখবো, রেখে দাও। অপমানিত হয়েছে দিলীপ, নিজের কথা না ভেবে অন্যের কথা চিন্তা করা সময়ের কি ভীষণ অপচয়! পড়াশুনার পরে কতদিন ইচ্ছে করেছে কফি হাউসে গিয়ে আড্ডা মারে; প্রস্তাব শুনে স্বাতী বলেছে—চলো, তবে আজ আমার বেশীক্ষণ বসবার উপায় নেই, বুলবুলদের আসতে বলেছি। আবার অপমানিত হয়েছে দিলীপ। ইউনিভারসিটির করিডর দিয়ে দু'জনেই যাচ্ছে, কি একটা জরুরী কথা ছিল স্বাতীর সঙ্গে, বলতেই স্বাতীর একরোখা উত্তর—হঠাৎ হঠাৎ যা তোমার মনে ওঠে—দুপুর-দাপুর না বলে একসঙ্গে যখন বসবো, গুছিয়ে বোল, তাহলে আমার পক্ষে বোঝার একটু সুবিধে হয়। তোমাকে একটু ধরতে পারি।

এর পরের অধ্যায় আরও ভয়ঙ্কর; দু'জনে বসেছে রেস্তোরাঁয়। দিলীপ মরে যাচ্ছে কিছু বলবে কিন্তু মুখে কথা যোগাচ্ছে না। কফি হাউসে সেই না-বলার জ্বালা জুড়তে স্বাতীর থিসিসের বিষয় নিয়ে হয়ত বিদ্রূপ শুরু ক'রে দিয়েছে। বলেছে,—বাঙালী প্যারাসাইটিক জাত, কি ভয়ঙ্কর কথা! কোন জাত সম্পর্কে ওরকম একটা কথা বলার আগে অনেক কিছু তলিয়ে দেখা উচিত। যেমন ধর ভারতবর্ষ বিশাল দেশ; ইকনমিক্ কোন থিওরিই এখানে ঠিক খাটে না। ভারতবর্ষকে উন্নতিশীল দেশ বললেও কম বলা হয় আবার ডেভলপড্ কানট্রি বললেও বেশী বলা হয়। দেশে এবং বিশেষ ক'রে বাঙালীর মধ্যে কেউ যদি প্যারাসাইটিক বীজ দেখতে চায়, সে কোথায় ভুল করবে জানত? ভুল করবে এখানেই যে, দেশে ক্যাপিটাল ফরমেশন্ কোনকালেই হয় নি কারণ ইনড্রাসট্রিয়াল রিভলিউশন্ ছাড়া ক্যাপিটাল ফরমেশন্ হয় না। তবে ভেবে দেখো, এখনকার ইতিহাসের একটা সুতো ধরে টানলেই শত সুতোর জট পাকিয়ে যাবার অযথা কমপ্লিকেশনের মধ্যে

তুমি যাচ্ছ। তাতে মুশকিল এই যে, তোমার যা হচ্ছে—থিসিস দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়ত হয়ে উঠছে অথচ কোন স্থির কন্‌ক্লুশনে তুমি আসতে পারছ না। সেই জন্যে বলছিলাম, অ্যাপ্লায়েড্ ইকনমিক্সে রিসার্চ করার কোন অর্থ হয় না; অযথা শাখাপ্রশাখা এমন ভাবে বেড়ে যেতে থাকে যে শেষ পর্যন্ত থিসিস মার খেয়ে যাবার সম্ভাবনা। অন্য দিকে ইকনমিক যে-কোন একটা দিক নিয়ে যদি তুমি রিসার্চ কর, অত ঝামেলা নেই। অঙ্কের দৌলতে কন্‌ক্লুশনের প্যাচ তোমার হাতের মুঠোয় এবং যেহেতু গাইড প্রফেসরদের মাথায় এরকম অনেক থিওরির প্যাটার্ন কাজ করে সেহেতু ডক্টরেট তাড়াতাড়ি পাওয়া বা সেই সুবাদে বিদেশে কিছু স্কলারশিপ্ জুটে যাওয়া—দু'টোর কোনটাই অসম্ভব নয়। আর দেখছো তো—কত ছেলেমেয়ে ষাট দশকে এই ক'রে বিদেশে চলে গেল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁরা এখন এক একজন ডাকসাইটে ব্যক্তি। আমরাই তাদের হয়ত সিঅফ্ করেছি বা আমাদের দাদারা এয়ারপোর্টে গিয়ে তাঁদের বিদায় দিয়ে এসেছিল। নিজেকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার অখণ্ড যুক্তি দিলীপের।

এ নিয়ে তর্ক হয়েছে স্বাতীর সঙ্গে। স্বাতীর কোন যুক্তিকেই ও মেনে নিতে পারে নি। আউটরাম ঘাট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জাহাজগুলি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, প্রস্তাব করেছে—চলো বসি। দু'জনে বসে থাকে। কথা হয় না। সন্ধ্যা নামে। দূরের মানুষগুলো আবছা হয়ে যায়, অন্ধকার ছায়া ফেলে সন্ধ্যার গভীরে—কী যেন বলতে গিয়ে দিলীপ বলতে পারে না। স্বাতী বোঝে—দিলীপ কী বলতে চায়; মানসিক দিক থেকে স্বাতী কারুর কথা শোনার জন্য তখন তৈরী নেই, দিলীপের কথা একেবারেই নয়, কারণ দিলীপ সব বোঝে, পরিবেশ বা অবস্থা কিছুই বোঝে না। দিলীপ ব্রিলিয়েন্ট তর্ক করে, তখন কথাগুলো খুবই ধারাল লাগে কিন্তু কোন্ কথা কখন কি মুহূর্তে বলতে হয়—জানে না; অন্য পক্ষের মনটা তৈরী আছে কিনা জানে না বলে কথা অপ্রাসঙ্গিক হয়। আসলে দিলীপের আখ্যান শুনে আমি তখন ভেবেছিলাম, দিলীপ একটা কথা বুঝতে চায় নি। স্বাতী একেবারে ভারজিন্ সয়েলে চাষ শুরু করেছে এবং কত বেশী ওকে খাটতে হয়েছে বা হচ্ছে; দিলীপের লাইব্রেরীতে বসে কোথায় কি আছে জানলেই কাজ হয়ে যায়।

দিলীপ একবার যা ভাবে, বলবেই, তা বলেই ফেলবে। কোন বাধা

মানবে না। যেন বিস্ফোরণ ঘটাতেই ওর ভয়ঙ্কর একটা নেশা—কাঁর হাত-পা উড়ল বা নিজে পুড়ে মরল কিনা—সেদিকে ভাববার অবসর বা ফুরসৎ কোনটাই নেই। ওর মধ্যে ভয়ানক একটা ইন্‌টলারেন্স আছে; ছোটবেলায় বাপ হারালে বা মায়ের ভালবাসার যে পরিমাণ ডোজ পেয়ে ফ্রয়েডীয় থিওরি অনুযায়ী ব্যালেন্স গড়ে ওঠে—তার কিছু কিছু গ্যাপ ওর চরিত্রে রয়েছে। এবং একদিন রেস্তোরাঁয় কাট্‌লেট্‌ খেতে খেতে বলেই ফেলেছিল কথাটা—আমি তোমাকে ভালবাসি, স্বাতী। তুমি কি বোঝ না, কথাটা বলার জন্য বহুদিন ধরে আমি গুমরে মরছি। স্বাতীর কথাটা মনঃপূত হয় নি, একটু সরে বসে বলেছিল—চলো উঠি। ভালবাসার একটুও সময় নেই স্বাতীর—ওটুকুও দিলীপ বুঝতে চায় নি। গবেট।

এই গবেটকে নিয়েই মনের মধ্যে আজ মহা অশান্তি। কারণ মনের খুজলি নানা জাতের; তার চুলকুনিও বড় বিচিত্র। তার ভঙ্গি পালটালেও আসল সুখ বা সুর একইভাবে সুরালোকিত। সেই চুলকুনিতেই দিলীপ তার পুরনো সম্পর্ক রিভাইভ্‌ করার জন্য হালে উঠেপড়ে লেগেছে। প্রায়ই স্বাতীর বাড়িতে গিয়ে দিলীপ বসে থাকছে এবং স্বাতী বাড়িতে না থাকলেও ব্রজেশবাবুকে কশে বোঝাচ্ছে যে স্বাতী যদি এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থিসিস লিখতে থাকে, তাহলে ওর আর ডক্টরেট পাবার কোন চান্স নেই। এসব কথা আমার কানে আসছে এবং আমি ভেবে নিতে বাধ্য হচ্ছি যে দিলীপ সেই টিপিক্যাল্‌ বাঙালী চরিত্র, যে আশু প্রয়োজনে খাবি খায় এবং নিজের প্রয়োজনে সবরকম এথিক্স বিসর্জন দিতে রাজি। আমার একটা চিরকালই ইগো ছিল যে আমি বেশ লম্বা রোপে খেলতে পারি কিন্তু দিলীপের আবির্ভাবে আমার ক্যাল্‌কুলেশন্‌ সব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। দিলীপ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হওয়াতে আমার মনের মধ্যেও কতগুলি 'ফিশন্‌ মেটিরিয়াল' অনবরত বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে; ভদ্রভাষায় একে আমরা মানসিক ভারসাম্যের অভাব বলতে পারি। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য হয়ত একে মানুষের সেই চিরকেলে অধিকারবোধ বলবেন, কারণ অধিকারবোধ ও ক্ষমতাপ্রিয়তার জন্যেই দুনিয়ার পলিটিক্স-এ আজকাল আর সামান্যমাত্র মানবিকতাবোধ নেই; একে অন্যকে কিভাবে এবং কত শীঘ্র গ্রাস ক'রে ফেলবে—এরকম একটা করাপ্ট্‌ রাজনীতি আমরা এই 'মিডিওকার যুগে' চালিয়ে যাচ্ছি এবং তা নিয়েই সবাই কেমন আমরা পাগল ও ব্যস্ত।

আমার একমাত্র ভরসা দিলীপকে স্বাতী ঠিক পছন্দ করে না। শুনেছি এক সময়ে কলেজের অনেক আন্দোলনেই দিলীপ ছিল মাথা এবং তখন নাকি পড়াশুনা ডকে উঠেছিল। এবং কলকাতায় যে-কোন আন্দোলন করতে যেহেতু মস্তান-পলিটিক্সের সাহায্যের প্রয়োজন হয়—সেই কারণেই ও নাকি ঐ বিদ্যাতেও হাত পাকিয়েছিল। এখন অবশ্য ভদ্রলোক হয়ে গেছে এবং তাই সেই বেপরোয়া দৃষ্টি বা মনোভাবও আর নেই। এখনকার মেরুদণ্ডহীনতা আরও ভয়ঙ্কর ; নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোন টোপে এখন পা ফেলতে রাজী। স্বাতীর কথাতে যা ধরতে পারছি, মাছ ছুঁড়ে ফেলে দূর আকাশে শকুনির মত অপেক্ষা করা এবং সময় মত ছোবল মারলেই কার্যসিদ্ধি। এও এক ধরনের আঁতেলেক্‌চুয়াল মস্তানগিরি, বাঁচার আজকাল একমাত্র ওষুধ।

মাঝে মাঝে দু'এক সময় নানা কথার জাল বিস্তার ক'রে আরও কয়েকটি কথা আমি জেনে নিয়েছি স্বাতীর কাছ থেকে। যেমন এরই মধ্যে একদিন ব্রজেশবাবুর কাছে আমার বিরুদ্ধে নানারকম লাগাচ্ছে খবর পেয়ে আমি স্বাতীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—দিলীপ চরিত্রটা তো বেশ জটিল, ঠিক বুঝে ওঠা দায়। স্বাতী গম্ভীর হয়ে বলেছিল—'বড় স্বার্থপর।' আর এ'কদিন—আপনিও দেখছি দিলীপ মুখার্জীর মত এঁড়ে তর্ক করছেন। ওরা, এই দিলীপ মুখার্জীরা, ভারতবর্ষের সেই অগণিত তরুণ—যারা দেখবেন দেশকে গালাগালি দিতে দিতে একদিন সত্যিই বিদেশে চলে যাবে এবং কোন বড় চাকুরে হয়ে পেল্লাই গাড়িতে চড়ে বেড়াবে, প্রচুর মেয়েকে ফ্ল্যার্ট্‌ করবে এবং হঠাৎ কোন শক্ত মেয়ের পাল্লায় পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। ছেলেমেয়ে চাইবে না, কিন্তু তাও যদি একটি ছেলে বা একটি মেয়ে হয়—গর্ব ক'রে বলবে, ওরা দু'জনেই আমেরিকার সিটিজেন। এবং আর দেশে আসা যখন অসম্ভব, নিজেরাও হয়ে যাবে আমেরিকার নাগরিক—। জীবনটাকে যারা এভাবে ভাবে, তাদের কত দুর্ভাগ্য—আমি মাঝে মাঝে ভাবি।

আমি কথাটায় রহস্যজনক হেসে বলেছিলাম—আমি লক্ষ্য করেছি, দিলীপ তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিল, স্বাতী।

—তাই নাকি, কী ক'রে জানলেন ?

—চোখ দেখলে বুঝি কোন্ পর্যায়ে তার ভাব-ভালবাসা।

—আপনার ট্যালেন্ট বহুমুখী। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, আপনি

আজকাল দিলীপ সম্পর্কে ওরকম ফিউরিয়্যাস্ হয়ে উঠলেন যে— ? আর আমি কথা বাড়াতে সাহস পাই নি সেদিন।

আগের শোনা কাহিনী ও ইদানীংকালের দিলীপের আবির্ভাব ও তার প্রকাশ জুড়তে জুড়তে আর একটা কথা আলতোভাবে ছুঁড়ে দিলাম আর একদিন—দিলীপ যে তোমাকে ভালবাসে, কোনদিন বলে নি ?

—বলেছে, লাইব্রেরীতে যেতে যেতে কিংবা আমি হয়ত তন্ময় হয়ে কিছু নিয়ে ভাবছি তখন, এই সেদিনও, আমার খুব বিরক্ত লাগে জানেন—এবং বলতে দ্বিধা নেই, আপনি আসার পরে এই উৎপাত অনেক কমে গিয়েছিল। আবার শুরু করেছে—মুশকিল কি জানেন, ওর সিচুয়েশনের বোধ একেবারে নেই। একেবারে নিরেট ও মূর্খ।

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠেছিলাম, কারণ যদিও আমার মনে তখন অনেক দিনের অনেক ছবি ভেসে উঠেছিল, আমি ভাবছিলাম থিসিস ছাড়া স্বাতী ও অমরেশ সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আর তখনই একটা পারস্পেক্টিভ্ প্ল্যান তৈরী ক'রে ভাবছি—আমার এরকমই একটা 'ডামি' চরিত্র দরকার—যে আমার উদ্দেশ্য বুঝবে না, অথচ আমার হাতে খেলবে।

স্বাতীর সঙ্গে আমার এই স্বাভাবিক সম্পর্কটাকে দিলীপ শুনেছি 'অন্যায়' অধিকার বলে আখ্যা দিয়েছে এবং ওর মুভমেন্ট বুঝতে পারছি ও একেবারে 'এটাকে' বরদাস্ত করতে পারছে না। ভাবখানা এমন, স্বাতীতে জীবনে না পাক তাও সই ; কিন্তু স্বাতীর মন বিষিয়ে না দিলে বাঙালী রোমান্টিকতার কতটুকুই বা মূল্য ; জাতেই বা উঠবে কী ক'রে ? আমি এসবের কার্য-কারণ নিয়ে ভাবছি এবং কোথায়, কখন এবং কি অবস্থায়, আমাকে কী করতে হবে, তা নিয়ে তলিয়ে দেখতে বাধ্য হচ্ছি। একটার সঙ্গে অন্যটার কী সম্পর্ক, এই ব্যাপারটা একটু ঝালাই করে নিচ্ছি। দিলীপ তরুণ, অ্যামবিশাস্। স্বাতীকে ভালবাসা ওর পক্ষে স্বাভাবিক এবং আমি যদি সেই পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াই, সেই কাঁটা সে তুলবেই। যেভাবেই হোক—দরকার হলে আমি জানি গর্হিত কোন উপায়েও—যেভাবে পলিটিক্যাল ফোর্স রাজনীতির প্রয়োজনে আজকাল মস্তানদের কাজে লাগায় এবং মস্তানরা একটার পর আরেকটা, কার্যসিদ্ধি ক'রে মূল রাজনৈতিক দলেই একদিন আসন গেঁড়ে বসে,—প্রয়োজনে তাতেই বা আপত্তি কোথায় ?

দিলীপ চরিত্রের এ-দিকটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভদ্রলোক সেজেও কী কারণে ও মস্তানদের লিফট দেয় বা ঐ ইমেজটা ভদ্রলোকের পক্ষে খুব একটা সুনামের সহায়ক নয় জেনেও তাদের মধ্যে দু'এক সময় ওকে দেখা যায় কেন—এ নিয়ে রবি চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু স্বাতী ছাড়া দিলীপের ব্যাপার নিয়ে খুব বেশী লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে যাওয়া একটু রিস্কি। আসলে পরদেশী বলেই মস্তানগিরিতে হয়ত একটু বেশী ভয়, নয়ত বস্তির পাশেই বুলবুলেরা বেশ আছে; গুণ্ডাগিরি, রক্ত-পাত আর বোমা বিস্ফোরণের মধ্যেই তো ওরা দিব্যি মজা ক'রে সিনেমায় ঘুরে আসে। ছোটবেলায় খুলনায় দেখেছি শম্ভুদা বিভাসদার ওপর হান্টার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত; সবাই ভদ্রলোকের ছেলে কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে ওভাবে রক্তপাত ও সায়েস্তা করার অভিযানে কেউ কারুর পিছপাও হত না। এখানে সেরকম কিছু যদি দিলীপ ক'রে বসে, আমার খুব ভয়—আমি পূর্ব-বাংলার বাঙাল্ হয়েও তখন যে কী করব—কিভাবে আমার প্রেসটিজ বাঁচাব, ভেবে পাচ্ছি না।

যত ভেবে পেলাম না, তত কতগুলো অজানা, বইয়ে পড়া এবং কল্পিত চরিত্র আমার চারপাশে ঘুরতে থাকল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ঘরের দরজা ঠেলে একটা কল্পিত মস্তান আমার সামনে একটা লক্‌লকে ছোরা বুকের সামনে তুলে ধরেছে। কোমরে মোটা বেল্ট্, চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত চোখ দু'টো দেখে আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে যেতে থাকল। তার সমস্ত শরীরে দেখলাম বিরাট বিরাট কয়েকটা পোষ্টার। তাতে লেখা পশ্চিমবঙ্গ—১৯৬৭ সাল। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ৬৭ সালের শিল্প-মন্দার শীতল প্রবাহে ঐ রক্ত চক্ষুর জন্ম। সেইসব বিরাট বিরাট পোস্টারে আরও অনেক অজানা সব কথা লেখা। ভয়ে সমস্ত শরীর আমার কাঁপছিল। সব কথা আমি খুঁটিয়ে পড়তে না পারলেও দেখলাম তাতে লেখা আছে—১৯৪৭ সাল শিক্ষার জগতে মন্দা। সেবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা শহর ছাড়া) ৭৫ হাজার ছেলেমেয়ে নাকি শেষবারের মত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল। মনে পড়ে? কে কাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। ৭০ সালে স্কুল ফাইনালে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় দু'লক্ষ। তারপর থেকে সংখ্যাটা প্রতি বছর বাড়ছেই। সেই বছরেই 'ঘেরাও' আন্দোলনের জন্ম। অত

ছেলেমেয়ের মধ্যে ইউনিভারসিটিতে ক'জন মাত্র জায়গা পেয়েছিল, জানেন? গড়পড়তা হিসাবটা কি মনে পড়ছে? পাঁচ হাজার গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যদি এক হাজারের জায়গা হত—তবে তো আপনি ভাগ্যবান। বিজ্ঞানের নানা বিভাগে অবস্থা কি ততদিনে আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে নি? কে যেন অববরত প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম, দিলীপ মুখার্জী হয়ত পোষ্টার মাথায় ক'রে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে—এবং আমি তারই অভিনীত নাটক দেখছি। —তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই ত্রিশ লক্ষ লোক বেকার ছিল। সরকারী হিসাব চিরকালই কম, পনেরো লক্ষ। ১৯৭০ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা মরিয়া হয়ে চাকরীর জন্য ধর্ণা দিয়েছিল, দিল্লীর লোক তো. আপনি, কিছুই তো খবর রাখেন না—সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল, পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজারে। এ সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—কখনও ভাবেন? এরা কেউ সুস্থ আলো-বাতাস পেয়ে মানুষ হয়ে ওঠে নি। ১৯৫৭-৫৮ সালে শতকরা চুয়ান্ন ভাগ লোক কলকাতায় মাত্র ত্রিশ বর্গফুট এলাকায় কোনমতে মুখ গুঁজে থেকেছে। দিল্লীর স্কাইস্ক্র্যাপারের অধিবাসী কি ভাবতে পারবে? এদের ছেলেমেয়েরা তখন ঐ অবস্থায় ঘরের বাইরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হত; অর্থাৎ বাইরের মুক্ত আকাশেই এরা মানুষ। এ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে থাকতে বাধ্য হয়েই তার থেকে জন্ম নিল মস্তান, না হয় বেশ্যা। লোকটা যেন কোন পট দেখিয়ে দেখিয়ে আমার ইতিহাসচেতনা বাড়াতে চাইছে। এবং ঘুরে ঘুরে পোষ্টার দেখিয়ে যাচ্ছে অদ্ভুত এক জাদুকরের মত। যা ঘটে যাচ্ছে, আমি বাধা দিতে সাহস পাচ্ছি না।

অন্য একটা পোস্টারে লেখা: 'কলকাতার মাত্র সাত ভাগ লোক ফ্ল্যাট্ বা আলাদা বাড়িতে থাকার সুবিধে পায়।' '—৫৮ ভাগ লোক একটি ঘরে কোনমতে পড়ে থাকে।' '—তিন হাজার বস্তিতে আট লক্ষেরও বেশী লোক থাকে।' '—নিত্যকর্মের জন্য কমন্ মিউনিসিপ্যালিটির পায়খানা—সেখানেও লাইন।' ভাবতে পারেন?

—আমরা মস্তানদের নিয়েও সমীক্ষা করেছি। এগুলি আপনাদের জানা দরকার। মস্তানদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত, বেশী পড়াশুনা হয় নি। যদিও দু'একজন কবিতা লেখে, গান গায়, খেলা দেখে, দু'একজন খেলেও, প্রচুর কিক্ চায় এবং তার জন্য প্রচুর পরিমাণে মদ গেলে এবং প্রায় প্রত্যেকেই বেশ্যাসক্ত। দু'একজন ভাগান মেয়েমানুষকেই বিয়ে-সাদী করে। মেয়েমানুষ

সম্পর্কে নির্বিকার এমন মস্তান লক্ষ্যণীয়ভাবে কম। এরা একটা গ্যাঙ্ হিসেবে পাড়ায় পাড়ায় প্রথমে হাত পাকায় এবং কম্পিটিশনে ও অ্যাক্শনে জয়ী হয়ে হয়ে ক্রমে ক্রমে প্রমোশন্ পেয়ে একেবারে 'দাদা' হয়ে যায়। যেহেতু প্রতিটি অ্যাক্শনের একটা রিঅ্যাক্শন আছে, তাই যাদের জন্য অ্যাক্শন—তাঁদের কাছেই প্রটেক্শনের আশ্বাস। সূত্রপাত হয়েছিল বেকারী থেকে কিন্তু এর বিকাশ হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সা, লোভ ও অধিকারকে কুক্ষিগত ক'রে রাখার প্রয়োজনে। জন্ম এদের যেভাবেই হোক, নানা কারণে এরাই আজকাল রাজনীতির লেজ ধরে টানাটানি করছে। রাজনীতিটা এদের কাছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটা মাধ্যম।

পট্, মানে পোস্টারটা এবার ঘুরে গেল। এবার তাতে সিনেমার পর্দার মত কে যেন বড় বড় হরফে লিখে দিল হেডিং ঃ মস্তানগিরির লিডারশীপ্ ঃ বয়স ২১ থেকে ২৪। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রধর এসে বললেন—সবার চেহারা যে মস্তানদের মত, তা কিন্তু নয়। ও ভুলটি করবেন না, দিল্লীর লোক তো, সাবধান ক'রে দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। মাঝারি গড়নের তরুণই বেশী। এরা বেশীর ভাগ বোমা বা ছোরা ব্যবহার ক'রে। ধরুন, আমরা দেড়শো জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, তাদের মধ্যে ৯৮ জনের অস্ত্র হয় বোমা, না হয় ছোরা। রিভল্ভার হলে তো জাতে উঠে গেল—তবে এদের মধ্যে আমরা শুধু তিন জনের কাছে রিভল্ভার দেখেছি তবে সোডার বোতল ছুঁড়তে ওস্তাদ দেখেছি ১৫ জনকে। আগে আগে এরা ছোটখাট একটা চাকরী হয়ত করত কিন্তু মস্তানগিরি যখন সমাজের সর্বস্তরে সমাদৃত হতে থাকল—তখন তাদের এ ধরনের কোন মামুলি দাসত্ব করার আর প্রয়োজন রইল না।

এই দুই রক্তচক্ষুর মধ্যে আমি এত কথা খুঁজে পেলাম বা কেউ আমাকে বলে গেল কিনা জানি না। কিংবা এও হতে পারে লাইব্রেরীতে নানা সমীক্ষার রিপোর্ট যখন ঘাঁটতাম—তার মধ্যে থেকে যে রিপোর্টটা আমাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল, সেটা হয়ত পর পর আমিই ভেবে নিচ্ছিলাম। চিন্তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ আমরা যেরকম মানুষ দেখি, স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায়—সেরকম কিছু ঘটাও আশ্চর্যের নয়। ভেবে একটু সুস্থির হয়ে নড়েচড়ে বসেছি, আবার একটা রক্তচক্ষুর আবির্ভাব। হাতে একটা রুমাল, টের পাচ্ছি রুমালের নীচে একটা ভেল্কিবাজ টয় রিভল্ভার। মনের

যে অবস্থায় দড়িটাকে সাপ মনে হয়, আমারও ঠিক সেই অবস্থা। তাই টয় হোক বা প্রকৃত রিভল্ভার—ভয় পেয়ে হাত-পা শিটে যাবারই কথা—পেছনে আর একটা লোক—তারও হাতে একটা রুমাল এবং অন্য কোন অস্ত্রে সজ্জিত তার সাকরেদ। আমার সামনে জীবন-পণ ক'রে ছোরা ধরে দাঁড়িয়ে—বলছে, আ-বে, বাঙালীর কি হল না হল—তা বে তোর তাতে কী শালা? তুই শালা দিল্লীর মাল হয়ে সি, পি, আই, এম, স্যাজবার বৃথা চেষ্টা ক্যরছো গুরু—সব্ টের পেয়েছি। তুই শালা সি, আই, এ,-র এজেন্ট—ভাল চাস ত স্বাতী-ফ্যাতি ছেড়ে কেটে পড় হারামী। কাজল বৌদিকে লুকিয়ে কলকাতায় খুব মস্তানি ক'রে বেড়াচ্ছ, না? একবার রগড়া খেলে স্যব্ ঠিক হয়ে যাবে—কেমন? মস্তান বলল—শুনুন—দু'রাত্রির মধ্যে কেটে পড়ব্যেন্, বাঙ্গালজাত প্যারাসাইটিক্ কিংবা নয়, ওসব গুলতানি দিয়ে বেড়াছেন কেন? প্রডাক্টিভ্ এফর্ট হ'ল কিংবা গেল—অত স্যব্ না ভেবে ভাল চান ত—বুঝলেন, স্বাতির পথ ছেড়ে বাপ্ বাপ্ ব্যলে কেটে পড়ুন—ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম।

বাংলার বিষয় নিয়ে কিছু বলা বা ভাবা সত্যিই খুব রিস্কি এবং একটু বোধহয় মুশকিল। পদে পদে শহীদ হবার ভয়।

আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে অকারণে বড় দুশ্চিন্তা করছি। মনটাই বোধহয় মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। যার বা যাদের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই, যে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে, অপেক্ষা করলে, সময় বাঁচে, সুবিধা হয়, এবং খেলাটা একটু জমে ওঠে—সে-ই আগেভাগে এসে দরজায় কড়া নাড়ে এবং মনটাকে আশু প্রয়োজনে কাজে লাগায়। বড় পাজি এই মন; হাতের একবার বাইরে চলে গেলে মনটাই নিজের পরম শত্রু। নয়ত এখন তন্ময় হয়ে শুধু স্বাতীর কথা ভাবা উচিত ছিল। নিজের হাতের তৈরী গাছটার ফল, যদি ফলবতী হয়, ফলটাকে পেড়ে আগে মুখে পুরতে ইচ্ছা যায়। যদিও ম্যারেড্ লোকের পক্ষে অন্য নারীর সঙ্গ, নারীর ছবি, এবং মনে মনে অন্য নারীর সঙ্গে সংগমও পাপ। ক্ষতি হয়, আস্তে আস্তে মনটা নেমে যায়। এটা কাজলের কথা, আমার মনে মনে সারাক্ষণ জপ করা উচিত ছিল।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিলাম। কথা আছে স্বাতী আসবে এবং আমরা মুড বুঝে ঠিক করব, ঘরে বসে 'পেয়ার' করব কিংবা বাইরে। স্বাতী কখন আসবে জানি না, কিন্তু সারা বাড়িতে ওকে চলে ফিরে বেড়াতে

দেখছি, মাঝে মাঝে ওকে টেনে ধরছি বুকে। ও হাসছে—বলছে, খুব যে প্রেম গজিয়েছে, বলেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, টক্ ক'রে হাতটা লেগে গেল নরম বুকে—জীবনরসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল আমার সমস্ত সত্তা। স্বাতীর নগ্ন এবং অপূর্ব স্কাল্পচার আমি দেখলাম এবং মনে মনে ওকে কিভাবে ভোগ করলাম, বিবাহিত পুরুষের পক্ষে না বলাই ভাল। পাশে ফিরে শুয়ে শুয়ে মনে মনে যখন সংগম করছি আর ভাবছি কি অসাধারণ এই ক্রিয়েটিভ্ আর প্রডাক্টিভ ফোর্স—ঠিক তখনই, স্বাতী এসে হাজির। আমি তাড়াতাড়ি স্বপ্নের বা মনের স্বাতীকে ছেড়ে কাপড়জামা পরে নিলাম। আমার নগ্ন রূপটা স্বাতী দেখে নিল কি না জানি না। ওর কাছে আমি অনেক কষ্টে, এখনও, এই পর্যায়েও খুব সাক্সেস্ফুলি ভাল মানুষ সেজে আছি। বাঙালী মধ্যবিত্ত বলেই আমার এত ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলাম।

স্বাতী বলল—কি ব্যাপার? হাততালি দিয়ে ওঠার মত তো সাজি নি।

—না সাজলেও তোমাকে অপূর্ব লাগে—

—ওটা আপনার দেখার ক্ষমতা।

—না, আমি স্মরণ করলাম, ওটা বাঙালীর চিরকেলে ক্রিয়েটিভ্ ফোর্স।

—তা, ওটা প্রডাক্টিভ্ ফোর্স কিনা, সে বিচারই আজ আমরা করবো।

—চা, না কফি? আমি শুধোলাম।

—দুটোই। স্বাতী হেসে বলল।

—যেমন আমার জীবন, কাউকে ছেড়ে কাউকে নয়।

—হ্যাঁ, পুরুষ জাতটার পক্ষে ওস্তাদের শেষ মার; মজা লুটতে ভারি মজা, না? বড় স্বার্থপর, এই পুরুষ নামক শিকারী।

—এই স্বার্থপরতা নিয়েই তোমাদের মত বিচিত্র শিকারকে শরাঘাতে বিদ্ধ করতে পারি, নয়ত চিরকাল বঞ্চিত হয়েই থাকতে হত।

স্বাতী হাসল। আমিও তখন শরাঘাত করতে এগিয়ে গেলাম—স্বাতীকে কাছে টেনে গভীরভাবে চুমু খেলাম। শরীরে কি ভয়ঙ্কর লোভ, এবং কি ভয়ঙ্কর অতৃপ্ত তৃষ্ণা। লিচু খাবার মত একটার পর আরেকটা খাচ্ছি তো খাচ্ছিই।

অতঃপর স্বাতী বলল—হয়েছে, এবার ছাড়ুন। বলুন, আজকে আমরা কোথায় যাব?

—এখানেই ভাল, এই ঘরে। কথার আড়ালে প্রেম করা যাবে।

স্বাতী বলল—আজকে যে বড় প্রেস্‌টিজ্‌টাকে শিকেয় তুলে রাখছেন—কি হল আপনার?

—বিচ্ছেদের রিয়্যাক্‌শান্‌।

—কে আবার বিচ্ছেদ ঘটাল?

—দিলীপ মুখার্জী।

—ও, তাই বলুন। থাক্‌। ওর কথা আজ নয়, অন্য দিন।

—তবে এসো, আবার আমরা ভালবাসা-বাসি খেলি। তোমাকে আজ আমি আর ছাড়বো না, সাপের মত জড়িয়ে থাকবো।

স্বাতী বলল—আর আমাকে কষ্ট দেবেন না, বলুন।

—সে কী, কষ্ট দিয়েছি?

—হ্যাঁ, অনেক।

স্বাতী আমাকে কতটা ভালবাসে, সেই প্রথম টের পেলাম। ততক্ষণে ঝোলা ব্যাগ থেকে স্বাতী তার থিসিস বার করেছে। সব ভুলে, ওর ভাবনা-রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি, —এতক্ষণ যাকে শরীরে পেতে চাইছিলাম, সে এখন আস্তে আস্তে আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে থাকল। আমি পড়ছি, স্বাতী একবার বাধা দেবার চেষ্টা করল—বলল, পরে পড়বেন না হয়, কিন্তু আমি ডুবে যেতে থাকলাম এবং বললাম, একটা কাজ কর, তুমি রবি চৌধুরীর ঘরে গিয়ে বোস, এই চ্যাপ্টারটা পড়ে আমি এক্ষুনি আসছি। পরিচিত চ্যাপ্টারগুলি আমি উল্টেপাল্টে যাচ্ছি। একটা জায়গায় এসে আটকে গেলাম, —যেখানে স্বাতী বাঙালীর প্রডাক্‌টিভ্‌ এফর্টের মূল সূত্রগুলো সারা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছে, কোথায় এবং কেন বাঙালী পিছিয়ে পড়ছে। এবং রণতরী দেশ থেকে উচ্ছেদ হবার পেছনে রয়েছে একটা দেশকে সব দিক দিয়ে শোষণ ক'রে অন্য একটি ঔপনিবেশিক দেশকে সমৃদ্ধ করার ইতিহাস। টের পাচ্ছি, স্বাতী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার এক মুহূর্ত আগের 'আমির' সঙ্গে এ আমির কোন মিল খুঁজে না পেয়ে হয়ত একটু অবাক হয়েছে ও, হয়ত ভাবছে, ভালবাসায় পড়লে মানুষ সত্যি কি অন্যের জিনিস নিজের বলেই ভাবে?

থিসিসটা আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যেতে থাকলাম। আবার কয়েকটা লাইনের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম লেখা আছে: লর্ড ওয়েলেসলি অষ্টাদশ

শতাব্দীর প্রথমে যে-কথা বিলেতকে জানিয়েছিলেন, জাহাজ তৈরীর সেই সমৃদ্ধ চিত্র পরবর্তীকালে আর দেখা গেল না। এতেই তিনি বাংলার জাহাজ তৈরী শিল্পের তারিফ করে বলেছিলেন, 'কলকাতা বন্দরে দশ হাজার টনী জাহাজ চলাফেরা করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না'।

স্বাতী কখন রবি চৌধুরীর ঘরের দিকে চলে গেছে. কিছুই টের পাই নি। থিসিসটা খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। স্বাতীর ভাবনা-রাজ্যে প্রবেশ ক'রে শরীর-চেতনা কেমন যেন কর্পূরের মত উবে যায়; ধূপের গন্ধ ছড়ায়। যেন কোন গানের সুরের মত মানুষটার চেয়ে তখন সুরালোকিত জগৎটা আমাকে ভুলিয়ে রাখে বেশী।

॥ তেইশ ॥

স্বাতী যা ওর থিসিসে বলতে চায় তা এখন গোটা চ্যাপ্টারটা পড়ে ভাববার চেষ্টা করছি। এটাই শেষ পরিচ্ছেদ, এবং এটার ওপরেই ওর থিসিসের গুরুত্ব। স্বাতী দু'টো জিনিস দেখিয়েছে : এক, ব্রিটিশ পারস্পেকটিভ্ প্ল্যান কাকে বলে, একটার সঙ্গে অপরটা কিভাবে জড়িত। আর দ্বিতীয়, সেই প্ল্যানটা সামনে রেখে ওরা কিভাবে এগিয়েছে। এবং মজার কথা, এগোবার আগে, কোন্ প্ল্যানের কি রেজাল্ট্ হবে তা তারা আগে থেকে জানতে পারছে।

যেমন জাহাজ শিল্প এমন এক সমৃদ্ধ শিল্প, যা একদিনে গড়ে উঠতে পারে না; তার জন্য চাই বহুদিনের বিস্তৃত প্রস্তুতি। ব্যবসা-বাণিজ্য সব দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেই একটি দেশের জাহাজ শিল্প গড়ে উঠতে পারে এবং ভারতে বস্ত্র শিল্প, লোহা, তামা ইত্যাদির বিকাশই জাহাজ শিল্পের বিকাশের নিদর্শন। ডি, এইচ, বুকাননের বই, 'ডেভেলপ্‌মেণ্ট অব্ ক্যাপিটালিস্ট এ্যানটারপ্রাইজ্ ইন্ ইণ্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাতী দেখিয়েছে যে, নানা অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কাজে লোহা ভারতে ব্যবহৃত হত। এত ভাল লোহা কি ক'রে তৈরী হত তা বাস্তবিকই আশ্চর্য। দিল্লীর কুতুব মিনারের পিলার পঞ্চম শতাব্দীর তৈরী এবং ওজন ছয় টন। এত বিশাল লোহা ঢালাই কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল কেউ জানে না। যেসব লোহা ঢালাইয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাতেও লোহার বিস্তৃত ব্যবহার প্রমাণ হয়। ও দেখিয়েছে যে কারণে এবং যে-অবস্থায় ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্র শিল্প একদিন দেশ থেকে লোপাট্ হয়ে গিয়েছিল, সে একই ইতিহাস জাহাজ শিল্পের। কারণ বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্প ধ্বংস না করলে জাহাজ শিল্পকেও নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। একেই স্বাতী ব্রিটিশদের পারস্পেকৃটিভ প্ল্যান আখ্যা দিয়েছে।

এই একই লাইন ধরে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেও এগিয়েছে। ১৭৬৫ সালেও ভারতবর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা গ্রামের চিত্র আমরা পাই। মাদ্রাজের চারটি 'সরকার' অঞ্চলের যে রিপোর্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হয় সেইসব স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিকে ধ্বংস করতে না পারলে বস্ত্রশিল্প বা অন্যান্য

শিল্পকে ধ্বংস করা যায় না। সুতরাং বাংলার গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল, সে সম্বন্ধে উইলিয়ম বোল্টস্ 'কন্‌সিডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ারস'-এ বলেছেন,—'বাংলাদেশে ইংরেজদের বাণিজ্যকে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্যাবলী বলে উল্লেখ করলে সত্যের অপলাপ হয় না। ...কোন্ শিল্পীকে কত মাল, কিরকম দামে সরবরাহ করতে হবে ইংরেজরাই তা ইচ্ছেমত ঠিক ক'রে দেয়। এজন্য দালাল, পাইকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সেপাইর সাহায্যে কোম্পানীর ভৃত্যদের কাছে হাজির করা হয় এবং মালপত্রের পরিমাণ, মূল্য ও মাল দেবার সময় একটা দলিলে নিজেদের সুবিধেমত শর্ত লিখে তাতে শিল্পীদের সই নেওয়া হয়। ...তারপর কাছারীর সেপাইরা চাবুক মারতে মারতে তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ...যেসব তন্তুবায় চুক্তিপত্র অনুসারে মাল দিতে অসমর্থ হয়, তাদের ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি ক'রে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হয়। পাছে কোম্পানীর লোকেরা এদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে কাপড় বুনতে বাধ্য করে, সেই ভয়ে অনেকে নিজেদের বুড়ো আঙ্গুলটি কেটে ফেলে অক্ষম সেজে থাকত।'

'দেশের কথায়' সখারাম গণেশ দেউস্কর তাই দুঃখ করেছেন—'ইংরেজ বণিকের স্বার্থপরতায় দেশের এই বিশাল বাণিজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাই, এখন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকে 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে।'

ঐতিহাসিক উইলসন্ বলেছেন—'ভারতীয় শিল্পের বিলোপ সাধনের জন্য এরকম গর্হিত উপায় অবলম্বন করা না হলে ম্যান্‌চেস্টার ও পায়েসলির কাপড়ের কলগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত। ...ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ সাধন করেই বিলেতী কলগুলিকে সজীব রাখা হয়েছে।...'

আমি ব্রিটিশ পারস্পেক্‌টিভ প্ল্যানটা মাথায় রেখে আবার যখন থিসিসটা পড়ছি আমারও যেন চোখ খুলে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়, যা করা হচ্ছে সবই মাথায়, একটা উদ্দেশ্য রেখে।

মীরকাশিম ১৭৬২ সালে ইংরেজ গভর্নরকে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন—'...প্রত্যেক পরগণায়, প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে এরা (কোম্পানীর গোমস্তারা) জিনিসপত্র কেনে আর বেচে। রায়ত ও বণিকদের কাছ থেকে এরা জোর ক'রে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং দাম দেয় চার ভাগের এক ভাগ...। বেচবার সময় তাদের জিনিস

এদের ওপরে চাপিয়ে দেয় এবং অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ও মেরে-ধরে এক টাকার জিনিসের জন্য পাঁচ টাকা আদায় করে...। কোন কর দেয় না... এভাবে বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার লোকসান হচ্ছে (আমার অফিসাররা এদের কিছু বলতে পারে না, কিছু করতে পারে না)।'

এভাবে বাংলা ও সারা ভারতের শিল্প-গৌরব ও আর্থিক বুনিয়াদকে ধ্বংস করা হল। করা হল একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে। যারা বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করল না, যারা রুখে দাঁড়াল না, তারা বুঝল না, ভবিষ্যতে কে কার গলা টিপে সমৃদ্ধ হতে চাইছে। যারা প্রতিবাদ করল না, তারা এই অত্যাচারের অংশীদার হতে পেরে হঠাৎ ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। গোমস্তা, পিওন, পাইকার আর 'কাল-রঙা ভূত' বা বেনিয়ানদের অত্যাচার ও তাদের এই অমানুষিক ক্ষমতা দেখে সাহেবরাও মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ তৃতীয়বার ও শেষবারের জন্য এসে যা দেখেছিলেন, তার কিছুটা সংশোধন করার শেষ চেষ্টা করেন। তিনি কোর্ট অব ডাইরেকটরদের কাছে যে চিঠি লেখেন, তাতে কিছু সত্য উক্তি রয়ে গেছে। তিনি স্বীকার করেছেন—'কোম্পানীর ভৃত্যেরা বা অসংখ্য কালো এজেন্ট বা সাব-এজেন্ট যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে আমার আশঙ্কা, এটা ইংরেজদের পক্ষে চিরকালের একটা কলঙ্ক হয়ে থাকবে।'

তাই মিঃ ব্রুকস্ অ্যাডামস্ মন্তব্য করেছিলেন, '১৭৫৯ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে (ব্রিটেনে) যে দ্রুতগতিতে পরিবর্তন আসে, তা ভাবা যায় না। ১৬৯৪ থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল খুবই কম ; ১৭৬০ সালেও বার্ক লিখেছেন, তার দশ বছর আগে, তিনি মাত্র ১২টি ব্যাঙ্ক দেখেছিলেন অথচ "বাংলার রত্ন" আসার পরে প্রত্যেকটি মার্কেট টাউনে একটি ক'রে ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে।'

থিসিসের সাইডে সাইডে স্বাতীর উক্তি। ওর এই ভাবনা-রাজ্যের কথা থিসিস যাঁরা পড়বেন, কেউ জানতেও পারবেন না। এগুলো পড়তেই আমার বেশী ভাল লাগছে। এক জায়গায় স্বাতী লিখেছে—নৃশংস বণিক ইংরেজদের কথা পড়ে আমার রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ওঠে। সখারাম গণেশ দেউস্কর 'দেশের কথায়' নন্দকুমার নামে এক সাহসী ব্রাহ্মণের কথা লিখেছেন—তিনি তাঁতিদের ঐ দুর্দশার দিনে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বোঝাতে চেয়েছিলেন

ব্রিটিশরা তাদের কলের ঘানিতে জুড়ে তাদের কত বড় সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি এই সেই নন্দকুমার যিনি ইংরেজদের উৎখাত করার আরও এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। মারাঠাদের নিয়ে ইংরেজদের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। পারেন নি, ধরা পড়ে যান। নন্দকুমার সম্পর্কে দেউস্কর যেটুকু লিখেছেন, সেটাই তাঁর আসল রূপ—তাঁর প্রতিবাদী সত্তা। সারা দেশে যখন প্রতিবাদ করার লোক ছিল না, তাঁতিদের ধরে ধরে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুলালরা অত্যাচারের ত্রাহিনাদ ছাড়ছেন গ্রামে-গঞ্জে, তখন একটিমাত্র মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন—সম্ভবতঃ একা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সেই একটি প্রতিবাদী প্রাণ চিরকালের মত নিশ্চুপ হয়ে গেল। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মানুষটির প্রতিবাদী উজ্জ্বল মুখখানা মনে পড়ছে।

আমার মনে পড়ে গেল, নন্দকুমারকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়, কলকাতার সব ব্রাহ্মণরা এ দৃশ্য দেখে অপবিত্র হবার ভয়ে গঙ্গার ওপারে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বাতীর কিছু কিছু উক্তির মধ্যে আমি ব্রিটিশদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার ষড়যন্ত্র বা সংগ্রাম দেখতে পাচ্ছি। এগুলি যদি থিসিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে, তাহলে ইতিহাসের মধ্যে ও যে নতুন একটা দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে--সেটা মোটেই ফুটবে না। অর্থাৎ থিসিসটা খুব 'ডাল্' লাগবে এবং ডাইমেন্শন্ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওর বোধহয় কিছু কিছু জিনিস আবার নতুন ক'রে লেখা উচিত। যেমন গ্রাম ধ্বংস না করলে হস্তশিল্প বা অন্যান্য শিল্প ধ্বংস করা যায় না; জাহাজ শিল্পকেও লোপাট করা সম্ভব নয়; এবং গ্রামকে ধ্বংস করতেই চালু করা হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পুরনো জমিদারদের উচ্ছেদ না করলে নতুন কোন জমিদার শ্রেণী তৈরী করা অসম্ভব, তাই শুরু হল প্রচণ্ড বর্ধিত হারে এবং নির্দিষ্ট দিনে জমির খাজনা নেবার রেওয়াজ এবং 'দেবী সিং'-এর মত অনেক বেনিয়ানকে ডেকে বলা হল—তোমরা পাশবিক অত্যাচারের এক নতুন ইতিহাস রচনা কর। আমার মনে পড়ে গেল, রমেশ দত্ত, তাঁর 'ইকনমিক্ হিস্ট্রি' বইয়ে এই সব অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। দেবী সিং-ই ছিল সবচেয়ে সুযোগ্য লোক। নতুন দায়িত্ব পেয়ে জমিদারদের ওপর শুধু যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, তাই নয়, তাঁদের অনেককে জেলে পর্যন্ত পুরে রেখেছিল। সেপাইদের দিয়ে কৃষকদের ওপর এমন নৃশংস

অত্যাচার করেছিল যে তারা যখন ভয়ে গ্রাম-কে-গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে, সশস্ত্র সেপাইরা তাদের পথে এসে দাঁড়িয়ে পড়ত। তারা তখন জংগলে পালাত কিংবা উপায়ান্তর না দেখে বিদ্রোহ করত। পরবর্তীকালে দেবী সিং-এর মত অনেকে যে এত টাকা করেছিল, তার পেছনে মোটামুটি এই ইতিহাস। একটু যারা টাকাপয়সা করেছিল, তারাই জমি কিনেছে, কারণ জমিতে কিছু না করলেও দিব্যি আয় হয় এবং সব সময় নিজে গ্রামে না থাকলেও চলে। জমিতে পুঁজি নিয়োগ করলে মোটামুটি করমুক্ত আয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত; তবে আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ঝুঁকি অকারণ নেওয়া কেন?

কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালালে ব্রিটিশরা দেখেও না দেখার ভান করত। সব দিক থেকেই ছিল এদের পোয়াবারো। দেখা গেল, দেবী সিং অনেকের মতই বিরাট ল্যাণ্ড জেন্ট্রি হয়ে গেছে এবং এই যাদের কলঙ্কিত ইতিহাস, তারা টাকা ক'রে সেই টাকা কোন সময়েই যে প্রডাকটিভ্ চ্যানেলে লাগাবে না, সে ত জানা কথা (অথচ টাটাদের মত কয়েকজনও ছিলেন মস্ত বড় ল্যাণ্ড জেন্ট্রি, কিন্তু সেই যুগে, ব্রিটিশদের অত বাধা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালেই আয়রণ এ্যণ্ড ষ্টিল গড়ে তোলেন; শিল্প প্রসারে এঁদের ভূমিকা কিংবদন্তীর মত লাগে)। অর্থাৎ পুরানোকে উচ্ছেদ না করলে নতুন জমিদার শ্রেণী গড়ে তোলা যায় না এবং ইনসেনটিভ্ না দিলে লোকেরা টাকাটা জমিতে ইন্‌ভেস্ট করবে কেন? তাই নানারকম সুবিধে দেওয়া হল। এক, যত ইচ্ছে অত্যাচার কর, ব্রিটিশ সরকার দেখেও দেখবে না। জমিদার যদি হাজারো পত্তনিদার বসায়, আইনে বাধা থাকলেও কিছু বলা হবে না। পুরনো কৃষকদের উচ্ছেদ ক'রে যদি বেশী খাজনায় নতুন কৃষক বসান হয়—তাতেও কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। কৃষকরা যদি বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, জমিদার বা মহাজনদের এক কথায়, ব্রিটিশ সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করা হবে। ১৮৫৩ সালে ব্রিটিশরা লোক দেখাতে কৃষকদের উচ্ছেদ বন্ধ করার আইন-ফাইন করেছিল বটে কিন্তু ততদিনে ওদের রাজ্য শাসন সুরক্ষায়, জমিদারদের অবদান স্মরণীয় হয়ে গেছে। সুতরাং জমিদারদের বিরুদ্ধে কিছু করা ওদের স্বার্থ পূরণের আর সহায়ক ছিল না। অন্য দিকে জমিকে যদি লাভদায়ক বিনিয়োগের ক্ষেত্র না বানান যায়, তবে যে উদ্বৃত্ত টাকা এই শ্রেণীর কাছে আসছে—সেটাকে এরা শিল্প-প্রসারে ব্যয় করবে—। সেটাও তো ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী। ওটাও তারা হতে দিল না। তাই

সেদিন শত প্রতিবাদ এবং শিল্পপতিদের শত চাপ সত্ত্বেও, জমির খাজনা ছাড়া উদ্বৃত্ত আয়ের ওপর আয়কর বসান হল না—যেমন এখনও হয় না।

আবার স্বাতীর মন্তব্য। —আসলে ইতিহাস পড়তে পড়তে একটা জিনিস আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি। ইংরেজদের নিজেদের তৈরী জিনিসপত্র এ দেশে চালু করা কখনই সম্ভব ছিল না—যতদিন এদেশের শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা যাচ্ছে। করলও তাই ; ঠিক যেন একটা নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হবার মত, সেটাই ঘটল। অযোধ্যা আর বেনারস চিরকালই ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ ছিল। ব্রিটিশরা সেখানে যাবার তিন বছরের মধ্যেই সব শেষ, শুধু দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। গ্রাম-কে-গ্রাম ছেড়ে লোকেরা পালিয়েছে। শিল্প ও ব্যবসার কণ্ঠরোধ ক'রে যেমন তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ও মানুষের চিরাচরিত সম্পর্কটাই পালটে ফেলল তারা। যে জমির ওপর জমিদারদের মোঘল আমল পর্যন্ত কোন স্বত্ব ছিল না, পুরানো জমিদারদের মাছের মত খেলিয়ে খেলিয়ে আর অত্যাচার ক'রে, সবাইকে করা হল সর্বস্বান্ত। নিয়ে আসা হল নতুন জমিদার। কৃষক বা রায়তদের উচ্ছেদ করার নানা পর্যায়ের নানা ষড়যন্ত্রে নীরব রইল ধূর্ত ইংরেজ। এবং তার ফলেই গড়ে উঠল জমিদারদের মত একটা সুরক্ষিত শ্রেণী—যা প্রায় এক একটা ব্রিটিশ দুর্গ হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহ ও কৃষক আন্দোলনের সময়। এসব খুঁটিয়ে দেখলে একটা কথাই মনে হয়—ভারতে ওরা কি করতে এসেছিল তা ওরা জানত এবং ওরা যখন নানা কায়দায়, কখনও অত্যাচার করে, আবার কখনও-বা জাসটিস ও ডেমোক্র্যাসির ধ্বজা তুলে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন একটু-আধটু সুবিধে, পোষা কুকুরের লেজ নাড়া দেখে ছুঁড়ে দিয়েছে আর আমরা নিজেদের ধন্য মনে করেছি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ক'রে যখন ওরা অলক্ষ্যে গোটা বাংলার ইতিহাস পালটে দিচ্ছে তখন আমরা শহরে এসে সব সাহেব হয়ে ফুটুং-ফাটাং ইংরেজী আওড়ে ভাবছি, দেশোদ্ধার করছি।

ব্রিটিশরা চেয়েছিল এমন সুরক্ষিত বন্দোবস্ত যার থেকে ভবিষ্যৎ ঝুঁকির রাজস্বও উঠে আসে। এই ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েই বাঙালীকে তারা প্যারাসাইটিক করেছে এবং বাঙালীর সব প্রডাক্‌টিভ্ শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা সেদিন বুঝি নি বলেই এই ষড়যন্ত্রে সায় দিয়েছি। আজও বুঝি না, তাই মার্ক্সিজম্ আওড়ে এবং না-বুঝে বলে থাকি যে ক্যাপিটাল্

ফরমেশন্ ছাড়া শিল্প গড়ে ওঠে না। এবং ঔপনিবেশিক সব রাষ্ট্রেই ক্যাপিটাল ফরমেশনের ইতিহাস একই ধাঁচে গড়ে ওঠে, সেখানে বাঙালী বা অবাঙালী বলে কোন কথা নেই। যেকোন ঔপনিবেশিক দেশেই যে-ভাবে শোষণ চলে এবং সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়—তাতে কোন দেশেই শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। ব্রিটিশরা এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছে কিন্তু গড়ে উঠতে দেবে না বলেই গড়ে ওঠে নি; তাই কোন ইকনমিক্ থিওরি দিয়ে শাসকদের অভিসন্ধি কোন কালেই বোঝা যায় না। ব্রিটিশরা এই মানুষ-ভূমি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটাবার আগেই জানত কি ভয়ঙ্কর একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন তারা নিয়ে আসতে যাচ্ছে এবং তার ফলাফল কি হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা কী হবে তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান নায়ক লর্ড কর্ণওয়ালিস বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর ডেস্‌প্যাচে লেখেন—'আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই (এ দেশের) ভূস্বামীদের আমাদের সহযোগী ক'রে নিতে হবে। যে ভূস্বামী একটা লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে ও সুখে-শান্তিতে ভোগ করতে পারে, তার মনে সেটার কোনরকম পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না।'

সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'-এ এটাই ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টির পশ্চাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের অধিবাসীগণের মধ্য হইতে এরূপ একটি নতুন শ্রেণী তৈরী করা, যে শ্রেণী—এই দেশে ইংরেজ শাসনের একটি সুদৃঢ় স্তম্ভ রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া জনসাধারণের অর্থাৎ বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধানল হইতে এই শাসনকে রক্ষা করিতে পারিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভারতের সকল ইংরেজাধিকৃত অঞ্চলে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহের ঝড় বহিতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করা দেশীয় সমর্থকহীন একক ইংরেজ শক্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।'

বদরুদ্দীন উমর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক' বইতে বলেছেন, 'পুরাতন জমিদারের পরিবর্তে যারা নতুন জমিদার হলো তারা অধিকাংশই ছিল শহরবাসী, বেনিয়ান, দালাল (স্বাতী এক কোণে লিখেছে—পড়ে ভাবলাম, দালালরা কি কখনও সত্যিকারের রেনেসাঁস আনতে পারে, না

তাদের দ্বারা ও কাজ হয় ?) ব্যবসায়ী প্রভৃতি। শহরে বসবাস করার ফলে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নিয়মিতভাবে তারা রাজস্ব আদায় করতে পারতো না। এই খাজনা আদায়ের প্রয়োজনেই তারা সৃষ্টি করে আর এক নতুন মধ্যস্বত্ব-ভোগী। ' এই নতুন মধ্যস্বত্বভোগীকে সরকারও আইন সম্মত বলে স্বীকার ক'রে নিলো এবং জমিদারের মোট প্রাপ্যের উপর নিজেদের অতিরিক্ত প্রাপ্য কৃষকদের থেকে আদায় করতে গিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত ক'রে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিল।' বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'-তে লিখেছেন, 'জমিদারদের পরবর্তী স্তরে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, গাঁতিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষুদে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হলেন। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে বড় বড় জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা একশতের খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তারপর চিরস্থায়ীত্ব ও মধ্যস্বত্বের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে (অর্থাৎ একশো বছরে) জমিদারের সংখ্যা বেড়ে দেড় লক্ষের বেশী হল।'

জমিদার, ইজারাদার, পত্তনিদার প্রভৃতি রঙ-বে-রঙের মধ্যস্বত্বভোগী শোষকরা কৃষকদের উপর যত প্রকার নির্যাতন চালাত তার একটা তালিকা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় সংযোজিত হয়। স্বাতী এই তালিকাটি থিসিসে নেয় নি বটে কিন্তু সাইডে লিখে রেখেছে। পড়ে শোষণের রকমটা ধরতে পারছি। তা এরকম—(১) দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত (২) চর্মপাদুকা প্রহার (৩) বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষস্থল দলন (৪) খাপরা দিয়ে নাসিকা, কর্ন মর্দন (৫) মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ (৬) পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া (৭) গায়ে বিছুটি দেওয়া (৮) হাত-পা নিগড়বদ্ধ করা (৯) কান ধরে দৌড় করান (১০) ফাটা দু'খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা (১১) গ্রীষ্মকালে ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রে পা ফাঁক ক'রে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের ওপর ও হাতের ওপর ইঁট চাপিয়ে রাখা (১২) প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা ও গায়ে জল নিক্ষেপ করা (১৩) গোণীবদ্ধ ক'রে জলমগ্ন করা (১৪) বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা (১৫) ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা (১৬) চুনের ঘরে বদ্ধ ক'রে রাখা (১৭) কারারুদ্ধ ক'রে উপোস রাখা (১৮) গৃহবন্দী ক'রে লঙ্কামরীচের ধোঁয়া দেওয়া।

সমগ্র উনিশ শতক ও বিশ শতকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসে এই অতিরিক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভের ফলে এদেশে নিয়মিতভাবে খাদ্যসঙ্কট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী হয়েছে এবং কৃষকদের

জমি থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ ক'রে তাদের পরিণত করেছে ভূমিহীন কৃষক ও গ্রাম্য দিনমজুর শ্রেণীতে।

আমি একটার সঙ্গে অন্যটার যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি। ইতিহাসের যে কার্য-কারণ একটা দেশ অথবা দেশবাসীকে অমোঘ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়—তার অদৃশ্য হাত আমি স্বাতীর থিসিসে দেখতে পেলাম।

সেন্সাস কমিশনার স্যার টমাস মনরোর মতে, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে কোন ভূমিহীন কৃষক ছিল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র ত্রিশ বছর পর, ভারতে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ। ভূমিহীনদের সংখ্যা এরপর থেকে বাড়তেই থাকে এবং ১৯৩১ সালে আদমসুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে বাংলাদেশে কৃষিকার্যরত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগই ভূমিহীন। জমিদার-মহাজনদের উদ্দেশ্যও ছিল তাই, জমি হাতড়াও, শেষ ক'রে দাও অথচ দিও না কিছু। কারণ অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী লিখেছেন, ১৮৮৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে দখলী জমি হস্তান্তরের সংখ্যা ছিল ৪৩ হাজার। ১৯১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরো লক্ষে।

ভূমিহীন কৃষকরা গ্রামে কাজকর্ম না পাওয়ায় দলে দলে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। সুকোমল সেন, তাঁর বই 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস'-এ দেখিয়েছেন কিভাবে, কি ভয়ানক অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিক বিদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ভারতীয় শ্রমিককে মরিশাস, ব্রিটিশ গায়না, ত্রিনিদাদ, জামাইকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ফরাসী উপনিবেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে চালান করা হয়। চালান করত 'আড়কাঠিরা'।

একদিকে ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা যেমন বাড়ল, তেমনি এই অত্যাচারের হোতাদের গর্ভে জন্ম নিল মধ্যশ্রেণী এবং তাদের হাতে এল বাংলার রেনেসাঁস। অন্য দিকে দুর্ভিক্ষের ঘন ঘন সূচনা। ১৮০১ সাল থেকে ১৮২৫ সাল—এই চব্বিশ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক মারা পড়ল দুর্ভিক্ষে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল—এই কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং এতে ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে দুর্ভিক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক শেষ হয়ে যায়। একেই বলে শোষণের পারস্পেকটিভ প্ল্যান।

তাই বদরুদ্দীন ওমর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ইংরেজদের পক্ষে সুফল

পরিণামের হিসাব দিয়ে বলেছেন—'শিল্পক্ষেত্রে নতুন উদ্যমকে ব্যাহত ক'রে সেখানেও বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিকা খুব উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার শিল্প থেকে প্রাপ্য মুনাফার ওপর সে ধরণের কোন কর নির্দ্ধারণ করে নি। এর ফলে বাংলাদেশে ধনীদের হাতে যে বিনিয়োগ-যোগ্য অর্থ ছিল সেটা তারা জমিদারী ক্রয় এবং ভূমিস্বত্বের মালিক হওয়ার জন্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যয় করে। কারণ এই ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগ করলে নিশ্চিতভাবে এবং নিরুপদ্রবে মুনাফা ভোগ করা যেতো এবং সে মুনাফার অঙ্কও শিল্প-মুনাফার তুলনায় হতো অনেক বেশী। এই কারণে যাদের হাতে কিছু পরিমাণ বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি জমা হতো তাদের মধ্যে অধিকাংশই সেটা জমিজমা ও জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের জন্য নিয়োগ করতো...। তাই এই নতুন ধনীক শ্রেণীর (শহরে পুঁজিপতি, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, দালাল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি) কাছে জমিদারীও বাণিজ্য পণ্যের মতো লেনদেনের স্পেকুলেশনের ও মুনাফার বস্তু হয়ে উঠল। এই অপদার্থ বেকার জমিদাররা ভূমি থেকে উদ্বৃত্ত যাবতীয় মুনাফা নিজেদের প্রয়োজন ও ভোগবিলাস মেটানোর জন্যে খরচা ক'রে যায় এবং তার ফলে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক ও বিস্তৃত বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করতেই সহায়তা করে।'

পরবর্তীকালে এইসব ধনী লোকেরা তাঁদের অর্থ কি ভাবে ব্যয় করেছেন সে ইতিহাস আমার জানা। কার্য-কারণ বা একটার সঙ্গে অন্যটা কিভাবে জড়িত হয়ে আছে, তার তথ্যমূলক বুনিয়াদ জানতে পেরে আমি সূচনা ও পরিণতির একটা স্পষ্ট ছবি পেয়ে গেলাম। জাহাজ শিল্পের প্রসার লাভের ব্যাপারে স্বাতী দেখিয়েছে কিভাবে ইংরেজরা ফরাসী এমন কি আমেরিকান-দের কাছ থেকে জাহাজ তৈরীর কৌশল গোপনে বার ক'রে নিজেদের জাহাজকে আধুনিক ক'রে তুলেছিল। আর এখানে ইংরেজরা জাহাজ নির্মাণের কৌশল ও বিদ্যাটাকে কেন এবং কিভাবে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছিল, জাহাজ সম্পর্কে স্বাতীর অত তথ্য না ঘেঁটেও আমি বুঝতে পারছি। এখন এও বুঝতে পারছি বাঙালীরা কেন প্রোডাকৃটিভ এফর্ট থেকে দিনে দিনে সরে এসেছিল। বুঝতে পারছি নবকৃষ্ণ মায়ের শ্রাদ্ধে ১৯ লক্ষ টাকা কি মোটিভেশনে খরচ ক'রে বসেন। বুঝতে পারছি বেঙ্গল চেম্বারস্ অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাসৃট্রির ১৯৭১ সালের সার্ভে রিপোর্টে বাঙালীদের শিল্প ব্যবসায়ে রেনেসাঁয় পদক্ষেপ হিসেবে মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর, হাওড়ার কিশোরিলাল

মুখার্জী, ভাগ্যকুল পরিবার, সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী, বটকৃষ্ণ পাল এ্যাণ্ড কোম্পানী—ইত্যাদি গুটি কয়েক মানুষ ও পরিবার ছাড়া আর কারুর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে বলে স্বীকৃতি দেয় নি কেন।

রেলওয়ের মত এত বড় একটা শিল্প যাকে মার্ক্স পর্যন্ত বলেছেন, 'অন্য শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে অগ্রদূত,' সেখানেও ব্রিটিশ পারস্পেক্টিভ্ প্ল্যানের হেরফের হয় নি। ১৮৫৩ সালে ডালহৌসী তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদনে যে লক্ষ্য সামনে রেখেছিলেন, সেই মত শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'রেল গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সরকারের বাণিজ্য বাড়ান, এবং ভারতকে একদিকে গ্রেট ব্রিটেনের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস এবং অপরদিকে ভারতকে গ্রেট ব্রিটেনের রপ্তানিকৃত শিল্পদ্রব্যের বাজার হিসাবে গড়ে তোলা'।

এই কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ভারতে রেল ও জাহাজ পরিবহণ দ্রুত প্রসারলাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। চাল-কল, ময়দা-কল, তুলা, পাটের জন্য প্রেসিং ও প্যাকিং মিলের সৃষ্টি, কয়লা খনি স্থাপন, ব্রিটিশ পুঁজির সাহায্যে নীল চাষ, রবার উৎপাদন, ও কফি ও চা বাগিচা শিল্পও স্থাপিত হয়। সেখানে ভারতীয় অর্থ বিনিয়োগ করার কোনরকম উদার নীতি ইংরেজরা অনুসরণ করতে রাজী হয় নি, বরং ব্রিটিশ পুঁজি আকর্ষণ করতে নানারকম 'জামাই-আদরের' ব্যবস্থা করেছে।

এবার আবার স্বাতীর উক্তি। তার মানে এ কথাগুলো থিসিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বাতী লিখেছে—'ট্রেডার জাত যখন দেশ শাসন করে এবং উপনিবেশবাদকে শোষণের মন্ত্র হিসেবে জানে, তখন তাদের লবি যে প্রচণ্ড হয়ে উঠবে তা জানা কথা। (আমারও মনে পড়ে গেল ম্যানচেষ্টার লবি, 'কটন এমপি'-দের লবি, বেঙ্গল চেম্বারস ও অন্যান্য চেম্বারদের লবি সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি। ট্রেভেলিয়ান (Trevelyan) তাঁর ১৮৬৫ সালের বাজেটে চা, কফি ও পাটের ওপর রপ্তানি কর বসাবার চেষ্টা করলে তাঁকে ক'দিনের মধ্যেই সেক্রেটারী অব স্টেটের পদ ছেড়ে বিলেতে চলে যেতে হয়। তেমনি সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ কমাবার জন্য মেয়াও-এর (Mayo) সঙ্গে কমাণ্ডার-ইন-চীফের যে ঝগড়া শুরু ও চিঠি বিনিময় হয়েছিল, তা কম বড় ঐতিহাসিক দলিল নয়। মেয়াও গভর্নর জেনারেল হয়েও কিছু করতে পারেন নি কিন্তু রেগে মেগে বলেছিলেন—'স্বার্থপরতা জলাঞ্জলি দেওয়া খুব

শক্ত ব্যাপার। জনগণের সেবা পরে হলেও চলে।') এসব লবির এত শক্তি ছিল যে মতভেদ হলে ক্ষমতাসম্পন্ন গুণী মানুষদের সরে যেতে হত। যাঁরা দেশ শাসন করেন এবং যাঁদের মধ্যে দু'একজন এ দেশের কল্যাণে সামান্য কিছু করতে চেয়েছিলেন—স্বার্থপরতা ও লবির শক্তি, তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে রেখেছিল। তাঁদেরও কিছু করতে দেওয়া হয় নি। এর অন্য একটা দিকও আছে। ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ ছিল এবং এখন সেই ইতিহাস ঘেঁটে অনেকে অনেক বইও লিখেছেন। অথচ যখন ওঁরা সেই ব্রিটিশ উদ্দেশ্য সামনে রেখে, এত বড় দেশটাকে নিজেদের স্বার্থে পুরোপুরি ব্যবহার করছেন, তখন কিন্তু এসব ঝগড়া-বিবাদ বা চিঠি চালাচালির খবর কারুর জানার সাধ্য ছিল না। বোঝার উপায় তো ছিলই না। যারা সাহেবদের চিরকাল ত্রাণকর্তা ভেবে এসেছে তাদের পক্ষে এদের মোটিভ্ ও তাদের পারস্পেকটিভ্ ধরা অসম্ভব ছিল। নয়ত এত বড় যে রেলওয়ে শিল্প, তাতে বাঙালী কাজ পেয়েছে ঠিকই কিন্তু ওয়ার্কশপে বা যন্ত্রপাতি গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থায় বড় চাকুরী পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। স্বাধীনতার আগে সারা ভারতে পি, এন, টি,-তে দশজন মাত্র নেটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার নেওয়া হত। অন্যদিকে ইণ্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ১৯১৬ সালে মন্তব্য করেছিলেন—বড় বড় চমৎকার ইঞ্জিনিয়ারিং শপে শুধু মেরামতির কাজ হয় আর বড় জোর ওয়াগন, ট্যাঙ্ক, ব্রিজের জিনিসপত্র ও ছাদের জিনিস তৈরী হয়। রেলের যাবতীয় যন্ত্রপাতি তখন বিদেশ থেকে আমদানী করা হত। অর্থাৎ রেলওয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশও ভারতে প্রস্তুত করতে দেওয়া হয় নি। সেখানেও সেই একই উদ্দেশ্য—ভারতকে শিল্প প্রয়াসের পথে রেলওয়ের মত 'অগ্রদূত' যাতে এগিয়ে না নিয়ে যায়—সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া। অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থায় বিনিয়োগের এমন সুবর্ণ সুযোগ ক'রে দিয়ে বাঙালীর সামনে এত বড় ফাঁদ পেতে রাখা হয় যে পূর্ব-বুর্জোয়া সমাজ আর এক ধাপ এগোতে পারে নি। তাই দ্বারকানাথ কয়লা খনি ও বড় বড় শিল্প ব্যবসায়ে নেমেও ছেড়েছুড়ে দিয়ে খেদোক্তি করেছিলেন—'ইংরেজরা ভারতীয়দের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সব কিছুই কেড়ে নিয়েছে এবং সব কিছুই এখন সরকারের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল'।

স্বাতীর থিসিসের একটা জায়গায় এসে আমার চোখ আটকে গেল। স্বাতী লিখেছে—যখন লক্ষ লক্ষ লোক মরে তখন শহরবাসী নির্বিকার থাকার

মন কোথায় পায়? এ নগর ও কলকাতা-সভ্যতার জন্ম হয়েছিল সাহেব নবাবদের হাতে। এল, এস, এস, ও'ম্যালে তাঁর বই, 'দি জেনারেল সার্ভে ইন মডার্ন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দি ওয়েস্ট'-এ মধ্যবিত্তের যে জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়েছেন, তা স্বাতী শিল্প গড়ে তোলার অনীহার কার্য-কারণ দেখাতে বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করেছে। ও'ম্যালে বলেছেন, মধ্যবিত্তের জন্ম অভিনব একটা ঘটনা। এ শ্রেণীর আগে অস্তিত্ব ছিল না। অভিজাত সমাজ ও দরিদ্রদের মাঝখানে যে সমাজ এবং জমির মূল্য বাড়ার ফলে যে উদ্বৃত্ত অর্থ, তার থেকেই মধ্য-শ্রেণীর জন্ম। এ মধ্যশ্রেণী আগে ছিল না যদিও এরাই এখন বাড়ছে। জমির দাম বাড়ছে বলে এদের হাতে প্রচুর ধনসম্পত্তি ও প্রচুর জমিজমা ও প্রচুর অর্থ। অর্থ আসছে বলে আয়াসী জীবন আর আয়াসী জীবন থেকেই মধ্যশ্রেণীর জন্ম। সাহেবদের সংস্পর্শে এসেই এরা নানা পেশাদারী কাজে হাত পাকায়। গ্রামে এদের জন্মের পর থেকেই পিতৃপুরুষকে দেখেছে কৃষকদের ওপর অত্যাচার করতে এবং দেখে দেখে কৃষকদের দুঃখ বোঝা তো দূরের কথা, তারা অত্যাচারকেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে জেনেছে। দুঃখকষ্ট ও অত্যাচারের মর্মান্তিক সব ঘটনা থেকে বাঁচতেই এরা শহরে ছুটে গেছে। এবং সেখানে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নততর হয়ে ভেবেছে বিরাট রেনেসাঁস এসেছে। —'জমির মালিক ও প্রকৃত চাষির মধ্যে এই যে ব্যবধান—সেটা বাড়তেই থাকল এবং শোষক ও শোষিতের সম্পর্কে রূপান্তরিত হল।...নৃশংস অত্যাচার ও শোষণ চালিয়ে যাওয়াই ছিল ওদের স্বার্থরক্ষার উপায় আর তার থেকে বাঁচতেই এরা (মধ্যশ্রেণীরা) পালিয়ে এল শহরে।...একশো পঁচিশ বছরের আয়াস ও সুখের জীবনে (অভ্যস্ত হয়ে) বাস ক'রে, এরা জমিতে চাষ বা ফ্যাক্টরীতে কাজ করার (কঠোরতার) সঙ্গে নিজেদের আর খাপ খাইয়ে নিতে পারল না; এতে (আলসেমীতে) হাত দু'টোও খুব নরম হয়ে গেল এবং অফিসের কাজ ছাড়া আর কিছু তারা শিখতে রাজী হল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধে ভোগ করেই জন্ম নিল এই শ্রেণী...(মধ্যবিত্ত), এবং এরা (চিরকাল) ভেবেছে রেনেসাঁস আসার মূলেও এরা এবং এটা বলতে তারা ভালবাসে...।' এবার রেনেসাঁসের প্রকৃত অর্থ তিনি বুঝিয়ে বলেছেন—'প্রকৃত রেনেসাঁস মানুষের জীবনের সব দিকটা পালটে দেয়, (প্রকৃত) উন্নতির পথে নিয়ে যায় এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কৃষি ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে সত্যিকারের উন্নতি হয়েছে কি না—এবং তা উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য করা যায়

কিনা—সেটাই বলে দেবে রেনেসাঁসের সূচনা'। এ জাগরণ কী সত্যিই এসেছিল বাংলায় ?

বুঝতে পারলাম মধ্যবিত্তরা অত হুজুগে হয় কেন, জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, অত্যাচারের নৃশংস পরিবেশ থেকে বাঁচতে শহরে এসে আশ্রয় নিলে, হুজুগ-সর্বস্ব মনে কোন আন্দোলনই দানা বাঁধতে পারে না কেন। থিসিসটা রেখে আমি গভীরভাবে ভাবতে থাকলাম।

এক্ষুনি আমি স্বাতীকে মনে মনে ভোগ ক'রে পরম তৃপ্তি পাচ্ছিলাম ; আমি ওকে দেখাতে চেয়েছিলাম আমার সাহস কারুর চেয়ে কিছু অংশে কম নয়। অথচ বড়ই আশ্চর্য, ভুলে গিয়েছিলাম আমার মাটি কোথায়, কতটুকু আমার এগোন উচিত, এবং স্বাতীকে ভালবাসার কতটুকু আশ্বাস দিলে লোকেরা আমাকে গালাগালি দেবে না। আসলে স্বাতীর শরীরে এমন সব রত্ন আছে, মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে মধ্যিখানে থিতু হয়ে সেগুলি কুড়তে গেলে নিজেকে বীরপুরুষ প্রতিপন্ন করতেই হয়। স্বাতীকে ইমপ্রেশন্ দিতে গিয়ে বড় বড় আশ্বাস আর বড় বড় কথা আমাকে বলতেই হয়। নয়ত মধ্যবিত্ত আমি, আমার ইজ্জত নিয়েই টানাটানি পড়বে। আমি স্বাতীকে দেখাতে চাই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, যদিও জানি বীরভোগ্যারা কিছু ছাড়তে কোনকালেই রাজী হয় না। বাংলার ইতিহাসে কাউকে বিশেষ কিছু ছাড়তে দেখলাম না। বাঙালী ছাড়তে অভ্যস্ত নয় বলেই, একটু কেউ কাপড় ছাড়ল বা খোলস ফেলল দেখেই হৈ-চৈ ক'রে উঠে তাকে মালা পরায়। চিত্তরঞ্জন দাস যখন চূড়ান্ত বিলাসিতা ক'রে একদিন সত্যি সত্যি শ্রীচৈতন্য হয়ে গেলেন, বাঙালী ছুটে গিয়ে হাততালি দিয়ে মালা পরিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের সুযোগ্য বংশধর হয়ে, স্বাতীর জন্য খুব একটা স্যাক্রিফাইস্ করব—মনে হয় না। সেই ধাতই নয়। আমার ষড়যন্ত্র কোন্ দিকে কোন্ অদৃশ্য পথে ধাবিত হবে, এই মুহূর্তে আমি মুখ ফুটে বলতে চাই না, বলতে হয়ত পারবও না। কারণ বাঙালী কখনও প্ল্যান ক'রে ষড়যন্ত্র করে না -হঠাৎ হঠাৎ সে অভাবনীয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তখন আমাকে কতটা লাগবে ক্লীব এবং ঘৃণ্য—সেটা এই মুহূর্তে ভাবতে নারাজ। মধ্যবিত্ত আমি, স্বাতীকে প্রাণবন্ত কোন শরীর চেতনা মনে হয়েছে আমার—তা ঘুরিয়ে-পেচিয়ে আভিজাত্যের মোড়কে ঢেকে রাখার যতই না চেষ্টা করি এবং যা মুখে আসে, বা মুখে যা বলি, তার মধ্যে বিস্তর ফারাকটাকে

যতই আমি শব্দের আড়ম্বরে লুকিয়ে রাখতে চাই। তবে থিসিসটা পড়ে ফেলে আমি বুঝতে পারছি ইতিহাসের কোন্ নিগূঢ় পথ অনুসরণ ক'রে বাংলা আজকে এই অবক্ষয়ের পথে ধাবিত হচ্ছে এবং সেই ধাবিত ও চর্বিত হবার পথে আমার ভূমিকা কি। স্বাতীর স্বাদ ও সৌরভ একটু আলাদা, কিন্তু ওর যে এত বড় একটা ভাবনা-রাজ্য আছে, তা বুঝেও আমি বেশ্যা-বাড়িতে যেন ভোগ করতে গিয়েছি। গিয়ে দেখি, সে প্রাণের আবেগে অতুলপ্রসাদের গান গাইছে। আমার শরীর-চেতনা মাগির পায়ে লুটিয়ে পড়ে রইল, দেখি তার আর উঠবার সাধ্য নেই।

এই মুহূর্তে আমি কেন যেন স্বাতীর দিকটা তন্ন তন্ন ক'রে দেখে নিজেকে খুঁজতে থাকলাম। বিচ্ছেদের একটা পূর্বাভাস আমার হৃদয়কে প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে। আমি দিলীপ মুখার্জীর তল পাব কিনা সন্দেহ ; কারণ ও আরও অনেক গভীরে বিচরণ করে এবং প্রকৃতই যাকে বলা হয়—'সন্ অব দি সয়েল্'। সব কিছু আঁকড়ে থেকেই ও সব কিছু হাতড়ে নেবে এবং সুযোগ বুঝে একদিন দেশপ্রীতিটার খোলস ছেড়ে সোজা বিদেশে পাড়ি দেবে। যাবার আগে আমার বিরুদ্ধে মস্তানদের লাগিয়ে যাবে, হয় আক্রোশে, না হয় 'জাস্ট ফর্ এ ফান'। ভীতু লোককে ভূতের ভয় দেখিয়ে যতটুকু সুখ—সেই ফান আর কি!

॥ চব্বিশ ॥

একটা জরুরী মিটিং ছিল নারায়ণ সামন্তের ঘরে। গাড়ি ক'রে অফিসে আসতে গিয়ে বিশ্রীরকম একটা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গিয়েছিলাম, হর্ণের একটা মড়া কান্না এখনও কানের পর্দায় কাঁপুনি ধরাচ্ছে ; অফিসে এসে ঘড়িতে চোখ রেখে আঁতকে উঠলাম—বেশ দেরী হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ফাইল-টাইল গুছিয়ে 'ইমীডিয়েট্, মোস্ট আরজেন্ট' মোড়কে এঁটে, নিরুত্তেজিত বুরো-ক্র্যাসির মধ্যে একটু প্রাণসঞ্চার ক'রে দ্রুত পায়ে আমি এস, ডি'-র ঘরের দিকে ধাবমান হলাম। দেরী হয়ে গেলে কেমন যেন একটা হীনমন্যতায় ভুগি, কলকাতার ইয়ার-বন্ধুরা বা দু'একজন 'লা-পরোয়া' সহকর্মী আমার মুখে রেখা ফুটতে দেখে হাসে, বলে- তোমাকে দেখে কি মনে হয় জান, অমরেশ ? মনে হয় দিল্লীর গোলামী, কলকাতার স্বাধীন সত্তার স্পর্শ পেয়ে বৃথা গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিক হও, এখানে এই কলকাতায়, সময়টা সব সময় যে এগিয়ে চলে তা নয়, পেছনে বা আশেপাশেও তাকিয়ে দেখে। করিডরে এ ধরণের উক্তি আমার ঠিক পছন্দ হয় না, বিশেষ ক'রে ভারত সরকারের প্রতিনিধি আমি, আমার জাত-ভাইরা বুরোক্র্যাসির ঠেলা সামলেও এগিয়ে যাচ্ছে, আমিই বা পিছিয়ে থাকি কোন্ মুখে ? গোলামী ব্যাপারটাকেই দিল্লীতে আবার সবাই ডিসিপ্লিন আখ্যা দিতে অভ্যস্ত ; গোলামী দিল্লীর চাকার লুব্রিকেটিং ওয়েল্। তেল দিলে ওখানে যে শুধু কাজ হয়, তাই নয় ; অকাজকেও কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং তেলা মাথায় তেল দিতে আপত্তি কোথায় ?

স্বাধীন সত্তা বলতে এরা কী বোঝে, জানি না। প্রেয়সীর আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে আমার অন্ধকার ঘর এখন সূর্যালোকিত (এইমাত্র ভাবছিলাম, আমার সাংঘাতিক আত্মোন্নতি হয়েছে ; আমি আমার সত্তার স্বরূপ খুঁজে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছি)। এখন মনে হচ্ছে মানুষ অযথা ঝগড়া করে, বৃথা এই খুনোখুনি, মারামারি বা মস্তানগিরি। পার তো প্রেয়সীর আলিঙ্গন বদ্ধ হও, দেখবে, পলিটিক্যাল পাওয়ার অতি তুচ্ছ ; নির্বিকার এক

নিদ্রাসক্ত চোখে চারিদিকের এই দুর্নীতির ঢেউকে তখন 'বেদিং বিউটি' মনে হবে, গদির জন্য লড়াই বা খেয়োখেয়ি চার পেগ হুইস্কির নেশার মত কোন ভাসমান স্থিতি—দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ আর ঘরের মধ্যে তখন শুধু টালমাটাল ঘর। মনটা এখন আমার দ্রুত ফোর্থ ডাইমেন্‌শন্যাল হয়ে যাচ্ছে, আমি টের পাচ্ছি।

নারায়ণ সামন্তকে আমি কোন্ ভঙ্গীতে দেখবো, মনে মনে তারই বোধ হয় জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। থিয়েটারে আজকাল যেরকম 'স্টীলের' আমদানী হয়েছে. দেখলাম নারায়ণ সামন্ত সেরকম 'স্টীল' হয়ে বসে আছেন। তিনি কবে জন্মেছিলেন এবং কবে থেকে ওখানে বসে আছেন কেমন যেন হঠাৎ গুলিয়ে গেলে। সাল, ক্ষণ আর সময় হাতড়াতে থাকলাম। পেছনের কতগুলি বছর উঠে এল সামনে, ভবিষ্যৎ গহ্বরের কতগুলি বছর কার যাদুস্পর্শে এক মুহূর্তে অতীত, স্থবীর হয়ে গেল। সত্তর-পঁচাত্তর সালকে দেখলাম পোর্টফোলিও ব্যাগটাকে হাতে উঠিয়ে পোস্টার হয়ে ঝুলছে; একাশি-বিরাশি সাল একটা বুশ শার্ট পরে চোখের সামনে নারায়ণ সামন্ত হয়ে গেল। বুশ শার্টে 'আই লাভ্ ইউ'-এর মত হাসিখুশী একটা মেয়ে; এগ্রেসিভ্ হয়ে গোটা পুরুষ জাতটাকে যেন চুমু খাবে, এমন একটা 'হংকং-ই' লুটিয়ে পড়া ভাব। সেই সেক্সি 'আই লাভ ইউ'-কে তখন দেখলাম পুরুষ জাতটাকে অ্যাকৃশনে বেচে দিয়ে পর্দায় কী যেন খস্‌খস্ ক'রে লিখে সরে পড়ল। আমি এগিয়ে দেখি লেখা আছে—'পদ্মশ্রী'। একবার ভাবলাম, বিদেশী মেয়েটা এদেশের শত 'পভার্টির' মধ্যে থেকেও তার কালচারের হয়ত প্রেমে পড়ে গেছে এবং প্রেমে পড়লে যা হয়, রাতারাতি নাম পালটে হয়ে গেছে 'পদ্মশ্রী'। যেই নামই মেয়েটা নিক, এতক্ষণ স্টীল হয়ে ছিল, এবার যখন নারায়ণ সামন্ত হেসে উঠলেন—তখন দেখলাম তাঁর বুকে মেয়েটির সেই হস্তলেখা—'পদ্মশ্রী'। কলকাতায় এখন নিশ্চয় প্রচণ্ড ঝড়, কে কোথায় করিডরে, ঘরের ছায়ায়, উপরে-নীচে বা ঘরে ঢোকার কোণটার মুখে মুখ বাড়িয়ে এবং ঘরের মধ্যে ফিস্‌ফিসিয়ে সবাই তখন বলছে এক কথা—কিরকম পদ্মশ্রী বাগিয়ে নিলেন দেখলেন? 'পি-আর' কাকে বলে এবার বুঝলেন?

এসব ফিস্‌ফিস্ গুজুর-গুজুর কথা আমি অবশ্য কোনকালেই ঠিক বুঝি না—এবং সামন্তের ব্যাপারে আমি আবার 'ফিশি' কথাবার্তা মোটেই

বরদাস্ত করতে রাজী নই ; কারণ আমার চিরকালই ধারণা, নারায়ণ সামন্ত গুণী এবং জ্ঞানী। সকল বিষয়ে (এমনকি কন্‌ডাক্ট্‌ রুল পর্যন্ত) তাঁর ব্যুৎপত্তি ; নানা রকম রেভলিউশনারী পসিবিলিটি নারায়ণ সামন্তর ক্ষণজন্মা স্বভাবে। তাঁর হাতে, নিন্দুকরাও স্বীকার করবেন, রেডিও নানা শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত। এজন্যই নিশ্চয় তাঁর এই দেশজোড়া স্বীকৃতি। এরকমই কিছু আমি ভাবছিলাম—দেখলাম, থিয়েটারে যা ঘটে, ঠিক সেরকম হঠাৎ চরিত্রটিই সূত্রধর হয়ে গেল। কলকাতার কালবৈশাখী ঝড়ে তাঁর কাছাটা আবার খুলে গিয়েছিল—সেটা তিনি কোনমতে সামলে-সুমলে ছুটতে ছুটতে স্টেজে এসে বললেন—না মশায়, শুধু 'পি-আরে' কিচ্ছু হয় না। কোন্‌টা চাই জানেন? ইন্‌টিগ্রেটেড্‌ এণ্ড কোঅর্ডিনেটেড্‌ কাজ ও তার মনিটারিং—যা দেশের উন্নতি ও প্রগতির স্বার্থে আমরা বলে থাকি বা ক'রে থাকি। সভানেত্রী বললেন, পাওয়ার মানে বিদ্যুৎ,- বিদ্যুৎ যদিও পাওয়ার, কিন্তু সব 'পাওয়ার' তো আবার বিদ্যুৎ নয়, আপনারা প্লিজ্‌ কনফিউজ্‌ড্‌ হবেন না বা কোনরকম কনফিউশনে থাকবেন না,—পাওয়ারের দশ বছরের পারস্পেক্‌টিভ প্ল্যান চাই, ওমনি কিরকম প্ল্যানের ধূম পড়ে গেছে দেখছেন, যেন দেশের উন্নতিতে পাওয়ার লাগে না, যেন সভানেত্রী বললেই তবে পাওয়ার জেনারেট্‌ হয়—সেই প্রগতির স্বার্থে এফেক্‌টিভ্‌ ইমপ্লিমেন্‌টেশন্‌ অব দি 'পয়েন্ট', মানে পয়েন্টেড্‌ প্রোগ্রাম চাই। বুঝলেন? সূত্রধরের এরকম কনফিউজ্‌ড্‌ কথাবার্তার কি উদ্দেশ্য, এবং কাকে তিনি ব্যঙ্গ করতে বা পাল্টা জবাব দিতে করিডরে এরকম ছুটোছুটি করছেন, কিছুই বুঝলাম না। তবে পঞ্চধাতুর একটা যে কেমিক্যাল গুণ আছে, আগের দিনে বা এখনও, যাকে আমরা পরশপাথর বা পরশমণি বলি, এবং আঁচলের গুণে প্রোমোশন পেয়ে যে একেবারে আধুনিক সভ্যতা হয়ে গেছে—সেই দৃষ্টি বা শক্তি, আমার চোখের দৃষ্টিটাকেই পালটে দিল কিনা কে জানে! আমি দেখলাম ভেজাল ডালদার মত অতীতটা তাড়াতাড়ি ড্রেস্‌ক্রেস্‌ পরে বর্তমান হয়ে বসে আছে।

নিজেকে যদিও তখন খুব কড়া শাসন করছি আমি, তবুও দেখলাম এ করিডর থেকে আমি সে করিডরে ঘুরছি। বুঝতেই পারলাম না, তখন আমি কোথায়! ঘড়িটা তাড়াহুড়োতে ফেলে এসেছি ; যদিও' অফিসে নেমে আমার ঘড়িটাতে সময় দেখেই যেন দেরী হয়ে গেছে বলে আঁতকে উঠেছিলাম। আজকে সবটাই যেন কেমন গড়বড়ে লাগছে। ওটা নিশ্চয়

মনের ঘড়ি ছিল, নয়ত আমার রিয়েল ঘড়িটা হাতে থাকতই ; রিয়েল ঘড়িটা থাকলে নিজের বেহুঁস ভাবটা হয়ত অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারতাম। মনে পড়ল, মিটিং ছিল নারায়ণ সামন্তের ঘরে, অথচ ঘুমের ঘোরে যেমন হয়, আমি এখন রাইটারস্ বিল্ডিং-এর এমুখো-ওমুখো ঘুরছি।

যে মানুষটা এগ্রিকালচার করতে করতে নাট্যকার হয়ে গেছেন, জিজ্ঞেস করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর ঘরে গেছি কিন্তু দেখি তিনি নেই। দেখলাম, তাঁর অনেকগুলো নাটকের বই আমাকে তাড়া করছে। নাটক কি নিজেকেই নিজে শোনাবে ? আমি ভয় পেয়ে ডেপুটী ইলেক্‌শন্ অফিসারের ঘরে পালিয়ে গেলাম।

চমৎকার মানুষটি। গৌরবর্ণ। যৌবনকালে নিশ্চয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন নানা বর্ণের লোকের সঙ্গে মিশে মিশে কেমন যেন কালারলেস্ হয়ে গেছেন। বাইরে নামটা দেখেই গিয়েছিলাম, কিন্তু নাট্যকার ছুটিতে, অথচ তাঁর জলজ্যান্ত নাটকগুলি ভেতরে নিয়ে যাবে বলে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে—এই অবিশ্বাস্য এবং অভাবনীয় বেশ্যাবৃত্তির সিচুয়েশনে পড়ে, আমি তখন ভাবছি, ডেপুটী চীফ ইলেক্‌শন অফিসরের ঘরে ঢুকবার আগে কায়দা করে বাইরে এসে আবার না-হয় তাঁর নামটা দেখেই নি, কিন্তু ভাবতে না ভাবতে সেটাকেও দেখলাম ঘুরতে ঘুরতে একেবারে উধাও হয়ে গেল। আমি ভেবে পেলাম না—এঁকে, এই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে কি-ভাবে ও কী-নামে সম্বোধন করব। রাইটারস্ বিল্ডিং-এ নামের পরোয়া করে না, এমন খনজন্মা লোক নিশ্চয় ভট্চায্যি বা দিক্‌শিত্। একটা কিছু নিশ্চয় তিনি হবেন—ভেবে ভেবে আকুল হলাম।

তিনি খুব সিম্‌প্যাথেটিক্ বলতে হবে। আমার মুখে বা চোখে ভ্যাবাচ্যাকা খাবার একটা ভাব দেখেই বোধহয় তিনি এক গ্লাস জল আনার জন্য ঘন্টি বাজালেন, এবং পিওন এলে তাকে বেশ ধমকের সুরে বললেন—এক গ্লাস জল। মনে পড়ে গেল, ঘণ্টাখানেক ধরে একটি মানুষকেই আমি রাইটারস্ বিল্ডিং-এ খুঁজে বেড়াচ্ছি—ভয়ানক পিপাসার্ত আমি এবং ক্লান্ত। কলকাতার কোন পাবলিশার নাট্যকারের নাম দিয়ে বলেছিলেন—'ইনি না বললে, আপনার নাটক জাতে উঠবে না,' তখন থেকেই ঘাবড়ে আছি। তাই বোধহয় নাট্য-বিচারকদের সম্পর্কে অতি উচ্চকোটির একটা ধারণা নিয়ে আমি তখন থেকে ছোটাছুটি করছি। মাথাটাও একটু হয়ত ঘুরে গিয়ে

থাকবে, কারণ এ পর্যন্ত যত ঘুর-পাকই খাই-না কেন, কাউকেই ঠিক নিজের আসনে দেখি নি। তাই দৃষ্টিটাও বেশী ছোটাছুটি করতে বাধ্য হয়ে এখন সেও রীতিমত টায়ার্ড। দেখি নি বলব না, দেখেছি অনেককেই; হয় করিডরে, না-হয় গল্প করছে, নয়ত ঘর থেকে সদ্য বেরিয়ে করিডর-মুখো, কিংবা করিডরে তৈরী পিওনের চা সেবনে ব্যস্ত; কেউ আবার গরম চা খাবার সম্ভাবনায় প্রগতিবাদী কথাবার্তা বলছে। হতে পারে এইসব 'কমিটেড্' লোকদের দেখে বিরক্তিতে মনের এখন একটা প্রজেক্‌শন দেখছি। মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিচ্ছিল।

সে যাই হোক, এক গ্লাস জল খেয়ে আমি অনেকটা ধাতস্থ হলাম।

তিনি তখন ভট্‌চায্যি না রক্ষিত কিংবা দিকৃশিত্—নামটা তখনও মনে করতে পারছি না—তিনি যে-নামধারীই হোন—আমাকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে বললেন—আপনি দিল্লীর লোক, না?

—কি ক'রে বুঝলেন? আমার বিস্ময় উক্তি। —আপনি কি কপালের রেখা পড়তে জানেন? কথাটা বলছি আর মনে মনে ভাবছি, ইনি তাহলে এ-জন্মে না হোক গত জন্মে নিশ্চয় ভট্‌চায্যি ছিলেন; অনেক টারময়েল সামলাতে সামলাতে ইদানীং তিনি নিশ্চয় দিকৃশিত্ হয়ে গেছেন।

—না, তিনি বললেন—৭৯-এর ইলেক্‌শন করতে আপনি দিল্লী থেকে এসেছিলেন—না? আপনার নাম যতদূর মনে পড়ে, অমরেশ রায়।

ভাবলাম, এতটা স্মরণশক্তি না থাকলে কি ইলেক্‌শন করা যায়? আর সঙ্গে সঙ্গে তারিফ ক'রে বললাম—ঠিক বলেছেন। আমি সেই মানুষ। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এটা কি ৭৯ সাল, না ৮২।

হতবাক বিস্মিত চোখে ভদ্রলোক এক পলক ইলেক্‌শনী চোখ নিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। একটু পরে বললেন, রাইটারস্ বিল্ডিং-এ ঘুরে ঘুরে আপনার মাথাটা নিশ্চয় ঘুরে গেছে। আপনি ৮২ সালটাকে একেবারে ৭৯ সাল বানিয়ে দিচ্ছেন? বলেই আবার হাঃ হাঃ হাসিতে রাইটারস্ বিল্ডিং-টাকে একেবারে কাঁপিয়ে ছাড়লেন।

আসলে ভট্‌চায্যি বা দিকৃশিত্ বোধহয় জানেন না, নিজের মাটি খুঁজে না পেয়ে মাঝে মাঝে আমার ওরকম হয়, নয়ত নারায়ণ সামন্তের ঘরে গিয়ে তাঁকে আমি স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকতে দেখি কেন?

যাই হোক 'স্যরি' বলে, আমার লুটিয়ে-পড়া স্বভাবটাকে কোনমতে হাতের মুঠোয় সামলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখলাম, নেম-প্লেটটা নেই। তার মানে সমাধান হল না, ইনি ভট্চায্যি ছিলেন, কিংবা দিক্‌শিত্। তিনি যেই হোন হাসতে জানেন। ওঁর হাসিতে একাধিক জননেতা কেঁপে ওঠেন কিনা জানি না। তাঁদের তো আবার হাসবার বিন্দুমাত্র অবসর নেই। জনতা বা জনসাধারণ কতটা জাগলো, সেই প্যারামিটার ধরে তাঁরা সদাসর্বদা ছুটে বেড়াচ্ছেন। রাইটারস্ বিল্ডিং-এর চক্করে পড়ে সেই প্যারামিটারের কি অবস্থা হয়, সেটুকু বোঝা বোধহয় তাঁদের পক্ষেও শক্ত।

আমি রাইটারস্ বিল্ডিং-এর নাগরদোলা সামলে সবে ফাইলপত্র নিয়ে এস, ডি,-র ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছি—দেখি, হিন্দি সিনেমাতে যেরকম জলের ওপর নায়ক-নায়িকারা খুব স্লো-স্পিডে সবরকম ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে যায়—অনেকটা সেরকম, দেখি এস, ডি,-র ঘর ফুটো হয়ে গেল এবং নারায়ণ সামন্ত সমভিব্যাহারে ডি,ডি,জি,ই, হয়ে গেলেন। আমার তখন আশঙ্কা হতে থাকল, মিঃ ধরের তাহলে কী অবস্থা? একটিমাত্র মানুষ আমার কাজে এখনও সদাশয় ছিলেন, আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট্ করতেন—তাঁকে ধারে-কাছে তো কোথাও দেখছি না। তবে কি ইনিই উপরে চিরকাল ছিলেন আর মিঃ ধর নীচে থেকে উপরের সিঁড়ি সামলাচ্ছিলেন? সেরকম কোন সূক্ষ্ম বিচার করার শক্তি তখন আমার ছিল না। রাইটারস্ বিল্ডিং আমাকে অনেকটা বোধহীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। কে যে কখন কি ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সামন্ত বললেন—আসুন, আসুন—কি মনে করে? ও, মিটিং ছিল—না? তা কৌন্তেয় সিংহ তো এখনও এল না। আপনি কৌন্তেয়কে কি কোথাও পাঠিয়েছেন? (শুনুন কথা। কিরকম ব্যাপার-স্যাপার কলকাতায় ঘটে? দিল্লীর লোকের পক্ষে সত্যি বুঝে ওঠা দায়। আমি হতবাক হয়ে ভাবতে থাকলাম, এক তো সেই লিস্টটাই আমি এখনও পাই নি, তার মানে আপনার মহামান্য পদের সুশোভিত অঙ্গন-ছায়ায় কৌন্তেয় এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী পাওয়ারফুল। তাকে বেকুব বানাতে গিয়ে আমি না আবার শেষকালে বিফুল হয়ে যাই। তাছাড়া অতীত-বর্তমান যেরকম হাতে-হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা শুরু করেছে

—প্রোগ্রামের ব্যাপারে ওটা নাকি হয়েই থাকে—কেউ ওঠে, আবার কেউ ধপাস ক'রে পড়ে—কেউ রাজা বা কেউ রাণী হয়ে যায়—আবার কেউ বা বহু দিন ধরে অখ্যাত অজ্ঞাত হতে হতে একেবারে অনাদৃত ভিখেরী—সেটা আমি জানতাম।)

তবে যতদূর জানি এবং করিডরের আনাচে-কানাচে যা শুনি, নারায়ণ সামন্ত মেয়েদের আঁচলের মতই রীতিমত অঘটন ঘটাতে পারেন। তাই স্বরটাকে বেশ সংযত ক'রে বললাম—না, সে লিস্ট তৈরী করা যাবে না। আর তাছাড়া, কৌন্তেয় এখন আরও বড় অফিসর হয়ে গেছে—এখন তো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

নারায়ণ সামন্ত হাসতে হাসতে বললেন—তাই বুঝি? যদি তাই হয়—খুব অন্যায়। ধরা-ছোঁয়ার বাইরের লোকগুলোর জন্যই সরকারী অনুশাসন বা কনডাক্ট রুল।

বলেই তিনি ডিকশনারীর মত ইয়া একটা মোটা কনডাক্ট রুলের পাতা উল্টোতে থাকলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, যিনি কনডাক্ট রুল ছাড়া এক মুহূর্ত চলেন না, তাঁরও রোজ ঘটি মাজার দরকার হয় না কি? হঠাৎ দেখি একটা ফিলসফিক উত্তর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—দেখতে দেখতে বহু বছর কেটে গেল, না? কৌন্তেয়র বড় অফিসার হবার কথা ছিল বটে, আমিই কথা দিয়েছিলাম; ওরা যে ক্যাটেগরিকে ক্যাটার ক'রে, আমাদের ডাইরেক্টলি কিছু করা সম্ভব,—আপনাদের নিউজে তো তা নয়। কাজ ভাল করত তো। প্রমোশন চ্যানেলটা আরও একটু প্রগ্রেসিভ্ করার জন্য আমি দিল্লীর ওপর বহু দিন থেকেই চাপ দিয়ে আসছি। বেশী কিছু করতে পারি নি; তবে দু'চারজন ট্যালেন্টেড লোক—যাঁরা সত্যিই যোগ্য, তাঁদের প্রমোশন দিয়ে অন্য স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁরাও খুশী, আবার আমিও খুশী।

টক্ ক'রে মাথায় এল, তিনি খুশী, তার অনেক কারণ আছে। সাম্রাজ্য চালাতে গেলে কিছু এমন লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, যাঁরা প্রকৃতই সংস্কৃতবান বা জন্মসূত্রে যাকে বলে জিনিয়াস্। এঁরা সময়মত বেরিয়ে না গেলে একনায়কশাসন কি কখনই সম্ভব? এঁদের কাছ থেকে যদি পথটা একবার কন্টকমুক্ত করা যায়—তবে সেই পথে রাজার পুত্তুররা চলতে গিয়ে দেখেন, আকাঙ্খিত পথে এবার বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে।

(প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, দিল্লীর এক আলোকিত কক্ষে এক রাজার পুত্তুর সোফা-কাম্‌-বেডের খুব সৎব্যবহার ক'রে বুরোক্র্যাসির অনেক দরজা পেরিয়ে যান। যিনি করতেন তিনি এখন অবশ্য স্বর্গে গেছেন, অথচ যিনি বেঁচে আছেন, তাঁর এখন অনেক উচ্চগতি। সাবানের দাম বেড়েছে কি আর সাধে? এসব বড় জোর মনে মনে ভাবা যায়। বলতে নেই।)

—তাহলে বলছেন, —নারায়ণ সামন্ত অনেকটা নিশ্চিন্ত নিরালম্ব কণ্ঠে বললেন—কৌন্তেয়কে আপনি পাঠান নি ?

(কি বিপদ! কৌন্তেয়কে পাঠাব আমি? দিল্লীর সঙ্গে মানুষটির যেরকম দহরম্‌মহরম্‌—শেষকালে আমার চাকরীটাই যাক্‌ আর কি! মাথা খারাপ) ?

আমি মাথা নেড়ে জানালাম—না। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন---এই দেখুন, ভুল হয়ে গিয়েছিল, আমিই তো ওকে সেই লিষ্টটা তৈরী করতে পাঠিয়েছি। বড় দেরী হয়ে গেল,—মাপ করবেন। আসলে কি জানেন, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, এভাবেই রেডিও চলছে, চলবেও। আমাদের কাজ কি জানেন তো— ? আমাদের কাজ, মাঝে মাঝে একটু নাড়া-চাড়া দেওয়া এবং সাড়া জাগানো। যাতে কিনা জগদ্দল পাথরে আমরা চাপা না পড়ে যাই। বুরোক্র্যাসির ঐ এক দোষ, সব ভুলিয়ে রাখে, বুঝলেন না—রীতিমত ওলট-পালট ক'রে দেয়। তাই বলছিলাম মিঃ রায়, অঘটনপটিয়সী থেকে সাবধান!

কথাটা শুনেই খেয়াল হল, স্বাতীর থিসিস পড়ে আমার শরীর-চেতনা যেরকম খোলস ছেড়ে মাটিতে পড়ে ছিল বেশ কিছুক্ষণ, সেরকম মানুষের বা সহকর্মীর বা সাবর্ডিনেটের দুর্বলতার লিষ্টটাকেই তো আমরা সব হাতড়ে বেড়াচ্ছি। কে কাকে কখন উঠিয়েছে বা আছাড় দিয়ে ফেলেছে, কোন্‌ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কে কাকে অপারেশন ক'রে বাদ দিয়ে দিয়েছে, বা এক জনের ক্ষমতা খর্ব করতে কে কাকে স্রেফ্‌ ট্রান্সফার ক'রে ছেড়েছে— সেটা জানলে যে নিজের পথই আলোকিত হয়। সেই লিষ্টটার দিকেই তো সবার নজর। কে যে সেই লিষ্টটা কার হাত থেকে বাগিয়ে বা হাতড়ে, ইদানীংকালে রাজনৈতিক পাশা-খেলুড়েদের মত কলকাঠি নাড়াতে চাইছে, রেডিওর ব্যাপার-স্যাপার বোঝা দায়—যারা ভেতরে আছে, তাদের পক্ষেও ঠিক ঠাওর করা একটু মুশকিল। ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন্‌ এমন জিনিস,

যা সাল-খন-তারিখ মিলিয়ে হাত ধরে চলে না—বহুদিনের সঞ্চিত বোধ বা কর্মসাধনা জমাট বেঁধে বেঁধে তার থেকে জন্ম নেন বা গড়ে ওঠেন এক-একজন আদর্শবান পুরুষ। দিশেহারা সামুদ্রিক ঝড়ে তাঁরা তখন এক-একটি আলোকবর্তিকা।

ইতিহাস বা ঐতিহ্য একবার সৃষ্টি হয়ে গেলে, যাঁরা সেই ইতিহাসের হোতা বা ঐতিহাসিক চরিত্র—পরবর্তীকালে তাঁরাই নানা নামে ঘুরেফিরে আসেন, শারীরিক কোন নিয়মে নয়, আত্মিক প্রয়োজনে। এঁদের মহান ট্র্যাডিশনে পুষ্ট হয়েও যাঁরা অক্ষমতায় পরবর্তীকালেও অজ্ঞাত, কুখ্যাত অথবা ব্যক্তিত্বহীন রয়ে যান অথচ বড় বড় আসন অধিকার ক'রে বসেন—তাঁরা তখন অবাক হয়ে দেখেন—যে ট্র্যাডিশনের অঙ্কুর প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল—সেটাই নানা ভোল্ পালটে এক অদৃশ্য কার্য-কারণ হয়ে গেছে এবং পরবর্তীকালের ঘটনাগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। তাই সিজারের চেয়ে সিজারিজম, ডালেসের ডালেস-ইজম, ম্যাকার্থারের চেয়ে ম্যাকার্থাইজম বা রেগনের চেয়ে রেগেনিজমের অনেক বেশী শক্তি বা বলা ভাল, তার অদৃশ্য হাত আরও অনেক বেশী জোরাল খেল্ দেখায়।

সেটা ভেবেই বোধহয় সন-তারিখ বা কার্য-কারণের সূক্ষ্ম কেমিক্যাল্ অ্যাকশন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নারায়ণ সামন্ত হেসে উঠলেন—ভাবখানা এই, দেখ, যা আমি চেয়েছি, তাই হয়েছে—অদৃশ্য হাতে রেডিওর ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেছি। আমার কি ভয়ানক শক্তি, একবার চেয়ে দেখ। তোমরা যারা আমার অপজিশন—যারা এবং যেসব ফরমিডেবল্ লোক থাকলে ইতিহাসটা অন্যরকমভাবে গড়ে উঠত—মহৎ এক অদৃশ্য ট্র্যাডিশনের সুতো খেলিয়ে দেখো—এক এক ক'রে সব তাদের বিদায় দিয়েছি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—সব। এখন এই রাজ্যে আমিই সর্বময় কর্তা। অপজিশন্ নিশ্চুপ বা অথর্ব। জীবনে যদি একটা লক্ষ্য থাকে এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য থাকে আত্মবিশ্বাস আর একটু ভাগ্য—তাহলে কি, ঠিক কিনা—কার্যসিদ্ধি এক টিপ নস্যি নয়? হাঃ—হাঃ—হাঃ।

শ্লেষ হাসি শব্দ ক'রে ছড়িয়ে নারায়ণ সামন্ত আবার 'স্টীল' হয়ে বসে রইলেন। নানা চরিত্র তখন নানা সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পার্ট শুরু ক'রে দিল। একাডেমীতে সাতটা টাকা দিয়ে আমি প্রায়ই নাটক দেখি—খুব এক্সপেরিমেন্টাল্, জীবনমুখী সব নাটক—ওগুলো আমার মানসিক বিকাশ ঘটায়।

তখন রেডিওর আর একটা নাটক দেখছিলাম। এবার স্টেজে এসে দাঁড়ালেন দিল্লীর এক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, রীতিমত সুটেড্-বুটেড্, এবং মুখে পাইপ। আন্তর্জাতিক বিষয়ের নানা জটিল বিষয় ভাবতে হয় বলে হাতে সীমিত সময়। তাও তিনি দেশের-দশের উপকার হবে ভেবে, কলকাতা রেডিও স্টেশনের একটা বড় কেলেঙ্কারী এন্‌কোয়্যারী করতে এসেছেন। কলকাতার লোক তাঁর নামধাম জানল না, কারণ তিনি নামধাম জানাতে চান নি। যে দুচারজন জার্নালিস্ট্ কোন স্কুপ্ খবরের আশায় কানাঘুষো শুনে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন—তাঁদের তিনি নিরাশ করেছেন। বলেছেন,—সরকারী কাজ যত কম জানাজানি হয় তত নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব। কাগজে লেখাটেখা হলে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব এমব্যারেসিং হবে। তবে কিছু না বললেও এমন লোক আছেন বা তাঁদের চেহারাই এমন পল্লবিত যে দেখলেই বোঝা যায় কোন বড় বুরোক্র্যাট্ বা স্কলার অথবা স্বনামধন্য কোন মানুষ।

তিনি এসে দাঁড়াতেই ঘাড়ে-গর্দানে অতিব মাংসল মানুষ নামক জন্তুটি—'হায়, কী হল, হায়, এ কী হল', বলে কাশির গঙ্গা থেকে উঠে এল। বলল—আমি মরে গেছি, আমাকে বাঁচান স্যার। বিবেকটা পুরোপুরি খুইয়ে ফেললেও পঞ্চম বিবাহ ক'রে বোধহয় একটু ভয় ঢুকেছিল এবং তাই তিনি এতদিন কাশীর গঙ্গার জলে ডুব দিয়েছিলেন। পঞ্চম স্ত্রী কলকাতায় স্বামীর খোঁজ করতে এসেছেন অফিসে; তখন বহুবল্লভ নানা মহিলা ও মেয়েকে টেলিফোন ক'রে ক'রে এপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছিলেন—। কাউকে বলছিলেন, ছবি ছেপে দেবেন, কাউকে আসতে বলছিলেন কারণ তার মধ্যে নাকি লেখিকা হবার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে আর কাউকে-বা বলছিলেন, আমেরিকা-লণ্ডন-ফেরা মানুষের মতই ভয়ানক ব্যস্ত, একটুমাত্র সময় আছে লাঞ্চ আওয়ারে, তবে অপর পক্ষের সম্মতি থাকলে, তার সদ্গতি হতে পারে। অপর দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতাজনিত নিমন্ত্রণ—তাহলে না হয় আমার সঙ্গেই লাঞ্চ ক'রে নেবেন। —নিশ্চয়, হাঃ হাঃ, নিশ্চয়। টেলিফোনটা রেখে একটা মোষ বা শূকর ঘোঁত ঘোঁত ক'রে উঠল।

টেলিফোনটা রেখেই তিনি বিপদ বুঝে পঞ্চম স্ত্রীকে অফিসে বসিয়ে রেখে কেটে পড়লেন। সেই পঞ্চরত্না স্বামীর অপেক্ষায় কতকাল অফিসের সেই সিটে বসে আছেন, কেউ বলতে পারে না। ঠিক যেন ইলেক্ট্রিকিউটেড্

ভঙ্গী, সতীসাধ্বীর সহমরণ। স্টেজে উঠে এসে স্বনামধন্যের সামনে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত—আমাকে বাঁচান, স্যার। সারা জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকবো। একবারটি বাঁচিয়ে দিন, স্যার।

তখন বিচারক ধর্মাবতার ঘাড়ে-গর্দানের জন্তুকে উদ্দেশ ক'রে তার অপ-কর্মের এক লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। এক-একটা অভিযোগ বলে যাচ্ছেন, আর জন্তু মাথা নাড়ছে। অবশেষে বললেন—ব্রাহ্মণ-কুলিন প্রথা এই প্রগ্রেসিভ্ দেশ থেকে কবে উঠে গেছে, আপনি কি টের পেয়েছেন? মাথার চুল নড়ে, ঘাড়ে-গর্দানের মাংস নড়ে। অক্সফোর্ডে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের মূল পাণ্ডুলিপি টুকে নিয়ে এসেছিলেন? ঘাড় নড়ে। অন্যের লেখা একটু অদলবদল ক'রে নিজের নামেই চালিয়ে দিয়েছেন, না? কাগজের হিসাব নেই—না?

জন্তু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কপালে ঘাম, চোখ দু'টিতে অনুতাপের আগুন, মুখে আদিম একটা লোভ নিয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। একটু সামলে নিয়ে বলল—যদি স্বীকার করি সবই সত্যি, তাহলে কি স্যার, বাঁচতে পারবো? যা হবার হয়ে গেছে স্যার। বাঁচার এখন উপায় বলুন।

ধর্মাবতার বললেন—বাঁচার আর কোন উপায় রাখেন নি, আপনাকে সাসপেণ্ড করা হল। তবে যেহেতু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছেন, তাই বলছি, প্রত্যেকেই স্বাধীন নাগরিক, কারুর মাথায় হাত বুলিয়ে যদি কেস্ চালাতে পারেন—না, না আমি কিছু বলছি না। তবে পাপ ক'রে কান্নাকাটি করার ব্যাপারটা খুব নন-প্রগ্রেসিভ্। দেশের ক্ষতি হয়।

কেস্ চালিয়ে সত্যিই যেদিন জন্তু জিতে গেল—সেদিন থেকে আবার ঘুরে-ফিরে টেলিফোন। —হ্যাঁ, নিশ্চয়, লাঞ্চ আওয়ারে, একমাত্র সময়, কাল যাব লণ্ডনে, পরশু আমেরিকায়। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আজই যা একটু সময়—ইনটারেস্টেড্ থাকেন তো তার সদগতি হতে পারে।

নারায়ণ সামন্তকে স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকতে দেখে আমার এত কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখন ভাবছিলাম, বাঙালীর মস্ত বড় গুণ, তার স্বভাবটা পালটায় না। এ-ব্যাপারে নিশ্চয় সে অজেয়, অমর।

নারায়ণ সামন্তের মস্ত সুবিধে, মাঝে মাঝে তিনি স্ট্যাচু হয়ে যেতে পারেন, কারণ—যদিও অনেক ঘটনা তাঁর চোখের সামনেই ঘটে, তিনি এই মহৎ গুণে নির্বিকার থাকতে পারেন। সব কিছু দেখতে নেই, নিজের ক্ষতি হয়। অতএব দেখলেও না দেখার ভাণ করাই নিরাপদ। সারা দেশের

অধিকাংশ রাজনীতিবিদরা যেমন স্ট্যাচু হয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে জেগে উঠে আপ্তবাক্য ছাড়েন—তাই তো, দেশের তো তাহলে বেশ উন্নতি হচ্ছে! হচ্ছে বই কি, নিজেরা আমরা যখন কেউ থেমে নেই, তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় এগোচ্ছে এবং ব্যালেন্সে দেখা যায় যোগফল ঠিক মিলে যাচ্ছে। কি পছন্দ হল না, না?

আমি কতক্ষণ চুপ ক'রে বসে বসে আবোলতাবোল ভাবছিলাম, হঠাৎ ধীমান দিগম্বরের কথা মনে পড়ে যাওয়ায়, মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম—তবে তিনি তো শুনেছি সঙ্গীতের অসাধারণ বুঝদার মানুষ ছিলেন, তাঁকে আপনি তাড়ালেন কেন?

এসব কথার কোন উত্তর নারায়ণ সামন্ত কখনও দেন না; তিনি ভঙ্গী ক'রে যথারীতি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তখন কোন এক সূত্রধর এতক্ষণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে হয়ত আরাম করছিলেন, হঠাৎ লাফ দিয়ে করিডরে আমাকে ডেকে নিয়ে সে কি তাঁর হাসি, রীতিমত দেখবার জিনিস।

আমার বিস্ময় ভাবটা দেখে বললেন—অঙ্কেতে আপনি নিশ্চয় খুব কাঁচা, না? কখন ও কোন্ অবস্থায় একছত্র সম্রাট হওয়া যায়, জানেন? সব কাজের ফাঁকে সুযোগের ফাংনা কখন নড়ে যদি সেটা আপনার হিসাব বুদ্ধির মধ্যে থাকে। নারায়ণবাবুর সাধ্য ছিল না ইচ্ছেমত চাকা ঘোরান। সেই চাকাটা যখন একদিন এক ব্যারিষ্টারের পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল—ব্যস, সেই সুযোগে চাকাটাই বাদ পড়ে গেল। সোফা-কাম-বেডের ব্যাপার মশাই, বোঝা দায়! তা বাবাঃ তুমিও তো ধোওয়া তুলসী নও, ভাগ্যগুণে ইতিহাস হয়ে গেছ বলে এখন সুরক্ষা তোমার হাতের মুঠোয়, তাই। দিগম্বরকে এক আঁচড়ে রেডিও থেকে একেবারে 'মাষ্টার ভয়েস' ক'রে ছেড়ে দিয়েছ! আপনাকে দেখছি উনি—ঐ যে তিনি, আজকাল খুব খাতির যত্ন করছেন! বেশী লিবার্টি নেবেন না যেন—আপনাকেও একদিন তাহলে স্ট্যাচু বানিয়ে ছেড়ে দেবে। দিল্লীর লোক তো, তাই সাবধান ক'রে গেলাম।

পরদেশী আমি, অত তাড়াতাড়ি স্ট্যাচু হয়ে বসলে স্বাতী তার রিসার্চের শেষ পর্যায়ে কাজ নিয়ে মহা বিপদে পড়বে যে। তাই আমি সূত্রধরকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখি রুদ্ধ হালদার দাঁড়িয়ে। বলল—চলুন, আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

এরকম তো কথা ছিল না। আজকে সকাল থেকেই আমার মাটি খুঁজতে গিয়ে উল্টোপাল্টা সব ব্যাপার ঘটছে।

আমি যখন অনেক ঘাট পেরিয়ে বাঙালীর কীর্তির আবার তারিফ করতে পানিহাটী গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম গঙ্গার ঘাটে, একটা রিক্সার পরিবর্তে ঝরঝরে একটা গাড়ি। যিনি গাড়ির চালক, দত্ত না কি যেন নাম, রুদ্ধ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, এখন ঠিক মনে পড়ছে না, নামটা যাই হোক—নিশ্চয় খুব স্পোর্টস্‌ম্যান। পানিহাটীর ছোট্ট গলি দিয়ে তিনি যেভাবে আমাকে চালিয়ে নিয়ে রুদ্ধের বাড়িতে হাজির করলেন, সেই বিস্ময় আমার তখনও কাটে নি। আমি বাড়িতে বসে, রুদ্ধ হালদারের হাসিখুশী স্ত্রী ও হাসিখুশী মেয়ের আদর-আপ্যায়ণে খুশী হয়ে ভাবছিলাম, হাসপাতালে পা ভেঙ্গে যেখানে শুয়ে থাকার কথা, সেখানে লেহ্য-পেয় খাবার সুযোগ মানুষের কি করে হয়?

রুদ্ধ আমাকে অনেক কিছু দেখাল, মন্দির, ঘাট, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কুটির, চৈতন্য কোন্ ঘাট দিয়ে এসেছিলেন, ভাঙ্গা নাটমন্দির, একটা গরু জাবর কাটছে, মেলা হয় কোথায় এবং অবশেষে কালীমন্দির। —এখানেই চৈত্র সংক্রান্তিতে বড় মেলা হয়, দূর দূর থেকে লোকজন আসে। মহাতীর্থ। আর এই যে কালীমন্দির দেখছেন, এটা ছিল ডাকাতদের কালীমন্দির। ডাকাত-ভক্ত মন্দিরে দাঁড়িয়ে প্রসাদ নিলাম। কি জানি পলিটিক্যাল ডাকাতি ছাড়াও, রাস্তাঘাটে বা ট্রেনে যেরকম ডাকাতি দিন দিন বাড়ছে, দেশে যে একটা সরকার আছে এবং তাকে ভয় পাওয়া উচিত, মনেই হয় না। ট্রেনে, বাসে, ব্যাঙ্কে, পথে-ঘাটে বিপদে পড়লে প্রসাদের মাহাত্ম্যে হয়ত মিরাকুলাসলি বেঁচে যাব। দেশে যখন সরকার বিপন্ন, তখন ভগবানই একমাত্র ভরসা।

একটা লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল। দিল্লীর লোক শুনে লোকটা কাজকম্ম ফেলে আমাদের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত এল। মরামুণ্ডু নিয়ে নাকি আমাবস্যার রাত্রিতে বসে; খুব শক্তি পেয়েছিল। নিজের আহাম্মকিতে সব খুইয়েছে। অন্যকে মারতে গিয়ে, বাটি চালান বা ঐ ধরণের কিছু মন্ত্র চালান করতে গিয়ে, নিজের ছেলেকেই হারায়। যাকে বলে বুমেরাঙ্গ। এসব কথা রুদ্ধই আমাকে বলছিল।

রুদ্ধ ততক্ষণে আমাকে এনে হাজির করেছে করপোরেশনের একটা বিদ্যুৎচুল্লির সামনে। এটা থেকেও নেই, চালাবার লোক নেই। বেশী

মাতব্বর থাকলে যা হয়। লোকেরা কোন সুবিধে পাচ্ছে না—অযথা টাকা খরচ। ওয়েস্টেজ্‌। তবে ঐ যে লোকটাকে দেখছেন,—বলেই রুদ্ধ ডাকসাইটে গলায় চিৎকার ক'রে উঠল—এই পলাস, কোথায় যাও, দিল্লীর লোক। লোকটা গঙ্গাস্নান করছিল, আগে থেকে বলা ছিল কিনা জানি না, গঙ্গার পাড় দিয়ে দৌড়ে আমাদের দিকেই আসছে। দূরে দূরে গাদা বোট, বহু লোক গঙ্গাস্নান করছে।

রুদ্ধ বলল—প্রণাম কর। দিল্লীর মহামান্য লোক। খুশী থাকলে সুবিধে হতে পারে।

দিল্লীর লোকের অত ক্ষমতা জেনেও লোকটা ফোকলা দাঁত দেখিয়ে নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। রুদ্ধ ব্যাখ্যা ক'রে—ব্রাহ্মণ কিনা, তাই ইতস্ততঃ করছে। কি করবে বলুন, কোথাও চাকরী নেই। পশ্চিম বাংলার কি অবস্থা আপনারা ভাবতেও পারবেন না। ব্রাহ্মণ হয়ে শ্মশানে ডোমের কাজ করে। ওদিক থেকে তার বউ-ছেলেমেয়ে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। ভাবছিলাম, সাহেবদের কল্যাণে বাঙালীর না-জানি একদিন কত সুনাম বা হাঁকডাক ছিল। সাহেবরা যখন পেরে উঠত না—বাঙালীই তখন দেশটাকে চালিয়েছে। এটা ভেবে হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, বউটা ঘোমটার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—দেখবেন বাবু, ঐ বিজলী চুল্লিটা যেন চালু না হয়, আমরা তাহলে শ্মশানের মড়া পাব না, না খেতে পেয়ে মরবো।

আমার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মানুষের কত রকমের দুঃখ। ব্রাহ্মণ, তাও মড়া নিয়ে ভাবছে! আমি তাকে পলিটিক্যাল লিডারদের মত অনেক আশ্বাস দিয়েছিলাম। যদিও জানি, প্রগতির নামে যদি বিজলী চুল্লী মড়া পোড়াবার কাজে লাগে, আমি হরিদাস পাল, আমি রুখি কি সাধ্যি।

আশ্বাস দিয়েই আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম। মরা-মুণ্ডু নিয়ে যে শব-সাধনা করে সেও আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল--দিল্লীতে গেলে নাকি আমার সঙ্গে সে দেখা করবে। দিল্লীতে কত রকম বাটি চলে তার ঠিক নেই—মাঝখান থেকে আবার মন্ত্রপূত বাটি আরও কোন বিপদ না ঘটায়। আমার খুব ভয় ধরে গেল। তাড়াতাড়ি ঝরঝরে গাড়িটায় উঠে বসলাম, ওটাকে তখন আমার আমেরিকান পেল্লাই গাড়ি মনে হচ্ছিল। পাগলা বাড়িতে আসবে বললে ভদ্রলোকের যা অবস্থা হয়।

॥ পঁচিশ ॥

এ ঘর থেকে অন্য ঘরে গিয়ে দেখি লোড্-শেডিং। রবি চৌধুরীর ঘরের এক কোণে মোটা ওয়েস্টলাইনের মোমবাতি জ্বলছে। শুনলাম রবি চৌধুরী ঘরে নেই, কখন আসবে তারও ঠিক নেই, কারণ কলকাতায় নাকি ট্রাম-বাসের স্ট্রাইক। এক দল বলছে স্ট্রাইক হবে, অন্য দল বলছে—না।

ঘরের অন্য একদিকে স্বাতী বসে, রুবির সঙ্গে হাসিগল্পে মশগুল। সব দেখে শুনে মনে হল চিরন্তন কলকাতার এই চিরন্তন রূপ। রবি চৌধুরীর চরিত্রটাও তাই। এই আছেন এই নেই; কোথায় থাকবেন, কখন আসবেন কেউ বলতে পারে না, রুবিও বলতে পারল না। লোড্-শেডিং কেন হয় এ প্রশ্ন করে লাভ নেই। মোমবাতির স্বল্পালোকিত আলোতে স্বাতীকে আর একবার দেখলাম। বাঙালীর অতীত ও ভবিষ্যৎ মোমবাতির আলোতে যেন ভাসছে। আমিও এক কোণে বসে আছি। কথা বলতে একেবারে ইচ্ছে করছিল না, তবুও এই মুহূর্তে যে-প্রশ্নটা আমার করা উচিত—সেটাই আমার মুখ দিয়ে বেরুল—রবি চৌধুরীর ফিরতে কি দেরী হবে? কলকাতায় আজকে কি হয়েছে?

—ও, নিউজের লোক হয়েও তা বুঝি জানেন না? কংগ্রেস আই স্ট্রাইকের ডাক দিলে অন্যরা বাজ পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্ট্রাইক করার অধিকার কি শুধু মেহনতী পার্টির? বলেই রুবি হাসতে থাকল—কলকাতায় এদের বাস, এরা জানে কখন একটা গম্ভীর কথা বলে কখন চুপ ক'রে যেতে হয় কিংবা কোন্ প্রশ্নের কোন্ সরস উত্তর। রুবি উঠে গেল, বলল—দাঁড়ান, কফি দিতে বলি।

রুবির কথা শুনে এক্ষুনি আমি ভাবছিলাম, দিল্লীর লোক হয়ে, এমন কি নিউজের লোক হয়েও, কলকাতার খবর ঠিক রাখা যায় না। কখন যে কি ঘটবে এবং ঘটছে আমার পক্ষে সব সময় ঠাওর করা মুশকিল। আজ বিকেল থেকেই আমি হাওয়া। জানি না, অফিসে নিশ্চয় আমাকে নিয়ে খোঁজাখুঁজি পড়ে গিয়েছিল। যদিও কেন জানি বুঝে গেছি, অফিসে আমার উপস্থিতি

কারুর আর বেশী কাম্য নয়। না থাকলেই ঐ নানা দল আর নানা পলিটিক্স খুশী। তাছাড়া কেউ থাকল বা না থাকল তাতেই বা কি এসে যায়—খবর দেবে—সেটাই তো খবরের মূল কথা। কি খবর দেওয়া হবে না হবে, সে নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের একেবারে পরিপন্থী। সুতরাং বুঝতে পারছি আমি খুব দ্রুত অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠছি; আমার উপস্থিতি কলকাতার অপমান, স্বাবলম্বী হবার পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা। বাস্তবিক এসেছিলাম অনেক 'ইগো' নিয়ে। ভেবেছিলাম কলকাতার স্টেশনের, বিশেষ ক'রে নিউজ বিভাগের নিশ্চয় কিছু পরিবর্তন আনতে পারব। বুঝতে পারছি সব কাজ সবার নয়।

যেমন কলকাতায় লোড্‌-শেডিং হয় কেন আজ আর তা কারুর অজানা নয়। হয়, হয়ে থাকে এবং শক্তিকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নিয়ে গেলে অভাবনীয় এক অবক্ষয় দানা বাঁধতে বাধ্য—যার কার্যকারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলাই বিপজ্জনক। কেউ যে খুব দোষী, তাও নয়; কারুর যে কিছু করার আছে তাও নয়, কেউ যে এর থেকে উত্তরণ দেখাবে সেও যেন সুদূর এক অনাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন। প্রতিবাদে সোচ্চার হলে আজকাল আবার জীবন নিয়ে টানাটানি। আমার মধ্যে ক'দিনের মধ্যে যে চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে—তাতে আমি বুঝতে পারছি, এই মধ্যশ্রেণীর রাজনীতি ও অবক্ষয়ের সূচনাকালে রেনেসাঁসের ভাঁওতা না থাকলে, আজকের মত আত্মসচেতনতাটুকু খোয়া যেত না। উপায় শুধু চুপ ক'রে থাকা; হৃদয়ে যন্ত্রণা যদি কখনও হয়, তবু প্রতিবাদী মনটা শিকেয় তোলা থাক। গোটা শহরটা এখন ফুলে-ফেঁপে অস্থির, 'সারা শরীরে সেই অস্থিরতার বিস্ফোরণ', উপায় শুধু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখা এবং কিছু করার না থাকলে চুপ ক'রে থাকা।

আলো-ছায়ায় দেখলাম স্বাতীর মুখে গাম্ভীর্যের কয়েকটি রেখা। জিজ্ঞেস ক'রে লাভ নেই, কারণ সূচনা ও পরিণতির মধ্যে যে বেদনার সুর, তারই মেঘ দেখছি মুখে। ঘরে ঢুকেই মোমবাতীর আলোতে অবশ্য মনে হয়েছিল, এ আলোটুকুর মধ্যে যত বড় রাজনীতির কেলেঙ্কারির ইতিহাস থাক—এর অন্য অর্থে এটা নিশ্চয় কোন শুভ সূচনার ইঙ্গিত। নয়ত কেকের সঙ্গে মোমবাতির আলোটুকু দরকার হয় কেন? ছোটবেলায় মাদুর বিছিয়ে গোল হয়ে বসে হ্যারিকেনের আলোতে পড়াশুনা করতাম। এতে পড়াশুনা কতটা হয় জানি না, তবে মানুষের সঙ্গে তার যে ছায়াও ঘোরে—ঐ বোধটুকু জাগে। দলে

পড়ে বাঙালী যেমন মিরাকেল্ ঘটায়—বিপদে পড়লে বাঙালী তেমনি স্বাবলম্বী হতে জানে। অন্ধকারের পাশেই আলো ; লোড্-শেডিং, (আবার কেন জানি ভাবলাম) বাঙালীকে আলোকিত হতে উদ্বুদ্ধ করছে। গাড়ির ব্যাটারিতে দিব্যি ড্রইংরুম আলোকিত। ব্যবসায়ীরা পলিটিক্সের তোয়াক্কা না ক'রে জেনারেটর্ লাগাচ্ছে তাদের কর্ম প্রচেষ্টার মবিলিটি এনে।

আমি যে খুব বর্তমান নিয়ে ভাবছি তা নয়। অতীতের কোন একটি পাতা খুলে আমি স্বাতীকে প্রশ্ন করেছিলাম—খুব যে খুশী খুশী লাগছে, কি হল ? প্রেমে পড়েছো ?

—কবেই তো—দেখেন নি ? চোখ নেই ?

—চোখ আছে, দৃষ্টি নেই। অনুপযুক্ত লোকের কাছে আমি জানি ভালবাসার কথা বলতে নেই ?

—আপনার কাছে এলে আমার যে কী হয়—স্বাতী সেদিন চেপে গিয়েছিল। কথাটা শেষ করে নি।

আমি কথাটা শোনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম—কি হয় স্বাতী ?

—জানি না, কি হয়! আমার যন্ত্রণা আপনি বুঝবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব-রূপসা নদীর ঢেউ ছলাৎ ক'রে উঠেছিল বুকে। আমি স্বাতীকে কাছে টেনে চুমু খেয়েছিলাম। ও বাধা দেয় নি। ওর চুড়িগুলি নিয়ে আমি খেলছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার সাহস বেড়ে গেছে। ভালবাসা—সে কত বড় দুঃসহ এক ট্র্যাজেডী জানি না—ভালবাসা, তবু সে নতুন ভাবে, নতুন ক'রে অঙ্কুরিত হতে চায়।

স্বাতী তখন রহস্যজনক হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—চা-কফি হবে না ? আমরা কি যে-যার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবো ?

আমিও হেঁয়ালী করার সুযোগ ছেড়ে দিই নি, বলেছিলাম—হৃদয়ের তৃষ্ণা কি সবসময় চায়ে মেটে ?

ওর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটাকে আমিও তখন আরও স্পষ্ট করতে চাইছি—এবং স্বাতীও বোধহয় সে প্রশ্নটা আর এড়িয়ে যেতে চায় না।

স্বাতী জানতে চাইল—হৃদয়ের তৃষ্ণা কি ভাবে মেটে ?

হেসে বলেছিলাম—হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে ভালবাসায়। স্বাতী আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে শব্দ ক'রে হেসে উঠেছিল। বড় রহস্যজনক স্বাতী ; ধরা দিয়েও ধরা দেয় না। ঠিক যেন স্বপ্নের মত। আবোলতাবোল ব্যাপার।

স্বাতীকে যখন আরও বুকের কাছে টেনে নেব ভাবছি, তখন এ-হাসি যেন মনে করিয়ে দেয়, ও চেতনার কোন শাশ্বত বোধ, শরীর নয়। এরকম টানাপোড়েনের সময় একটু ব্যঙ্গ বা হাসির বিস্তীর্ণ অবকাশে আমি কেমন যেন ভড়কে যাই! হয়ত ভীষণভাবে ভড়কে গিয়েছিলাম, আর আমার ঐ ভড়কান মুখ দেখে স্বাতী হেসে অস্থির। এগিয়ে গিয়ে ঘন্টি বাজিয়েছিল, বলেছিল—অমরেশবাবু যখন অন্যভাবে তৃষ্ণা মেটাতে চান—তখন না হয় এক কাপ কফির অর্ডার দি—কি, ঠিক আছে তো?

বেয়ারা এল—স্বাতী নিজেই অর্ডার দিল—দু'কাপ কফি।

বেয়ারা সেলাম ক'রে চলে গেল। এক অতীন্দ্রিয় জগতে আমি ভাসছিলাম। মধ্যবয়সের রোমান্টিকতা, মেঘ-রৌদ্র-ছায়া-অরণ্য-বনপথ-সমুদ্র-গভীর প্রাণোচ্ছ্বাস নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে; অভিজ্ঞতার ভরা-পেটে সহজ কথাটার জন্য আমি তখন শব্দ হাতড়াচ্ছি।

তবু বললাম—দু'কাপ কেন?

—একা তৃষ্ণা মিটিয়ে কি হবে?

স্বাতীর কথায় অনেক সিম্‌বলিক্ অর্থ। ভালবাসার সূর্যোদয় হয়েছিল সেদিন।

—দু'কাপ না হয় তুমিই খেও, তৃষ্ণা যখন তোমার একটু বেশী।

—আপনার? আপনার বুঝি তৃষ্ণা নেই?

—কি মনে হয়?

—খুব আছে।

—আর তোমার?

—আমাদের তৃষ্ণা থাকতে নেই। সমাজ বরদাস্ত করে না, এখনও—এই বিংশ শতাব্দীতেও।

—তবে যে কত ভালবাসা হয়, কত ঘর ভাঙ্গে, সেটা কী?

—মোহ এবং রিয়েলিটি।

—আর এটা? বিমূর্তময়ী স্বাতী প্রতীক কথাবার্তা বলতে চাইছে, আমিই বা কম যাই কেন? তাই বললাম—এটাও ভালবাসা এবং ঘর ভাঙ্গা, কি বল? একটু থেমে আবার আমার একই প্রশ্ন—তফাৎ নেই?

—ভালবাসার তফাৎ আছে, সেটুকুই তফাৎ। স্বাতীর মুখে শব্দগুলো যেন নতুন অর্থে অর্থপূর্ণ।

—এখানে কতটুকু তফাৎ? আমি একগুঁয়ের মত একই কথা নিয়ে খেলছিলাম।

আমার মনে পড়ে গেল স্বাতী বলেছিল তফাৎ এটুকু যে, তফাৎ যে আছে তাও বোঝা যায় না। স্বাতীকে তখন আমার একটা বিমূর্ত পেইন্টিং মনে হচ্ছিল। কথাগুলো রঙ ছড়িয়ে এক একটা আঁচড়ে যেন আকাশ-জোড়া আলপনা দিচ্ছে। রুবি বলল—কি অত ভাবছেন? এখনও কফি খান নি? বুঝেছি রবির জন্য হয়ত দুঃশ্চিন্তা করছেন, না? আরে, ও যদি উন্ডেড্ হয়, তাও ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে আসবে। জানেন ওদের সাহসের কাছে আমরা আজকাল পেরে উঠি না। ও মাঝে মাঝে বলে দেখবেন, আমরা নাকি বুর্জুয়াজী দল, চিরকাল ভেস্টেড্ ইনটারেস্টের স্বার্থ দেখেছি, আমরা স্ট্রাইকের কি বুঝি? এবং মেহনতী জনতার স্বার্থ বিপন্ন হলে মেহনতী জনতা সরকার নিজেই স্ট্রাইক কল্ দেবেন। সেই সুযোগ্য অবসরের জন্য আসুন আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করি।

রুবির অভিযোগের মধ্যে কলকাতার সত্যিকারের চেহারা ফুটে ওঠে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

যদিও তখন আমার হাত থেকে অতীতের ছেঁড়া-পাতাটা খসে গেছে এবং আমি বিপন্ন কলকাতায় তখন ফিরে এসেছি। রুবির কথার তাই কোন উত্তর দিতে পারলাম না। ভদ্রতা রক্ষা করতেই উত্তর দিচ্ছি, প্রশ্ন করছিও ভদ্রতা করে। তবে কি রাতটা নিরাপদ নয়? স্বাতীকে কি এখনই পৌঁছে দেওয়া দরকার? অথচ যাবার জন্য স্বাতীর কোনকরম তাড়া দেখছি না। হয়ত রুবি ওকে আশ্বাস দিয়েছে রাত হয়ে গেলে রবির গাড়িতে পৌঁছে দেবে, আমি ঠিক জানি না। আমি লোড্-শেডিং-এর পরে এসেছি, ও নিশ্চয় অনেক আগে।

আমরা তখন মেহনতী জনতার প্রতিনিধি রবি চৌধুরীর জন্য অপেক্ষা করছি, কারণ কলকাতার গণ্ডোগোলে যদিও-বা লোক মরে, অন্দোলন কখনও মরে না।

পরিবেশটায় একটা অপেক্ষার মুহূর্ত যেন সারা ঘরে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। হালকা আলো-ছায়ায় আমার মধ্যে যে একটা নস্টাল্জিয়া খেলা করে, স্বাতী জানে বলেই বোধহয় এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—থিসিস পড়েছেন? আমার খুব জানতে ইচ্ছে

করছে, যা বলতে চাই, বলতে পেরেছি ?

—অত বড় কথা বলার যোগ্যতা নেই। ওটা বলবেন ডাঃ দাস। আমি শুধু লে-ম্যানের দৃষ্টি নিয়ে বলতে পারি, তুমি যে শুধু ইতিহাসের মধ্যে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছো তাই নয়, চিরকেলে বস্তাপচা কতগুলো আইডিয়াকে চালেঞ্জ করেছো। যাঁরা চিন্তাধারায় বেশ এগিয়ে আছেন, তাঁরা তোমার যুক্তির মধ্যে হয়ত নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন। কিন্তু যাঁরা শুধু চুলচেরা বিচারে সারা জীবনটা কাটাতে গিয়ে জীবনের অর্থই খুঁজে পেলেন না—তাঁরা হয়ত রুখে দাঁড়াবেন। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি—পৃথিবীতে নতুন কথা আমরা কেউ বলি না। যা-কিছু নতুন বলে মনে হয়, সেটা বলার কায়দা বা নতুন কোন ইনটারপ্রিটেশন্।

রুবি বলল—অমরেশবাবু বেশ বোঝাতে পারেন, না-রে স্বাতী? তখন দিল্লীর লোক মনেই হয় না।

আমি হেসে উঠলাম—কেন, দিল্লীর কি কোন গুণ থাকতে নেই ?

—তা কেন, রুবি নিজেকে সংশোধন করল—কিছু পড়ে তা নিজের মত ক'রে নিজের ভাবটা বোঝান খুব শক্ত, অমরেশবাবু—।

আশ্বস্ত হলাম—ও, এই কথা। হ্যাঁ, স্বাতী, যা বলছিলাম, সবচেয়ে রিভিলিং লেগেছে আমার বা তোমার জন্মবৃত্তের ইতিহাস। হাল আমলের ডিন, এ, এ প্রমাণ করেছে, জন্মলগ্ন উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার নয় ; আমরা ঘুরে-ফিরে তারই সীমিত বিন্দুতে প্রতিনিয়ত এবং নিজেদেরই অজ্ঞাতে আবর্তিত। তাই বলছিলাম, রিভিলিং লেগেছে, ঐ কথাটি, যে-কারণে এবং যে উদ্দেশ্য মাথায় রেখে ব্রিটিশরা এ দেশীয় সূতিবস্ত্র, রেশম, ধাতু-শিল্প বা সমৃদ্ধ লৌহ-শিল্প ধ্বংস ক'রে এদেশের বিশাল বাজারটা নিজেদের শিল্প বিপ্লব ঘটাতে কাজে লাগিয়েছিল, সেই একই কারণে জাহাজ শিল্পের মত অত বড় একটা সমৃদ্ধ শিল্প দেশ থেকে উধাও হয়ে গেল। এই লিংকেজ্‌কেই আমি নতুন ধরনের ইনটারপ্রিটেশন্ বলতে চাইছি।

—এই লিংকেজ্‌টাকে কি থিসিসে আনতে পেরেছি ?

—আমার বলা সাজে না। তবুও বলছি, কিছু কিছু জায়গায় নতুন ক'রে লিখলে আরও ভাল হত। তবে থিসিসটা পড়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না, জমিদার শ্রেণীকে তাদের উদ্বৃত্ত টাকা শিল্প ও বাণিজ্যে খাটাতে দেওয়া হয় নি। হয় নি, তার কারণ একটা পারস্পেকটিভ্ সামনে রেখে ব্রিটিশরা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ঐতিহাসিক যন্ত্রের মত ব্যবহার করেছিল। সেইভাবেই মধ্যশ্রেণীর জন্ম-ইতিহাসে ওরাই সহায়ক হয়েছিল। জন্মলগ্নে অত্যাচার দেখে দেখে শহরে এসে সব কিছু আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম; কৃষকদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখি নি। মধ্যবিত্ত রাজনীতি তার সমস্ত দ্বান্দ্বিক স্বভাব নিয়ে, গরম পেয়ালায় ফাঁকা বুলির মত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ওঠে; এই আন্দোলনের দৌড় কতটুকু এখন আমার কাছে স্পষ্ট।

স্বাতী বলল—মনে রাখতে হবে উনিশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বাণিজ্য শিল্পের ক্ষেত্র ছিল সীমিত; শিক্ষার প্রসার হয়েছে অথচ শিক্ষক আর 'রাইটার' ছাড়া কোথাও চাকরী নেই। তাই এ ক্রোধ ফেটে পড়েছিল কংগ্রেস গড়ার কাজে ও স্বদেশী আন্দোলনে। খেলার সময় নিজের খেল্‌ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ হয়ত একটা গোল ক'রে ফেলা যায় কিন্তু তাতে টিম্‌ ওয়ার্কের শক্তি প্রমাণিত হয় না। তেমনি স্বদেশী আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে দারুণ একটা সাহস ও মৃত্যুপণের পরীক্ষা। কিন্তু সারা দেশকে বিপ্লবের পথে নিয়ে যাবার পক্ষে এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ঠেলায় আন্দোলনটা বহুমুখী হতে পারে নি। নক্সাল আন্দোলনেও দেখলাম—সেই ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতাবাদই আর একবার প্রমাণিত হল।

কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের কারণ বা ইতিহাস একটাই। সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'-এ দেখিয়েছেন (স্বাতীকে সাহায্য করতে যার থেকে আমি এলাবরেট্‌লী নোটস্‌ নিয়েছিলাম), কৃষকদের ওপর জমিদার ও মহাজনদের সুতীব্র শোষণ ও জমি হাতড়ে না নেওয়া পর্যন্ত দিন দিন ঘাটে-মাঠে-বাটে ঘরে ও বাইরে কৃষকদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার। তা থেকে বাঁচতে কৃষকদের বিক্ষোভ, লড়াই ও বিদ্রোহ। জমিদার মহাজনদের রক্ষা করতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাব এবং বিক্ষোভ দমন। আমেদাবাদ, পুনে, দাক্ষিণাত্য, মধ্যভারত কিংবা বাংলাদেশ—সব ক্ষেত্রে শোষণের ফর্ম এক ও অভিন্ন। শোষণের চরম পর্যায়ে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ দমন করতে অতিব উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যের রণপরীক্ষা। একদিকে শাবল, তীর-ধনুক, কাটারী ও দা দিয়ে আক্রমণ, অন্যদিকে বন্দুক ও বুলেটের দাম্ভিক সাহস। সেখানে এবং সব জায়গায় জমিদার এবং মহাজনশ্রেণীর দ্রুত পলায়ন এবং ব্রিটিশ সৈন্যের পেছনে পেছনে তাদের আবার দ্রুত

আবির্ভাব। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-নীতি ও সুবিচারে জনসাধারণের সর্বত্র আস্থা। তাই 'অমর' ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থ নির্ভর-শীল—এই মনোভাবই আমাদের নির্বিকার থাকার ইন্ধন জুগিয়েছে।

এত কথা ভাবছিলাম বটে কিন্তু শুধু বললাম—ক্লাস কনফ্লিক্ট কোথায় কোথায় ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—সেটা তুমি আর একটু এলাবরেট্‌লী দেখাতে পারতে।

—আমাদের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য কেন—তার একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আমি দিয়েছি, কারণ তাহলে, আমাদের যা স্বভাব, কোন কারণে তা মলেও যায় না তার স্পষ্ট ইঙ্গিত হয়ত আমাদের ভবিষ্যতে পথ দেখাবে।

—কিন্তু বাঙালী যে প্যারাসাইটিক জাত, তা প্রমাণ হল কোথায়?

স্বাতী একটু অবাক হয়ে বলল—বাঃ, পারে-প্রকারে সেটাই তো বলেছি। আমাদের জন্মলগ্নের ইতিহাস যদি আমাদের জানা থাকে তবে বুঝবো উনিশ শতকী রেনেসাঁস বলতে যা আমরা বুঝি, তা ভুল। ওটা আর কিছু নয়, সমাজ শিক্ষা ও জীবন আর বোধকে একটু অন্যরকমভাবে তলিয়ে দেখার প্রচেষ্টা। বহু বছরের জগদ্দল পাথুরে বুদ্ধি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে অতন্দ্র লড়াই ও সংগ্রাম। অর্থাৎ অন্য পথে অন্যতর চেতনায় চলবার সাহস। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি দেখাতে চেয়েছি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ক'রে প্রডাক্‌টিভ্ এফর্টকে অন্য দিকে চ্যানেলাইজ্ ক'রে গোটা জাতটাকেই প্যারাসাইটিক ক'রে দেওয়া হয়েছে।

—তাহলে দেখো বাঙালী প্যারাসাইটিক নয়, তাকে প্যারাসাইটিক করা হয়েছে—তোমার থিসিস পড়ে ওটাও মনে হতে পারে কিন্তু।

—সেটাই তো আমি বলতে চাইছি, আমাদের এগিয়ে যাবার স্পিরিট্ নেই, ঝুঁকি নেবার স্পৃহা নেই, এক বা একাধিক প্রয়োজনে বহুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার এন্‌টারপ্রিনিয়োরশীপ্ নেই—তাই আমরা এক হাতে আধা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক্র ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধরে অন্য হাতে সোসিয়্যালিজম্ আনতে চাইছি। অথচ অন্যান্য রাজ্য থেকে একশো-দেড়শো বছরের লিডারশীপ্ পেয়েও বাঙালী কেন পেছনে পড়ে রইল সেটাই আজকে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এটা ঠিক, 'কটন-এম, পি' বা 'ম্যানচেষ্টার প্রেসার' ট্যাক্‌টিসের ইতিহাস প্রমাণ দেয় যে ইংরেজরা চায় নি আমরা কিছু করি বা এগোই। তবুও এই বিরূপ পরিস্থিতিতে কিছু করার জন্য যে মনোবল

দরকার ছিল, তার অধিকারী আমরা হতে চাই নি। নয়ত দেখুন, কিছু কিছু ব্যাঙ্ক বা জীবন-বীমা কোম্পানী গড়েও রাখতে পারি নি আমরা। অর্থ যদি জাতটার অনর্থ ঘটাত তবুও দেখতেন বিজ্ঞান, শিল্প ও কর্মসাধনার নতুন নতুন ক্ষেত্র খুলে যেত ; তাতে কবিতা বা উপন্যাস অত হয়ত লেখা হত না কিন্তু বহুমুখী হত তার চলার ক্ষেত্র ও জীবনের স্টাইল।

—এখন কি ফাইনাল টাইপ করাবে ?

—হ্যাঁ, ভাবছি। তার আগে ড্রাফ্‌টা একবার ডাঃ দাসকে দেখাতে চাই—তারপর।

রুবি বলল—এবার শেষ ক'রে ফেল স্বাতী। দিলীপ ডক্টরেট্ পেয়ে গেল আর তুই এখনও ড্রাফ্ নিয়েই পড়ে আছিস। সেদিন রবির কাছে দিলীপ এসেছিল জানিস ? বলছিল অনেকগুলি কাজের নাকি অফার পেয়েছে। দিল্লীতেও নাকি চলে যেতে পারে। কোথায় শেষ পর্যন্ত জয়েন করল তা অবশ্য জানি না।

স্বাতী বলল—ওর কথা রেখে দে। দিলীপ এ যুগের ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র, ওদের কিসের অভাব হয় বল ?

রুবি রহস্য ক'রে বলল—ঠিক বলেছিস, অভাব ওদের কিছু নেই তবে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টেলেক্‌চুয়্যাল্ পারস্যুইট্ চালিয়ে যাবার যে আনন্দ, ওদের ওটুকু বোধহয় নেই। বলেই রুবি খাবার-দাবার আয়োজন করতে উঠে গেল।

স্বাতীকে একা পেয়ে বললাম—ইদানীং আমি দিলীপ মুখার্জীর প্রস্‌পেক্‌ট্ নিয়ে খুব ভাবছি।

—কেন, ঘটকালি করবেন নাকি ?

—হ্যাঁ, কারণ আমার মত পুরুষ দিয়ে তোমার তো বিশেষ সুবিধে হবে না।

ঠাট্টা করলাম বটে কিন্তু অন্যের হাতে স্বাতীকে তুলে দেবার সম্ভাবনায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। সেদিন ব্রজেশবাবু বলেই ফেললেন—স্বাতীর থিসিস শেষ হয়ে এল, ওর মা বলছে আর আমিও ভাবছি, এখন স্বাতীর একটা বিয়ে-থাওয়া দেওয়া দরকার। স্বাতী বিয়ে করতে চাইছে না, তুমি যদি ওকে একটু বোঝাও, আমার বিশ্বাস, কাজ হবে। স্বাতীর মা নাকি মেয়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছেন এবং মনটাকে শান্ত করতে সোজ

পণ্ডিচেরীতে চলে গেছেন। শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বুঝতে পারলাম, দিলীপ মুখার্জীর ঘোরাঘুরি আর আমার সঙ্গে স্বাতীর এত ভাব-ভালবাসা তাঁর হয়ত ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। তিনি হয়ত চাইছেন, স্বাতী ড্রইংরুমে সেজেগুজে এসে দাঁড়াক এবং ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বা পি, এইচ, ডি, কেউ একজন তাকে দেখুক, তারপর পছন্দ হলে তো কথাই নেই। এর কোনটাই হচ্ছে না দেখে তিনি অসহায় ব্রজেশবাবুকে একা ফেলে পণ্ডিচেরী চলে গেছেন। এরকম একটা একরোখা জেদকে আমি কোন যুক্তিতেই মেনে নিতে পারলাম না।

—আমি ভাবতে পারি না অমরেশদা, এ সমাজে সত্যিই কি স্বাধীন ভাবে থাকা যায়—সত্যিই কি কিছু করা যায়? করতে আপনারা দেন?

চুপ ক'রে রইলাম। একটু আগে স্বাতী আমার কত কাছে ছিল, কিন্তু এখন যেন ওর নাগাল পাচ্ছি না। ছোটবেলায় বিরাট প্রান্তর দিয়ে হেঁটে যেতাম, পায়ের তলায় শুকনো পাতা, দূরে দূরে বাড়ি, আরও দূরে খুদে খুদে মানুষ, হঠাৎ নজরে পড়ত আকাশটা, ততক্ষণে বাহারী রঙে সে মেতে উঠেছে। অবাক হয়ে সেই বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, যতই পৃথিবী ঘুরি, ঐ আলোর রাজ্যেই শেষ যাত্রা। আমার পেছনে যে আলোর পটলেখা, সেটাই আমার আসল সত্তা।

স্বাতীকে আমার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে হয় নি। মধ্যবিত্তের দৌড় তো, আমি বেঁচে গেছি। শেষ কথাও ওর সঙ্গে হতে পারল না, কারণ ততক্ষণে রবি চৌধুরী দলবল নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী যে-যার আসনে গোল হয়ে বসে এবং দু'জনকে একসঙ্গে বসে থাকতে দেখে হেসে বললেন—কি অমরেশবাবু, আপনাদের রিসার্চের কত দূর? স্বাতীর দিকে তাকিয়ে এবার তাঁরা একসঙ্গে বলে উঠলেন—বাঙালী প্যারাসাইটিক জাত—আপনারা কি সেটা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ ক'রে ছাড়লেন?

স্বাতী বেশ ব্যঙ্গের সুরে বলল—প্রমাণ দেবার কি দরকার? চারপাশে দেখতে পাচ্ছেন না?

রবি চৌধুরী আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন—বড় আটকা পড়েছিলাম। সরি।

বললাম—কেন?

—আরে মশায়, বলেন কেন, স্ট্রাইক হবে কি হবে না—এ নিয়ে অযথা

লড়াই। হবে কি হবে না—জানেন, এই যে দো-মনা ব্যাপারটা, এটা সর্বত্র এখন আমাদের জীবনের সঙ্গী। দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব নিয়েই কলকাতার পারসনালিটি। সেই স্ট্রাইক নিয়ে ঝগড়া, বিবাদ, লড়াই এবং অবশেষে পুলিশের গুলি। গুলি চললে লোক মরে না এও হয় না। অতএব দু'জন নিহত, কয়েকজন আহত।

বলেই মিঃ চৌধুরী ঘণ্টি বাজালেন। রুবি ততক্ষণে শামিকাবাবের প্লেট সাজিয়ে দিয়েছে—রাম এল বলে।

ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী বললেন—তোমার বিজয়ের অনারে আজকে না হয় স্কচ্ হুইস্কি হয়ে যাক্।

মিঃ চৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন—বেয়ারা, হুইস্কি।

—জি, সাহাব, বলে বেয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুবি এসে বলল—আজকে কিন্তু বেশীক্ষণ ওসব নয়। আপনারা বরং খেয়েদেয়ে আসর জমান। আমি স্বাতীকে খেতে বলেছি এবং রবিকে পৌঁছে দিতে হবে।

ঘোষ-বোস-মল্লিক-মুখার্জী বললেন—দাঁড়াও, এই তো এলাম। আচ্ছা, একটা কাজ করো, স্বাতী, অমরেশবাবু এবং রবিকে প্রথম পর্যায়ে না হয় খাইয়ে দাও, আমরা ততক্ষণে কলকাতার ধ্যানটুকু সেরে নি। স্বাতী যখন উপস্থিত আছে, হলপ্ ক'রে বলতে পারি, সন্ধ্যাটা বেশ জমবে।

রুবি সংশোধন করাল—সন্ধ্যে নয়, রাত সাড়ে দশটা বাজে।

ঘোষ-বোস-মল্লিক ও মুখার্জী তখন একসঙ্গে হেসে উঠলেন—তোমাদের মত বেরসিকদের জন্যই বাঙালী জাতটা একেবারে প্যারাসাইটিক হয়ে যাচ্ছে—। দিল্লীর লোক দেখে কি দোকানপাট সাতটার সময় বন্ধ ক'রে দিতে হবে? দিল্লীর অথরিটি কলকাতা মানে না—কি বল, রবি?

মিঃ রবি চৌধুরী স্বাতীকে আপ্যায়ন করতে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, বললেন—তোমরা চালাও। আমারও প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি আছে। তবে ঘরটা আগে সামলে নি, যদিও আমি এই মুহূর্তে একমত, দিল্লীর অথরিটেরিয়ান্ ব্যাপারটাকে সব সময় মানা যায় না। কলকাতার রাত সাড়ে দশটা আমাদের কাছে সন্ধ্যা,—কি বলুন অমরেশবাবু?

আমি হাসছিলাম—। রবি চৌধুরীদের মাতন নাচে গভীর রাতও সন্ধ্যার আলোকসজ্জায় ঝলমল্ ক'রে ওঠে।

॥ ছাব্বিশ ॥

স্বাতীর থিসিস এখনও টাইপ্ হয় নি এবং পেশ করতে আরও বেশ কিছু দিন লাগবে। এদিকে দিলীপ মুখার্জীকে ডক্টরেট পেতে দেখে আমার যে খুব সন্তোষ হয়েছে, বাঙালী হয়ে হলপ্ ক'রে বুক ছুঁয়ে বলতে পারছি না। এত শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে স্বাতী থিসিস লিখেছে যে ওর থিসিস গ্রহণযোগ্য হবে কিনা মনে হওয়া স্বাভাবিক ; সেই আশঙ্কা যদি দিলীপ মুখার্জী আরও বাড়িয়ে তোলে, বিস্মিত হব না। এরকম একটা অবস্থায় অন্যের সফলতাকে যদি আনন্দে গ্রহণ না করা যায়—দোষ দেবার কিছু নেই। অর্থাৎ নানা কারণে আমিও বুঝতে পারছি দিলীপের সঙ্গে আমি যদি কোন সম্পর্ক না রাখি, তবেই স্বাতী খুশী হবে বেশী। দেশের নেতারা অনেক কিছু হাতড়েও যেমন আরও কিছুর জন্য হাত-পা বাড়ান—আমিও তাই। সবাই সুরক্ষার কথা এত চারিদিকে ভাবছেন, আমিই-বা অত ডিপ্রাইভ্ড্ হয়ে থাকি কেন ? আমার কেস্ তো আরও জোরাল। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বাঙালী জীবনের সবচেয়ে বড় প্রায়রিটি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চেয়েও বড় জিনিস। স্বাতী থিসিস সাবমিট্ করার পরের অবস্থাটাও আমার 'ওভারসি' করতে হবে এবং যদি করি, এখনই তার প্রশস্ত সময়। যদিও জানি, 'ওভারসি' আর 'মনিটারিং' ইদানীং খুব চালু কথা এবং তাকে উপলক্ষ্য ক'রে কিছু কিছু মিটিং বা উপ-মিটিং বসলেও—যাঁরা সেইসব মহৎ কাজ করেন, ভারতকে কেউ তাঁরা মহৎ দেশ ভাবেন না। এবং তাঁদের 'মহৎ' দায়িত্বও ঐ আলোচনা ও পাল্টা আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ ; দেশ এগোলে বা দেশ বাড়লে কি কি কোন্ সেক্টরে 'ওভারসি' করতে হয়—সেই পারস্পেক্টিভ্ ধূর্ত লোকদের যেরকম হবার কথা, মহৎ লোকের 'সি-ম্নিং' আবার অন্য জাতের। জাতের ঊর্ধে কোন পদক্ষেপেই আমরা প্রকৃত অর্থে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নই।

দেশের বা দশের সুরক্ষার কথা আমার অবশ্য না ভাবলেও চলে, কারণ স্বাতীর থিসিস শেষ হবার পরবর্তী সম্ভাব্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি নিজেকে এবং আমার চারপাশের মানুষদের 'ওভারসি' করতে চাইছি।

শুনেছি, দেশের নেতাদের কোনরকম প্ল্যান না করলেও দিব্যি চলে যায় এবং প্রতিশ্রুতির সঙ্গে ভাষণ মিশিয়ে কিছু গালাগালি, স্খলন ও ভবিষ্যৎবাণীর উক্তি করলেই গদিটা বজায় রাখা যায়। আমি আমার জীবনটাকে যে-পর্যায়ে টেনে এনেছি, যে অবস্থায় পড়ে যত দিকের দরজা শত্রুদের সম্মুখে খুলে দিয়েছি—ওখানেই আছে ভাবনারাজ্য, সুখ ও আরামের খেলা। সেখানে আমার মন ছাড়াও, চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে ফারাক এবং তা নিয়ে যা অন্তর্দ্বন্দ্ব বা যন্ত্রণা এবং আত্মরতি ও আত্মসুখ ওটা চেপে রেখে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে যাদের কাছে আমি অসহ্য, তাদের মারমুখী সরঞ্জাম এবং আমাকে শক্তিহীন ও গদিচ্যুত করার নিঃশব্দ ও দুর্বোধ্য ষড়যন্ত্রটা আমি হাত ফসকে যেতে দিতে পারি না।

এত কথা ভেবেই দিলীপকে আজ আমার ঘরে ডেকেছি। ও কয়েকবারই এসেছে অফিসে ; সেটা একদিক দিয়ে ভালই। কারণ অফিসে আমার কতটা ক্ষমতা, তাও ওর দেখা দরকার। শুধু দিল্লীর লোক বললে কিছুই বলা হয় না, এটা আবার দিলীপের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কথাবার্তা বলেই আমি বুঝতে পেরেছি ও আমার ঘরেও আসতে চায়, দেখতে চায় যেখানে স্বাতী নির্বিবাদে ও নির্বিচারে আসে-যায়, সেখানে স্বাতী নিরাপদ রয়েছে কিনা এবং আমার মধ্যে দানবীয় যে সূক্ষ্ম-মানুষগুলি লোভ ও অধিকার নিয়ে বিরাজ করছে সেগুলি ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্টোপাসের মত কতকগুলি হাত বার করে কিনা। এবং স্বাতী সেই অবস্থায় তার ভারজিনিটি কতটা এখনও বজায় রাখতে পেরেছে। দিলীপ আকারে-ইঙ্গিতে সেকথা বলেছেও এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে যেকোন ভদ্রলোক ওকে ঘরে নিমন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দিলীপ জানে না, আমি বাঙালী হয়েও সব সময় ইমোশনালী চলি না, আমার সুবিধে ও স্বার্থ বজায় রেখেই আমি অন্যকে লিফ্‌ট্ দিতে অভ্যস্ত। মনের যে অবস্থায় দিলীপকে বাড়িতে ডেকেছি, তা বোঝা দিলীপের সাধ্য নেই।

দিলীপ ঘড়ির কাঁটা ধরে এল। ভেরি গুড্। ওকে বেশ কিছুদিন পরে দেখে আমার প্রথম যেটা মনে হল, তা এই, আর একবার স্বাতীর কাছ থেকে আঘাত পেলে ও আর কোন দেশী মেয়ের মুখ দেখবে না—এবং সোজা একেবারে বিদেশী গাউনের খোলসে মুখ লুকবে।

পুরুষের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে যেসব ড্রেস-ফেস্ পরার

প্রয়োজন হয়, তার ত্রুটি করে নি দিলীপ। বেশ একটা রঙ-চঙ-ওয়ালা বুশ্ শার্ট, 'ফ্লেয়ারী'-প্যান্ট, চোখে ফটো লেনসের চশমা, যাতে চোখের অরিজিনাল দৃষ্টি বোঝা একটু দুরূহ, মুখে-চোখে সাক্‌সেস্-জাতীয় পুরুষের মৌতাত এবং তার সঙ্গে সিমেট্রিক্যাল্ চৌকস হাসি ও গাম্ভীর্য। সুতরাং ওকে দেখে আমার এও মনে হল, স্বাতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোন্ পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, সেটাও সে ঘরের ও মনের জিওগ্রাফি দেখে আঁচ ক'রে নেবে। কিংবা শ্রেফ্ এও হতে পারে, ডক্টরেট্ পাবার পরে ও যে যাদবপুরে কাজ করছে, এই 'হওয়া'-টুকু, (মেয়েদের ঠোঁটে লিপ্‌স্টিক্ লাগাবার পেছনের অভিসন্ধিটুকুর মত) আমাকে ও স্বাতীকে উপহার দিতে চায়। আনন্দ হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে স্বাতীর কাছে তা পৌঁছতে পারলে তার একটা অন্য অর্থ দাঁড়াবে, এ ক্যালকুলেশন্ করাও অসম্ভব নয়। আধুনিক যুগে যথোপযুক্ত 'মাধ্যম' বা মিডিয়া বেছে নেবার মস্তবড় সুবিধে হল, নিজের আত্মবিশ্বাস বা সম্ভ্রম কোনটাই খোয়া যাবার ভয় থাকে না। ওর সাজগোজ দেখে আমার মনে কত ভাবনা উঠল, যদি একবার টের পেত, দিলীপ হয়ত আমার কাছে এত ঘন ঘন আসার আগে ভাবত।

আমি সাদর সম্ভাষণ জানালাম—এসো দিলীপ, বসো—কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্। কি খাবে? চা-কফি-রাম বা হুইস্কি? বলে ফেলো। সবই আজ তোমার অনারে।

এত উচ্ছ্বাস হয়ত দিলীপ আশা করে নি। কলকাতার চোখে দিল্লীর একজন বড় অফিসরের কায়দাকানুন এমনিতেই একটু গ্ল্যামারাস্ ব্যাপার। এত উদার আহ্বান শুনে হয়ত ও একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাই বলল—না, ড্রিংকস্ এখন নয়, একটু কফি হোক না—।

—বেশ, বলেই আমি বেল টিপে দু'কাপ কফির অর্ডার দেবার আগে, আর একবার জিজ্ঞেস করলাম—আর কিছু?

—না।

জিজ্ঞেস করলাম—এখন কী করছো? (কি করছে আমি জানি, তবুও ভাবলাম ওর মুখ থেকেই শুনে নেওয়া দরকার। দিলীপের মত অ্যামবিসাস ছেলেরা শুধু ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছু বলে যায়, নানা লোককে নানারকম কথা বলে, পরে সামলাতে পারে না)।

সফলতার প্রাচুর্য খেলে গেল দিলীপের মুখে। বলল—বর্তমানে

ডিপার্টমেন্টে পড়াচ্ছি। অনেকগুলো অফার হাতে। (বরানগরে পড়ায় কিংবা যাদবপুরে, বুঝলাম, ওটা একটু ভেগ রাখতে চায়) প্ল্যানিং কমিশনের অফারটাও ঠিক ফেলে দেবার মত নয়। মাইক্রো ইকনোমিক্সের খুব কদর, অমরেশদা।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। তোমার কদর তো চিরকালই ছিল দিলীপ। তা তুমি কি করবে ভাবছো?

—একবার ভাবছি দিল্লীতে চলে যাই এবং যাব কিনা আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করি। আবার ভাবছি, কলকাতাতেই ভাল। ঠিক যে কি করা উচিত, ভেবে পাচ্ছি না।

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ, সবার জীবনেই এরকম একটা সময় আসে যখন ছবির মত ভবিষ্যৎটা দেখতে পারছি না বলে নিজের ওপরেই ভয়ানক রাগ হয়—কি বল?

দিলীপ এক চোট হাসল। ও তো হাসতে পারে—তবে স্বাতী যে বলেছিল, দিলীপকে ও কখনও হাসতে দেখে নি। নাচতে না জানলে উঠোনটাকে কি বাঁকাই মনে হয়?

দিলীপ জিজ্ঞেস করল—কলকাতায় আপনার কাজ কতদূর এগোল?

কথাটা শুনেই এক মুহূর্তে বুঝে নিলাম রেডিওতে যতটা কাজ করতে চেয়েছিলাম, কাজের চেয়ে ফ্রাসট্রেশন বেড়েছে, সেটা হয়ত দিলীপ জানে। কারণ কৌন্তেয়-র সঙ্গে দিলীপের খুব সদ্ভাব। অনুমান করলাম, নিন্দা আর অপবাদ ছাড়া আরও নিশ্চয় কিছু শুনেছে। কৌন্তেয় আর যাই করুক, আমার গুণগান করবে না। হয়ত শুনেছে, আমি ভয়ানক দাম্ভিক এবং পদে পদে অফিসে অফিসারগিরি ফলাচ্ছি। এবং দিল্লীতে আমার মত হাজারো অফিসার আছে, আর সেখানে আমার চেয়ে বড় অফিসারকেও কেউ পাত্তা দেয় না।

—কি এমন কাজ করছি যে হবে? ভাবলাম, একটু জেরা ক'রে দেখি এগুলোর কতটা ওর নিজের কৌতূহল, কতটা বদনাম শোনার এফেক্ট। না ভেবেচিন্তে প্রতিপক্ষের সামনে নিজের ওপিনিয়ন দেওয়া ঠিক নয়।

দিলীপ বুঝল, কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয় নি। একটু যেন নার্ভাস ফিল করল। নার্ভাস হলে ও কি ভেতরে ভেতরে কাঁপে? যদিও ও আবার হাসল কিন্তু আমি যেন অন্য কোন অনুভূতির অদৃশ্য রেখা পড়তে দেখলাম।

কপালে দু'একটা শিরা—উপশিরাও তাই জানান্ দিল, চোয়াল-চিবুকের খাঁজেও যেন অপ্রস্তুত একটা ভাব গোপন করার প্রচেষ্টার ফাঁকে দেখলাম হাসিটা ঠোঁটের কোণে অটুট। মনে মনে আমি স্বাতীকে তারিফ করলাম, কি এক শক্তির গুণে—কে জানে, সেটা কমপিউটার কি না—স্বাতী মানুষকে ঠিক চিনে ফেলে। আমাকেও চিনে ফেলেছে কিনা কে জানে? তাহলে তো একটু মুশকিল। আমার ষড়যন্ত্র এই মুহূর্তে কাকপক্ষীও যেন টের না পায়—সেটাই অমি চাই।

দিলীপ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। বললাম—কি ভাবছো? কফি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল?

—ও হো, বলেই কাপে চুমুক দিতে দিতে আলতো অন্যমনস্কতায় দু'একবার আমাকে জরীপ ক'রে নিল। যতদূর মনে হল, ও আমাকে এখন সাইজ-আপ করার চেষ্টা করছে। কৌস্তেয়-র কাছে যতই নিন্দা শুনে থাক, ও নিশ্চয় ভাবছে, আমার চেহারায় বা ব্যবহারে এমন একটা কিছু আছে যার গুণে স্বাতীর মত মেয়েও মুগ্ধ। এও কি দিলীপ জানে স্বাতীর সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রায় রিসার্চ শুরু ক'রে দিয়েছিলাম এবং সেরকম এলেম থাকলে বা ধরপাকড় করলে হয়ত একটা নেহেরু ফেলোশিপই পেয়ে যেতাম!

দিলীপ আর আমার 'কাজের' ধারকাছ দিয়েই গেল না। আমিও প্রশ্নটাকে নানা টুকরোয় ভেঙ্গে আরও জেরা করতে পারতাম, করলাম না। ওকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে হলে আমার বিচার-বুদ্ধি সম্পর্কে আগে ওর আস্থা জাগান দরকার। মানুষের মনোজগৎটা কমপিউটারের চেয়েও জটিল—পুরোপুরি কনট্রোলে আনা বোধহয় অসম্ভব।

দিলীপ হয়ত আমার কাছ থেকে স্বাতীর সব কথা শুনতে চেয়েছিল। ভেবেছিল, একটু ধরিয়ে দিলেই অনর্গল বলে যাব। ওটা করতে নেই। নীরবতা ছাড়া সব সময় সাসপেন্স রক্ষা করা যায় না। একই ডিপার্টমেন্টে থেকে একজন আর একজনকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না এবং মুখ দেখতে হলেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ—এ তো আকছার হতে দেখেছি। কিন্তু একই জায়গায় থেকে একজন নির্বিকার, আর অন্যজন সব খবর পাচ্ছে বা যোগাড় হয়ে যাচ্ছে—এটাই দিলীপের ব্রিলিয়েন্সি। জানলেও দিলীপ আমার মুখ থেকে সব কিছু শুনতে চায়, কারণ ওর ধারণা, স্বাতী যে এত বড় একটা কাজ করেছে এর পেছনে আমার নাকি অনেকখানি হাত। স্বাতীর কথা কোন্

পর্যায়ে কতটুকু বলব তা আমি এক মুহূর্ত ভেবে নিলাম। ও যদি জোনতা স্বাতীর আসবার কথা আছে বলেই ওকে টেস্ট করতে ডেকেছি এবং আটঘাট বেঁধে—তাহলে হয়ত আসত না।

আমার ঘরে স্বাতী নির্বিবাদে আসে অথচ দিলীপের উপস্থিতি পর্যন্ত কেয়ার করে না—এটাই কি দিলীপকে দেখাতে চাই? আমার প্রতি স্বাতীর এই আস্থা ও বিশ্বাসটুকু ওকে আজ আমি এখানে বসে উপহার দেব। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিল—কুঁড়েঘরের নিকোনো উঠোন দিলীপ, তুমি কি কখনও দেখেছ?

প্রশ্নটা বোঝা ওর পক্ষে একটু জটিল হবে এবং এখন, যখন আমার স্বভাব ও ভব্যতা নিয়ে নানা কথা ভাবছে, এসময় সিম্বল বা মেটাফর ব্যবহার করা বা কথায় কথায় কোটেশন ঝাড়ার স্বভাবটা কত বিরক্তিকর, দিলীপ একবার বুঝুক।

আমি দিলীপকে একটা সিগারেট অফার করলাম। ও একটু ইতস্তত ক'রেও সিগারেটটা নিল, ধরাল, মানে আমিই ধরিয়ে দিলাম। সিগারেটের ধোঁয়ায় লাঙ্স এফেক্ট ক'রে কিনা জানি না, কিন্তু ধোঁয়ার গুণে নার্ভটার্ভগুলো যে চাঙ্গা হয়ে হঠে—দিলীপকে দেখে বুঝলাম। ধোঁয়া ওর মুখের চেহারা পালটে দিচ্ছিল।

দিলীপকে অনেকক্ষণ ধরে তাক্ ক'রে এখন আমার কাছে একটা কথা স্পষ্ট, স্বাতী যদি দিলীপকে বিয়েও ক'রে, ছ'মাসের মধ্যে হয় স্বাতী সুইসাইড্ করবে, না হয় আলাদা থাকবে। ইমোশনাল্ ব্যাপারে ও বেশীক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারে না এবং পারে না বলেই ওর চাহিদা বা ওর দিকটাই বড় হয়ে ওঠে। ও বোধহয় এটুকু বুঝে গেছে তুড়ি মেরে অঙ্ক কষে ফেলার চেয়ে মনোজগৎটা আরও জটিল। এই জন্যেই দেখা যায় ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা প্রেমের ব্যাপারে অনেক সময় বড়ই অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং তখনই পয়সার গরমে আলুলায়িত নারী-সঙ্গ অনেক বেশী উপাদেয় মনে হয়।

আমার চালে কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে কিনা জানি না। স্বাতীর এখন যা মনের অবস্থা, দিলীপের এঘরে আসা ও বরদাস্ত নাও করতে পারে। হয়ত ভয়ানক চটে যাবে এবং কার ওপর চটবে সেটাই ভাবছি। স্বাতী যদি জানতে পারে দিলীপের ওপর ওর এত বীতরাগ জেনেও দিলীপকে আমি আমার ঘরে আপ্যায়ন করছি—তাতে আমার ক্ষতি হতে পারে। দিলীপের

আগমনটা এমনভাবে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, স্বাতী ও আমি কোন একটা বিষয়ে যখন ভীষণ তর্ক করছি বা আলোচনায় মশগুল—ঠিক তখন, থিয়েটারের দ্বিতীয় অঙ্ক ও অদ্বিতীয় দৃশ্যের মত, দিলীপ মুখার্জীর প্রবেশ। সেই 'প্রবেশ' নিষিদ্ধ হলেও দোষটা আমার উপর বর্তাত না। আসলে এ রিস্ক নিয়েছি অনেক ভেবেচিন্তে—আমার ঘরে ওদের আবার নতুন ক'রে ভাব-ভালোবাসা হলে আমি তার সাক্ষী হয়ে থাকতে পারব এবং আমার সঙ্গে স্বাতীর পর্বটা ওদের সম্পর্কের মধ্যে একটা উল্লেখনীয় বিষয় হয়ে থাকবে। সেটাই তো আমি চাই।

সেদিনের কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। স্বাতীর মত স্বাধীনচেতা মেয়ের ওপরেও বিয়েসাদীর জন্য যেরকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, আমারও মনে হয় বাঙালী সমাজে অন্যভাবে থাকা প্রায় অসম্ভব। তাই বলেছিলাম—তোমার মার যদি আপত্তি না থাকে তবে দিলীপ মুখার্জীই-বা কি দোষ করল? যতদূর দেখেছি ও তো দশ-পা এগিয়ে আছে।

স্বাতী বলেছিল—মার আপত্তি নেই। কাজ করছে, অত ব্রিলিয়েন্ট ষ্টুডেন্ট বলে সুনাম! আর বাবার কি অ্যাটিচিউড্ হয়েছে জানেন? সারা জীবন সংগ্রাম করা যখন সম্ভব নয়, কোথাও না কোথাও কম্প্রোমাইজ্ করতেই হয়। তা মায়ের যখন আপত্তি নেই, অগত্যা—। অমরেশদা, আমি একটু অন্যরকম হতে চেয়েছিলাম, সাধারণ দশজন মেয়ের মত নয়, একটু অন্যরকম। তা অন্যরকমভাবে বাঁচার দেখছি কোন উপায় নেই—বিশেষ ক'রে মা যা জুলুম শুরু করেছেন, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

বলেছিলাম—একা থাকার রিস্কের কথাই হয়ত তোমার মা ভাবছেন। বড় অদ্ভুত একটা মিডিওকার যুগের মানুষ আমরা। ঘুরেফিরে সেই একই আবর্তে আবর্তিত হতে ভালবাসি। অসাধারণ হয়ে ওঠার কোনরকম উপায় নেই। কেউ তোমায় সাথ দেবে না, এমন কি, আমিও না। সেদিক থেকে সমাজটা খুব একটা এগোয় নি, স্বাতী।

স্বাতী বলেছিল—জানি।

বুকটা আমার ছল্‌কে উঠেছিল। একটু ভেবে নিয়ে একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছিলাম—আমার মত পুরুষ দিয়ে তোমার তো কিছু সুবিধে হবে না।

—কার কোনটাতে সুবিধে আপনি বুঝি সব বুঝে গেছেন? আমার

অনেক সময় মনে হয় জীবন মানে আরও কোন গভীর স্বপ্ন নিশ্চয়। কিংবা সাধনা বা উপলব্ধি। সারা জীবন স্পিন্‌স্টার থাকবো, মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, ব্যস। আর কিছু চাই না।

মোচড় দিয়ে উঠল বুকটা। কে যেন আমাকে পুকুরের জলে চেপে ধরেছে, আমি ছট্‌ফট্ করছি একটু মুক্ত নিশ্বাসের জন্য। একবার ভাবলাম, ওকে প্রতিশ্রুতি দি, যা তুমি চাইছ তাই হবে, স্বাতী। কিন্তু পারলাম না। সুদূর দিল্লীতে আমি থাকি, স্বাতী শুধু জীবনের পরিপূর্ণ এক অভিজ্ঞতা, সুদূর দ্বীপের কোন স্বপ্ন, যেন মস্ত একটা ঘুম দিয়ে উঠলাম আমি। জেগে উঠে দেখব, কাজল দাঁড়িয়ে হাসছে, মেয়েটা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে---আর কোনদিন আমাদের ছেড়ে যেও না বাবা, ওর দু'চোখ ভরা জল, রঞ্জনের ছোট ছোট হাতের স্পর্শে আবার ফিরে পাচ্ছি পিতৃচেতনা,---না, স্বাতী, দালালের মত, মহাজনের মত অল্প আয়াসে জীবনের কমিশন্ খেতে আমি রাজি। আমার দ্বারা কোনরকম অঙ্গীকার বা পণ সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তের ষড়যন্ত্রে মধ্যবিত্ত অকারণে পাক খেয়ে মরে!

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই স্বাতী এল। একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা যেন। ঘরে দিলীপকে দেখবে স্বপ্নেও বোধহয় ভাবে নি স্বাতী। একটু হক্‌চকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিল।

দিলীপের পক্ষ নিয়ে কথা বলে আমি স্বাতীর বিস্ময় ভাব কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যা করলে দিলীপকে বুঝে ওঠা শক্ত হয়ে উঠবে অর্থাৎ যা বললে ও একটু আড়াল পেয়ে সামলে উঠবে, তা করতে চাই না। মহামূল্যবান একটি মুহূর্তের জন্য আমি সেই থেকে চাতক পাখীর মত অপেক্ষা করছি। আজকে এই মুহূর্তে একটু বিশেষ ধরণের উক্তি বা প্রকাশভঙ্গী আমার কাছে আত্মসমীক্ষা বা বিচারের পক্ষে পরম মূল্যবান সম্পদ।

শুধু বললাম—স্বাতী, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোস। তোমার জন্যেই—।

অন্য দিন আমার কথাটা হয়ত শেষ করতে না দিয়ে সরস কোন উক্তি করত। কিন্তু আশ্চর্য, একটু ঘুরে স্বাতী দিলীপকেই বলল—তুমি?

দিলীপের ততোধিক বিস্ময় উক্তি—তুমি?

এসব জিজ্ঞাসা চিহ্নের উত্তর হয় না। দু'টি মুখের প্রকাশভঙ্গী আমার কাছে অভিনব লেগেছিল। আমি ভাবলাম, দু'জনের ভঙ্গীটা ছবিতে ধরে রাখতে পারলে বেশ হত; নির্ঘাত একটা আর্টপিস্ হয়ে যেত। পরবর্তী

ডায়লগের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে রইলাম। ভিজে বেড়াল হয়ে থাকার মানসিক সংগ্রাম, যারা ভিজে বেড়াল নয় তাদের বোঝার কথা নয়।

স্বাতী ধীরে ধীরে এসে বসল। 'তুমির' উত্তরটা বোধহয় স্বাতী তখনও ভাবছে অথচ ওর কাছে দিলীপের আগমন এক বিস্ময়সূচক প্রশ্ন হলেও স্বপ্ন নয়, বাস্তব সত্য! স্বাতীর ভাবনা আমার যে অনুকূলে যাচ্ছে, ওর ভাবগতিক দেখে এখন অবশ্য তা মনে হচ্ছে না। ওর বোধহয় গলা শুকিয়ে কাঠ। অনুমান ক'রেই আলতোভাবে জিজ্ঞেস করলাম—স্বাতী, কফি, না এক গ্লাস জল?

স্বাতী বলল—জল। বড় দেরী হয়ে গেল। আজ বোধহয় অমরেশদা কিছু আলোচনা হবে না। আমাকে এক্ষুনি উঠতে হবে। (ধরে নিলাম, এরকম একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য আমাকেই ও দোষী ঠাওরেছে। গলার স্বরে একটু যেন উষ্মা বা বিরক্তি)।

দিলীপ হয়ত ভাবল, ওর উপস্থিতিতে আলোচনা অথবা প্রেম—দুটোই মাটি হল। ভদ্রতা ক'রে বলল—আমি তবে আজ উঠি, আপনারা যা করবেন ভেবেছিলেন, করুন।

দিলীপের কথাটা কানে লাগলেও, আমি একটু হাসলাম। জানি, স্বাতীর সঙ্গে মুখোমুখি হবার এত বড় সুযোগ দিলীপের সারা জীবনেও আসে নি। লক্ষ্য করলাম, দিলীপ চলে যাক এটা স্বাতীও চাইছে। ওর উপস্থিতির অস্বস্তি এখনও ওর চোখেমুখে। তাহলে কোনকালে কি স্বাতী নিজের অজ্ঞাতেই দিলীপকে ভালবাসত? বিচারে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেল।

তাই ভাবলাম, আর একটু যাচাই করে নি। বললাম—না, বোস। এই তো এলে। আলোচনা যদি জমাতে চাই তুমি থাকলে হয়ত একটু অন্য পয়েন্ট অব্ ভিউ জানতে পারব।

দিলীপ আমার এই ছোট্ট কথাটুকুর জন্য অপেক্ষা করছিল এবং এই সুযোগে আর একবার নড়েচড়ে বসল। দিলীপ বসে থাকলেই যে স্বাতী বসে থাকবে, সেটা গ্যারেন্টি দিয়ে বলা যাচ্ছে না। আমার ঘরে স্বাতী বিনা সঙ্কোচে আসে-যায়, এটাই হয়ত দিলীপকে ও জানাতে চায় নি।

ওরা দু'জনেই তরুণ অথচ ওদের দু'জনের মুখে কোন কথা নেই। এই অবস্থায় আমারও অস্বস্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি এ পরিস্থিতিতে

পরম সন্তোষ পাচ্ছি। দিলীপ বা অন্য আরও অনেকের চেয়ে আমি যে অনেক জটিল চরিত্র, আর কেউ না বুঝুক আমি টের পাই।

—দিলীপ, কফি হোক—কি বল?

দিলীপ মাথা নেড়ে সায় দিল। ও কিছু একটা চাইছিল, আমি জানি।

কিছুক্ষণ পরেই তিনটে কফিতে আমরা চুমুক দিতে থাকলাম। আমি চুমুক দিতে দিতে তাক করছি দু'জনের দিকে। দিলীপ দেখছে আমাকে। কখনও-বা আড়ালে স্বাতীকে আবার কখনও আমাকে এবং স্বাতীকে। আমি লক্ষ্য করলাম স্বাতী দেখছে আমাকে এবং আলাদাভাবে দিলীপকে। এই পরিস্থিতিটা নেহাৎ একটা দুর্বিপাক কিনা স্বাতী হয়ত বুঝতে চেষ্টাও করছে। ওর অব্যক্ত কমপিউটারে কতগুলো ডেটা চড়িয়ে ও হয়ত এখন রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করছে। কিংবা ওর যে ভয়ঙ্কর একটা ইনটিউশন আছে, তার আয়নায় এই প্রথম ও হয়ত আমাকে যাচাই ক'রে দেখছে।

মনে পড়ে গেল একদিন আমারই একটা কথায় খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠেছিল স্বাতী। আমি বলেছিলাম—মাঝে মাঝে মনে হয় স্বাতী, কোন হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে হঠাৎ যখন একটু আলো এসে পড়ে তখন আমি দেখি—বিশ্বাস কর—সত্যিই আমি দেখি—আমিই এনেছি বাংলার অবক্ষয়; সেই প্রতীক চরিত্র আমি।

সে কী রহস্যময়ীর হাসি! আমি তখন ভাবছিলাম দিল্লীর মহম্মদ বীন তুঘলকের সমাধি-গম্বুজে কতকগুলি বিমূর্ত শব্দ ছুঁড়ে দিচ্ছে স্বাতী, আর জীবন ও রঙের মোড়ক লাগিয়ে শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমার চেতনায়।

বলেছিল—আপনি যখন ঘাবড়ে যান, বিভ্রান্তির ছায়া পড়ে মুখে-চোখে, আর সমস্ত সত্তায়, আমার তখন খুব ভাল লাগে। মনে হয় বিভ্রান্ত একটা যুগকে বুকে নিয়ে আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না, জীবনের ছোটখাট সুখ-দুঃখ, মায়া-মমতা, ব্যর্থতা ও যন্ত্রণা অনেক বেশী কাম্য কিনা। তখন আমার মনে হতে থাকে যাকে আমি ইতিহাসের পাতায় খুঁজে বেড়াই সেরকম একটি জলজ্যান্ত মানুষ আমার চোখের সামনে হাজির হল কি ক'রে?

কে যেন শ্বাসরুদ্ধ ক'রে দিয়েছিল আমাকে। আমি শুনছি তখন গীর্জার ঘন্টাধ্বনি। না-কি, মা দুর্গার আরতি? আমি ভাবছিলাম, বাংলার মাটি, বাংলার জল-নদী-সমুদ্র, বাংলায় মন-সুখ-বুদ্ধি, বাংলার গান-আঘ্রাণ-বাউল, বাংলার বোধশক্তি ও দৃপ্তি বা উনিশ শতকী বয়ে-যাওয়া, লুটে-খাওয়া, বা

আপামর সংস্কারে আবদ্ধ জীবন আঁকড়ে আছি, মা—। মাগো, বুকে বড় ব্যথা আমার, বাঙালী হয়েও মা, বাঙালীর মত বাঙালী হতে পারলাম না। কেঁদেকেটে শুধু প্রার্থনা করি—আমাকে মানুষ কর মাগো, এ যুগে না হোক অন্য কোন যুগে।

বুঝলাম পরিবেশটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

দিলীপ এ অবস্থাটা আর বুঝি সইতে পারছিল না, তাই বলল—তোমার থিসিসের কতদূর, স্বাতী?

—শেষ হবার নয়। ওটা অনেকটা ষড়যন্ত্রের মত, কিছুতেই শেষ হয় না।

স্বাতী কথাটা কাকে উপলক্ষ্য ক'রে বলল—ঠিক জানি না। মনে হল যেন আমাকেই। একটু থেমে, দিলীপ চুপ ক'রে আছে দেখে আবার বলল—যাই হোক ক'রে থিসিসটা শেষ ক'রে ফেলবো ভাবছি, আমার আর খেলতে ভাল লাগছে না।

'খেলতে' কথাটা আমি লক্ষ্য করলাম। স্বাতী হয়ত বুঝতে পেরেছে এ পরিবেশের জন্য পুরোপুরি আমিই দায়ী। চোখে চোখ রাখছে না, আমাকে এড়িয়ে চলছে। দিলীপ সব কিছু রীতিমত যেন গিলছে এবং এখন একটু স্বস্তির হাসি দেখছি ওর মুখে।

আমি বললাম—দিলীপের অনারে আজ এসো তিনজনে সেলিব্রেট করি। আপত্তি ক'রে ওঠার কথা ছিল কিন্তু দেখলাম দু'জনেই রাজী হয়ে গেল। পরিস্থিতিটা আমি হাতের বাইরে যেতে দিতে পারি না। আমার ভুল পদক্ষেপের জন্য স্বাতীকে যদি দিলীপের আরও কাছে ঠেলে দি, সেটা হবে আমার মস্ত বড় পরাজয়। বললাম—তোমরা গল্প কর, আমি এক্ষুনি আসছি।

॥ সাতাশ ॥

স্বাতীকে অনেক কথা বলা হল না। যত প্রিয়পাত্র হোক, সব কথা বলতে নেই।

কলকাতায় আমার আর থাকার অর্থ নেই; প্রয়োজনও হয়ত ফুরিয়ে এল। বছর ঘুরে এল আমি কলকাতায় এসেছি, অনেক কিছু দেখলাম, যা না থাকলে হয়ত বোঝা যায় না। এই মানুষজন, ভিড়-ভাড়াক্কা শব্দ, বিন্যাস, চলাচল, ধোঁয়াশা-কুয়াশা, পেঁয়াজ-রসুন খাবার মত কলকাতার মুখে গন্ধ, মিনিবাস উর্ধ্বশ্বাসে পার্ক স্ট্রীটে হাওয়া, ওয়েলিংটন্ রোডে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে ওরা শিকারীর সন্ধানে আর রিক্সাওয়ালারা সারি সারি শুয়ে পড়েছে ফুটপাতে, বিড়ি ফুঁকছে, হাসিমস্করা করছে, খেলার মাঠে সহস্র মানুষ, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স, বাম ফ্রন্ট ও কংগ্রেস আই-এর আলাদা অলাদা মিটিং, এবং তা নিয়ে রেডিওর লোকেদের ছোটাছুটি, এয়ারপোর্টে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং দিল্লীতে খবর পাঠাবার ব্যস্ততা—তারই ফাঁকে ট্যাক্সির জন্য আবার শ্যেন দৃষ্টিতে রাস্তা দেখা এবং একটাকে কোনমতে পেয়ে বলা, 'সঙ্গিনী অসুস্থ, নিয়ে চল।' উত্তরে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল ট্যাক্সিওয়ালা, 'হাত ধরে দেখুন, দু'দিন ধরে আমার জ্বর—কি ক'রে যাই?' সত্যিই তো 'কি ক'রে যাই' নিয়েই তো যত সমস্যা। হাজার হাজার লোকের সঙ্গে শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে দু'একটা সিনেমা বা থিয়েটার, কবিতার আসর বা যাত্রা কিংবা লোড্-শেডিং বা অন্ধকারের পলিটিক্স—বাইরে থেকে কলকাতার এ রূপ কিংবা অরূপ দেখে আর উচ্চারণ করতে পারছি না, 'কলকাতা শবাসনে সমাসীন, মৃত্যুর প্রতীক্ষায় এখন'।

এ যুগটার ক্লাইম্যাক্স বলে কিছু নেই; যদি বেশী কাঁদাও, বা দুঃখে যদি বুক ফাটে, তবে চিন্তাশীল মানুষ বিরক্ত হন। ভাবুক মানুষকে কেউ আর দেখতে রাজী নয়, এ যুগের নতুন দাবী—কনশিয়াস মানুষ চাই। তাই তাঁরা যুক্তিতর্ক খাড়া ক'রে বলতে শুরু করেছেন, পৃথিবীর সর্বত্রই একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ গ্রাস করছে। মানুষের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারুর

আর কোন আস্থা নেই। এই বিশ্বাসের অভাবটাই মিডিওক্রিটির জন্ম দেয়, মানুষের ব্যক্তিত্ব কেড়ে নেয় আর মানুষ সর্বদিকে নিঃস্ব হয়ে বাঁচার ব্যর্থ প্রয়াসে খাবি খায়। সুনিশ্চিত হতে গিয়ে করাপ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতাকে দোষ দিয়ে লাভ কি—ভারতবর্ষের বর্তমান চিত্র উনিশ-বিশ হলেও, এই।

তাই দেখলাম দিলীপ মুখার্জী হঠাৎ চিল হয়ে স্বাতীর এরিয়্যাল ভিউ নিতে লাগল। আমি কবি হয়ে কবিতা লিখছি কিন্তু জানি চিলের স্বভাব ছোঁ মারা; কার নজরটা কোন্ দিকে, ওটা মধ্যবিত্তের শিক্ষা, ভুল হবার কথা নয়। স্বাতীর সঙ্গে তাই ইচ্ছে করেই আমি কোন বোঝাপড়ার মধ্যে যাচ্ছি না। কমিশনটাও আর পাব কিনা সন্দেহ। স্বাতী সংসার ধর্ম নিয়ে মশগুল থাকুক, জীবনে সুখী হোক—কি এক দুর্বোধ্য কারণে এখনও সেটা অবশ্য মেনে নিতে পারছি না। ভদ্র সমাজকে ওসব কথা বারবার বলতে নেই, গায়ে ফোসকা পড়ে। সবাই সুস্থ হয়ে গেছে বলতে নেই—ডাক্তার রাগ করেন।

আকাশে চিল উড়তে দেখে আশীষদের বাসায় খুব যাতায়াত শুরু করেছি। অঞ্জনার সঙ্গে আলাপ করতে ভারি ভাল লাগে। ছোট্ট একটা ঘরে বড় একটা তক্তপোষ। একপাশে একটা টেবিলে অঞ্জনা বসেছে, আশীষ বাড়িতে নেই, তাই অঞ্জনা আমার সঙ্গে আলাপ করছিল। সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমার একটা ধারণা, ভুল হতে পারে, তবুও বলছি, আমার ধারণা, যারা পার্টি করে তাদের নিশ্চয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার নেই। অন্ততঃ বলার অধিকার নেই। আশীষের মুখে আমার কথা কতটা শুনেছে জানি না, হেসে বলেছিল—আপনার খুব ভুল ধারণা, অমরেশদা। পার্টি বৈঠকে আমরা যে-যার স্বাধীন মতামত দেবার অধিকার রাখি। কিন্তু আলোচনার পরে দলের তরফ থেকে যদি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—তখন আমরা কেউ আর কথা তুলি না। সবাই মিলে কাজটা করার চেষ্টা করি।

—তোমার মত ক'জন মেয়ে আছে, যারা পার্টি করে?

—অনেক, অসংখ্য। তবে সবার কথা জানি না। আমার কথাই আমি বলতে পারি। আমি আছি। অঞ্জনা হাসল। খুব পবিত্র লাগছিল ওকে। অঙ্গীকারের আলো দেখেছিলাম ওর চোখে-মুখে।

রহস্য ক'রে বলেছিলাম—যতদূর জানি মেয়েদের পেটে কোন কথা থাকে না! এটা কি সত্য বলে ধরে নেবো?

অঞ্জনা অনুত্তেজিত স্বরে বলল—মেয়েদের সতিত্ব রক্ষার দায়িত্ব আমার।

পর হঠাৎ উনি জানতে চাইলেন—তুমি কি ইদানীং সি, পি, আই, এম,-এর পার্টি অফিসে যাচ্ছ ?

—না-তো ? কে বললো ? আমি বিস্মিত হয়ে মিঃ ধরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

—না, মানে। তুমি তো জান, আমরা সেণ্টারের লোক। পার্টি-ফার্টির উর্ধ্বে। কেউ বা কারা যদি বলে, তুমি কোন একটা পার্টির প্রতি সহানুভূতি-শীল—তাহলে আমার পক্ষে তোমাকে ডিফেণ্ড করা একটু মুশকিল হয়ে পড়বে। বলেই তিনি একটা চিঠি আমার হাতে দিলেন। এটা কয়েকজন কংগ্রেসবাবুদের সই করা চিঠি। অভিযোগ করা হয়েছে যে ইদানীং কংগ্রেস-আই-এর কোন খবর দেওয়া হচ্ছে না, তার কারণ আমি নাকি একটি পার্টির দালাল। চিঠিটা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ মিঃ ধরকে কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

মিঃ ধরকে বুঝিয়ে বললাম—আসলে কি জানেন, সেদিন যে স্ট্রাইকটা হয়েছিল—তু'দলই ডেকেছিল স্ট্রাইক। কংগ্রেস-আই থেকে আমরা পাঁচরকম খবর পেতে থাকি এবং তাতে দেখতে পাই বিভিন্ন নেতার স্টেটমেণ্টে একজন আর একজনকে কন্‌ট্রাডিক্ট করছেন। তাই ইন্‌ডিভিজুয়্যালী কারুর খবর না দিয়ে আমরা বামফ্রন্টের খবরটা দিয়ে বলেছিলাম যে, ওদেরটা সফলকাম হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ নেতা দলবল নিয়ে সোজা উঠে এলেন রেডিও অফিসে। যাচ্ছেতাই ধমক দিলেন তিনি এবং বলে গেলেন, তিনি আমাদের উৎখাত করার শক্তি রাখেন এবং এই বেয়াদবী, বিশেষ ক'রে দিল্লীর লোকের এই দালালী কি ক'রে বন্ধ করতে হয়—তা তিনি জানেন। বলেই তিনি এমনভাবে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যে আমাদের মনে হচ্ছিল, তক্ষুনি একটা বোমা ফাটবে এবং আমরা উড়ে গিয়ে পড়ব রাস্তায়। বলেই বললাম—রিয়েলী মিঃ ধর! আই ডোণ্ট নো হোয়াট্ টু ডু। আই উড র‍্যাদার বি ফার্ম দ্যান টু ইল্ড টু সাচ ডার্টি থ্রেট।

মিঃ ধর হেসে বললেন—দিস ইজ ক্যালকাটা মাই ডিয়ার। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ট্যাক্টফুল অর ইউ আর ইন দেয়ার ট্র্যাপ।

বাস্তবিক কলকাতাকে চিনি না বলে এই মস্তানগিরিতে আমার ভীষণ ভয়। কোন একদিন অফিস থেকে বেরোতে গিয়ে আর হয়ত বাড়িতেই ফিরলাম না বা স্বাতী একদিন গায়েব হয়ে গেল কলকাতার এই রাজনীতির

শিকার হয়ে—ভাবলেও আমার বুক কেঁপে ওঠে। এই চাতুর্যহীন নির্বোধ মৃত্যুতে আমার ঘোর আপত্তি। অনিচ্ছায় শহীদ হওয়া আমার ধাতে নেই। আজকাল তাই তো হচ্ছে আকছার।

এই রাজনীতিতে অবশ্য কেউ বেশী চিন্তিত নয়। সেদিন আমি বসেছিলাম ডিউটি রুমে—আমার কতগুলো চিত্র দেখে মনে হল রেডিওকে কেন্দ্র ক'রে কেউ যদি আখেরে গুছিয়ে নিতে পারে, সেটাই তো এখন সবার কাম্য হওয়া উচিত। রাজনীতিতে নীতিফিতি আশা করার আহাম্মকির মত রেডিওর আশা-আকাঙ্ক্ষাও যে কলকাতার মাটি ছুঁয়ে চলবে—এটাই তো স্বাভাবিক। দেখলাম লোক আসছে, যাচ্ছে, গান গাইছে, চেক নিচ্ছে, সিনেমা অ্যাকট্রেস এল কিংবা সিনেমার হিরো—একজন কর্মী জুটে গেল তাদের সুবিধে দেখতে। কত কোম্পানীর কত হিতার্থী এল, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ট্যুরের ব্যবস্থা হয়ে গেল। কবিপক্ষের কনট্রাক্ট, তাও দেখি সারা, এখানে মিটিং সেখানে মিটিং—এখানে প্রিসাইড করতে হবে, ওখানে উৎসব—সবেতেই রেডিওর ট্যালেনটেড মানুষের প্রয়োজন পড়ে। এই ভয়ানক কালচারাল্ ট্রেড-এক্সচেঞ্জের হদিস পাওয়া ভার। সবাই 'করে খাচ্ছে'। কেউ থেমে নেই। এই কালচারাল আপসার্জ রুখবো আমি? তবে তো আমার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে।

এসব দেখেই মাঝখানে একটু সময় ক'রে আমি বাঙালী জাতির উৎস সন্ধানে লেগে গেছি, সেটা তো দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছবার কথা নয়। অথচ আমি বুঝতে পারছি কারুর গোপন ষড়যন্ত্রে সমস্ত রেডিওতে রাষ্ট্র হয়ে গেছে যে আমি নাকি স্বাতীর জন্য মরে যাচ্ছি এবং বাঙালী জাতিকে প্যারাসাইটিক প্রমাণ করার পেছনে কোন একটা বড় শক্তি কাজ করছে। প্রকাশ্য ঝগড়ায় আমি নামতে চাই নি। নয়ত বলতে পারতাম কী কারণে ঐ লিষ্টটা তৈরী করা যায় না, কেন গুণীজনেরা, শিল্পীরা উপেক্ষিত এবং প্রোগ্রাম-পিয়াসী মেয়েরা-শিল্পীরা বিপন্ন বোধ করেন। বহু ঐতিহ্যবাহী ট্র্যাডিশনের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যাঁরা থিসিস লিখবেন, তাঁদের জন্য এইসব সরস কাহিনী তোলা থাক।

সেদিন তাই আশীষকে বলেছিলাম—কলকাতায় এতদিন থেকেও এ শহরকে একটুও চিনতে পারলাম না আশীষ।

—সে কি? অত বড় একটা থিসিস নামালেন—

—আমি?

—উৎসাহ দিয়েছেন কিভাবে, আমি দেখি নি? স্বাতীর জীবনে ইনটেলেক্‌চুয়াল কমরেডশীপ্‌ যদি কেউ দিয়ে থাকে—আপনি। হ্যাঁ, দিলীপ মুখার্জী নয়, আপনি। সেদিন স্বাতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি স্বাতীকে বলেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমিও কম মুগ্ধ হই নি, অমরেশদা। কলকাতায় থেকে যান না—।

হেসে বললাম—গোলামী কি ক'রে করতে হয়, ওটুকুই শুধু শিখেছি আশীষ। বাঁচতে শিখি নি এখনও।

কথাটা ভাবতে গিয়ে বুকের পাঁজর ব্যথা ক'রে উঠল। বিদায়ের সুর বাজছে সর্বত্র।

—আসুন, আসুন, অমরেশবাবু—ঘোস-বোস-মল্লিক একসঙ্গে বলে উঠলেন। আমরা রবিকে বলছিলাম, আসল কথা কালচার। ওতে বাঙালীর লিডারশীপ্‌ কেউ কোনদিন খর্ব করতে পারবে না।

মিঃ রবি চৌধুরী ধমক দিয়ে উঠলেন—মল্লিক, মাল গিললেই হয় না—কেন গিলছো, কি ফ্রাসট্রেশনে গিলছো—সেটা যদি স্বাতীর থিসিস পড়ে জান, তবে বাঙালী জাতির হয়ত কিছুটা মঙ্গল হত।

—রাখো হে, দিল্লীর কথা রাখ। ঐসব লোক—যাদের তোমরা প্রডাক্‌টিভ্‌ বা পরিশ্রমী জাত বল—টাকা ক'রে ক'রে এখন কী করছে দেখে এসো। গত বছরের ফিগার ছিল—শাশুড়ীর ঠেলায় কুড়িজন সদ্য-বিবাহিত বউ-এর সুইসাইড্‌। বাংলার কুলীন যুগেও তো এরকম হয় নি!

রবি চৌধুরী বললেন—ওসব বস্তাপচা কথা রাখ তো। মালদার জিনিস খেয়েও বড় কিছু ভাবতে পার না, বড়ই দুর্ভাগ্য কলকাতার। একটা শামিকাবাব মুখে পুরে বললেন—মল্লিক! একটু ভাবতে দাও। বাঙালী যেমন ভাবে চলছে, চিরকাল সেভাবেই কি চলবে? প্লিজ, এই গূঢ় কথাটাই আমাকে মাঝে মাঝে ভাবায়। অমরেশ-স্বাতীর প্রেম বুঝলে না—রীতিমত প্ল্যাটোনিক্‌। তাই দেখছো না, ওদের ক্লান্তি বলে কিছু নেই।

—ঠিক, রবি, ঠিক। অমরেশবাবু! আপনার 'প্ল্যাটোনিক্‌ লাভ' শেষ পর্যন্ত মার খাবে কিনা—থিসিসের চেয়ে ওটার জন্যেই আমাদের দুঃশ্চিন্তা। তবু এসো ঘোষ-বোস-দস্তিদার সেই চিরন্তন প্রেমের অনারে আমরা শেষ বারের মত পান করি। বলেই মল্লিক গ্লাসটার থেকে এক সিপ্‌ নিয়ে বলল—রবির সংস্পর্শে এসে আজকাল মেহনতী জনতার জন্য রীতিমত আমার চোখের জল পড়ে। হ্যাঁ, তোমরা বাছারা খেয়ে-পরে থাক। আমরা যখন সহায় রবি, নিশ্চয় দেখো মেহনতী জনতা একদিন খেতে পাবে। পেট ভরে খেতে পাবে।

॥ আঠাশ ॥

আমি অফিসে বসে তখন কাগজ পড়ছিলাম। নিজের অভিযোগ বা ক্ষোভ আড়াল করার আমার একমাত্র উপায়। জ্যোতিবাবুর প্রেস কনফারেন্স ছিল। লেফট্ ফ্রন্টের যেসব পজিটিভ পারফরম্যানসের কথা বলা হয়েছে, দিল্লীর ন্যাশনাল নিউজের পরিপ্রেক্ষিতে অত বড় খবর না হলেও কলকাতা খবরের এটা লিড। কেন্দ্রের হোম মিনিস্টার গেছেন আসামে এবং দ্বিতীয় দিনের বৈঠক শেষ হয়ে গেলেও এ-ব্যাপারে আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে মতান্তরের কোন মীমাংসা হয় নি। আন্দোলনকারীরা ৩৬ ঘণ্টা 'রাস্তা রোখ'-এর ডাক দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৭১ সালের সীমা-রেখার ব্যাপারে সাংবাদিকদের একটা নতুন পয়েন্ট বলেছেন, যদিও কথাটা আমার কাছে মোটেই নতুন কিছু নয়। ৭১ সালের নীচে কেন্দ্র যেতে রাজী নন। তার কারণ, লাখের ওপরে শরণার্থী হুড়মুড় ক'রে এসে পড়লে, পশ্চিমবঙ্গের ইকনমির ওপর আবার একটা চোট পড়বেই। রাজনৈতিক ভারসাম্যে জনমত লোটা যাবে না। অন্যান্য রাজ্য, কে কত শরণার্থী নেবে—সেটার নির্ধারণ অত চট্ ক'রে হবার নয়, বর্তমান আঞ্চলিকার রেষারেষিতে।

এই দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা আমাদের লিড—যার সামান্যমাত্র নিউজ সেন্স আছে, সে-ই বুঝবে। কিন্তু শরণার্থী পয়েন্টটা আছে এবং সম্মানিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সবচেয়ে বড় কথা—আমি যা ভাবছি তার উল্টোটা করলেই যেহেতু জব্দ করা যায়—আমার বিরুদ্ধে চার্জ প্রমাণ করা যায়—তাই জ্যোতিবাবুর প্রেস কনফারেন্স আমাদের সেকেণ্ড লিড। দিলেই হল, খবরে গেলেই হল। কে আগে আর কে পরে, ওটার অত ইম্‌পরট্যান্স নেই। আমি বসে আছি কিন্তু তরল গুহ শুনছি ওদের বলছে, আসাম লিড হবে এবং সেকেণ্ড যাবে জ্যোতিবাবু।

জনা একবার যেন প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল—মিঃ রায়ের অন্য মত এবং আমারও মনে হয়, আসাম স্টোরিটা আপনার করা হলেও ওতে বিশেষ কিছু

নেই। ন্যাশনাল বুলেটিনের লিড সব সময় আমাদের লিড হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়।

তরল গুহ বকে উঠলেন—যা তোমাকে বলছি, তাই কর। ধমকটার পেছনে কত ব্যাপার হয়ে গেছে তা আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। নিজের জোর খাটাতে গিয়ে অপমানিত হতে আমি চাই না। কলকাতায় আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

নিউজ হয়ে যাবার পরে দেখলাম তরল গুহ প্রথমে গেল ডি, ডি, জি, ই,-র ঘরে এবং পরে এস, ডি,-র ঘরে এবং প্রত্যেককে তাঁদের ঘর থেকে পরপর টেলিফোন ক'রে তিনি কি যেন বলে এলেন। তারপর যতদূর আমার অনুমান, ক্লোজড্ ডোর মিটিং চলল কৌন্তেয়-এর সঙ্গে। এসব দেখে, কিছুটা শুনে, কিছুটা খবর নিয়ে আর কিছুটা অনুমান ক'রে আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। ভাবলাম, শেষবারের মত এদের বুঝিয়ে দিই—আমারও কতটা বা কতটুকু ক্ষমতা। যে দেশ তরল গুহের মত মানুষের হাতে খবর পরিবেশনের দায়িত্ব দেয়—সে দেশ কত দুর্ভাগা, অনুমান ক'রে আমি ভেতরে ভেতরে গর্জাতে থাকলাম। বুঝলাম গোটা সমাজটাই এই। দৃষ্টিহীন, স্পাইনলেস্ আর তোষামোদপ্রিয়। সুবিধেবাদী তো বটেই। আজ অবশ্য খবরটা বড় কথা নয়, ষড়যন্ত্রটাই বড় এবং আমি যে কেন্দ্রের খবরের চেয়ে 'জ্যোতিবাবু, জ্যোতিবাবু' করি, তার এক অকাট্য প্রমাণ। ফাঁদে আমি ধরা পড়েছি।

জনাকে ডেকে পাঠালাম। —কি জনা, ভাল আছ তো ?

—হ্যাঁ স্যার, এই কোন মতে চলে যাচ্ছে।

—আমি তো চললাম জনা। তোমাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছি। মাপ কোরো।

জনা নিঃশব্দে চেয়ারে বসে বলল—তোষামোদ আমার আসে না। তাও বলছি, নিউজ সেন্স কাকে বলে, কিভাবে নিউজটা সাজাতে হয়, বাদ দিতে হয়, এডিট্ করতে হয়—আপনি আমাকে হাত ধরে শিখিয়েছেন। আপনার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আজকাল আমিও কিছুটা শিখেছি মনে হয়। তবে আপনার এখানে না থাকাই শ্রেয়। সম্মান নিয়ে কাজ করা, বুঝলেন—কথাটা জনা শেষ করল না।

বললাম—আজকের লিড নিয়ে আমার কিছু বক্তব্য ছিল জনা।

জনা কোন কথাই বলতে চাইল না। —আমাকে মাপ করবেন, সব কথা আমার বলা সাজে না, বলবোও না। দিল্লীতে আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমার কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছে রইল।

আমি ধরে নিলাম—আমার কথাটা ওরা কেন মানল না—তার পেছনে বেশ কিছু দিনের ষড়যন্ত্র নির্বাক হয়ে আছে। ইদানীং আমি অফিসটাকে কোনমতে ম্যানেজ দিয়ে কলকাতার জীবনে একটু যেন বেশী মিশে গিয়েছিলাম। স্বাতীর থিসিসও আমাকে দৌড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তরল গুহকে অনেক ব্যাপার নিয়ে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ আমি নিজের হাতে তুলে দিয়েছি। তাঁর বা কৌন্তেয়-র বিজয়ে এটুকুই আমি বুঝতে পারছি, এই রাজ্যে, ন্যায়নীতি ও ন্যায্যপথ নিয়ে কেউ আর মাথা তুলে কাজ করতে পারছে না। এই পরশ্রীকাতরতা, অন্যের ক্ষমতায় হিংসায় জ্বলে ওঠা এবং তাকে খর্ব করতে গর্হিত কাজ করতেও পিছুপাও না হওয়া—না, থাক ওসব কথা।

—আচ্ছা জনা! দিল্লীতে গেলে দেখা কোরো কিন্তু।

জনা মাথা নেড়ে চলে গেল। চাপা মানুষ, বুঝতে পারলাম, অনেক কিছু ওর বলার ছিল কিন্তু রাজায় রাজায় যেখানে যুদ্ধ, সেখানে চুপ ক'রে থাকাই শ্রেয়। জনার কিছু বলার ব্যাপারে একটু অসুবিধা আছে, আমি বুঝতে পারি।

পিনাকী ব্যানার্জী ঘুরঘুর করছিল। ডেকে পাঠালাম। —তুমি কিছু বলবে ?

—না, স্যার। আপনি শুনলাম দিল্লীতে চলে যাচ্ছেন স্যার।

—হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে, পিনাকী। কেন, কিছু বলবে ?

—আপনি কবে যাচ্ছেন স্যার ? শুনলাম কালই চলে যাচ্ছেন ?

—সে কি! আমি জানলাম না আর তোমরা সব শুনে বসে রইলে ? তুমি বুঝি অনেক আগে খবর পাও পিনাকী ?

—তা—না, স্যার। তবে ওরকমই যেন শুনছিলাম। তাই ভাবলাম, আপনি যখন আছেন, কথাটা ভেরিফাই ক'রে নিই। মিনিস্ট্রি ছাড়া তো ডাইরেক্টরেট্ আপনার গায়ে হাত দিতে পারে না—না, স্যার ?

—না, তুমি ভুল করছো পিনাকী। আমি এখন নিউজ বিভাগের অধীনে। অধিকর্তা অসন্তুষ্ট হলে অর্থাৎ তাঁকে কোন ব্যাপারে বলে বলে যদি আমার

বিরুদ্ধে ক্ষেপানো যায়—তবে ডাইরেক্টরেট্ কেন, মিনিস্ট্রিও আমার ওপরে খুশী হবে না। কেন, কিছু হয়েছে নাকি? তরল গুহ কি নিউজ বিভাগের বড় কর্তাকে চটিয়ে দিতে পেরেছেন?

—ওসব কেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, স্যর—ওসব আমি কিছুই জানি না। আমি পিনাকীর চোখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। ও চোখ সরিয়ে নিল।

আমার পরাজয়ে ওর আনন্দ হয়েছে—ওটা ওর পক্ষে বলা মুশকিল। আসলে আমি কবে যাচ্ছি, ওর দলের এ খবরটা হয়ত দরকার এবং পিনাকী হয়ত ভেবেছিল, আমাকে একটু প্রোভোক্ করলেই রাগের মাথায় আমি বলে ফেলব। পিনাকীর সাধ্য নেই বোঝে, ওর চেয়ে আমি অনেক বেশী ডিপ্লোম্যাটিক এবং ওর কানেক্‌শনস্ আমি জানি। যত ইনোস্যেন্টলি পিনাকী কথাগুলো জিজ্ঞেস করছিল, অতটা সরল ও নয়। কি জানি আশীষ ও ওদের পার্টির লোকেদের সঙ্গে আমাকে ঘুরতে দেখে পিনাকীই হয়ত তরল গুহকে লাগিয়েছে যে আমি রাতারাতি লেফ্‌টিস্ট হয়ে গেছি। কংগ্রেস আই-এর খবর আজকাল কম আর জ্যোতিবাবুর খবর আজকাল বেশী যাচ্ছে—এটাই তার কারণ। হঠাৎ কেন জানি মনে হল, স্ট্রাইকের খবর দেওয়া নিয়ে ওর দলের লোকেরা একদিন যে হৈ-হৈ করতে করতে আমাদের সংবাদ বিভাগে হামলা করেছিল—তার পেছনে কার হাত? পিনাকী নয়তো? অর্থাৎ ঘরের খবর, নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হবে বলে কোন্ বিভীষণ দেয়? সেটা ডি, ডি, জি,-ই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এদের কোনরকম কষ্ট হয় নি জানি কিন্তু মিনিস্ট্রি পর্যন্ত যদি পৌঁছে গিয়ে থাকে, আশ্চর্য হব না। পিনাকীর উপস্থিতি তখন আমার অসহ্য লাগছিল। তাই বললাম—আর কিছু বলবে?

পিনাকী দাঁড়িয়ে ছিল আমার রওনা হবার ঠিক ডেট্ জানতে। তা আমি ওকে বলব না—আমার এই সাবধানী মনটাকে ও চেনে না। হয়ত 'টের পায় নি কিংবা খেয়াল করে নি।

—না স্যার, যেজন্য আজকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং ছিল, আপনাকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া হবে—সেটা কবে হতে পারে, তা জেনে নেবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর।

কথাটা শুনে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। কিন্তু পিনাকীকে কিছু বলে লাভ নেই। শুধু একটু হাসলাম।

একটু রহস্য ক'রে বললাম—সম্বর্ধনা যদি দিতে চাও, দেরী কোর না পিনাকী। তোমরা বোধহয় একটু দেরী ক'রে ফেললে। কালকের প্লেনেই হয়ত চলে যাচ্ছি।

—তার মানে স্যার, আপনি মিনিষ্ট্রির চিঠি পেয়ে গেছেন?

—না, পাই নি। কালকে হয়ত পাব। কিন্তু পিনাকী, তুমি কি চাইছ, আমি আরও বেশ কিছুদিন কলকাতায় থেকে যাই? তা নিশ্চয় চাইছো না। তোমাদের সম্বর্ধনার অর্থ যদি এই হয়, আমি লড়বো, আমার অধিকার কিছুই ছাড়বো না—তবে তোমাদের সম্বর্ধনায় আমি যোগ দিতে রাজি। তবে তার আগে তোমরা নিজেরা একটু কন্‌সালট্‌ ক'রে নিও, কেমন?

পিনাকী ঘাবড়ে গিয়ে বলল—সে তো নিশ্চয়, সে তো নিশ্চয়। আমি চলি স্যার। পিনাকীকে নজর করে দেখলে অবক্ষয়ের ইতিহাস ঘাঁটতে হয় না। ওর চলে যাবার ভঙ্গীটা সাপের চলার মতই ভয়ঙ্কর।

উঠে পড়ব ভেবেছিলাম—দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রুদ্ধ।

—কিছু বলবে?

—না।

—আমি চাই, তুমি কিছু বলো।

—বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। রাত কাবার হয়ে যাবে। তার প্রয়োজন নেই। যেসব কাহিনী বা সত্য ঘটনায় একটা জাতের কেলেঙ্কারী ফাঁস হয়ে যায়—সেটা না বলাই ভাল। তাতে কোন পক্ষেরই মর্যাদা থাকে না। তবে যাবার আগে একটা কথাই বলতে চাই—কলকাতায় আর বেশী দিন থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনি কালকেই চলে যান।

আমি বুঝলাম একটিমাত্র মানুষ সত্য কথাটা বলছে। কেন বলছে, কি কারণ তাও যেন কিছুটা অনুমান করতে পারি।

হেসে বললাম—তুমি কি ভাবছো রুদ্ধ, কলকাতায় এদের হাতে আমি অকালে শহীদ হব?

—আশ্চর্য কিছু নয়—কলকাতায় আপনি কি কাজ করছিলেন, এখন অনেকেই জানে।

—কি কাজ করছিলাম, রুদ্ধ? আমি অবাক চোখে তাকালাম। চলো, ঘরে চলো।

—না, বসতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে—আমি অনেক দূরে থাকি মিঃ রায়। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন ইদানীং আপনি একেবারে সময় পাচ্ছিলেন না।

—না, ভুলি নি। পানিহাটীর ঘর-বাড়ি-শ্মশানযাত্রী-মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলে কত স্নেহে ও কত আদর ক'রে, সব আমার মনে আছে রুদ্ধ।

—আজ আমি সেকথা বলতে আসি নি।

—জানি।

—ডাইরেক্টরেটের চিঠি পেয়েছেন?

—না।

—পান নি?

—কেন, পাওয়া উচিত ছিল নাকি?

—মিঃ ধরের কাছে খোঁজ নিয়েছেন কোন চিঠি এসেছে কি না?

—না। এলে তিনি নিজেই ডেকে পাঠাতেন। আমাকে ঐ একটি মানুষ গার্ড ক'রে যাচ্ছেন, তুমি জান?

—হ্যাঁ, জানি—তাই বোধহয় তিনি এখনও বলেন নি। তবে চিঠি এসেছে জানি।

—দিল্লী ডেকে পাঠিয়েছে—এই তো? কিংবা রুদ্ধ এটাই স্বাভাবিক, কলকাতায় আমার থাকাটা চার্জ-সিটের মত খাড়া না করলে তরল গুহ বা কৌন্তেয়-র ইজ্জত থাকে কি করে?

—বাঙালীকে প্যারাসাইট্ প্রমাণ করতে পারলেন?

—আমার তো প্রমাণ করার দায়িত্ব নয়। একজন রিসার্চ করছে, তাকে আমি সাহায্য করতে চেয়েছি।

—কলকাতা যখন ক্ষেপে যাবে সেটা 'র‍্যাওডিজম্'—তখন আর কেউ ভেবে দেখবে না, স্বাতী বিশ্বাসকে আপনি প্রতিপদে বাধা দিয়ে আসছিলেন।

—তুমি এত কথা জানলে কি করে? এসব কথা আমি করিডরে দাঁড়িয়ে বলতে নারাজ, রুদ্ধ। তুমি বরং আমার বাড়িতে এসো। রবি চৌধুরীকে তুমি তো চেনো।

—গিয়েছিলাম, দেখা পাই নি।

—গিয়েছিলে? দেখা হল না, আমার দুর্ভাগ্য।

—আমাদেরও খুব দুর্ভাগ্য আপনার যোগ্য স্থান বা মর্যাদা আমরা দিতে পারি নি। তবে সম্বর্ধনা দেবো ঠিকই—আমি দশ টাকা চাঁদা দিয়েছি।

আমি হাসতে হাসতে নেমে এলাম। বুঝলাম, রুদ্ধ সব খবরই রাখে এবং ও বলতে চায়, চারপাশে হাওয়াটা যেরকম আমার বিরুদ্ধে গরম হয়ে উঠেছে—সবচেয়ে ভাল হয়, যদি কাউকে কিছু না বলে রাতারাতি আমি কেটে পড়ি।

বেরোতে যাব, দেখলাম রবি চৌধুরীর গাড়ি। দরজাটা খুলে বললেন—তাড়াতাড়ি উঠে আসুন। রুদ্ধ, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

—আমি শেয়ালদা যাব—আপনারা যান। রুদ্ধ এড়িয়ে গেল।

—বোস না, তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না।

গাড়িতে চুপচাপ বসে আছি। আমি পেছনে, রুদ্ধ মিঃ চৌধুরীর পাশে।

—তোমাদের তুলনা হয় না, রুদ্ধ—রবি চৌধুরী বললেন।

—আমাকে কেন বলছেন? আমি কি কিছুর মধ্যে থাকি?

বুঝলাম, আমাকে নিয়েই দু'জনের মধ্যে ইসারায় কথা হচ্ছে।

—পিনাকীর গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখো—আমিও রাখছি। এখন সম্মানের সঙ্গে অমরেশবাবুকে দিল্লীতে ফেরৎ পাঠাতে পারবো কি না, বুঝতে পারছি না—

—মিঃ রায় বোধহয় এসব কিছুই জানেন না—একটু বুঝিয়ে বলবেন।

রবি চৌধুরী ধমকের সুরে বলে উঠলেন—সব জানেন। কলকাতায় থাকছেন অথচ কলকাতার পলিটিকস্ বোঝেন না—এটা কি হয়? মিঃ রায়কে তুমি চেনো না, রুদ্ধ। তবে জিনিসটা এভাবে ঘোরাল হয়ে উঠবে বুঝতে পারি নি। নয়ত আর একদিনও ওয়েস্ট হতে দিতাম না।

এদের দু'জনের কথা বলার ধরণে বুঝলাম, আজ কিংবা দু'দিন আগে রবি চৌধুরীর সঙ্গে রুদ্ধের কথা হয়েছে। সুতরাং দু'জনে আকার-ইঙ্গিতে মহাভারতের একটা যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়ে গেল।

রুদ্ধকে শেয়ালদা ষ্টেশনের সামনে নামিয়ে দিয়ে রবি চৌধুরী সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইলেন, তারপর বললেন—আপনি এক্ষুনি মিঃ ধরকে ফোন করুন। এত নির্বিকার আপনি? আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। মশায়, আপনাকে নিয়ে আমার দেখি মহা বিপদ হল।

—কি হয়েছে, খোলাখুলি বলুন না? তবে তো বুঝি। আমি বুঝতে পারছিলাম, তরল গুহ কিছু একটা ব্যাপারে আমাকে একেবারে জব্দ ও পর্যুদস্ত ক'রে ছেড়েছেন। কিন্তু ওটা তিনি ক'রে থাকেন বা করবেন, তিন মাস আগে থেকেই আমি জানতাম। তা নিয়ে অত বিচলিত হবার কি আছে?

—ফোন করুন, দেখুন না—যা আমরা জেনেছি, উনি আপনাকে ভালবাসেন, নিশ্চয় কিছু পথ বাৎলে দেবেন।

রবি চৌধুরীর মাথায় একবার যদি পোকা ধরে আর রক্ষে নেই। জোঁকের মত লেগে থাকেন।

আমি ফোন করলাম—স্যরি, টু ডিসটার্ব ইউ অ্যাট সাচ এ্যন অড্ আওয়ার। আই ওয়েন্ট ইন ইয়োর রুম্, টোয়াইস্, বাট—

—দেটস্ ভেরী নাইস অব ইউ। মিঃ রায়, আই ওনট্ বি এ্যবল্ টু টেল ইউ এভরি থিং ওভার দি ফোন। বাট্ আই থিং ইউ শুড্ লিভ্ ফর ডেলহি লেটেস্ট বাই টুমরো। আই উড্ লাইক্ টু গো উইথ ইউ। ইটস্ এ কন্সপিরেসি টু সি ইউ আউট অব্ ক্যালকাটা। (আমি জানতাম, এটাই হবে—কিন্তু এত আগে, তা ভাবি নি) ইয়েস, সাম চার্জেস্ হ্যাভ্ বিন্ লেবলেড্ এগেন্স্ট্ ইউ—দে আর সিলি চার্জেস্। আই নো—হু এমাংগস্ট আস হেলপড্ টু ফ্রেম দোজ চার্জেস্। দিল্লী উড হ্যাভ্ বদারড লিস্ট ফর হোয়াট ইউ আর প্রাইভেটলি ডুয়িং হিয়ার—

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম—আমার খুব কিউরিওসিটি হচ্ছে—আমি জানতে চাই, কি চার্জেস্।

তিনি বললেন—স্যো ফার অ্যাজ আই নো ইউ দ্যে আর ভেরী সিলি। ইউ আর চার্জড অফ্ বিয়িং সিম্প্যাথেটিক্ টুওয়ার্ডস্ সি, পি, আই, এম। মিঃ রায়, তুমি কি আমেঠীর গণ্ডগোলের খবরটা আমাদের বুলেটিনে দিয়েছিলে?

বললাম—হ্যাঁ। খুব ইনোসেন্ট খবরটা ছিল। আমেঠীতে কংগ্রেস কর্মীরা গণ্ডগোল করেছে, এ চার্জ তো আমরা করি নি, করেছে অপোজিশন্ নেতারা। পরের দিন সব কাগজে খবরটা বেরুবে। দিল্লী সেদিন নটার সময় নিয়েছিল, আমরা তার পরের দিন সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ-এর বুলেটিনে কিছু অপজিশন্ নেতাদের বক্তব্য সমেত নিয়েছিলাম। সেগুলি আমাদেরই করেস্পনডেন্টের

স্টোরি, এজেন্সির খবর নয়। তরল গুহের খুব আপত্তি ছিল, তিনি বলেছিলেন ইলেকশন কমিশন ডিনাই করেছেন অপজিশন্ চার্জেস, সেটা ন'টার বুলেটিনে আমি শুনেছি, অযথা এসব আবার দিয়ে ঝামেলা বাড়ান কেন? দিল্লী যেমনটি করবে, আমরা যদি সেই লাইন ধরে চলি, কখনো কোন ঝামেলা হয় না। মিঃ ধর, আপনি নিশ্চয় মানবেন, খবর দিতে গিয়ে অত কথা ভাবলে খবরের নিরপেক্ষতা সব সময় বাঁচান যায় না। এই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউণ্ড—কেন, তা নিয়ে কিছু ঝামেলা হয়েছে নাকি?

—না, ঝামেলা হয়ত হত না, কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে তোমার সি, পি, আই, এম,-এর লিঙ্ক খুব কায়দা ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়ায় জিনিসটা একটু অন্য রকম টার্ন নিয়েছে। সে যাক, তুমি সকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ডোণ্ট ওরি, আই অ্যাম উইথ ইউ।

টেলিফোন রেখে আমি গুম্ হয়ে বসে রইলাম। আমেঠীর ইলেকশনের গণ্ডগোলের খবরটা অত ডিটেল্‌সে আমরা নিয়েছি অথচ দিল্লী নেয় নি—এখান থেকে এটা কেউ না জানালে তো দিল্লীর পক্ষে জানার কথা নয়। আমি তরল গুহের ষড়যন্ত্রের একটা পুরোপুরি আভাস পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। উনি কি এখান থেকে বুলেটিন পাঠাতেন? আঘাতটা এদিক থেকে আসবে ভাবতেও পারি নি।

রবি চৌধুরী এসব কিছুই শুনতে পান নি, তাই অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছেন। অধৈর্য হয়ে বললেন—কি বললেন, মিঃ ধর?

—কি আর বলবেন? বাঙালী বাঙালীর কত বড় শত্রু এবং সেটা এরকম নগ্নভাবে ধরা দেবে, ভাবেন নি বলেই দুঃখ করছিলেন। তাই বলছেন, আমার সঙ্গে দিল্লী যাবেন। সংক্ষেপে যা হয়েছে, বললাম।

—ওসব কাদের কাজ জানি। হয়ত সেটা আন্দাজ ক'রেই মিঃ ধর অত বিচলিত হয়েছেন। ওসব নিয়ে অযথা মন খারাপ করবেন না। সে যাক, আসল কথায় আসুন। আপনাকে কবে যেতে বলছেন?

কলকাতায় থাকা আর নিরাপদ নয়, সেদিকেই দেখছি রবি চৌধুরী জোর দিচ্ছেন বেশী। খুব স্ট্রেনজ্ ব্যাপার!

কথাটা রবি চৌধুরী রিপিট করলেন, যেন একটু চিন্তাগ্রস্ত—কালই যেতে বলছেন?

আমি মাথা নাড়লাম।

—ভেরী গুড। তবে প্লেনের টিকিটটা করেই ফেলি, কি বলেন? কি হয়েছে, কার জন্য এসব হচ্ছে, আপনার গতিবিধি কারা ওয়াচ্ করছে, আমরা পার্টির লোক মশায়, আমরা কিছুটা জানতে পারি। তবে সবটা এখন বলার প্রয়োজন দেখি না। একটিমাত্র অনুরোধ—আমি যা বলবো, শুনবেন বলুন, কথা দিন।

—আপনি যদি এমন কোন কথা বলেন যার জন্যে আমি তৈরী নেই, সেটাও তো ভাবা দরকার। আমি স্বীকার করছি, আপনাদের মত সাহস আমার নেই, তবুও বলছি কলকাতায় দু'একটা আরও কাজ বাকি ছিল।

—যেমন? রবি চৌধুরী জেরা শুরু করলেন। হাসতে হাসতে বললেন—স্বাতীর সঙ্গে শেষ 'ইয়ে'—হয় নি, এই তো?

কথাটা সত্য। স্বাতীর ব্যাপারে আরও সাত দিন অন্ততঃ থেকে যেতে চেয়েছিলাম। ওর থিসিস টাইপ হচ্ছে এবং আমি তাতে সাহায্য করছি। মাঝখানে দিলীপ নাক গলাতে এসেছিল, স্বাতী তাকে আমার মর্যাদা রাখতেই অপমান করে নি। সোজাসুজি বলে দিয়েছে, স্বাতীর কোন ব্যাপারে সে যদি না থাকে, খুশী হবে। তারপর থেকে ও হয়ত আমার গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছে এবং কার সঙ্গে কিভাবে এবং কোন্ তালে যোগাযোগ রাখছে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। গত রাতে স্বাতীকে যখন পৌঁছতে যাচ্ছি, তখন যা ঘটেছে—তা এখনও স্বাতীকে বলা হয় নি। স্বাতীকে আগে না বলে রবি চৌধুরীকে বলা ঠিক হবে কিনা, সেটাই তখন ভাবছিলাম।

—কি, চুপ ক'রে আছেন যে? দেখুন, এসব রিসার্চ-ফিসার্চ অনেক করেছেন, এখন কলকাতার পলিটিকস্ থেকে বাঁচতে আপনাকে অনেক বেশী তৎপর হতে হবে।

—কেন, এরা ধরে মারবে নাকি? হেসে বললাম।

—বলা যায় না। কলকাতায় কারণে-অকারণে লোকেরা শ্রেফ্ হুজুগে পড়ে আকছার এটা করছে এবং আপনি এতদিন এখানে থেকে এটা নিশ্চয় অন্ততঃ বুঝেছেন।

—দিল্লীতে চলে গেলেই কি সে বিপদ কাটবে?

—হ্যাঁ, আপাতত কাটবে। দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করার সাহস এদের নেই। এরা প্রকৃতই প্যারাসাইট—স্বাতীর গোটা থিসিসে হয়ত এদের কথাই নেই,

কিন্তু আজকে রাজনীতিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে—কতটা যুক্তিহীন জুলুম আর র‍্যাওডিজম, সেটার কার্য-কারণ লিখলে হয়ত কাজ দিত।

—কোন রাজ্যকে পালটাবার দায়িত্ব আমাদের নয়। রেডিওর একটু যা করতে চেয়েছি তাতেই তরল গুহ আমাকে অফিস থেকে তাড়াবার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেছেন কবে থেকে। আর সেরকম যদি কিছু করতে চাইতাম, তবে তো মশায়, এতদিনে খুন হয়ে যেতাম। আসলে এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়. আমিও যে খুব বিচলিত হচ্ছি তাও নয়, তবে—একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললাম—মিঃ চৌধুরী, ব্যাপারটা আমার খুব আঁতে লেগেছে। আমার মনটা ভীষণ ভাবে বিদ্রোহ ক'রে উঠছে। যদি মরেও যাই, তবুও আমি কলকাতায় আরও সাত দিন থাকবো।

—উঃ, আপনাকে নিয়ে—! আচ্ছা কাল সকালে ভাবা যাবে। আজকে নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন।

দেখলাম রবি চৌধুরী তাঁর গাড়ি নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। কলকাতায় আমি অক্ষত না থাকলে ওঁর বোধহয় প্রেস্‌টিজ্‌ থাকবে না।

বুলবুলকে একবার টেলিফোন করলে হয়। স্বাতীকে যদি ও খবর দিতে পারে স্বাতী যেন কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে। সম্ভব হলে বাড়িতে। রবি চৌধুরী যখন এত বিচলিত হয়েছেন—তখন আমার বোধহয় কলকাতায় আর সাত দিন থাকা নিরাপদ নয়। রবি চৌধুরী নিশ্চয় অকারণে বিচলিত হন নি। তবে কি সত্যিই কিছু ঘটতে যাচ্ছে? তিনি আঁচ করেছেন?

—কে, বুলবুল? হ্যাঁ শোন। তোমাকে অনেক রাতে বিরক্ত করছি, মাপ কোরো। তোমার সেই বান্ধবী আছে না, যে স্বাতীর বাড়ির কাছে থাকে, তার সঙ্গে একটু যোগাযোগ ক'রে যদি—।

—মশায়, সে বান্ধবী নেই, দিল্লীতে বাপের বাড়ি গেছে। তবে তার স্বামী আছেন, অসুবিধা হবার কথা নয়, কারণ তিনি স্বাতীকে চেনেন। যদিও ভাবছি এত রাতে পুরুষমানুষকে বিরক্ত করা– সে যাক্‌, কিছু একটা করবো। কেন, হঠাৎ কী হল? রোজই তো শুনি আপনাদের দেখা হয়, হঠাৎ এত রাতে তাকে বিশেষভাবে ধরার প্রয়োজন পড়ছে কেন?

—ভালবাসার সময় শুনেছি, বুলবুল, রাত-বে-রাত বলে কোন কথা নেই।

—চমৎকার! খুব জমেছে বলুন।

—খুব। তবুও আমার গলায় একটা ভয়ার্ত স্বর প্রকাশ পেয়েছিল কিনা জানি না—কোনদিন অত রাতে ফোন করি নি, ওর একটু আশ্চর্য হবারই কথা। জিজ্ঞেস করল—কি, অমরেশদা, চুপ ক'রে আছেন কেন? আপনার কোন বিপদ হয় নি তো?

—না, বুলবুল, কিচ্ছু না—তবে স্বাতীকে যদি খবরটা দাও। ও কোথায়?

—টুরে। তাই তো একটু মুশকিল।

—বলবে, দশটার মধ্যে আমাকে কিন্তু বেরিয়ে যেতে হবে অফিসে—

—আর কিছু? খুব ভাল মেসেনজার পেয়েছেন কিন্তু। যদি সেরকম কিছু থাকে এক্ষুনি চেষ্টা করতে পারি। আপনার স্বার্থে পর-পুরুষকে না হয় একটু বিরক্তই করলাম। যতদূর জানি ওতে তারা খুশী হয়—!

খুব একচোট হাসলাম। না, এত রাতে নয়। কাল বোলো, তাহলেই হবে।

—আপনি অনেক দিন আসেন না কিন্তু অমরেশদা। ও বলছিল।

—এবার আর বোধহয় হবে না, বুলবুল।

—সে কি? আর দেখা হবে না?

—সেরকমই তো মনে হচ্ছে। ভারতবাসীরা কতগুলো ব্যাপার খুব সহজ ক'রে নিয়েছে। বল তো কি?

—কি? বুলবুল আগ্রহান্বিত হল।

—এই যে, যা-কিছু হচ্ছে সব তোমার ভাগ্য। তোমার হাতে কিছু নেই। গরুর দড়ি দেখো নি, যতটুকু দড়ি ততটুকুই তোমার স্বাধীনতা। ব্যস। নিরাসক্ত হয়ে কর্ম কর, চেও না কিছু। কি, ভাগ্যের কথা শুনতে ভাল লাগছে বুঝি?

—আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।

—স্বাতীকে কথাটা বোল না যেন, ও আবার হিংসেয় জ্বলে উঠবে।

ঝর্ণার জলের মত মিষ্টি আলোড়ন তুলে রাত দুপুরে বুলবুল খিলখিল্ হাসল। এদের ছেড়ে যেতে হবে, খুব কষ্ট হচ্ছে।

ও জিজ্ঞেস করল—আর কিছু বলতে হবে?

বললাম—না।

বুলবুল বলল—আপনি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি কি যেন আপনার হয়েছে। কি বিপদ আমি জানি না, তবে একটা কথা বলে রাখি,

দিলীপ মুখার্জী থেকে সাবধান। ও কিন্তু কলেজ জীবনের শুরুটাতে খুব গুণ্ডাদের সঙ্গে মিশত। আর স্বাতীর জন্য পাগল। সাবধানে চলাফেরা করবেন কিন্তু। চলি।

টেলিফোনটা রেখে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, মেয়েরা আন্তরিক বলেই কি বুঝতে পারে কি হতে যাচ্ছে বা ঘটনার পূর্বাভাস? পরশু দিন আমি স্বাতীকে পৌঁছে দিয়ে যখন অনেক রাতে ফিরছি—দিলীপ মুখার্জী আমার কাছে এসে দাঁড়াল—বলল—আপনি? স্বাতীকে বুঝি পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন?

—হ্যাঁ—কেন? তুমি এখানে এত রাতে? কিছু বলবে?

—না, কি আর বলবো—তবে শুনলাম আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন এবং রেডিও আপনার সম্বর্ধনা দেবার জন্য দিন তারিখ ঠিক করছে?

আমি খুব আশ্চর্য হলাম। রাতদুপুরে হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে আমাকে ধরে এরকম একটা কথা বলবে দিলীপ—পেছনে কোন উদ্দেশ্য নেই তো? ওর হাতে কি ছোরা-ফোরা আছে? ও কি আমাকে আক্রমণ করবে? গলি থেকে বেরুলেই কি ওর সাকরেদরা আমাকে চেপে ধরবে? আমি খুব নার্ভাস হয়ে ভেতরে ভেতরে ঘামছিলাম। এদের কোথায় কি কানেক্‌শন আমার বোঝার সাধ্য নেই। তাই যতটা সম্ভব ভদ্রতা রক্ষা ক'রে বললাম—চলো একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি; কিছু বলবে তো আমার বাড়ি চলো।

এদিকটা বেশ অন্ধকার। দু'জনে আমরা গলি দিয়ে হাঁটছি। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, স্বাতীর প্রতি ওর কত গভীর ভালবাসা এবং আমি ওর কতটা ক্ষতি করেছি, ও এক্ষুনি তা বুঝিয়ে ছাড়বে। দিলীপের সঙ্গে পাশাপাশি চলতে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। চোখ-কান খুলে রেখেছি। হাতে ওর কিছু আছে কিনা—কিংবা ও কোনরকম হুঙ্কার দেয় কিনা বা সাংকেতিক কোন শব্দ করে কিনা, লক্ষ্য রাখছি।

কিছুক্ষণ চলার পরে দিলীপ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। এই বুঝি কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং আমি খুন হতে চলেছি। নিজেকে আমি প্রাণপণ বাঁচাবার চেষ্টা করছি। মনে হল এই বুঝি দিলীপ ছোরাটা বার ক'রে বলে উঠল—কি চাঁদু খুব যে লড়ক্কুবাজি করছো, এখন? হৃদপিণ্ডটা যেন উঠে এল বুকের কাছে। একটা শীতল অনুভূতিতে আমি তখন বাকরুদ্ধ। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। হাতটা এমনভাবে রেখেছি

যাতে ঘাড়-গর্দান আর পেটটাকে, আমি রাতের আততায়ীর কাছ থেকে কোনমতে বাঁচাতে পারি।

চোখ দু'টো দিলীপের জ্বলছিল। নির্ঘাত দিলীপ আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য রাতদুপুরে আমাকে ফলো করছে। তবু রক্ষে, ও নিজে এসেছে এবং ওর সঙ্গে অন্য কেউ নেই। ওর সাকরেদদের নিয়ে একসঙ্গে হামলা করার সম্ভাবনা আর নেই দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। তাই হয়ত হঠাৎ সাহস ফিরে পেলাম এবং বেশ জোরের সঙ্গে বললাম—তুমি এরকম করছো কেন, বলতো? কিছু বলবে?

—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল, অমরেশদা।

—এখানে? এই গলির মধ্যে? কি কথা, বল?

—এখান থেকে আমার বাসা খুব দূরে নয়, চলুন আমার বাসায়। আপনাকে কিছু ডকুমেন্ট দেখাবো।

—ডকুমেন্ট? আমাকে? কিসের ডকুমেন্ট?

—না, এই যে স্বাতী আমাকে একসময় কত ভালবাসতো, তার ডকুমেন্ট।

—এই রাত দুপুরে সেধরণের ডকুমেন্ট দেখার কি খুব প্রয়োজন আছে দিলীপ? তাছাড়া তুমি যা বলতে চাও আমার ডাউট্ করার তো কারণ নেই—। একটু থেমে ওকে আবার ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে বললাম—তোমার সঙ্গে কি কেউ আছে?

—কেন? কে থাকবে? আমাকে কি গুণ্ডাদলের সর্দার ভাবেন নাকি, অমরেশদা?

—না, তা নয়। তবে, এত রাতে তুমি যেভাবে আমাকে রাস্তায় ধরে ডকুমেন্ট দেখাতে চাইছ, তোমার মাথা-ফাতা ঠিক আছে কিনা, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, দিলীপ।

—আপনি কি খুব ভয় পেয়েছেন? দিলীপের গলার স্বরে একটু ব্যঙ্গের আঁচ পাচ্ছিলাম, যদিও ওর চোখ দু'টো তখনও জ্বলছিল। ও আমাকে যে কিছুটা ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে—ওতেই কি ও একটা স্যাডিস্ট আনন্দ পাচ্ছে? এই মুহূর্তে দিলীপকে আর ব্রিলিয়েন্ট লাগছে না। কিন্তু ও যে মিডিওকার নয়, ভয়ানক মতলববাজ, স্পষ্ট অনুভব করলাম।

হাতে তখন আমার একটি মাত্র অস্ত্র—দারুণ জোরে হেসে ওঠা। ও তাহলে কনফিউজড্ হয়ে যাবে। হয়ত আমার চরিত্রটা আরও ঘোড়েল

মনে হবে। তাই সেই অস্ত্রটা ছেড়ে আমি দারুণ জোরে হেসে উঠলাম। বললাম—চলো, তোমার বাড়ি যাবে বলছিলে না—চলো যাই।

ঐ রাতে দিলীপ আমাকে তিনটি ডকুমেণ্ট দেখাল। স্বাতীর ভালোবাসার ওগুলো অবশ্য অঙ্গীকারপত্র নয়। একটি স্বাতীর চিঠি—অপূর্ব হস্তাক্ষর, একটা বই সম্পর্কে ও ইনটারেসটেড্, দিতে পারবে কিনা—লাইব্রেরীতে স্বাতী পাচ্ছে না, ইত্যাদি। বেশ যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছে। কতবার চিঠিটা পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ভাঁজে ভাঁজে ব্যবহারের স্পষ্ট ছাপ। অন্য ডকুমেণ্ট, স্বাতীর লেখা কোষ্ঠির ফলাফল। বড় আশ্চর্য হলাম—স্বাতী কি কোষ্ঠীতে বিশ্বাস করে?

জিজ্ঞেস করলাম—আর কিছু আছে?

দিলীপ বলল--ছিল, এত রাতে খুঁজে পাচ্ছি না।

—তুমি আমাকে এগুলি দেখাচ্ছ কেন, দিলীপ? আমি কিছুই তো বুঝতে পারছি না—। রাত দুপুরে তোমার এরকম ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। একটা কথা তোমাকে বলি—তোমরা দু'জনে দু'জনকে যদি ভালবাস, বিয়ে কর—আমার আর তাতে কি আপত্তি থাকতে পারে, বলো? সেরকম যদি কিছু হয়, আমি বরং তা ওয়েলকাম্ করবো। কিন্তু এরকম ব্যবহার করলে সেটা কি খুব স্বাভাবিক মনে হয়?

দিলীপের চোখে জল দেখলাম। ব্যর্থ প্রেমিক এত যে হীনবুদ্ধি হতে পারে, দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি!

আমি উঠে পড়লাম। বললাম—শোন দিলীপ, ক'দিনের মধ্যে আমি চলে যাচ্ছি। এখন যা কিছু বোঝাপড়া তুমি স্বাতীর সঙ্গে কোরো।

একা একা আমি হেঁটে যাচ্ছি—। দেখলাম, দিলীপ ছুটতে ছুটতে আসছে। আমি আবার ভীষণ ভয় পেলাম। হঠাৎ মনে আশঙ্কা হল—আজ নিরাপদে বাড়ী ফিরতে পারব তো? বুকটা আমার ধড়াস্ ক'রে উঠেছিল। অথচ কি এক অদৃশ্য মনোবলে আমি তখন ভাবতে চাইছি, মরাল্ ফোর্সে আমি ওর চেয়ে অনেক উপরে। ওরকম একটা ভঙ্গী ক'রে সেরকমই একটা ইমপ্রেশন্ দিতে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, বললাম—আবার যে ছুটে এলে—আরও কিছু বলবে?

—না, আপনি বিশ্বাস করলেন তো যে আপনি আসার আগে, স্বাতীর সঙ্গে আমার কত সদ্ভাব ছিল—। স্বাতীর সঙ্গে আমার তিন-চার বছরের

বস্তুত—। আপনাকে আমি জানিয়ে রাখতে চাই, স্বাতীর শরীরের প্রতিটি অংশের সঙ্গে আমি পরিচিত।

রাত দুপুরে কথাটা শুনতে আমার ভয়ানক বিশ্রী লাগল। কানটা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। একবার ভাবলাম, দিলীপের গালে কশে একটা চড় বসাই, যা থাকে বরাতে। কিন্তু নিজেকে খুব সামলে নিলাম। বললাম—তোমার সঙ্গে সম্পর্কের ওটাই কি মস্ত বড় পরিচয়? তুমি বড় আহাম্মক, দিলীপ।

দিলীপ আমার ওপরে বোধ হয় ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু তার সুযোগ দিই নি। পাশ দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। যাবার সময় ভাবছিলাম—এই আহাম্মকটার সঙ্গে স্বাতীর বিয়ে হলে স্বাতী ঠিক সুইসাইড করবে। একটা জলজ্যান্ত মেয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটবে।

॥ উনত্রিশ ॥

সাত সকালেই আমি তৈরী ; গোলামীর অভ্যাস। কলকাতাকে এভাবে ছেড়ে যেতে চাই নি। একদিন কলকাতা আমাকে স্নেহের কোল দিয়েছিল। ভয়ঙ্কর করাল রূপে সে এখন আমাকে পিষে মেরে ফেলে আমারই রক্ত খাবে, ভাবতে পারছি না। ভূমি থেকে ভূমিহীন চাষী, এই বিবর্তন তবু-বা বোঝা যায় কিন্তু 'বাবু' কালচার থেকে বিবেকহীন গুণ্ডামি—রাজনীতির এই অধঃপতন অসহ্য। রাস্তায় চলতে চলতে আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হয়ে রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে পড়ে আছে—এরকম কত লোকের কথা তো খবরের কাগজে দেখা যায়, পড়তেও যেন আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছি। সেরকম কোন আশঙ্কা নিয়ে কলকাতাকে বুকে আঁকড়ে পড়ে থাকার হিম্মত, অন্যের থাকলেও, আমার নেই। জীবনকে বড় ভালবাসি। শত দুঃখে, বেদনায় আর ব্যর্থতায় যখন নিঃশেষিত প্রাণ, তখন আশার আলো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে শরীরের প্রতিটি রোমকূপে ; জীবনকে আবার নিজেরই অজ্ঞাতে বুকে আঁকড়ে ধরি। নিরর্থক মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর অবমাননা, বড় ভয়ঙ্কর সে যন্ত্রণা।

আমি বুঝতে পারছি, রবি চৌধুরী কলকাতায় আমার নিরাপদ অবস্থানের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথায় ক'রে নিয়েছেন। আসলে রবি চৌধুরী ও রুবির আমার ওপরে মায়া পড়ে গেছে। ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় কলকাতা-বাসের মস্ত বড় পুঁজি। মনে পড়ে গেল কলকাতায় যেদিন পা দিয়েছিলাম, সেদিনের কথা। রবি চৌধুরী পা-টা তুলে দিয়েছেন চাকরটার সামনে আর টাইটা খুলে মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করছেন—'ই-য়্যাফ'।

প্রথম দিন থেকে আমার জীবনকে অক্ষত রাখার প্রতিশ্রুতি তাঁর মুখে-চোখে দেখেছিলাম—সেই চোখের দৃষ্টিতে এখন কি যেন একটা আতঙ্কের ছায়া। তবে উনি কি সব জানেন কে এবং কারা আমাকে ওয়াচ করছে, আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছে এবং কখন কোন্ অবস্থায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? ক'দিন ধরেই দেখছি তিনি হঠাৎ হঠাৎ গাড়ি নিয়ে এসে

হাজির হন, বলেন—উঠে পড়ুন। আমি বাধা দিই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সবে গাড়ি-বারান্দা পেরিয়ে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোথায় যাই, —কফি হাউস বা স্বাতীর বাড়ি—যেখানে ও থিসিস টাইপ করা নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত। কি করব, নিজেরই অজ্ঞাতে মনটা যে ওখানেই পড়ে থাকে! এতটা ক'রে, স্বাতীকে এতটা ছায়ার মত ঘিরে রেখে শেষ রক্ষা হবে না, ভয় পেয়ে পালিয়ে যাব? নিজেকে বড় হীনমন্য মনে হয়। ভাবতে পারি না ওর থিসিসের টাইপ করা শেষ পাতাটা দেখে যেতে পারব না—কারণ কারা যেন আমাকে বোঝাতে চায় ছুরিকাহতের চেয়ে দিল্লীর নিরাপদ আশ্রয় অনেক বেশী কাম্য। নিজের পৌরুষে বড় আঘাত লাগে; মধ্যবিত্তের বুকেও তখন অগ্নিশিখা দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠে; সাহস মেঘতুল্য গর্জন ক'রে ওঠে। ভাবি, পেছনে তাকাব না, এগিয়ে যেতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয়—তাও মাথা পেতে নেব। আবার আশঙ্কায় দুলে উঠি, ভাবি ব্যাচেলারের মত আমার তো মুক্ত জীবন নয়, অনেক ভেবেচিন্তে আমাকে চলতে হয় যে।

দিলীপের যা অবস্থা দেখলাম, বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে বা পুরনো পার্টির ইয়ারদের জড় ক'রে স্বাতীর চোখের সামনেই আমাকে হয়ত পঙ্গু ক'রে দেবে। তবে কি ওরকম কিছু করবে বলে পিনাকীও তড়পাচ্ছে? অন্যের সঙ্গে আঁট করছে? তবে কি কৌস্তেয় আর তরল গুহ সেরকম কোন ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে? রবি চৌধুরীর বিচলিত ভাবটা যতই আমি তলিয়ে দেখছি ততই আমি যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছি। বিশেষ ক'রে রাস্তার মাঝখানে ডকুমেন্ট দেখাবে বলে যেভাবে দিলীপ আমাকে চেপে ধরেছিল—ওর কোন অভিসন্ধি ছিল না—হতে পারে না। সেদিন যে বেঁচে গেছি নেহাৎ আমার ভাগ্য। একটা শীতল অনুভূতি ভেতরে ভেতরে আমাকে ফ্রিজ্‌ ক'রে দিচ্ছিল।

কলকাতায় থাকলে কে যে কখন ঘরে ফিরবে কিংবা আদৌ ফিরবে কিনা, ফিরবে বাড়িতে না হাসপাতালে, কিংবা সোজা মর্গে, কেউ বলতে পারে না। কে যে রাস্তার লোকের কাছে অকারণে মার খাবে বা রাজনৈতিক দলের কাছে, অথবা হুড়কে পড়বে বাসের তলায় বা কোন্‌ গলিতে কে যে কোন্‌ ফাঁদে পা দেবে—কেউ জানে না। এ ঠিক আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপার নয়; এ শুধু আমি-তুমি-তার ভালবাসা বা শত্রুতা নয়, এ কোন গভীর এক ক্ষত বা অবক্ষয়—যেখানে নিজেরই অজান্তে

আমরা ঢুকে পড়ি বা কেউ কেউ ডেকে নিয়ে তার তলদেশে ফেলে দিয়ে মজা লোটার হাসি হাসে। কি বিষণ্ণ, কি নিদারুণ অবস্থা।

রবি চৌধুরী কলকাতার ফাঁদগুলি জানেন এবং ফাঁদের ফাঁক দিয়ে তিনি বেরিয়েও আসতে পারেন। বদলা নিতে তিনি আবার উল্টো ফাঁদ পেতে রেখে আসেন। অন্য কারুর ব্যাপার হলে রবি চৌধুরী হয়ত সাকরেদ্‌দের সামলে নিতে বলতেন ; তখন তাঁর হুকুমই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমি বলেই তাঁর গাড়ি যখন-তখন দেখা যাচ্ছে বিনা নোটিশে এবং অনিচ্ছাসত্বেও তাতে আমার ঢুকে পড়তে হচ্ছে। —কোথায় যাবেন ? যদি বলি স্বাতীর বাড়ি, নিয়ে যাবেন নিজে। আবার কখন ফিরব, জেনে নিয়ে যথাসময়ে হাজির হচ্ছেন। আমাকে এতটা গার্ড দিচ্ছেন কেন ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে পরশু দিন আমি স্বাতীকে পৌঁছে ফিরতে গিয়ে দিলীপ মুখার্জীর মুখোমুখি পড়েছিলাম। ভাবলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয়। কিছু একটা হতে যাচ্ছে আমি টের পাচ্ছি।

তৈরী হতে হতে এসব কথা ভাবছিলাম। পরিষ্কার পাঞ্জাবি ও পাজামা পরে নিলাম। ওরকম ড্রেসেই আজকাল অনেক সময় অফিসে যাই। বইপত্রগুলো গুছিয়ে রেখেছি, সব ক'টা ভরা হয় নি। গুছিয়ে রাখলে ভরতে আর কতক্ষণ লাগে ? টুকিটাকি অনেক আবর্জনা জমেছে, কিছু ফেলে দিলাম ; কিছু গুছিয়ে রাখলাম। কিছু কাপড় ড্রাই-ক্লিনিং থেকে আনা বাকি। তক্ষুনি বেল টিপে বেয়ারাকে স্লিপ দিয়ে বললাম—এ কাপড়গুলো এনে দাও, আর দেখো, এক কাপ চা।

সে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল।

গুছিয়ে নিলাম পুরনো বাক্স। তাতেও অনেক আজেবাজে কাগজ, চিঠিপত্র জমে গেছে। স্বাতীর কয়েকটা চিঠি। বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা। কখন কবে লিখেছে এখন মনেও করতে পারছি না। বাকি কাগজপত্র ফেলে দিয়ে স্বাতীর চিঠিপত্রগুলো যত্ন ক'রে রেখে দিলাম। আমার কাছে ওগুলো অমূল্য সম্পদ।

রবি চৌধুরী এক্ষুনি এলেন বলে! আজই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বলছেন—আমি ঠিক রাজী হতে পারছি না। তিনি বিরক্ত হচ্ছেন মনে মনে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বোচকার বা পুঁটলির মত বেঁধে চালান করতে তাঁরও হয়ত খারাপ লাগছে। তাই পার্টি লেবেলে বা তাঁর নিজস্ব

ইনটেলিজেন্সের ওপর বিস্তর চাপ দিচ্ছেন, অনুমান করতে পারছি। এভাবে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাবার মত অনাদৃত কলকাতাবাস আমার মনে বিশ্রীরকম একটা টেন্‌শন সৃষ্টি করছে। অথচ ব্যাপারটা কিছু না। কিছু কাজ বা কিছু ব্যক্তিগত সাহস বা ইনিসিয়েটিভ দেখাতে গিয়ে কারুর কারুর সেটা ঠিক মনঃপূত হয় নি। তাই কেউ বা কারা আমাকে হয়ত ধোলাই দিতে চায়। সেরকম কিছু ব্যাপার ঘটলে সেটা শুধু আমার নয়, রবি চৌধুরীরও অপমান। অপমান ওঁর অনুগত মহলের বা কিছুটা হয়ত পরোক্ষভাবে ওঁর পার্টিরও।

রবি চৌধুরী যাই বলুন, স্বাতীর সঙ্গে শেষ দেখা না ক'রে আমি যাব না, তা আমি ঠ্যাং ভেঙ্গে পড়ে থাকি হাসপাতালে, কিংবা তাতে যদি কারুর ইজ্জত নিয়ে টানাটানি পড়ে, পড়ুক। আমারও গোঁ কম নয়।

মনটা যে কেমন ক'রে উঠল, কারুকে ঠিক বোঝাতে পারব না। বাক্স থেকে স্বাতীর চিঠিগুলি বের ক'রে আবার পড়তে লাগলাম।—'আপনি এখন শান্তিনিকেতনে খুব মজা করছেন। এদিকে আমি থিসিস নিয়ে রীতিমত হিম্‌সিম্ খাচ্ছি। মনটা আজ খুব খারাপ। সকাল থেকে শুধু পড়ছি, একটা লাইনও লেখা হয় নি। কলকাতার আকাশ এখন আমার জীবনের মতই আঁধার হয়ে আছে সব সময়। বৃষ্টি নামছে যখন-তখন, প্রাইভেট বাস স্ট্রাইক, লোড শেডিং-এর সঙ্গে বর্ষার জল মোটেই কবিত্ব আনছে না—কলকাতাকে অসহ্য ক'রে তুলেছে। তবু এক একদিন কাজে হয়ত গেছি ন্যাশানাল লাইব্রেরী—ফেরার সময় দেখি, ময়দানের ওদিকে ওপারে সবুজ গাছপালার মাথায় কালো মেঘের রাশ নেমে আসে—তখন বিকেলটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে বুকের কাছে ভার হয়ে বসে। বাদলের বাতাস মনটাকে একটু উদাস ক'রে দেয়—তখন কবির মত হঠাৎ মনে হয়—বাড়ির পথে না ফিরে ঐ সবুজ ছাই রং যেখানে মিশেছে, সেদিক দিয়েই কোথাও হারিয়ে যাই, যেমন ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদের চোখের পলকে হারিয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়। এই হারিয়ে যাবার ব্যাপারটা কত সহজে ঘটে—বড় অদ্ভুত, না?'

পড়ে যাচ্ছি। আর একটা চিঠি। এটাও কি শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে লিখেছিল? তারিখটা খুব কাছাকাছি। সেবার শান্তিনিকেতনে আমি চার-পাঁচ দিন ছিলাম, তাহলে কি ওটা কলকাতায় ফিরে পেয়েছি? খামটা

নেই, কেন লিখেছিল, মনের কোন্ অবস্থায়, যদি তখন সাইডের কোন জায়গায় লিখে রাখতাম, তবে বহুদিন পরে পেন্টিং দেখার মত একটা অনাবিল আনন্দ পেতাম। আবার সেই লোড শেডিং-এর কথা। কলকাতার লোড শেডিং ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতায় কতরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রে চলেছে—কেউ যদি তার হিসাব রাখত, অবাক হয়ে যেত।

—'কলকাতা তো আপনাদের দিল্লীর মত আধুনিক সুসজ্জিতা উচ্চবিত্ত মহিলা নয়, তার মলিন বেশ। তাই রোদবৃষ্টির খেলাও উপলব্ধি করা যায় না আকর্ষণীয়ভাবে। বৃষ্টি হলে, জলে-কাদায় একাকার বিপর্যস্ত মহানগরী। আজ সকাল থেকেই মুখ ভার আকাশের। সকালের দিকে গিয়েছিলাম ডিপার্টমেন্টে, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে ফিরেছি। ঝমঝম নয়, তবু মালুম দেয় তার সজল অস্তিত্ব। বাড়িতে এসে থিসিস নিয়ে বসতে যাব যথারীতি লোড শেডিং। অন্নদাশঙ্করের দারুণ কবিতাটা মনে পড়ে গেল :

বিজলীর ধারা এই। এই আছে এই নেই
এর চেয়ে হ্যারিকেন ভালো। জ্বালো জ্বালো হ্যারিকেন জ্বালো ॥
তেলেভরা পিদ্দীম। করুক না টিম্ টিম্
রাত ভরে সেও দেবে আলো। জ্বালো জ্বালো পিদ্দীম জ্বালো ॥

এই টিম্ টিম্ আলোতে মনের যত জমে থাকা বিষাদ যেন আক্রমণ করে। কারণ নেই। কলকাতায় আমরা আজকাল কিছু শেষ করতে পারি না কেন জানেন তো—শেষ করার কোন উৎসাহ আমাদের নেই—একটু বিজলীর আলোর অধিকার, সমাজের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাও আমাদের আজকাল সাথী। আমার অনেক সময় আজকাল মনে হয় 'পেন্ ইজ্ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড'—ওটা ভুয়ো কথা। এত দিনের জীবনে আজকাল আমার একটা কথা সব সময় মনে হয়—এই পৃথিবীতে আমার ভূমিকা কি? শুধু কি নিঃশেষ ক'রে নিজেকে দেবার—নেবার নয়? জানেন, অনেক সময় মনে হয়, আমার যেন কারুর কাছ থেকে কিছু পাবার নেই, কোথাও নিঃস্বার্থ আশ্রয় নেই, কোথাও নিশ্চিন্ত নির্ভরতা নেই। কোনও প্রকৃত বন্ধু নেই। এই নিঃসঙ্গতার সচেতনতা আমার সমস্ত চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিটি ক্ষণে জাগ্রত ক'রে রাখে—যার জন্য একটা অনন্য মানসিক শক্তি সব সময় আমাকে অনেক বেশী শক্ত, অনেক বেশী আত্মনির্ভর ক'রে রাখে। আর ঠিক তখনই

জোর ক'রে আবার থিসিস নিয়ে বসি। কিভাবে যে কাজ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কবে আসছেন?'

—স্বাতী।

চিঠিগুলি ভাঁজ ক'রে সবে রেখেছি মিঃ রবি চৌধুরী যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে এলেন—বলুন, আজই যাচ্ছেন, না কাল? প্লেনের টিকিট কাটতে যাচ্ছি।

—কাল।

—কেন? আজ নয় কেন? টুমরো এণ্ড টুমরো—বাট টুমরো মে নেভার কাম। ঠিক বলতে পারলাম না—ওরকম যেন কি একটা কথা আছে না?

—হ্যাঁ, আগামীকালটা মানুষের জীবনে নাও আসতে পারে, কিন্তু সেই অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা রোমান্সও তো আছে।

—রোমান্স বেরিয়ে যাবে, মশায়। কলকাতার ধোলাই খেলে রাজধানীর নিরাপদ অবস্থান চিরকালের মত ঘুচে যাবে। ও যে কি জিনিস, এখন কল্পনাও করতে পারছেন না।

—কিন্তু কে আমাকে ধোলাই দেবে? কে আপনাদের খবর দিয়েছে বলুন তো? শেষ সময়ে এরা আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে কেন, কোন্ যুক্তিতে?

—এসব খবর কেউ কাউকে দেয় না; এসব খবর খুব সন্তর্পণে, সংগোপনে যোগাড় করতে হয়।

—মিঃ চৌধুরী, আমি তো রাজনীতির লোক নই, আমাকে মেরে কার কি লাভ? আমি জানতে চাই কে আমার এই শত্রুতা করছে?

—কলকাতায় আপনি আর নিরাপদ নন—এটা কি আপনারও মনে হচ্ছে না? মনে কি কোন আন্‌ক্যানি ফিলিং হচ্ছে না, বলুন? রবি চৌধুরী বিচারকের মত আমাকে জেরা শুরু করলেন।

আমি কিছুক্ষণ গুম্ মেরে রইলাম, তারপর বললাম—আসলে কি জানেন, অফিসের লোক নানা কারণে শত্রুতা করছে, তা বুঝতে পারি। যেটা বুঝতে পারছি না—তা হল, কারা আমাকে মারবে? স্বাতীর রিসার্চে আমি একটু-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র—বাঙালীকে প্যারাসাইট কখনও বলি নি, স্বাতী যখনি বলেছে, আমি বরং বাধা দিয়েছি। আর মাঝখান থেকে আমি দোষী হয়ে গেলাম? আবার দেখুন, ওর অনেক যুক্তি মানতে পারি নি বটে কিন্তু মাঝে মাঝে একমত না হয়েও পারি নি।

—এবং একমত হতে হতে ওর প্রেমে পড়ে গেছি, কেমন? বলেই রবি

চৌধুরী অনাবিল উল্লাসে ফেটে পড়লেন। বললেন—ভাল করেছেন, মশায়। আপনি যদি ভালবাসায় পড়েই থাকেন, জীবন আপনার সার্থক হয়েছে, শুষ্ক কাঠে আবার সবুজ পাতা গজাবে, মশায়। প্রেম কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু দিলীপ মুখার্জী কি আপনাকে নিরাপদে প্রেম করতে দেবে?

রবি চৌধুরীর কাছে কোন কিছু গোপন করা অসাধ্য। মুখ খুলে না বললেও সব কথা জানেন অথচ ন্যাকামি নেই, অকারণ কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই।

তবু ভাবলাম, দিলীপ মুখার্জীর সম্পর্কে ওঁর অ্যাসেস্‌মেণ্টটা হয়ত এখন জেনে নেওয়া দরকার, যদিও আগেই মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে এব্যাপারে আমার কন্‌সাল্‌ট্‌ করা উচিত ছিল। বললাম—কিন্তু মিঃ চৌধুরী, দিলীপ মুখার্জীকে স্বাতী দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

—ওটা তো বাইরের কথা। ভেতরের কথাও কি তাই? হ্যাঁ, ঠিক। তবে বাঁধ যখন ভাঙ্গবে তখন জল যে কোথায় গড়াবে, দাদা, প্রেমের ব্যাপারে বিদ্বেষ কিন্তু প্রেমের গা ঘেঁষে চলে। দিলীপকে বেশী পাত্তা দেওয়া ঠিক নয়, স্বাতীর মত মেয়ের লাইফ্‌ ও মিজারেবল্‌ ক'রে ছেড়ে দেবে। বড় সাংঘাতিক ছেলে।

—তা আমি কি করবো বলুন?

—কাজে লাগান।

—এখন আর আমার কিছু করার নেই। এখন ওদের দু'জনার ভাগ্য।

—তা ঠিক, ভাগ্যের কথা বলছেন তো? তা আপনার ভাগ্য কি? বারবার কথাটা রিপিট্‌ করলে মনে ব্যথা পাবেন, না—থাক, যা বলছিলাম, কলকাতায় হয় কেউকেটা হয়ে যান, আপনার গায়ে কেউ আঁচড়টি লাগাবে না; কিংবা মেহনতী জনতা, দেখবেন দারুণ কদর। আপনার মত মধ্যবিত্ত লোকদের নিয়েই জ্বালা। আপনি যদি পার্টির লোক হতেন, তবে কি কারুর তোয়াক্কা করতাম? আপনাকে নিয়ে মুশকিল কি জানেন, আপনি না ঘরকা না ঘাটকা।

—কলকাতার মার খেলে দিল্লীর চোখে আমি বিপ্লবী হয়ে যাবে—জাতে উঠবো, মিঃ চৌধুরী।

শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন মিঃ চৌধুরী। বললেন—রুবি খুব কাঁদছে। মায়া পড়ে গেছে তো। তা আমি কি করবো বলুন? ও কি জানে না,

কাদের এই কারসাজি? রুবির চোখের জল দেখেই ভাবছি আর ভয় নেই। ওকে বুলেটের সামনে খাড়া করে দেবো। তা প্ল্যাটোনিক লাভ্ যখন, কলকাতাতেই বডি ফেলতে হবে কেন? ওতে শুনেছি দেহটা কোন কাজেই লাগে না।

—কি যে বলেন, শব্দের মোড়কে ভালবাসাকে মুড়ে রাখলে নিজের প্রেসটিজ্ রেখে ছুঁকছুঁক করা যায়।

আবার হেসে উঠলেন রবি চৌধুরী। বললেন—যাই হোক আমি অফিসে থাকবো। মিঃ ধরের সঙ্গে দেখা ক'রে আমার ঘরে একবার আসবেন। বলেই খুব ব্যস্তভাবে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

একা বসে ভাবছিলাম স্বাতীর এত দেরী হচ্ছে কেন? বাইরে বেরিয়ে করিডরে গিয়ে দেখি নীচে স্বাতীকে রবি চৌধুরী খুব বোঝাচ্ছেন। স্বাতী কখনও-বা মাথা নাড়ছে, কখনও-বা তিনি। হাত পা নেড়ে কথা বলার ভঙ্গীটা দূর থেকে দেখলে অদ্ভুত সুন্দর লাগে। মানুষ যে কত দরদী এবং জীবন্ত, বোঝা যায়।

পাছে কেউ আমাকে দেখতে পায়, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম—স্বাতীকে আমি কি বলবো?

—হঠাৎ তাকিয়ে দেখি স্বাতী।

—কখন এলে?

—এই তো।

—রবি চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—সব শুনেছো?

—হ্যাঁ।

—ভয় পেয়েছো?

—না। ভীষণ হাসি পাচ্ছে। বলে খুব হাসতে থাকল স্বাতী। আমার প্রথম দিনের হাওড়া স্টেশনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। যখন মালপত্র ও কুলি নামক দেবতাকে হারিয়ে আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি, তখন স্বাতী বিশ্বাস, —হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, ধীরে ধীরে নামল, আমি তখন ঘামছি, আর ছুটছি। ও তখন হাসছে, কলকাতার মেয়ে, ভাবখানা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সরে গেলেই যেন বিস্ফোরণের বিপদ কাটে। শেষে সব

যখন হারিয়ে বসে আছি, তখন দেখি মালপত্র ও কুলি নিয়ে স্বাতী দাঁড়িয়ে হাসছে।

ট্যাক্সিতে বসে প্রথম ডায়ালগ্‌টাও আমার মনে পড়ে গেল—খুব ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন, না ?

—মধ্যবয়সে সব হারাবার ভয়টা একটু যেন বেশী পেয়ে বসে স্বাতী, তুমি ঠিক বুঝবে না।

বললাম—আবার সেই অকারণ হাসি ? সেই, সেদিনের মত ? অতীতের একটা পাতা খুলে একটু পড়ে নিয়ে আবার বর্তমানে ফিরে এলাম—এবং আশ্চর্য হয়ে স্বাতীর মুখের দিকে তাকালাম।

—হাসির কারণ—নার্ভাস লোকেদের দেখতে আমার ভারি মজা লাগে।

—তার মানে রবি চৌধুরীর ইন্‌টেলিজেন্স সোরসের ওপর তোমার কোন বিশ্বাস নেই ?

—থাকবে না কেন ? খুব আছে। উনি খুব প্র্যাক্‌টিক্যাল মানুষ। বিশ্বাস না ক'রে উপায় আছে ?

—সত্যিই যদি অকারণে মার খাই, দিল্লীতে যে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।

আবার খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল স্বাতী। প্রাণবন্ত একটি সজল মুখে সূর্যের আলো পড়ল যেন।

ওর হাসি দেখে আমার নার্ভাসনেস্ অনেকটা যেন কেটে গেল। আর তখন দেখলাম, ইতিহাসের কয়েকটা পাতা আমার সামনে উড়ে এসে পড়ছে। সেই পাতাগুলো হাতে তুলে নিয়ে বললাম—মার খাবার ভয়টা যে অলীক নয়, তুমি মান ? যেমন ধরো, স্বদেশী আন্দোলন। ওঁরা একক শক্তিতে এবং একক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বিরাট রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছিলেন। ওদিকে পড়ে রইল কৃষক—তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, তাদের বিদ্রোহের সেদিন কোন খবর আমরা রাখি নি। জার্মানীর রণাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বাঘা যতীন পর্যন্ত। দু'বার অস্ত্রশস্ত্রে ভরা জাহাজ ব্রিটিশদের করতলগত হয়েছিল। সত্যি যদি অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে আসত—তবে তো সেই অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করার কোনরকম সুযোগ ছিল না। সেই গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করাই হয় নি। সব কিছু আমরা ব্যক্তিগত শক্তি অর্জনে কাজে লাগাতাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে তার কি কোন ভূমিকা থাকে, বলো ? সেদিন যারা মার খাবে বলে আমার

মত নার্ভাস হয়ে পড়েছিল—ইতিহাসের সেরকম কোন পুনরাবৃত্তি দেখে তুমি কি মারের ভয়টাকে ওভাবে উড়িয়ে দিচ্ছ ?

—দেখুন, দিল্লীর লোক—কিছুদিন এখানে রাজত্ব ক'রে ভাবছে কলকাতাকে চিনে ফেলেছে। এবং সেটা আবার আধা অন্ধকার ও আধা আলোর শহুরী অভিজ্ঞতা। তারই একটা স্পষ্ট রেখা আমি আপনার কপালে ফুটে উঠতে দেখলাম। রাস্তার মাঝখানে কলার খোসায় পা দিয়ে যে নিরপরাধ মানুষ হড়কে পড়ে—সেটা কি খুব হাসির ব্যাপার ? তাতে তবে আমাদের হাসি পায় কেন ? বলুন ?

—তুমি যত. হেসে কুটিপাটি হও—আমি ভাবছি—আমি মার খেতে পারি আর একটা কারণে। ধর, এম, এন, রায়। ও'র জীবনটা যদি খুঁটিয়ে দেখ, দেখবে মারটা মানুষের জীবনে কোন্ দিক থেকে আসে। বিপ্লবী হয়েও পালিয়ে গিয়েছিলেন আমেরিকায়। সেখানেই প্রথম এ্যাভেলিন ট্রেন্টের সঙ্গে দেখা ও বিয়ে। গেলেন মেক্সিকোয়। সেখানে মাইকেল বরোদিনের কাছে মার্ক্সীয় দর্শনে প্রথমে দীক্ষালাভ এবং মেক্সিকোতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন। হাতে তখন জার্মানীর প্রচুর টাকা। বরোদিনের সহায়তায় কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান। তারপরে যদিও বহুদিন তিনি ভারতে আসেন নি, বরাবর তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। আস্তে আস্তে বিরাট মানুষ হয়ে গেলেন। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তারপর ভারতের। অথচ শেষের দিকে তিনি অনুভব করতেন (তোমার থিসিসে এই উদাহরণটা দিতে পারতে বাঙালী কোথায় এবং কেন পিছিয়ে পড়ে তার উদাহরণ হিসেবে), 'আমি কারো প্রতিনিধিত্ব করি না, প্রতিনিধিত্ব করি আমি নিজের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমার এই যে পদমর্যাদা—এ শুধু ব্যক্তিগত একজন মানুষ হিসেবে।' এত বড় হিপক্রিট্ হলে মার খাবে না ? তাই পরবর্তী কালে দেশে ফিরে এসে তিনি কোন নেতার সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। এবং রাতারাতি হিউম্যানিস্ট হয়ে গিয়ে দেখলেন নিজের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল—তাও মার খেল। একে তুমি কি মার খাওয়া বল না ? তাই ভাবছি প্রবাসী হয়ে কলকাতার বেদম প্রহার খাব—এটাই তো স্বাভাবিক।

—আপনি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—তার প্রমাণ কি বলুন তো ?

প্রমাণ, ইতিহাস ভূগোল সব একাধারে আওড়ে যাচ্ছেন। আপনি কি নিজেকে একটা ঐতিহাসিক চরিত্র বলে ভাবেন এবং তার প্রমাণ দিতেই কি উঠেপড়ে লেগেছেন? আবার এক চোট হাসল স্বাতী।

—না, নার্ভাস যে ফিল করছি না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তোমার থিসিস। নন্দকুমার ছাড়া গণেশ দেউস্কর কোন প্রতিবাদী মানুষ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখতে পান নি—কেন? সত্যিকারের প্রতিবাদের ঐতিহ্য আমাদের নেই কিনা—তাই নার্ভাস হয়ে পড়ি।

কথাটা শুনে স্বাতী একটু গম্ভীর হল। বলল—চলুন।

—কোথায়?

—চলুন না।

—তোমার সঙ্গে শেষ কথা যে হল না।

—আমরা কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আবর্তিত। শেষ কথা বলে আমাদের কিছু নেই।

—তোমার থিসিস এখনও টাইপ করা বাকি—আর আমাকে যদি চলে যেতে হয়—খুব কষ্ট হবে আমার।

—উঠুন।

না উঠে উপায় নেই। যা জেদ ধরেছে! বললাম—কোথায় যাব বল? অফিসে যেতে হবে যে! রবি চৌধুরীকে কথা দিয়েছি, দেখা করবো। বলতে হবে আজ না কাল।

—আপনি আজই যাচ্ছেন।

—সে কি?

—অফিসে যারা আপনার অসম্মান করেছে, তাদের টিট দিতে হবে না? —উঠুন।

—ওরা আমার নখাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তোমাকে বলে রাখি, বাঙালী পরশ্রীকাতর জাত, আমার খুব জানা আছে।

—চলুন, মিঃ ধরের সঙ্গে কথা বলবেন।

—তোমাকে কি রবি চৌধুরী সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছেন যে এরকম করছ?

উঠে পড়লাম। আমি জানি, মারের ভয় স্বাতীর নেই। তাই শেষ বারের মত ও রুখে দাঁড়াতে চায়।

—আমি যে এখন অফিসে যাচ্ছি।

—আমিও যাব, চলুন।

—প্লেনে যাবার সময় নেই।

—জানি।

—তবে?

—আপনার জন্য রাজধানীর টিকিট কাটা হয়েছে। আপনি প্লেনে যাচ্ছেন না, কারণ ওটা সবাই জানে। ট্রেনে গেলে কেউ টের পাবে না।

—তুমিও এ অন্যায় জুলুম মেনে নিচ্ছ? না হয় মার খেয়ে হাসপাতালে দু'দিন পড়ে থাকতাম। তখন তো তুমিই সেবা করতে?

—বেঁচে থাকলে তবে তো সেবা। আগে বাঁচার চেষ্টা করুন। রোমান্টিক ভাবনা ছেড়ে সব কিছু গুছিয়ে নিন।

দু'টিমাত্র লোক স্টেশনে। রবি চৌধুরী ও স্বাতী। আমি কোন কথা বলতে পারছি না। অবমাননায় আর ক্ষোভে আমার সারা শরীর কাঁপছে। শুনলাম রুবি আসতে চেয়েছিল কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে বেশী লোককে আসতে দেওয়া হয় নি।

আমার সামনে ভবিষ্যৎ যেমন অন্ধকার, তেমনি অনুক্ত রইল স্বাতী। দিলীপ মুখার্জীকে বিয়ে করলে স্বাতীর এই দৃপ্ত ভাব কি খোয়া যাবে? সেটা যদি হয় বড় ব্যথা পাব। যদি তিন মাস পরে লেখে শুধু দুঃখ, জ্বালা আর ব্যর্থতার কথা—ব্যথায় টন্‌টন্ করবে বুকটা। —যদি লেখে যে অবমাননার স্বাক্ষর হয়ে আছেন আপনি, শেষ পর্যন্ত আমারও ভাগ্য তাই। এমন এক পুরুষকে আশ্রয় করতে হল, যে না জানে ভালবাসতে, না জানে প্রকৃত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে। অসংলগ্ন পৌরুষ ও গুণ্ডামীর যুক্তিহীন দাপটে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আত্মঘাতী হব ভাবতে পারি না, তবে কোনদিন যদি শোনেন স্বাতী নেই, অবাক হয়ে যাবেন না যেন।

এসব আমি কি ভাবছি জানি না। বিচ্ছেদের সময় অমঙ্গল ভাবতে নেই।

ট্রেন বুঝি ছাড়ার সময় হল। স্টেশনের কোণে জীবনের শেষ ব্যস্ততা দেখলাম। রবি চৌধুরী হাসছেন, হাত নাড়ছেন। স্বাতীর চোখ ভেজা। আমি স্বাতীকে এগিয়ে যেতে দেখছি আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। এবার সত্যি হারিয়ে গেল। আলো ছিল, নিভে গেল –দূরে চলে গেল স্বাতী অনুভব-চেতনার মস্ত এক আকাশ হয়ে গেল যেন! সহস্র স্বাতী সেখানে আলো নিয়ে, রঙ নিয়ে, প্রতীক্ষা নিয়ে বিরাট বিরাট রেখা টানছে আকাশে।

হারিয়ে গেছে স্বাতী। ট্রেনটা এখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। পৃথিবীর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। গানও স্তব্ধ। স্বাতীর সৌরভ আঘ্রাণ করছি আমি। রূপ নিয়ে দূরে যেতে যেতে স্বাতী যেন অরূপ হয়ে গেছে। বিটভেনের গভীর কোন সুরের মত এক অনবদ্য মূর্চ্ছনা যেন।

দিল্লীতে ফিরে কাউকে বলা যাবে না কলকাতায় ধোলাইয়ের ভয়ে পালিয়ে এসেছি।